মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা

সুস্মিতা সোম

দিপালী পাবলিশার্স
রামকৃষ্ণপল্লী, চাঁচল,
মালদহ

প্রকাশকাল ঃ আশ্বিন ২০০২

প্রকাশক ঃ
দিপালী পাবলিশার্স
চাঁচল, মালদহ

পরিবেশক ঃ
চক্রবর্তী বুক সেলার্শস
চাঁচল, মালদহ

প্রচ্ছদ ঃ
কৌশিক মুখার্জী

বর্ণ-সংস্থাপন
গ্রাফিক্স 'ও' পয়েন্ট
রামকৃষ্ণপল্লী, মালদহ

মুদ্রণ ঃ
গ্রাফিক্স 'ও' পয়েন্ট
রামকৃষ্ণপল্লী, মালদহ

পরিবেশক ঃ

ফার্মা কে. এল. এম. প্রাঃ লিঃ
২৫৭/বি, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা।

বুকস্
শিলিগুড়ি।

প্রণতি বুকস্
বি. এস. রোড, কুচবিহার

মডেল বুক ডিপো
কৃষ্ণজীবন সান্যাল রোড, মালদা।

গ্রাফিক্স বুকস্ সেন্টার
রামকৃষ্ণপল্লী, মালদা।

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয়
শ্রীসন্তোষ চক্রবর্তী মহাশয়কে

প্রাক-কথন

দেশের ইতিহাস লেখাব কাজে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার বড়ো ভূমিকা আছে। বড়ো বড়ো ইতিহাসবেত্তা, সমাজতাত্ত্বিকেবা এবকম কাজেব জন্য প্রেবণা দিয়েছেন। হাবিয়ে যাওযা বা হাবিয়ে যেতে বসেছে -- এমন সব তথ্য উঠে আসে অঞ্চলগত অনুসন্ধানে। সামাজিক রীতিনীতি-আচাব আচরণগত এমন কিছু তথ্য পাওয়া যায, যা আমাদেব জাতীয় ইতিহাসের জরুরী সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হ'তে পাবে।

অধ্যাপিক সুস্মিতা সোম এবকম একটি বড়ো কাজে হাত দিয়েছেন। মালদহ জেলার স্থাননাম সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইতিহাসেব চূর্ণ উপকরণগুলি খুঁজে খুঁজে বেব কবছেন। এই বইযে তাব কিছুটা নমুনা পাওযা গেল। গভীব ধৈর্য এবং মস্তনী মেহনত ছাড়া এধবণের কাজ কবা সম্ভব নয়।

ড. পুষ্পজিৎ রায়
এম এ পিইচ ডি (কলি)
রামকৃষ্ণপল্লী, মালদহ

ভূমিকা

নৃতত্ত্ববিদ হার্সকোভিটস কালচার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন - A Culture is a way of people (Man and his work). আবার বলা যায় সংস্কৃতি কেবলমাত্র একটি জাতির একটি জনগোষ্ঠীর জীবন যাপন প্রণালী মাত্রই নয়, সংস্কৃতি এক ধরনের মানসিকতা বিনিময়, মনন বিনিময় এর উপায় বা মাধ্যম। মানুষ সমকৃতি এই নামকরণের অন্তরালে নিজেকে খুঁজেছে সেই সঙ্গে অপরকেও খুঁজছে। এই অন্বেষণ ছড়িয়ে গেছে "কুটিরের কোণে, চাষার মাঠে, গৃহস্থের আঙ্গিনায়, নদীর পাড়ে, বটের ছায়ায়, জনহীন শ্মশানে, অন্ধকার-অরণ্যে, নৃত্যসঙ্গীত পূজা-আরাধনার বিচিত্র আনন্দে।"— সেই-ই আমাদের ঐতিহ্য, সেই-ই আমাদের উত্তরাধিকার। অথচ আশ্চর্য, তীব্র গতিশীলতার এই সময় সারনীতে দাঁড়িয়ে আমরা বিস্মৃত হচ্ছি সেই শিকড় সম্বন্ধ। বিজ্ঞানের সাধনা যদিও সংযোগের সেতুবন্ধ রচনায় নিরন্তর তবুও "সকল লোকের মাঝে বসে / আমার নিজের মুদ্রাদোষে / আমি একা হতেছি আলাদা?"- তাই এই ঐতিহ্যের শিকড় সন্ধান করা আমার অস্তিত্বের প্রশ্নেই প্রয়োজন।

সমগ্র ভারতবর্ষ যে সংস্কৃতি নিয়ে বিশ্বেব মধ্যে ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র জেলা মালদহ ও তার ব্যতিক্রম নয়। উত্তরবঙ্গের এই জেলা অন্যতম ও অনন্য কেবলমাত্র তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই নয়, বৈচিত্র্য রয়েছে এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদে, জনগোষ্ঠীর লৌকিক বৈভব ও সাংস্কৃতিক পরম্পরায়, সুপ্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধির ঐতিহাসিক রেখাচিত্রের মধ্যে। আমার এই উপলব্ধি কর্মসূত্রে প্রায় দু দশক ধবে দেখা সুন্দরী মহানন্দা অধ্যুষিত পুরাতন মালদহের জাতি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ভৌগোলিক বৈচিত্র্যেব সাথে আন্তবিক পরিচয়ে। শুধু তাই নয় এই জেলার অসংখ্য গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে সীমানা ঘিরে থাকা পূর্ব বাংলা, বিহার ও তরাই অঞ্চলেব ভাষা, আচার-আচরণ ইত্যাদির এক মিলিত মিশ্রিত রূপ। এই অভিজ্ঞতায় আরও নতুন উপকরণ দিয়ে আলোকপাত করেছেন আমার সহকর্মীরা এবং আমার ছাত্র-ছাত্রীরা। রয়েছেন মালদহ জেলার বিদগ্ধ মানুষেরা, যাদের উপলব্ধি সমৃদ্ধ করেছে আমাকে।

'মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা' কোন অভিনব ব্যাপাব নয়, এই জেলার গুণীজন মানুষেরা অনেক আগেই সেই কাজগুলি কবে গেছেন আরও সুচারু ভাবে, আমি শুধু সেগুলিকে একত্রে গ্রথিত করে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে সংযোজিত করেছি মাত্র।

সমুদ্রসম এই কাজে আমার অনুসন্ধানের অনেক ত্রুটি সহজেই চিন্তাবিদদের নজরে আসবে; সহৃদয় পাঠকের সেই নির্দেশিকা আমার আগামীর সঞ্চয় হয়ে থাকবে নিশ্চয়।

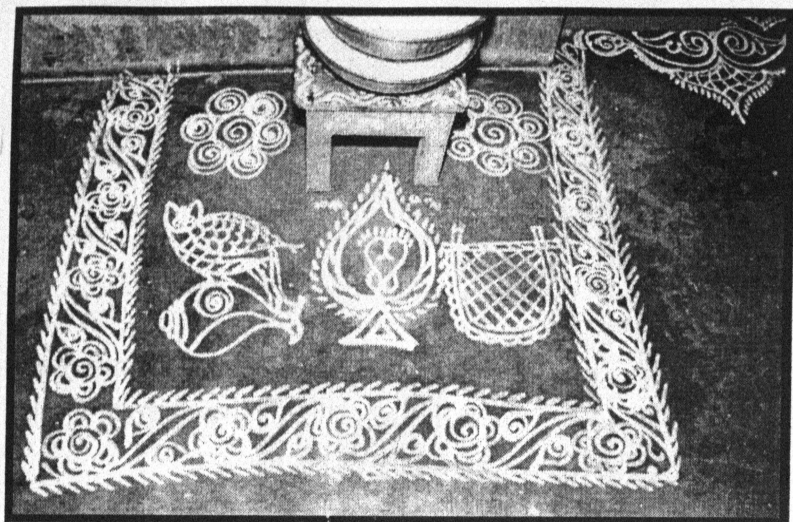
বিভিন্ন সময়ে যাঁদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি, তাদের মধ্যে আছেন - অধ্যাপক পুস্পজিৎ রায় (মালদা কলেজ), অধ্যাপক প্রদ্যোৎ ঘোষ (মালদা কলেজ), অধ্যাপক শক্তিপদ পাত্র (রাষ্ট্রীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, মালদা), শ্রী কমল বসাক (ঐ), আতাউল্লাহ (মালদা মডেল মাদ্রাসা), শ্রী প্রশান্ত গুহ মজুমদার (সহ সমাহর্তা), শ্রী দিলীপ চক্রবর্তী (রাজস্ব), শ্রী সমর রায় (বিধায়ক, মালদা), শ্রী পুন্ডরীকাক্ষ্ম রায় (সেচ অধিকর্তা, মালদা), শ্রী রতন দাশগুপ্ত (চাঁচল কলেজ, মালদা), চৈতালি চট্টরাজ (মালদা মহিলা মহাবিদ্যালয়)।

এই বইটি প্রকাশে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন শ্রী সমীর চক্রবর্ত্তী, প্রকাশনার কার্যভারে শ্রীমতি সোনা চক্রবর্ত্তী এবং চিত্রগ্রহণে সঞ্জিৎ কর্মকার। এদের আমি ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ মুদ্রক শ্রী কৌশিক মুখার্জীকেও। বর্তমান বইটির প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, পরামর্শ ও সাহস দিয়ে সাহায্য করেছেন মালদহের অনেক স্বনামধন্য গুণী ব্যক্তিরা। কেবলমাত্র ধন্যবাদ দিয়ে যাদের ঔদার্যকে পরিসীমায় আনা যায় না।

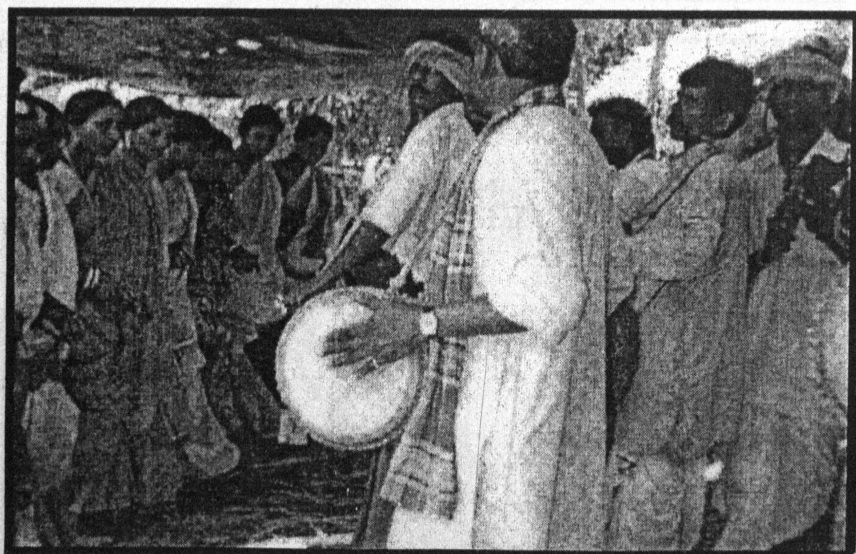
সুস্মিতা সোম

সূচীপত্র

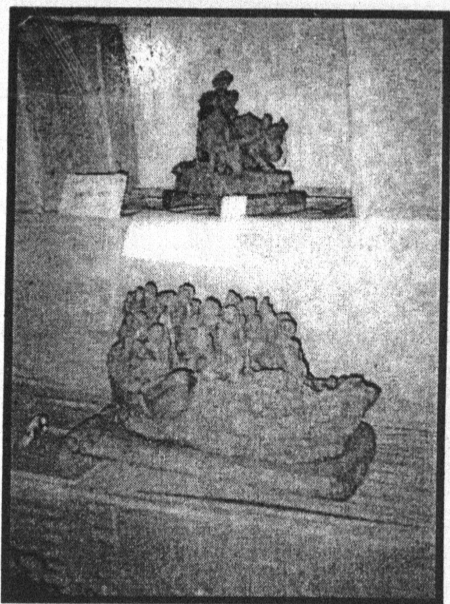
মালদহ জেলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	০৯
মালদহ স্থান নামের ইতিহাস অনুসন্ধান	৮৬
স্বাধীনতা উত্তর মালদহ জেলা গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	৯৬
মালদহ জেলায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়	১০০
ভাষা সমুহের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য	১৩৬
মালদহ জেলার মানুষের ধর্ম	১৫৩
মালদহ জেলার মানুষের আচরিত পাল-পার্বণ	১৬৩
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন ধারাসমূহ	২০৬
মালদহ জেলার আঞ্চলিক শিকড় অনুসন্ধান	৩০৬



পুরাতন মালদহের অগ্রহায়ণ মাসের নবান্ন উৎসব।



সাঁওতালদের 'বাহা' উৎসবের নাচ।



'ভাঙন রোধের ব্যর্থ প্রয়াস',
সনাতনের তৈরী মৃৎশিল্প।



গঙ্গা ভাঙ্গনের মাটি দিয়ে
অনবদ্য শিল্প সৃষ্টি করেছেন
শিল্পী সনাতন।



আঙ্গিনা আলপনা চর্চিত করছেন
সাঁওতাল কিশোরী।



পুরাতন মালদহে বাংলার নিজস্ব
আটচালা রীতির শিবমন্দির।



পার্বতী



হবিবপুরে আলপনা চর্চিত নিজস্ব
আঙ্গিনায় সাঁওতাল গৃহবধু।



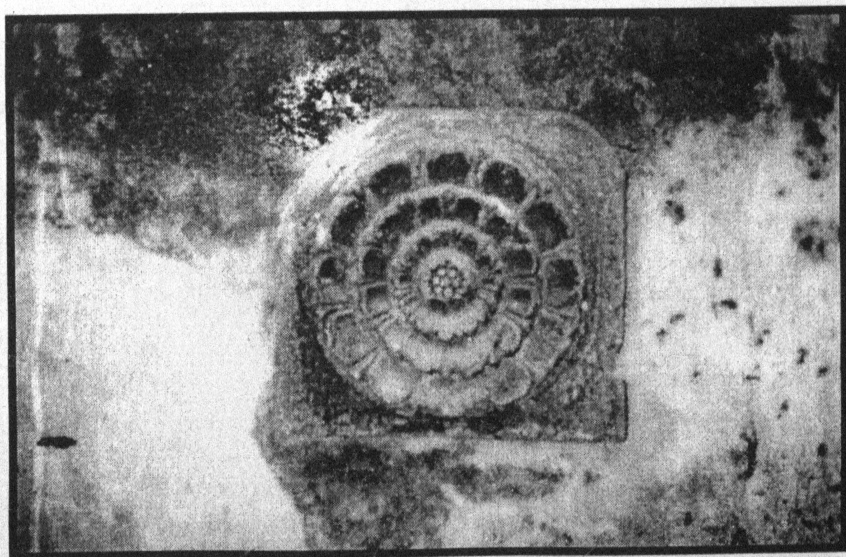
হবিবপুর কেন্দপুকুরে সিধু-কানু-বিরসা মেলায় গম্ভীরা গান গাইছেন দোকড়ি চৌধুরী



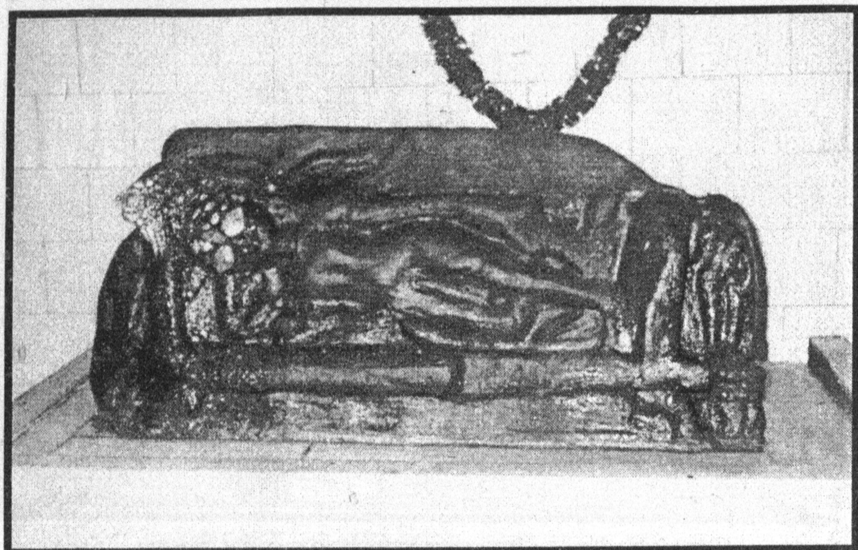
সিধু-জিতু-বিরসার জীবন দুঃখ নিয়ে গাঁথা গান গাইছেন সাঁওতাল রমণীরা।



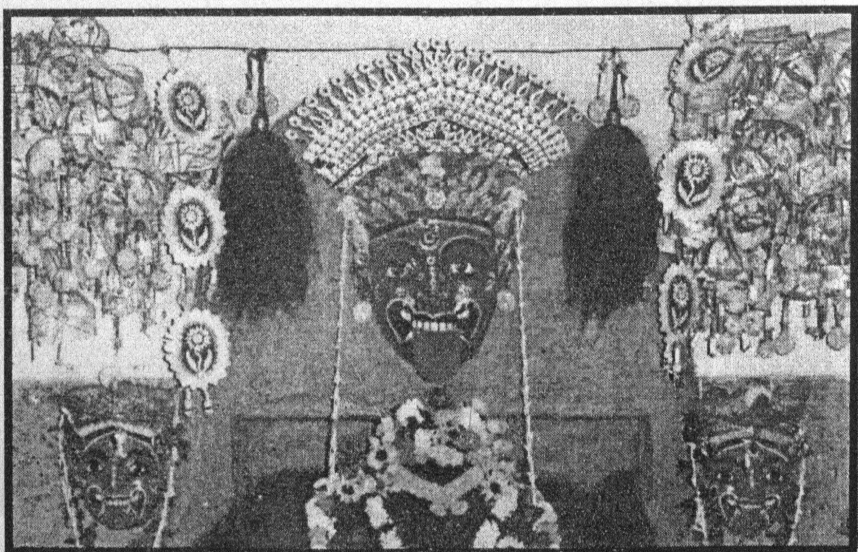
জগজ্জীবনপুরে খননকার্যের ফলে পাওয়া বৌদ্ধ বিহার।



পুরাতন মালদহে মহানন্দা ঘাটের সিঁড়িতে
অনবদ্য পদ্ম মোটিভ, পাল-সেন আমলের।



মা ও ছেলে (বুলবুলচন্ডী)



জহুরা মায়ের মুখোশ

মালদহ জেলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রাচীন কাল

গৌড়ভূমি ঃ

মালদহ জেলার অতীত ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন গৌড় জনপদ এবং প্রাচীন পান্ডু নগরের প্রসঙ্গ বার বার চলে আসে। কারণ প্রাচীন তথা অদ্যাবধিকালের ইতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে বর্তমান মালদহ জেলা গৌড় জনপদের অন্তর্গত ছিল। পানিনি সূত্রে গৌড়পুর নামে একটি অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পরিস্কার বলা আছে, এই গৌড়পুর পূর্বভারতে অবস্থিত। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে কৌটিল্য উল্লিখিত গৌড় এবং বর্তমান মালদহ জেলার গৌড় একই জায়গা যা ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে এই গৌড় দেশের একাধিক পণ্যের উল্লেখ পাই, তারমধ্যে অন্যতম হল গুড়, এই দেশে প্রচুর ইক্ষু চাষ হত ও তা থেকে উৎকৃষ্ট গুড় বিদেশে চালান যেত। পন্ডিত মহলের ধারনা ব্যাপক পরিমানে গুড় উৎপাদনের কারনেই এই দেশ গৌড়পুর নামে বিখ্যাত হয়েছিল। পুন্ড্রবর্ধন বা বর্তমান পান্ডুয়া আজও বরেন্দ্রভূমের একটি বিশিষ্ট স্থানের নাম। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়িক স্বর্ণের উল্লেখ আছে। পরবর্তী জৈন গ্রন্থ 'আচারঙ্গ সূত্রে' গৌড় দেশকে 'দুকুলের জন্য (রেশম) বিখ্যাত দেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দুকুল অর্থাৎ স্বর্ণাভ রেশম-ই কৌটিল্য বর্ণিত 'গৌড়িক স্বর্ণ' হতে পারে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। একথা বলার সপক্ষে যুক্তি হল উত্তরবঙ্গে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্যযুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত এক লিপি। সম্ভবত গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকেই বাংলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসে গৌড়ের প্রথম অভ্যুত্থান ঘটে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কিছু আগে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির তাঁর 'বৃহৎ-সংহিতা' গ্রন্থে গৌড়কে বাংলার অংশ বিশেষ বলে বর্ণনা করে গেছেন। বাংলার অপর অংশগুলির নাম যথাক্রমে পুন্ড্র, তাম্রলিপ্তি, বঙ্গ, সমতট ও বর্ধমান। ভবিষ্যপুরাণে গৌড় দেশকে বর্ধমানের উত্তরে ও পদ্মাব দক্ষিণে বলা হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে 'অনর্ঘ-রাঘব' এর লেখক মুরারি মিশ্র লিখেছেন যে, গৌড়ের রাজধানী ছিল চম্পায়। চম্পার অবস্থিতি ছিল দামোদর নদের তীরে বর্ধমানের উত্তর-

পশ্চিমে। পদ্মা পুরানে গৌড় দেশের রাজা নরসিংহের নাম পাওয়া যায়। স্কন্ধ পুরাণে আবার পঞ্চ গৌড়েব উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পাঁচটি স্থান হল যথাক্রমে—সারস্বত (পাঞ্জাব), কান্যকুব্জ (কনৌজ), গৌড় (বাংলা), মিথিলা (দ্বারভাঙ্গা) ও উৎকল (উড়িষ্যা)। এই স্থানের অধিবাসীদের পঞ্চ গৌড় বলা হত। আবার এই পঞ্চ গৌড়ের মধ্যে মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যবর্তী গৌড় রাজ্যই সকলের কাছে বেশি পরিচিত ছিল। এই পঞ্চগৌড়ের ব্রাহ্মণেরাই অবশ্য পরবর্তীকালে সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 'পঞ্চগৌড়' নামের প্রাচীনতম উদাহরণটি রয়েছে ৯২৬ খ্রীঃ রাষ্ট্রকূট অধিপতি তৃতীয় ইন্দ্রের চিঞ্চান তাম্রশাসনে। অনেক পরবর্তী কালে মিথিলার রাজা শিবসিংহ 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহন করেন।

ইতিহাসগত ভাবে যে গৌড়দেশের নাম পাওয়া যায় সেই গৌড় দেশ বলতে পশ্চিমবাংলার মালদহ, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলকেই বোঝাত। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সুযোগে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ নগরকে কেন্দ্র করে স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। কলহনের রাজতরঙ্গিনী ও হিউয়েন সাং-এর ভ্রমন বৃতান্তে মনে হয় যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই গৌড় রাজ্য নানা টুকরো টুকরো অংশে বিভক্ত ছিল। রাজা শশাঙ্ক-ই প্রথম এই বিচ্ছিন্ন বাজ্যগুলিকে বাহুবলে একত্রিত করে সিংহাসনে বসেন। তিনিই প্রথম দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা ও উড়িষ্যার কিছু অংশ এই গৌড় দেশের অন্তর্ভুক্ত করে তার সীমানা বর্ধিত করেন। তিনি মগধও অধিকার করে নিজেকে 'মগধেশ্বর' এই উপাধিতে চিহ্নিত করতেন। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত গৌড়রাজ 'মগধেশ্বর' উপাধি বহন করতেন। কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মা 'মগধেশ্বর' গৌড় রাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গৌড়েশ্বর উপাধিও গ্রহন করেছিলেন। রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে এক চরম বিশৃঙ্খলা তথা 'মাৎস্যনায়' দেখা দেয়। এই অরাজকতার হাত থেকে বাঙলাদেশকে উদ্ধার করেন খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে 'প্রকৃতিপুঞ্জ' থেকে মনোনীত পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল।

পাল বংশ ঃ

গোপালের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে যা জানা যায় তা হল তিনি বরেন্দ্র অধিবাসী। তিনি যোদ্ধা ছিলেন, তাঁর পিতা বপট ও পিতামহ দয়িতবিষ্ণু। তিনি রাজা নির্বাচিত হন ৭৪০ খ্রীঃ থেকে ৭৫০ খ্রীঃ মধ্যে এবং তাঁর মৃত্যু হয় আনুমানিক ৭৭০ খ্রীঃ। পাল বংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। গোপালেব পর তাঁব পুত্র ধর্মপাল (৭৭০ - ৮১০ খ্রী) সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করে 'পরমেশ্বর', 'পরমভট্টারক', 'মহারাজাধিরাজ' ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করেন। ধর্মপালের পর তাঁর পুত্র দেবপালের (৮১০ - ৮৫০ খ্রীঃ) রাজত্বে পাল সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়েছিল। মুঙ্গের থেকে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনে জানা যায় যে, ধর্মপালের রাজ্য সীমা হিমালয় থেকে রামেশ্বরম সেতুবন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। মালদহ জেলা থেকে পাওয়া খালিমপুর তাম্রশাসন ধর্মপালের বিজয় উৎসবেব ৩২তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে খোদিত হয়েছিল। ধর্মপালদেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় দেবপাল দেব সিংহাসন আরোহন করেন। রাষ্ট্রকূট অথবা গুর্জর রাজগণের সাথে যুদ্ধ করে দেবপাল দীর্ঘকাল গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। দেবপালের পব তাঁব পুত্র শূরপাল এবং মহেন্দ্রপাল কিছুদিনের জন্য রাজত্ব করেন। এরপর বিগ্রহপাল, (৮৫০ - ৮৫৮

খ্রীঃ আনুমানিক), নারায়ণ পাল (৮৫৮ - ৯০৮ খ্রীঃ), রাজ্যপাল (৯০৮ - ৯৪০ খ্রীঃ), দ্বিতীয় গোপাল (৯৪০ - ৯৬০ খ্রীঃ), দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯৬০ - ৯৮৮ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় বিগ্রহপালেব আমলে গৌড়রাজ্য পালবংশীয় রাজাদের হস্তচ্যুত হয়। কারণ এই সময় চান্দেল বংশীয় রাজা যশোবর্মা গৌড় দেশ আক্রমণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিমালয় পর্বতবাসী কম্বোজ জাতি উত্তরবঙ্গ আক্রমণ করেছিল। উত্তরবঙ্গের বর্তমান অধিবাসী কোচ, মেচ, রাজবংশী, পলিয়া সেই কম্বোজ জাতিরই বংশধর। কম্বোজ বংশীয় রাজগণের পর গৌড় দেশ কিছুকাল চন্দ্র বংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। গৌড়দেশকে পুনরায় পাল শাসনাধীনে নিয়ে আসেন বিগ্রহ পালের পুত্র মহীপাল (৯৮৮ খ্রীঃ আনুমানিক)। তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল বাজত্ব করেছেন। মহীপালের পর তাঁর পুত্র নয়পাল, তারপর তৃতীয় বিগ্রহপাল, রাজত্ব করেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দুর্বল ও অকর্মণ্য দ্বিতীয় মহীপাল কৈবর্তনায়ক দিব্যের (দিব্যক/দিব্বোক) হাতে পরাজিত ও নিহত হন। এরপরও নামমাত্র রাজা হয়েছিলেন দ্বিতীয় শূরপাল (১০৮০ - ৮২ খ্রীঃ আনুমানিক)। দ্বিতীয়বার গৌড়দেশকে নিজ অধিকারে নিয়ে আসেন শূরপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল (১০৮২ - ১১২৪ খ্রীঃ আনুমানিক)। তিনি প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বরেন্দ্র উদ্ধার করার জন্য সামন্ত রাজাদের কাছ থেকে সৈন্য নিয়ে কৈবর্তনাযক দিব্যেক পরবর্তী ভীমকে বন্দী ও পরে হত্যা করেন। এই ভাবে বরেন্দ্র ভূমি উদ্ধার করে রামপাল রামাবতী নামক জায়গায় নতুন রাজধানী স্থাপন করে রাজত্ব করেন। তিনি দীর্ঘ প্রায় ৩৩ বছর রাজত্ব করেন। এইসময় তিনি বরেন্দ্র ভূমিকে শুধু সুরক্ষিত ই নয় তার সীমানাও বর্ধিত করেছিলেন। পাল বংশের এই শেষ সম্রাট রামপালের রাজধানী রামাবতীর অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও অনেকেরই মতে এটির অবস্থান মালদহ জেলাব অমৃতি গ্রাম।

এ পর্যন্ত মালদহ জেলা থেকে পাল রাজাদের আমলের তিনটি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হয়েছে। প্রথমটি ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন। এটি পাওয়া যায় ইংরেজবাজার থানার গৌড়ের কাছে খালিমপুরে। দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় গোপাল দেবের। যেটি পাওয়া গেছে মালদা গাজোল থানার জাজিল পাড়ায়। শেষেরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তাম্রশাসন। যেটি সম্প্রতি পাওয়া গেছে মালদা জেলার হবিবপুর থানার জগজ্জীবনপুর তুলাভিটার উত্তর-পূর্ব দিকে (১৯৮৭ সালের ১৩ই মার্চ)। এতে দেবপালের পরলোক গমনের পর তাঁর পুত্র মহেন্দ্র পালের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির কথা আছে।

ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালীন সময়ে গৌড়-মগধ-বঙ্গে শিল্পের বহুবিধ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। এরমধ্যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প অন্যতম। হিন্দু ও বৌদ্ধদের নানারকম মূর্তি, ধাতু ও প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। তারমধ্যে মালদহ জেলাব বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত বিষ্ণু, বরাহ, বুদ্ধ, গণেশ, সরস্বতী, শিব, দুর্গা, মনসা, অষ্টবজ্রা, মধুশ্রী ইত্যাদি অনবদ্য ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি (মালদহ মিউজিয়ামে রক্ষিত) আজও দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। এছাড়া মালদার জগজ্জীবনপুরে সদ্য আবিস্কৃত বিরাট বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে সেই যুগের মানুষের স্থাপত্য কীর্তির উৎকর্ষতা তথা আর্থিক স্বচ্ছলতা।

সেন বংশ ঃ

সেনবংশীয় রাজাদের পূর্বপুরুষেরা ঠিক কোন সময়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন তা আজও সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত তাম্রশাসন ও খোদিত শিলালিপি সমূহ থেকে সর্বপ্রথমে সামন্তসেনের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। জানা যায় তাঁরা চন্দ্রবংশীয় কর্ণাট দেশ বর্তমান মহীশুর অঞ্চলের কানাড়ী ভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলের ক্ষত্রিয় ছিলেন। ষোড়শ শতকের লেখা আনন্দ ভট্টের বল্লাল চরিত থেকে জানা যায় এই সামন্ত সেন পুরাণের প্রসিদ্ধ মহাবীর কর্ণের পৌত্র বীরসেনের বংশজাত। তাঁরা পালরাজাদের অধীনে উচ্চপদস্থ সেনাধাক্ষ্যের কাজ করেছেন বংশানুক্রমে। সামন্ত সেনের পুত্রের নাম হেমন্ত সেন এবং হেমন্ত সেনের পুত্রেব নাম বিজয় সেন। এই বিজয় সেন এর সময়ে গৌড়রাজ ছিলেন মদন পাল। তিনি হত গৌরব হয়ে পড়লে এই সুযোগে বিজয় সেন মদন পালকে পরাজিত করে (১০৯৭ - ১১৬০ খ্রীঃ আনুমানিক) গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। শুধু তাই নয় তিনি বর্মরাজকে পরাজিত করে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গও অধিকার করেন। সেন রাজবংশের খোদিত লিপিমালা থেকে বোঝা যায় যে, বিজয় সেনই সেন রাজবংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। বিজয় সেন শূরবংশ দুহিতা বিলাস দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম বল্লাল সেন। বিজয় সেন প্রায় ৩৫ বছর গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। কারণ তাঁর ৩২ বছর রাজত্বকালীন সময়ে একখানি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয় সেন স্বর্গারোহন করেছিলেন এবং তার পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন পিতৃরাজ্যের অধিকারলাভ করেছিলেন। বাংলার হিন্দু রাজাদের মধ্যে বল্লাল সেনের নাম সর্বাগ্রগণ্য। তিনি আনুমানিক ১১৫৮/৬০ খ্রীঃ সিংহাসন লাভ করেন। বল্লাল সেন রাজা হয়ে নিজের রাজ্য রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ি ও মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, এবং প্রত্যেক ভাগে একএকজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন উপযুক্ত হলে তিনি পূর্ববঙ্গের ভার পান। বল্লাল সেন কেবল বীর ছিলেন না, তিনি ছিলেন বহু শাস্ত্র বিশারদ গ্রন্থ রচয়িতা এবং সমাজ সংস্কারক। তাঁর লেখা 'দানসাগর', 'অদ্ভুতসাগর', 'গ্রন্থদ্বয়' এবং 'বল্লাল চরিত' গ্রন্থ কাহিনী থেকেও তাঁর সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। শাস্ত্রচর্চা, যাগযজ্ঞ, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর আগ্রহ তথা বাংলার কৌলিন্য প্রথার উৎপত্তির সঙ্গে তাঁর নাম আজও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। যদিও তিনি স্বয়ং, তাঁর পুত্র লক্ষণসেন, পৌত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন তাঁদের তাম্রশাসন সমূহে নব প্রচলিত আভিজাত্য বিধির কোনই উল্লেখ করেন নি এবং শাসন গ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের নামোল্লেখ কালেও তাঁদের নতুন পদমর্যাদা উল্লিখিত হয় নি, সুতরাং সেই কারণে কৌলিন্য প্রথা সৃষ্টির জন্য বল্লাল সেন কতখানি দায়ী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। বল্লাল সেন অধিকৃত বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মিথিলার উল্লেখ এর অন্যতম কারণ মহানন্দা নদীর পশ্চিম তীরবর্তী ভূভাগ মিথিলা তিনি যে বৎসর জয় করেন সেই বৎসরে পুত্র লক্ষণ সেনের জন্ম হয়। রাজকুমারের জন্মাব্দ চিরস্মরনীয় করে রাখার জন্য বল্লাল সেন ১১১৯ খ্রীঃ থেকে একটি নতুন অব্দ গণনা শুরু করেন, নাম দেন লক্ষণাব্দ। এরপর মগধের কিয়দংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিলো। বল্লাল সেনের আমলে মালদহ জেলার সাদুল্লাপুরের কাছে সাগরদীঘি খনিত হয়েছিল। এই দীঘিব দৈর্ঘ্য এক মাইল প্রস্থ এর অর্ধেক। এই দীঘিতে ছয়টি বাঁধা ঘাট ছিল। বল্লাল সেন তাঁর একডালা গৌড়দূর্গ এই সাগরদীঘির উত্তোলিত মাটি দিয়েই তৈরী

করান। এছাড়া গৌড় নগরের মাটির দেওয়াল এবং বাঁধের কিছুটাও এই দীঘির মাটির দ্বারা তৈরী ইংরেজবাজারের তিন মাইল পশ্চিমে বাগবাড়ী বা বল্লালবাড়ীতে বল্লাল সেনের উদ্যান বাটিকা এবং প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। বলা হয় বাগবাড়ী বা বল্লালবাড়ীই গৌড়ের প্রাচীনতম প্রাসাদের প্রত্নসাক্ষর বহন করেছে। এছাড়া রয়েছে মালদহ জেলা থেকে ৫ কি.মি. দূরের চন্ডীপুরে বল্লালসেন আমলের দ্বারবাসিনী দেবী চন্ডীর মন্দির তথা রাজধানী প্রবেশের দূর্গ তোরণপথ।

পরিণত বয়সে রাজা বল্লাল সেন তাঁর পুত্র লক্ষণ সেনের হাতে রাজ্য সমর্পন করে ত্রিবেনীর কাছে স্ত্রী সহ বাণপ্রস্থে গমন করেন। এরপর লক্ষণ সেন ১১৭৯ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালীন সময়ের মোট সাতটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। এগুলি যথাক্রমে — গোবিন্দপুর তাম্রশাসন, মাধাইপুর তাম্রশাসন, তর্পণ দীঘি তাম্রশাসন, শান্তিপুর তাম্রশাসন, সুন্দরবন তাম্রশাসন, মাধাই নগর তাম্রশাসন, ভাওয়াল তাম্রশাসন ইত্যাদি। এছাড়া লক্ষণসেন সম্পর্কে জানা যায় মীনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাত-ই-নাসিরী' এবং সেই সময়কার কবি সাহিত্যিকদের রচনা যেমন হলায়ুধ মিশ্র, শূলপাণি, নারায়ন দত্ত, জয়দেব শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য, উমাপতিধর ও ধোয়ী কবিরাজ ইত্যাদির রচনা থেকে। এরমধ্যে কবি ধোয়ীর 'পবনদূত' নামক কাব্য গ্রন্থের বিষয় হল- "লক্ষণ সেন একবার দিগ্বিজয় করতে গিয়ে ভারতের দক্ষিনাংশে মলয় পর্বতে উপস্থিত হন। তাঁকে দেখে কুবলয়বতী নামের এক গন্ধর্বকন্যা আকৃষ্ট হয়। তিনি তখন পবনকে দূত করে লক্ষণ সেনের কাছে প্রেরণ করছেন যাওয়ার পথের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে। এই গ্রন্থের বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে, গৌড়ের কোন স্থানে নয় বিজয়পুর নামক স্থানে লক্ষণ সেনের রাজ্যাভিষেক হয়েছে। ধোয়ী কবি এই কাব্য লিখে লক্ষণ সেনের কাছ থেকে 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করেছিলেন। শ্রীমতি বসুদেবী লক্ষণ সেনের প্রথমা মহিষী ছিলেন। হলায়ুধ মিশ্রের 'সেখশুভোদয়া' তে বর্ণিত আছে যে রাজা পরিণত বয়সে বল্লভা নাম্নী অন্ত্যজ বংশ জাত এক নারীকে বিবাহ করেছিলেন। সেই কারণে তাঁর রাজ্যে প্রভূত অশান্তির কারণ উপস্থিত হয়েছিল। সেখ শুভোদয়ার বর্ণনা অনুযায়ী তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ও বিখ্যাত ধনুর্দ্ধরও ছিলেন। তিনি গঙ্গা তীরে শরাভ্যাস করতেন সেই শর গঙ্গা অতিক্রম করে অপর পারে গিয়ে পড়ত। তিনি খুব বেশি যুদ্ধ বিগ্রহ পছন্দ না করলেও কাশ্মীররাজ তাঁর কাছে পরাজিত হন এবং প্রাগ্-জ্যোতিষপুরের রাজা (কামরূপ - আসাম) তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। লক্ষণ সেন প্রথম বয়সে শৈব ও শেষ বয়সে পরম বৈষ্ণব হন। তিনি দেবী চন্ডী পূজারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আবার তার রাজত্বের শেষ দিকে মুসলীম পীর মখদুমশাহ জালালুদ্দিনের কৃপাভাজনও ছিলেন। কেশব সেনের তাম্রশাসনে তাঁর উপাধি সূদন শঙ্কর। লক্ষণ সেনের নামানুসারে তাঁর রাজধানীর নতুন নামকরণ হয় লক্ষণাবতী। ইসলাম শাসনাধীন বাংলায় যা 'লখনৌতি' নামে সুপরিচিত ছিল। লক্ষণ সেনই সম্ভবত সম্পূর্ণ গৌড় দেশ জয় করেছিলেন তাই তাঁর আমল থেকেই সেন রাজাদের উপাধি হয় 'গৌড়েশ্বর'। নানা গুণে বিভূষিত লক্ষণ সেন দুর্ধর্ষ তুর্কী ইখতিয়ার-উদ্দিন-বিন-বখতিয়ার-খিলজীর অতর্কিত আক্রমণে আত্মসমর্পনে বাধ্য হয়ে লক্ষণাবতী ছেড়ে যেতে বাধ্য হন, এইরকম বহু প্রচলিত একটি ঐতিহাসিক ধারণা অদ্যাবধি স্বীকৃত হয়ে আসছে। তবে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং সুখময় মুখোপাধ্যায় এর মতে মীনহাজ-উদ্দিন-সিরাজ যত সহজে এই পট পরিবর্তনের বর্ণনা দিয়েছেন তত সহজেই তা ঘটেছিল এইরকমটি মনে করেন না। এছাড়া বখতিয়ারের কাছে

পরাজিত হয়েও লক্ষণ সেন পূর্ববঙ্গে তাঁর অধিকার অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। এমনকি তাঁর পুত্ররা যথাক্রমে মাধব সেন, বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পরেও ১২২৩ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করে গেছেন বিভিন্ন তাম্রশাসনে তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য নদ-নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা মরুভূমি তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যদের খুব একটা সহজ গম্য ছিল না বলে বাংলায় তাঁদের অধিকার কায়েম করতে প্রায় ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সময় লেগেছিল। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় বাংলার ইতিহাসে সেন বংশের রাজত্বকাল এক গৌরবময় অধ্যায়। পালবংশের পতনের পর বাংলা এক চরম বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয়েছিল। সেনবংশীয় রাজারা সেই অব্যবস্থার হাত থেকে বাংলাদেশকে এক সুস্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থা উপহার দিয়ে প্রজাদের সুখ-শান্তি ও মঙ্গল বিধান করে ছিলেন।

বঙ্গদেশ ঃ

১৯৪৭ খ্রীঃ অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালীর আবাস ভূমিকে বলা হোত বঙ্গদেশ। প্রথমে এই 'বঙ্গ' শব্দটি একটি কৌম গোষ্ঠীর নাম হিসাবে আমরা পাই। পরে শব্দটি ভৌগোলিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কৌমগোষ্ঠীর নাম হিসাবে 'বঙ্গ' নামটির সঙ্গে বৈদিক যুগের আর্যরাও পরিচিত ছিল। বঙ্গ নামটি প্রথম পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। সেখানে বঙ্গ বাসীদের 'বয়াংসি' বা পক্ষীজাতীয় বলা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে 'পুন্ড্র' জাতিরও নাম পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এই 'পুন্ড্র' জাতিকে 'দস্যু' বলে বর্ণনা করেছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্র অনুযায়ী এই বঙ্গদের অবস্থিতি ছিল মধ্য-পূর্ব বঙ্গে আর পৌন্ড্রদেব উত্তরবঙ্গে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ মৌর্য সাম্রাজ্য ভুক্ত হওয়ার অর্ন্তবর্ত্তীকালে বঙ্গ বহু নামে পরিচিত হোত। যথা — গৌড়, বঙ্গ, সমতট, চন্দ্রদ্বীপ, বঙ্গাল, পুন্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, বারক, কঙ্কগ্রাম, বর্ধমান, কজঙ্গল, দন্ডভুক্তি, খাতি, নাব্য ইত্যাদি। এর ভৌগোলিক সীমারেখাও বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। ভাগীরথীকে সীমারেখা ধরে তার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল কজঙ্গল, রাঢ়, কঙ্কগ্রাম, কবট, সুহ্ম, তাম্রলিপ্তি ও দন্ডভুক্তি। প্রাচীন বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় তথা ভৌগোলিক ইতিহাসের প্রধান উপাদান কিংবদন্তী। সিংহলের দীপবংশ ও মহাবংশ নামের দুটি প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধ দেবের আবির্ভাবের অগে বঙ্গদেশের বঙ্গনগরে এক রাজা ছিলেন, তিনি কলিঙ্গ দেশের (ওড়িশা) রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। সেই বংশজাত বিজয় নৌকা যোগে লঙ্কাদ্বীপে এসে উপস্থিত হয় এবং কুবেনী নামের এক যক্ষিনীকে বিবাহ করে সিংহল দেশে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে ও বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পারা যায়। মহাভারতে পাওয়া যায় অসুর রাজা বলির কথা, তাঁর পত্নি সুদেষ্ণার পঞ্চপুত্রের নাম যথাক্রমে — অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র এবং সুহ্ম। আলেকজান্ডাব তার ভারত আক্রমণ কালে স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য গঙ্গারিডি রাজ্যেব কথা শুনে ছিলেন। অনুমান এর পব থেকেই বাংলা তার স্বাধীনতা হারায়। মহাস্থানগড়ের এক শিলালিপি অনুযায়ী জানা যায় যে উত্তরবাংলা মৌর্য সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল। এবং খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত বাংলা গুপ্ত রাজ গণের অধীন ছিল। ধরে নেওয়া যায় এই সময় থেকেই আর্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বাংলাদেশে ঘটেছিল। 'মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' থেকে আমরা জানতে পারি যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মানব মাত্র আট মাস পাঁচদিন সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন। ৬৩৮ খ্রীঃ চৈনিক পরিব্রাজক উয়াং চুয়াং এদেশে

এলে তিনি বাংলাকে পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত দেখেছিলেন। যথা কজঙ্গল, পুন্ড্রবর্ধনভুক্ত, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট। এ থেকে অনুমান করা যায় যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে সুদৃঢ় রাজশক্তির অভাবে বঙ্গদেশ খন্ড বিখন্ড হয়ে গিয়েছিল। এবং অনেক স্বাধীন নৃপতির আবির্ভাব ঘটেছিল। এরপরই বাঙলা একাধিক বৈদেশিক আক্রমণ দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। রাঘোলি অভিলেখ থেকে জানা যায় যে, শৈলবংশীয় রাজা বঙ্গদেশ আক্রমণ করে পুন্ড্রবর্ধনের রাজাকে পরাজিত ও নিহত করে। ৭৩০ খ্রীঃ কান্যকুব্জ রাজ যশোবর্মন বঙ্গদেশ অধিকার করেন। এরপর একে একে বিভিন্ন সময়ে কাশ্মীবরাজ, ললিতাদিত্য, কামরূপরাজ হর্ষদেব ইত্যাদির দ্বারা বঙ্গদেশ আক্রান্ত হয়। এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে বঙ্গদেশে যে ঘোর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তার থেকেই মাৎস্যন্যায়ের উদ্ভব ঘটে।

এই ব্যাপক অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়ের হাত থেকে বঙ্গদেশকে রক্ষা করেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপালের সময় থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মদনপালের সময় পর্যন্ত পালবংশই বঙ্গদেশে নিরঙ্কুশ শাসন করে এসেছেন। একই রাজবংশের ক্রমান্বয়ে চারশত বছর রাজত্ব করা ভারতের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা। নবম ও দশম শতাব্দীতে পাওয়া লিপি থেকে আমরা জানতে পারি, পালযুগের শেষ ভাগে বঙ্গদেশ উত্তর ও অনুত্তর, এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ বাংলায় (বাখরগঞ্জ জেলা) চন্দ্রদ্বীপ নামে এক রাজা ছিল। লহড়চন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র নামে আরও দুজন রাজার নাম তৎকালীন তাম্রশাসন থেকে জানা যায়।

পাল বংশের পতনের পর বাংলায় সেনবংশ রাজত্ব করে। এই সেনরাজাদের আমলে বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভক্ত ছিল, যথা - বিক্রমপুর ভাগ ও নাব্য।

একাদশ শতাব্দীর লিপিগুলিতেই প্রথম 'বঙ্গাল' দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই 'বঙ্গ আল' শব্দই মুসলমান যুগে বঙ্গদেশকে 'বঙ্গাল' নামে অভিহিত করতে সাহায্য করে। কিন্তু সমগ্র দেশ বোঝাতে 'বঙ্গাল' নামটি মোগল যুগেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। ডঃ সুকুমার সেন এই শব্দটির অর্থের বুৎপত্তি (বঙ্গা + লাহ) সমাস নিষ্পন্ন পদ না ধরে তদ্ধিতান্ত অর্থ করেছেন অর্থাৎ 'যে দেশে ভাল কার্পাস জন্মায়।' মুঘল সাম্রাজ্যের এটা ছিল পূর্বতম সুবা, এর বিস্তৃতি ছিল ভাগীরথীর পূর্বপ্রান্ত থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত। আকবরের সময়ে এই বাঙলাদেশ ১৯ টি সরকারে বিভক্ত ছিল। তার অর্ন্তভুক্ত ছিল ৬৮৯ টি মহাল। বাঙলাদেশ থেকে দিল্লীর দরবারে প্রেরিত রাজস্বের পরিমান ছিল ১,০৬,৯৩,০৬৭ আকবরশাহী টাকা, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় বাঙ্গালাদেশের সীমা বর্ধিত হয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় হিজলি, মেদিনীপুর, জলেশ্বর, কোচবিহারের অংশবিশেষ, পশ্চিম আসাম, ত্রিপুরা, ছোটনাগপুরের অংশ বিশেষ ও সুন্দরবন। এই বর্ধিত তালিকায় বাঙলাদেশ ৩৪টি সরকারে বিভক্ত হয়। তখন এর অর্ন্তভুক্ত হয় ১৩৫০ টি মহাল এবং রাজস্বের পরিমান ১, ৩১, ১৫, ৯০৭ টাকা।

প্রাচীন বাংলার ভূগোল তথা ইতিহাস থেকে বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি পৃথক জনপদে বিভক্ত ছিল বলেই জানা যায়। বিভিন্ন সময়ে বিদেশী পর্যটকেরা এই বিশাল ভূখন্ডের বিভিন্ন অংশকে 'বাংঘেলা' 'বেঙ্গালা' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। ইংরেজরা এই বঙ্গদেশকে বলতেন বেঙ্গল। তারা আবার এই নামটি গ্রহণ করেছিল তাদের পূর্ববর্তী আগন্তুক পোর্তুগীজদের দেওয়া

বেঙ্গলা শব্দ থেকে, 'বেঙ্গলা' শব্দটি আবার মুসলমানদের দেওয়া 'বঙ্গালহ' শব্দের রূপান্তর মাত্র। ১৫২৮ খ্রীঃ পাঠান সুলতানরা 'বঙ্গালহ' শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন। তবে তার আগে থেকেই বৈদেশিক পর্যটক মার্কো পোলো ও রশিদুদ্দিন তাঁদের ভ্রমন কাহিনীতে 'বঙ্গাল' নাম ব্যবহার করছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীঃ সম্রাট আকবর 'বাঙলা' অধিকার করে 'বঙ্গাল' শব্দটি আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহন করেন। পরবর্তীতে অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে বাঙলার চৌহদ্দি আরও বিস্তৃত হয়ে উড়িষ্যা, বিহার, আসাম, ছোটনাগপুর প্রভৃতি প্রদেশ গুলিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙলার প্রশাসনিক ক্ষমতা কার্যত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে যায়। এরও পর একশত বছর অর্থাৎ ১৮৫৮ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের পর বাঙলাদেশ সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ হয়। এরপর থেকে ইংরেজদের নথিতে বাঙ্গলাদেশ 'বেঙ্গল' নামে স্থায়ী আসন লাভ করে। ১৮৬৭ খ্রীঃ ভারত সরকারের ১৭৫৮ নং ঘোষিত আদেশে ভারতকে ১২টি শাসন-বিভাগে বিভক্ত ঘোষণা করা হয়। এইগুলি যথাক্রমে— ১) বেঙ্গল, ২) বোম্বে, ৩) মাদ্রাজ, ৪) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, ৫) পাঞ্জাব, ৬) আসাম, ৭) মধ্যপ্রদেশ, ৮) ব্রিটিশ ব্রহ্ম, ৯) বেরার, ১০) মহীশুর ও কুর্গ, ১১) রাজপুতানা, ১২) মধ্যভারত। সুতরাং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দেও বাংলার আয়তন ছিল বিশাল, যার অর্ন্তভুক্ত ছিল আজকের বিহার, ওড়িশা এবং আসাম। কিন্তু রাজনীতিগত শক্তি ক্ষয় করার দুরভিসন্ধি নিয়ে ব্রিটিশ সরকার এই বাঙলাদেশকে খর্ব করার চেষ্টা শুরু করেন। তাকে ক্রমশ ছোট করে আনা হয়েছিল বঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা ও ছোট নাগপুরে। তারপর আসাম প্রদেশকেও পৃথক করে সেটিকে একজন চীফ্ কমিশনারের শাসনাধীনে দেওয়া হয়। ১৯০৩ খ্রীঃ মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার এনড্রু ফ্রেজার ব্রিটিশ প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বাঙলাদেশকে দুখন্ডে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলা জুড়ে আন্দোলন গড়ে ওঠে। কিন্তু এই জনমতকে অগ্রাহ্য করে ১৯০৫ খ্রীঃ ১৭ই অক্টোবর বাঙলাদেশ দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়। আসাম, ঢাকা-বিভাগ, চট্টগ্রাম-বিভাগ, পার্বত্য-ত্রিপুরা, দার্জিলিং ও সমগ্র রাজশাহী বিভাগ একত্রিত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। এরফলে আন্দোলন আরও তীব্রতর হলে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ১৯১১ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে এক ঘোষণার দ্বারা বঙ্গভঙ্গের আদেশ রহিত করেন। এই ঘোষনার দ্বারা দার্জিলিং, ঢাকা-বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ ও রাজশাহী বিভাগকে পুণরায় বাঙলার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। এরপর ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে গেল দিল্লীতে এবং বাংলাদেশ থেকে আলাদা করে দেওয়া হল বিহার ও উড়িষ্যাকে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের শর্ত হিসাবে আবার দ্বিখন্ডত হল বাংলাদেশ- পশ্চিমবঙ্গ ও পাকিস্তান। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে পুর্ব পাকিস্তান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে 'বাংলাদেশ' নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত সংযুক্ত বাংলার মোট আয়তন ছিল ৭৭,৫২১ বর্গমাইল। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ নামাঙ্কিত এই বাংলার আয়তন ৩৩,৯২৮ বর্গমাইল।

বঙ্গ এই শব্দটি ঠিক কোন ভাষার অর্ন্তভুক্ত সে বিষয়ে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। অনেকের মতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গঙ্গা ইত্যাদি শব্দগুলি প্রাগার্য তিব্বতীয় উৎস থেকে উদ্ভুত। কারোর মতে প্রাগার্য মুন্ডারী (বোঙ্গা) ভাষার শব্দ এটি। আবার বঙ্গ, বাঙ্গাল, বাঙ্গালী এই

শব্দগুলি চর্যাপদে পাওয়ার কারণে প্রাচীনতম বাঙ্গলা ভাষার শব্দ বলেই কেউ কেউ এটিকে প্রতিপন্ন করতে চান।

পুন্ড্রবর্ধন / বরেন্দ্র ঃ

পুন্ড্রবর্ধন নগর পুন্ড্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন বুদ্ধদেবের খুল্লতাত পুত্র পান্ডুশাক্য কর্তৃক এই রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। এই নগরের বর্তমান নাম পান্ডুয়া বা পাড়ুয়া। মালদহ জেলার গাজোল থানায় এই বর্তমান পান্ডুয়া নগরের অবস্থিতি। কেউ কেউ বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়কে পুন্ড্রবর্ধন বলতে চান কিন্তু বর্তমান সময়ের অধিকাংশ ঐতিহাসিকই একথা মেনে নিয়েছেন যে মালদহের পান্ডুয়াই প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন বা পুন্ড্রনগব।

উত্তরবঙ্গে পুন্ড্র একটি প্রধান জাতি। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুন্ড্রেব উল্লেখ আছে। করতোয়া ও গঙ্গার মধ্যবর্তী প্রাচীন স্থানের নাম পুন্ড্র। পুন্ড্র রাজ্যের প্রাচীন অধিবাসীরা আজও এদেশেব সর্বত্র পুন্ড্র নামে বসবাস করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এর বর্ণনা অনুযায়ী বিশ্বামিত্রের পুত্র পুন্ড্রগণ থেকে পৌন্ড্র বা পুন্ড্রদেশের নাম হয়েছে। আর ভাগবতের মতে পুন্ডরা যযাতির পুত্র। আর স্থানীয় জনশ্রুতি মহাভারতের পান্ডুরাজার নাম থেকে এই অঞ্চল সৃষ্ট এবং এই রাজ্য খন্ডটি বিরাট রাজার শ্যালক কীচকের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষ্ণদাস মিশ্রের লেখা মগব্যক্তি নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় পুন্ড্রদ্বীপে উপনিবিষ্ট শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে জৈন-ধর্ম অবলম্বন করে পুন্ড্ররীক নামে খ্যাত হয়। মালদহ থেকে বগুড়া পর্যন্ত এক বিশাল এলাকায় এক সময় প্রচুর রেশম উৎপন্ন হোত। এই রেশমকীট পালন ও রেশম উৎপাদন কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরই তখন পুন্ড্ররীক বলা হোত। এই পুন্ড্ররীকরা অধিকাংশ-ই এখন বৈষ্ণবপন্থী এবং চাষবাসের কাজের সঙ্গেও যুক্ত। এরা শক্ত সমর্থ জাতি। মুসলমান রাজত্বকালে এদের অনেকাংশই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় এদের মধ্যে সংস্কৃতিগত এক মিশ্রণ দেখা দিয়েছে। যদিও রেশমকীট পালন কাজে এদের দক্ষতা আজও অনস্বীকার্য। বার্ণভট্টের হর্ষচরিতে একধরনের পৌন্ড্রবাসের কথা বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ সেটা পুন্ড্রদেশীয় রেশমী বস্ত্র।

পুন্ড্রদেশ ইক্ষু তথা আখ উৎপাদনের জন্যও বিখ্যাত ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর ‘বামচরিত’এ উল্লেখ করেছেন যে বরেন্দ্রভূমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে তার ইক্ষুক্ষেত সমূহ। পূর্বকালে বরেন্দ্রভূমের অপর নাম তাই পৌন্ড্রবর্ধন হয়েছিল। সুশ্রুত লিখেছেন যে, পুন্ড্রবর্ধনে এক বিশেষ জাতের আখ জন্মায় যার নাম হচ্ছে পৌন্ড্রক, এই জাতের আখ এখন ভারতেব অন্যত্রও উৎপন্ন হয় এবং মূল নাম অনুযায়ী তাকে ‘পৌড়িয়া’, ‘পৌড়া’ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এই ধরনের উৎকৃষ্ট আখ যে বরেন্দ্রভূমের অর্থনীতির অন্যতম বুনিয়াদ ছিল তা খ্রীষ্টপূর্ব কালের লেখক গ্রীসদেশীয় ইলিয়াস ও লুকানের বচনা থেকে জানতে পারা যায়। তাদের মতে বাঙলার বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ পণ্য ছিল ‘গুড়’ এবং সম্ভবত এই গুড়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতির কারণেই ‘গৌড়’ শব্দের উৎপত্তি হয়েছিল।

হিউয়েন সাং এর বর্ণনা অনুযায়ী এটি একটি বিরাট রাজ্য ছিল। রাজ্যটি সুপরিকল্পিত ও ঘনবসতি সম্পন্ন ছিল। রাজধানীতে জলাশয়, রাজ-কার্যালয় ও পুষ্পোদ্যান ছাড়াও ছিল ২০ টি সঙ্ঘারাম যেখানে প্রায় ৩০০০ বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করত। এক শত হিন্দু দেবালয়। হিন্দুদের মধ্যে

শৈব, বৈষ্ণব ও কার্ত্তিকের উপাসক সংখ্যা অধিক।" পুন্ড্ররাজ্যের কাছেই ছিল কৌশিকী-কচ্ছ রাজ্য। এটি পরে পুন্ড্ররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মালদহ জেলার অন্তর্গত গড়হন্ডা, অলিহন্ডা, ভান্ডার, কান্ডারণ, কুর্শিধা, ভালুকা, প্রভৃতি স্থান কৌশিকী-কচ্ছের অন্তর্গত ছিল। বর্তমান গণেশ জাতি এই কৌশিকী কচ্ছের প্রধান অধিবাসী ছিল। এখনও সামসী, চাঁচল অঞ্চলে এই গণেশ জাতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রাচীনতম এই নগর পান্ডুয়া নামে মালদহ জেলা সদর থেকে প্রায় ৯ কি.মি. উত্তরে আজও ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করেছে।

বরেন্দ্র ঃ

বল্লাল সেনের রাজত্বলাভের বহু আগে থেকে গৌড়ভূমি, রাঢ়, বঙ্গ, পুন্ড্র ও উপবঙ্গ এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এই বঙ্গভূমিতে আদিশূর নামে এক রাজা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। আদিশূরের পর রাজা হন ভুসুর। অনুমান এই ভুসুরই রাঢ়ী, বারেন্দ্রী ও সাতশতী ব্রাহ্মণদের শ্রেণীবিভাগ করেন। এই বংশের বরেন্দ্র শূরের রাজত্বকালে পুন্ড্রদেশের নাম বরেন্দ্রদেশ হয়। এরপর পালবংশীয় রাজারা পুন্ড্রবর্ধন অধিকার করলে শূরবংশীয় এই বরেন্দ্র অধিবাসীরা দক্ষিণে হুগলী জেলার পান্ডুয়া নগরে গিয়ে বসবাস করে। এই সময় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণও রাঢ় দেশে চলে যান। যাঁরা বরেন্দ্র দেশে থেকে গেলেন তাঁরাই বারেন্দ্র নামে অভিহিত হলেন। পালবংশীয় সম্রাটগণের পর বল্লাল সেন রাজা হয়ে নিজের রাজ্যকে রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ি ও মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, এবং প্রত্যেক ভাগে এক একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে পশ্চিমে মহানন্দা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে কামরূপ রাজ্য ও দক্ষিণে গঙ্গা নদী-বরেন্দ্র এই চতুঃসীমার অন্তর্গত। গৌড়, দেবীকোট মহাস্থান ও পুন্ড্রবর্ধন বরেন্দ্র-বিভাগের প্রধান নগর ছিল। বর্তমান ভাতিয়ার বিল বরেন্দ্র বিভাগের অন্তর্গত অন্যতম একটি নগর ছিল। জলপ্লাবনে যার কিছুই আর অবশিষ্ট নাই।

পশ্চিম প্রান্তে রাজমহল পাহাড়, পূর্বদিকে গারো পাহাড়ের মধ্যবর্তী প্রাচীন পাললিক মৃত্তিকায় গঠিত অংশটুকু বর্তমান মালদহ জেলার বরিন্দ্র অংশ যা বারেন্দ্রভূম নামে পরিচিত। এই মৃত্তিকার বয়স আনুমানিক ৫০ লক্ষ বৎসর। সংস্কৃতে বরেন্দ্র শব্দটির অর্থ (বর + ইন্দ্র) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম। অনার্য ভাষায় কৃষি যোগ্য জমি। বরেন্দ্র ভূমে প্রাপ্ত অসংখ্য প্রাচীন দিঘি একাধিক মূর্তি ও অন্যান্য নিদর্শন প্রমাণ করে বরেন্দ্র ভূমি এক সময় শ্রী ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল।

মধ্যযুগ

খিলজি বংশ ঃ

বক্তিয়ার খিলজি ঃ

প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস গ্রন্থ ইত্যাদিতে উল্লেখিত বরেন্দ্রীই মধ্যযুগীয় মুসলমান ঐতিহাসিকদের বরিন্দ, তবে বরিন্দ প্রাচীন বরেন্দ্রীর চাইতে সংকীর্ণতর ছিল এই রকম বর্ণিত হয়। মধ্যযুগীয় সাহিত্য, ইতিহাস এবং কুলজী গ্রন্থে বরেন্দ্রীর প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। লোক স্মৃতিতেও বরেন্দ্র এক ঐতিহ্যময় স্থান অধিকার করে আছে।

বাংলাদেশে এই মধ্যযুগের আরম্ভ এক উচ্চাকাঙ্খী ভাগ্যান্বেষী দুধর্ষ তুর্কী ইখতিয়ার - উদ্দীন - বিন - বখতিয়ার খিলজীর বাংলাদেশ জয়ের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে ফুতুহ-উস-সালাতিন গ্রন্থে (গৌড় ও বরেন্দ্র বিজয়ের প্রায় ওপন্যাসিক কাহিনী) মিনহাজ উদ্দীন সিরাজ এর বর্ণনার বঙ্গানুবাদটি এইরকম ঃ — "ইহার পর (মগধ অধিকারের) দ্বিতীয় বৎসরে বখত-ইয়ার তার সৈন্য গঠন করে বিহার (বিহার-সরিফ) থেকে যাত্রা করলেন; এবং সহসা নদীয়ায় প্রবেশ করলেন, এত সহসা এবং দ্রুত যে, তাঁর অশ্বারোহীদের ভিতর ১৮ জন ছাড়া আর কেউ তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে পারল না; বাকী সকলে পিছন পিছন অগ্রসর হতে লাগল। নগরের দ্বারে পৌছে তিনি কারও উপর কোনও অত্যাচার করলেন না, বরং নীরবে এবং বিনীতভাবে অগ্রসর হতে লাগলেন; কেউই সন্দেহ করতে পারল না যে, ইনিই বখত ইয়ার; বরং সকলেই ভাবল, এই আগন্তুকেরা বোধ হয় ব্যবসায়ী এবং মহার্ঘ অশ্ববিক্রয় উদ্দেশ্যেই এদের আগমন। বখত-ইয়ার রাজপ্রাসাদের দরবারে এসেই কোষ থেকে তরবারি উন্মুক্ত করলেন এবং বিধর্মীদের হত্যা শুরু করে দিলেন। তখন দ্বিপ্রহর, রায় লখ্‌মনিয়া ভোজনে বসেছেন, এমন সময়ে সহসা রাজপ্রাসাদের দ্বার থেকে এবং শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে তুমল আর্তনাদ উত্থিত হয়। (লক্ষ্মণ সেন) ব্যাপার কি বুঝবার আগেই বখ্‌ত-ইয়ার প্রসাদের ভিতর এবং অন্তঃপুরে ঢুকে পড়লেন এবং নরহত্যা আরম্ভ করে দিলেন। রায় তখন নগ্নপদে প্রসাদের দ্বার দিয়ে পালিয়ে গেলেন।"

ঐতিহাসিক ইসমীর ফুতুহ-উস-সালাতিন এর বর্ণনাটি আবার এইরকম ঃ —

বখত-ইয়ার অশ্ব বিক্রেতার ছদ্মবেশেই নদীয়ায় প্রবেশ করেছিলেন। নগরে প্রবেশ করে তিনি লক্ষ্মণ সেনকে সংবাদ পাঠালেন, প্রসাদের বাইরে এসে তাঁদের আনা তাতার অশ্ব, চীনা বস্ত্র সম্ভার এবং অন্যান্য মুল্যবান দ্রব্যাদি পরীক্ষা করবার জন্য। কিছুক্ষণ পর রায় যখন কারবানে (অশ্বদের বিশ্রামস্থল) এসে দাঁড়ালেন, তখন বখ্‌ত-ইয়ার তাঁকে বহুমূল্য এক উপঢৌকন দান করলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অনুচরদের ইঙ্গিত করলেন হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। তুর্কী সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ তাই করল। হিন্দু রক্ষী সৈন্যরা অতর্কিত আক্রমণ ঠেকাতে না পেরে পরাভূত হল; কিন্তু তাঁদের একদল রায় লখমনিয়াকে ঘিরে দাঁড়িয়ে স্থির বিক্রমে আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগল এবং তুর্কী সৈন্যদের মনে ত্রাস সঞ্চার করল....। অবশেষে যখন দুর্ধর্ষ খিলজী অশ্বারোহীবা ঝড়ের মত ছুটে এসে কয়েকজন হিন্দু সওয়ারকে হত্যা করল, তখন রায় লখমনিয়া বখত- ইয়ারের হাতে বন্দী হলেন।" --- এরপর খিলজী নিজেকে গৌড়ের শাসনকর্তা হিসাবে (১২০২ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি লক্ষ্মণসেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীর নতুন নামকরণ করলেন লখনৌতি।

মালিক ইজ্জুদীন মুহম্মদ শিরাম খলজী ঃ

রাজ্যজয়ে ব্যস্ত বক্তিয়ার খুব বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেন নি। ১২০৭ খ্রীঃ এই লখনৌতির পরবর্তী শাসনকর্তা হলেন মালিক ইজ্জুদীন মুহম্মদ শিরাম খলজী। এই সুলতানের রাজত্বকালে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। তবকাৎ - ই - নাসিরী বলছে যে, মহম্মদ শিরাম ও আহমদ শিরাম দুই ভ্রাতা খলজী আমীর ছিলেন। ... এদের মধ্যে মহম্মদ শিরাম - ই ছিলেন সাহসী ও নীতিপরায়ণ। কিন্তু তাঁর রাজত্ব কালীন স্বল্পস্থায়ী কার্যকলাপ সাহসিকতার কথা মেনে নিলেও ন্যায়পরায়নতাকে স্বীকৃতি দেয় না।

মালিক আলী মর্দান খলজী / সুলতান আলাউদ্দিন ঃ

মুহম্মদ শিরাম খলজীর ক্ষমতাচ্যূতির পরে কিছুকাল লখনৌতি রাজ্য দিল্লীর অধীন থাকে এবং সেইসময় হুসামুদ্দীন ইওজ খলজী দিল্লীর অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে দেবকোটে অধিষ্ঠিত থাকেন। এরপর আলী মর্দান বাংলায় ফিরে আসেন এবং এদেশের শাসনকর্তা হন প্রথমে দিল্লীর অধীনে পরে স্বাধীন সুলতান হিসাবে।

লাকোটির কারাগারে বন্দী আলীমর্দান কারাগার থেকে পালিয়ে সুলতান কুতুব - উদ - দীনের দরবারে আসেন, এবং নিজের সাহসিকতার পরিচয়ে সম্রাটের আস্থা অর্জন করেন। প্রীতি বশত সম্রাট তাকে শাসক বিহীন লখনৌতি প্রদেশের শাসনভার তার উপর অর্পন করে তাঁকে বাংলায় পাঠান, আলী মর্দান ক্ষমতা লাভ করে দেবকোট রাজ্যে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে দিল্লীতে সুলতান কুতুব - উদ - দীনের মৃত্যু হলে তিনি সুলতান আলাউদ্দিন এই উপাধি গ্রহন করে নিত্য নামের 'খুৎবা' পাঠের আদেশ দেন। তবকাৎ - ই - নাসিরী তার সম্পর্কে প্রশংসা সূচক বাক্য ব্যবহার করে লিখেছে - "তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত, সাহসী ও ভয়হীন লোক।"

আলী মর্দান বা সুলতান আলাউদ্দীন লখনৌতি শাসন করেছিলেন বছর ছয়েক। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে তিনি লখনৌতির সুলতান ছিলেন সে সম্পর্কে বলা হয় ১২০৮ খ্রীঃ কুতুবউদ্দিন অল্প সময়ের জন্যে গজনী অধিকার করেন তখন অলীমর্দান তার সঙ্গে ছিলেন। তখনও তিনি লখনৌতির শাসন ভার পাননি ধরে নেওয়া যেতে পারে। ১২০৯ খ্রীঃ গজনী থেকে ফিরে এসে তিনি ঐ ভার পান। ১২১০ খ্রীঃ কুতুবুদ্দীনের মৃত্যু হলে তিনি স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। মীন হাজের বিবরণ অনুযায়ী তিনি আরও দুবছর অর্থাৎ ১২১২ খ্রীঃ অবধি জীবিত ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু মীনহাজের বিবরণ অনুযায়ী আলী মর্দান পরবর্ত্তী শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দীন ইওজ খলজী বার বছর এবং ১২২৭ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং আলী মর্দানের সঠিক রাজত্বকাল সম্বন্ধে সঠিক ভাবে কোন সময় নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি বলা যায় যে, তিনি ১২১২ ও ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে নিহত হন এবং তাঁর রাজত্বেরও অবসান ঘটে।

এই অল্প সময়ে আলী মর্দান তাঁর রাজ্যের উন্নতির জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু যে করতে পারেন নি তার অন্যতম কারণ হল তার রাজ্যের আভ্যন্তরীন গোলযোগ। শুধু তাই নয় তার নিজ চরিত্রের খামখেয়ালিপনাও এরজন্য যথেষ্ট দায়ী। তবে আলী মর্দানের রাজত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে সেটি হল বাংলার মুসলমান শাসন কর্তাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম স্বাধীন সুলতান হিসাবে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন। অশ্বারোহী মার্কা এই মুদ্রা পরবর্ত্তীকালের দিল্লীর সুলতানদেরও অনুপ্রাণিত করেছিলো।

গিয়াসুদ্দীন ইওজ খলজী ঃ

আলী মর্দানের পরবর্ত্তী শাসক হিসামুদ্দীন ইওজ খলজী লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করে নতুন নাম নিলেন গিয়াসুদ্দিন ইওজ খলজী। তাঁর সম্বন্ধে তরকাৎ - ই - নাসিরীর বর্ণনা এইরকম - "তিনি ঘোর দেশীয় গম শিরের খলজী। হুসামুদ্দীন সৎ লোক ছিলেন। তিনি মুক্তহস্ত, ন্যায় নিষ্ঠ ও দাতা ছিলেন।"

গিয়াসুদ্দীনের রাজত্বকালীন ইতিহাস তাঁকে এই সম্মান দিতে বাধ্য যে তিনি তৎকালীন অন্যান্য উচ্চাকাঙ্খী সুলতানদেব তুলনায় স্থির প্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি দিল্লীর সুলতানের আনুগত্যের কারনেই মুহম্মদ শিরান খলজীর বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং শিরানের বিরুদ্ধে প্রেরিত কাত্রমাজ কমীকে অর্ভ্যথনা জানিয়েছিলেন। এই আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ দিল্লীর অধীনস্থ দেবকোট - লখনৌতি রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, শাসনক্ষমতা লাভ করার পরেও যখন আলী মর্দান দিল্লীর অনুমোদন নিয়ে বাংলায় ফিরে এলেন তখনও দিল্লীর প্রতি আনুগত্যের কারনেই ইওজ বিনা দ্বিধায লখনৌতি রাজ্যের শাসনভার ছেড়ে দিয়ে সময়ের অপেক্ষায় থাকলেন। এরপব দুর্দান্ত আলী মর্দান তাঁর খামখেযালিপনার কারণে রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলে খলজী আমীরেরা একত্রে ষড়যন্ত্র করে আলী মর্দানকে বধ করে ইওজকে সিংহাসনে বসতে আহ্বান জানালেন। তখন ইওজ রাজ্যের মানুষের সমর্থন নিয়ে, দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করে স্বাধীন সুলতান হিসাবে নিজেকে ঘোযনা কবে সিংহাসনে বসলেন, এবং উপাধি নিলেন সুলতান গিযাসুদ্দীন। সুলতান হবার পর সমগ্র লখনৌতি রাজ্যে তার নামে খুৎবা পাঠ করা হয় এবং মুদ্রায় তাঁর নাম অঙ্কিত কবা হয। সুলতান গিয়াসুদ্দীনের এই মুদ্রা সম্পর্কে ডঃ আবদুল করিমের বক্তব্য হল — "কোন কোন মুদ্রায তিনি নিজেকে ওলী আহাদ বা যুববাজ, আলা-উদ-হক্ক-ওয়াদ -দীন (সংক্ষেপে আলা-উদ-দীন) এই নাম উল্লেখ কবেছেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী সুলতানদেব মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম যিনি কেবলমাত্র সম্পদ এবং ক্ষমতা অভিলাষী না হয়ে প্রকৃত অর্থে জনহিতকব অনেক কাজ কবেছিলেন। তিনি দেবকোট থেকে তাঁর বাজধানী সরিয়ে লখনৌতি কে শাসন পরিচালনার কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত কবেছিলেন। এছাড় বসনকোট নামে এক দুর্গ তৈরী করে রাজ্যের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করেছিলেন [illegible] বিশিষ্ট আলিম, শেখ, সৈযদদেব বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন, আমীব ওমরাহদের [illegible] ছিল বৃত্তিব ব্যবস্থা। ফলে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ তথা অশান্তির পথ তিনি অনেকটাই বন্ধ করতে পেরেছিলেন, বহু মসজিদ ও খানকাহ তাঁর আমলে নির্মিত হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালীন উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যোগাযোগ ব্যবস্থা। একাধিক নদী ও বন্যাপ্রবণ এই অঞ্চলে বর্ষাকালেও যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য লখনৌতি থেকে লখানোরেব ফটক পর্যন্ত দীর্ঘ সুউচ্চ রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। যার সুফল আজও অব্যাহত। এছাড়া তিনি বাংলায স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁব জনহিতকর অসাম্প্রদায়িক কাজকর্মের জন্য।

গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজের নামাঙ্কিত যে সব মুদ্রা পাওয়া যায় তাতে তিনি নিজেকে একাধিক রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত কবেছেন। এগুলি যথাক্রমে নাসির আমীর উল মোমেনীন, এবং কসীম-আমীর- উল-মোমেনীন। এই সব উপাধির দ্বারা গিয়াসুদ্দীন নিজেকে আব্বাসী খলিফার সাহায্যকারী বলে ঘোষণা করেছেন।

গিয়াসুদ্দিন ইওযজ নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করায় ক্রুদ্ধ দিল্লীর সম্রাট ইলতুৎমিস তাঁর পুত্র যুববাজ নাসিবউদ্দিনকে লখনৌতি আক্রমণ করতে নির্দেশ দেন। এ সময়ে পূর্ব বাংলায় ইওয়জ যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় এই অতর্কিত আক্রমণ তিনি প্রতিরোধ করতে পারননি। নাসিরুদ্দিনের হাতেই তিনি বন্দী ও নিহত হন।

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ ঃ

ইলতুৎমিসের জেষ্ঠ্য পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ গিয়াসুদ্দিন ইওজকে হত্যা করে বসনকোট দুর্গ ও লখনৌতি নগরের অধিকার নেন। তাঁর দেড় বছরের স্বল্পস্থায়ী রাজনৈতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নেই। এরপর তিনি অসুস্থ হয় দেশত্যাগ করলে (১২২৮ খ্রীঃ) পুত্র স্নেহ কাতর ইলতুৎমিশ তাঁর মৃতদেহ দিল্লীতে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। সেইখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর কবরে একটি সুন্দর ভবন নির্মিত হয়। যেটি 'গরিব মকবরা' নামে আজও পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আলাউদ্দিন জানী ঃ

এরপর ১২২৮ থেকে ১২৮৭ পর্যন্ত একরকম বিশৃঙ্খলাব যুগ। নাসিরুদ্দিন মহমুদ শাহের মৃত্যুর পর বলকা মালিক খলজী লখনৌতি রাজ্যে বিদ্রোহ ঘোষনা করল। সুলতান সামসউদ্দিন লখনৌতির শৃঙ্খলা রক্ষায় অগ্রসর হলেন এবং বিদ্রোহী বলকা মালিককে বন্দী করে (৬২৭ হিজরা) লখনৌতির শাসনভার মালিক আলাউদ্দিন জানীকে অর্পন করলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আলাউদ্দিন জানী লাহোরের শাসনকর্তাব পদে স্থানান্তরিত হন।

সৈফুদ্দীন আইবক ঃ

আলাউদ্দিন জানীকে লখনৌতি থেকে লাহোরে স্থানান্তরিত করা হলে লখনৌতির সিংহাসন শূন্য হয়ে যায়। ইলতুৎমিস সেখানে সরস্বতী রাজ্যের জায়গীরদার সৈফুদ্দীন অইবককে প্রেরণ করেন। তবকাৎ - ই - নাসিরীর বিবরণ অনুযায়ী মালিক সৈফুদ্দিন আহিবক ইওগহন একজন খিজায়ী তুর্কী ছিলেন। পুরুষোচিত শক্ত সবল চেহারার অধিকারী হওয়ার কারনে সুলতান ইলতুৎমিশ তাকে ইখতিয়ার - উদ্দিন - চোস্ত কবাহ্ এর উত্তরাধীকারীদের কাছ থেকে কিনে নেন এবং প্রথমেই তাঁকে আমীর - ই - মজলিশ এর পদে নিযুক্ত করেন। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই সরস্বতী রাজ্যের জায়গীর তাকে দেঁওয়া হয়। সুলতান ইলতুৎমিশ তাঁর আনুগত্যে খুশী হয়ে তাঁকে ইউগানতৎ উপাধি দেন। দুই বা তিন বছর লখনৌতি রাজ্যের শাসনভার তার উপর ন্যস্ত থাকে। ৬৩১ হিজরীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

দিল্লীতে সুলতান ইলতুৎমিস ও লখনৌতিতে সৈফুদ্দিন আইবকের মৃত্যু প্রায় একই সময়ে হওয়াতে জনৈক আওব খান এই সুযোগে লখনৌতি দখল করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিহারের শাসনকর্তা তুগরল তুগান খাঁর হাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। এরপর লখনৌতির শাসনভার চলে যয়ে তুগান খাঁর হাতে।

তুগরল তুগান খাঁ ঃ

মালিক তুগরল তুগান খান তুর্কী স্থানের করতিখাহ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সুন্দর চেহারা ও সাহসিকতা ইত্যাদি গুণের কারণে সুলতান ইলতুৎমিস ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাঁকে ক্রয় করেন। প্রথমে তাঁকে সাকী-ই-খাস (ব্যক্তিগত মদ্য পরিবেশক) পদে নিযুক্ত করেন। কিছুদিন এ কাজ করার পর সুলতান তাঁকে সর-ই-দোয়াতদার এর (সুলতানের দোয়াত রক্ষাকারী দলের প্রধান) কাজে নিযুক্ত করেন। এরপর চাশনীগীর পদ থেকে আমীর-ই-আখোর (রাজকীয়

অশ্বশালার প্রধান) এর পদ দেওয়া হয়। ইলতুৎমিশের এই একান্ত প্রিয় পাত্র বিহার রাজ্যের জায়গীর নিযুক্ত হয়েছিলেন। সৈফুদ্দিনের মৃত্যুর পর তিনিই আওর খানের হাত থেকে লখনৌতির শাসনভার নিজের হাতে নেন।

তুগান খাঁনের রাজনৈতিক জীবন চূড়ান্ত ব্যর্থতার এক দৃষ্টান্ত। উড়িষ্যার রাজার হাতে তাঁর পরাজয় বাংলায় মুসলিম রাজত্বের বিস্তারের পক্ষেও সাময়িক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। পূর্ববর্ত্তী শাসকেরা বাংলার যে সব অঞ্চলে মুসলিম রাজত্বের বিস্তার করেন তার অনেকখানিই তুগান খাঁনের গাফিলতির কারণে মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়।

বিহার শরীফের দরগা থেকে পাওয়া (১২৪২ খ্রীঃ) একটি শিলালিপিতে তুগান খাঁন নিজেকে আল সুলতানী বা গভর্নর রূপে নিজেকে ঘোষণা করলেও অন্যত্র গিয়াস- উল- ইসলাম - ওয়াল - মুসলেমীন (ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী) এবং মুগীস- উস- মূলুকে- ওয়াল সুলতানী (রাজা ও সুলতানদের সাহায্যকারী) ইত্যাদি উপাধি নিজের সম্পর্কে ব্যবহার করেছেন।

তমোর খান ঃ

লখনৌতির অধিকার নিয়ে এরপর তুগরল খান ও তমোর খানের মধ্যে বিরোধ বাঁধে। লখনৌতির শাসনকর্তা হিসাবে চিহ্নিত হবার আগে তমোর খান ছিলেন তুগান খানের অধস্থন কর্মচারী। তুগান যখন আমীর - ই - আখোর ছিলেন তমোর ছিলেন তাঁর নায়েব। তখন থেকেই তাদের সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই শত্রুতা আরও বাড়িয়ে তুলেছিল লখনৌতি রাজ্যের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা সৈফুদ্দিন আইবকের সঙ্গে তমোরের বৈবাহিক সম্পর্ক।

তুগান খানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে লখনৌতির শাসনকর্তা হবার পর তমোর খান আরও দু বছর জীবিত ছিলেন। এরপর অদৃষ্টের অমোঘ নির্দেশে তুগরল ও তমোর একই রাত্রিতে (৯ই মার্চ, ১২৪৭ খ্রীঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃতদেহ লখনৌতি থেকে অযোধ্যায় নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করা হয়। এর থেকে বোঝা যায় তমোর খানের এই স্বল্পকালীন রাজনৈতিক জীবনে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি।

জালালুদ্দিন মাসুদ জানী ঃ

৬৪৭ হিজরীতে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থেকে প্রাপ্ত এক শিলালিপি থেকে জানা যায় জালালুদ্দিন মাসুদ জানী আলাউদ্দিন জানীর পুত্র, এবং তিনিই তমোর খান পরবর্তী লখনৌতির শাসনকর্তা। শিলালিপিতে প্রাপ্ত মালিক - উস - শর্ক (পূর্বাঞ্চলের অধিপতি) এবং শাহ তাঁর উচ্চাভিলাষ এবং প্রায় স্বাধীন মর্যাদার পরিচায়ক উক্তি। তাঁর রাজত্বকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটেনি। যতদূর সম্ভব বছর চারেক তিনি লখনৌতির সিংহাসনে ছিলেন।

ইখতিয়ার উদ্দিন ইওজবেক তুগরল খান বা মুগীসুদ্দিন ইওজবেক শাহ ঃ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলার শাসনকর্তাদের মধ্যে ইওজবেক তুগরল খান বা মুগীসুদ্দিন ইওজবেক শাহের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মীনহাজ- ই-সিরাজ এ তাঁর সম্পর্কে যে পরিচয় পাওয়া যায় তা এইরকম - মালিক ইখতিয়ারউদ্দিন ইওজবেক আদিতে কিফচাক এর অধিবাসী

সুলতান সামসুদ্দিনের ক্রীতদাস ছিলেন। সুলতান তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত নায়েব বা চাশনীগীর এর স্থলাভিষিক্ত করে। পরে আমীর - ই - মজলিস। এর পরে অযোধ্যার শাসনভার, সেখান থেকে লখনৌতি রাজ্যের শাসনভার তাব উপর অর্পন করা হয়। তুগরলের সময়ে লখনৌতির সীমানা গঙ্গার তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। উচ্চাকাঙ্খী ও অহংকারী ইওজবেক এর পর দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে মুগীসুদ্দিন নাম ধারণ করে স্বাধীনভাবে লখনৌতি শাসন করতে থাকেন। তিনি নিজের নামে খোৎবা পাঠ করান ও মুদ্রা প্রচলন করেন। কিন্তু কামরূপ রাজ্য অধিকারের সময় কামরূপ রাজের কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও বন্দী হন। বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয় (৬৫৫ হিজরি)। তাঁর মৃত্যুর পর লখনৌতি আবার দিল্লীর অধিকারে ফিরে যায়।

পরবর্তী শাসন কর্তাদের মধ্যে ছিলেন জালাল-উদ-দীন-মামুদ জানী (দুবার), ইজজ-উদ-দীন বলবন- ই-ওজবেকী, তাজ-উদ্-দীন আরসলান খান, তাতার খান এবং শের খান। বলাই বাহুল্য স্বল্পকালীন এদের রাজত্বে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই নেই।

এই শাসক গোষ্ঠীর অধিকাংশ ছিলেন 'মামলুক' অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন উপজাতিব মানুষ।

বলবনী বংশ ঃ

আনুমানিক ১২২১ খ্রীঃ দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন লখনৌতির শাসনকর্তা সহকারী শাসনকর্তা রূপে যথাক্রমে আয়তগীন আমীন খান ও তুঘরল খানকে নিয়োগ করেন। আমীন খান শাসনকর্তা হলেও বকলমে মুগীসুদ্দিন - ই সর্বেসর্বা ছিলন। তুঘরলের মৃত্যুর পর বলবন তাঁর স্নেহের পুত্র বুঘরা খানকে(যার প্রকৃত নাসর - উদ - দীন মাহমুদ শাহ) লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত কবেন। পিতার মৃত্যুর পর লখনৌতিতে তিনি স্বাধীন সুলতান বলে নিজেকে ঘোযনা করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উজীরের পরামর্শে বুখরা খানের পুত্র মুইষ-উদ্দিন কায়কোবাদ সিংহাসনে বসেন। কায়কোবাদ অত্যন্ত উশৃঙ্খল প্রকৃতির ছিলেন। পরবর্তী সুলতান বুঘরা খানের অপর পুত্র কায়কাউস। তিনি সুলতান রুকন - উদ - দীন কায়কাউস উপাধি ধারণ করেন। তিনি আনুমানিক ১২৯১ খ্রীঃ ১২৯৯ - ১৩০০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মাত্র ২৯ / ৩০ বয়সেই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিহত হন। কায়কাউসের এই পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে লখনৌতির বলবনী বংশ শেষ হয়ে যায়।

তুঘলক বংশ ঃ

শামস-উদ-দীন-ফিরোজ শাহ ঃ

বলবনী বংশের অন্তিম পরিনতির পর তুঘলক বংশের শামস - উদ - দীন ফিরোজ শাহ লখনৌতির সুলতান হন। এরপর দীর্ঘ একুশ বছর (১৩০৯ - ১৩২২) তিনিই লখনৌতির সিংহাসনে আসীন থেকে যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর সময়েই সাতগাঁও সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম সিলেট পর্যন্ত তাঁর রাজত্বের সীমা প্রসারিত হয়। শামস - উদ - দীন ফিরুজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শিহাব - উদ - দীন বাহাদুর শাহ তাঁকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে লখনৌতি অধিকার করেন।

এরপর এক দশকেরও বেশী কাল তাতার খান, বহরাম খান, ইওজ - উদ - দীন ইয়াহিয়া মহম্মদ তুঘলকের অধীনস্থ হয়ে সোনার গাও, সাতগাঁও ও লখনৌতি শাসন করেন। বাংলাদেশে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলা দেশ পর্যায়ক্রমে একবার দিল্লীর অধীন হয়েছে আবার স্বধীন হয়েছে। কিন্তু ১৩৩৮ খ্রীঃ ফককরুদ্দিন মুবারক শাহের স্বাধীনতা ঘোষনা থেকে শুরু করে ১৫৩৮ খ্রীঃ গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের উচ্ছেদ পর্যন্ত পুরোপুরি দুশো বছর বাংলা দেশ নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা ভোগ করেছিল। এই দুশো বছর বাংলার স্বাধীন সুলতানদের রাজত্ব। মুবারক শাহী বংশের স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ, ইখতিযারুদ্দিন গাজী শাহ এবং আলাউদ্দিন আলি শাহ।

ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ ঃ

১৩২২ খ্রীঃ বাংলার স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ বাঁধে। এঁদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হন গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ। কিন্তু তাঁর অন্যান্য ভ্রাতা দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি বাংলায় এসে গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহকে পরাজিত ও বন্দী করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে দিল্লীর অধিকারে আনেন (১৩২৪ খ্রীঃ) ১৩৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলাদেশ তোগলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই সময়ে বাংলাদেশ তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। লখনৌতি, সাতগাঁও এবং সোনার গাঁও। ১৩৩৮ খ্রীঃ আগে এই তিনটি অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন যথাক্রমে কদর খান, বহরাম খান ও মালিক আজুদ্দীন যাহিআ। কয়েক বছর সাফল্যের সঙ্গে সোনার গাঁও অঞ্চল শাসন করার পর বহরাম খান পরলোক গমন করেন। এই বহরাম খানের তরবারি বাহক ছিলেন ফকরুদ্দিন। তিনি ৭৩৯ হিজরায় দিল্লীর সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সোনার গাঁও অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং ফককরুদ্দিন মুবারক শাহ নাম নিয়ে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষনা করলেন। অবশ্য লখনৌতির সঙ্গে তাঁর যোগ সরাসরি শাসনকর্তা হিসাবে নয়। তারিখ ই - মুবারক শাহী এই বিষয়ে লিপিবদ্ধ করছে যে ফকরুদ্দিন সোনার গাঁওকে রাজধানী করে তাঁর গোলাম মুখলিশকে লখনৌতিতে রেখে দিলেন। এর থেকে মনে হয় ফকরুদ্দিন লখনৌতি জয় করেছিলেন এবং মুখলিশকে শাসন কর্তার পদে নিযুক্ত করেছিলেন।

ফকরুদ্দিনের মৃত্যু সম্পর্কে বখশী নিজামুদ্দিন তাঁর তবকাৎ - ই - আকবরীতে এবং গোলাম হোসেন তাঁর রিয়াজ - উস - সালাতীনে লিখেছেন যে লখনৌতির সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুলতান ফকরুদ্দিনের বিরূদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধের পর আলী শাহ ফকরুদ্দিনকে বন্দী করে হত্যা করেন।

ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ ঃ

ফকরুদ্দিন পুত্র ইখতিয়ারুদ্দিন সুলতানদের ইতিহাসে অনুলেখ্য নাম। কারণ ইখতিয়ারুদ্দিন গাজী শাহের নাম ইতিপূবে কোন ঐতিহাসিক সূত্রে পাওয়া যায় নি। কেবল মুদ্রা থেকে তার অস্তিত্ব জানা গিয়েছিল। তবে তিনি যে ফকরুদ্দিনের পুত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ৭৫৩ হিজরায় ইখতিয়ারুদ্দিন গাজী শাহ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন।

আলাউদ্দিন আলী শাহ ঃ

আলাউদ্দিন আলী শাহ - র পূর্ব নাম আলী মুবারক। তিনি লখনৌতির শাসন কর্তা কদর খানের অধীনে সৈন্যবাহিনীর বেতনদাতা ছিলেন (তারিখ-ই -মুবারক শাহী)। কদর খান সোনার গাওয়ে ফকরুদ্দীন মুবারক শাহের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ দমন করতে যান এবং ফকরুদ্দীনকে পরাজিত করেও নিজের অর্থ লোভের কারণে সৈন্যদের বিরাগ ভাজন হন, ফলে সৈন্যরা ফকরুদ্দিনের সঙ্গেই যোগ দিয়ে কদর খানকে হত্যা করে। ফকরুদ্দিন লখনৌতি অধিকার করে সেখানে নিজের ভৃত্য মুখলিশকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, পরে আলী মুবারক বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে মুখলিশকে বধ করে লখনৌতি অধিকার করেন। কিন্তু নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা না করে দিল্লীশ্বর মুহম্মদ তোগলকের কাছে লখনৌতির জন্যে শাসনকর্তা চেয়ে পাঠান। মহম্মদ তোগলক য়ুসুফকে বাংলায় নিযুক্ত করে পাঠান। কিন্তু বাংলায় এসে পৌছাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয় এরপর তোগলক আর কোন শাসনকর্তা নিয়োগ করেন নি। তখন আলী মুবারক প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হয়ে আলাউদ্দিন আলী শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন।

ইলিয়াস শাহী বংশ ঃ

শামস - উদ্দিন - ইলিয়াস শাহ ঃ

আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে হাজী ইলিয়াস শামস উদ্দিন ইলিয়াস শাহ নাম নিয়ে রাজা হলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই ইলিয়াসকে আলী শাহের ধাত্রী মাতার পুত্র, কোথাও বা তাঁকে ভৃত্য বলা হয়েছে। রিয়াজ - উস - এলাতীন ও বুকাননের বিবরনী উভয় সূত্র থেকেই জানা যায় ইলিয়াস বেপরোয়া চরিত্রের লোক ছিলেন এবং ষড়যন্ত্র করে আলী শাহকে বধ করেছিলেন। তবে রাজা হবার পর তিনি যোগ্যতাব পরিচয় দেন। তিনি উত্তরবঙ্গই শুধু নয় সমগ্র বাংলা এবং বাংলার বহির্ভূত অনেক অঞ্চলও নিজের অধিকারে নিয়ে আসেন।

কীর্তিমান এই নৃপতির পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ইলিয়াস যে বাংলার বাইরে থেকে এসেছিলেন সে ব্যাপারে সব বিবরনীই একমত। আরবের দুজন ঐতিহাসিক ইবন - ই - হজর এবং অল সখাওয়ী গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের কথা লেখার সময়ে গিয়াসুদ্দীনের পিতামহ ইলিয়াসকে অল - সিজিস্তানী বলেছেন। অর্থাৎ হাজী ইলিয়াসের পূর্ব নিবাস ছিল পূর্ব ইরানের সিজিস্তানে। ইলিয়াস যে মক্কায় তীর্থ করে এসেছিলেন, তা তার হাজী উপাধি থেকে বোঝা যায়। তারিখ - ই - মুবারক শাহীতে ইলিয়াসকে মালিক ইলিয়াস বলা হয়েছে। এর থেকে মনে হয় যে, আলাউদ্দিন আলী শাহের রাজত্বকালে ইলিয়াস লখনৌতির একজন অভিজাত রাজপুরুষ ছিলেন।

ইলিয়াস শাহ অসামান্য যুদ্ধ কৌশলী এবং লৌহ কঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর আগ্রাসী রাজ্য বিস্তারের নেশা নেপাল, উড়িষ্যা, চম্পারণ, গোরক্ষপুর, কাশী, সোনারগাঁও এবং কামরূপের কতকাংশ জয়ের মধ্য দিয়েই প্রমানিত। তিনি দিল্লীর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শামসী স্নানাগারের অনুরূপ একটি অপরূপ স্নানাগার নিজের জন্য নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই সব নানা কারনে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিরূদ্ধে অভিযান করেন, কিন্তু

ইলিয়াস পাণ্ডুয়ার লোকজন সৈন্যসামন্ত নিয়ে দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় নেওয়ায় ইলিয়াসকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ইলিয়াস শাহ মুসলিম সন্ত ও দরবেশ দের অত্যন্ত সম্মান করতেন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশে তিনজন বিশিষ্ট মুসলিম সন্ত বর্তমান ছিলেন - আঁখী সিরাজুদ্দিন, তাঁর শিষ্য আলা - হক এবং রাজা বিয়াবানী। শেষোক্ত দুজনের সঙ্গে ইলিয়াস শাহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি সন্ত পীর আলা - হকের জন্য একটি মসজিদ নির্মান করান (১৩৪২ খ্রীঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ৭৪৩ হিজরী ২রা শাবান, Dani Bibliography of the Muslim inscribtion of Bengal, P - 10)। রিয়াজ - উস - সালাতীনের মতে ফিরোজ শাহ যখন একডালা দূর্গ অবরোধ করেছিলেন সেই সময়ে শেখ রাজা বিয়াবানীর মৃত্যু হয় তখন ইলিয়াস শাহ অসীম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ফকীরের ছদ্মবেশে একডালা দূর্গ থেকে বেড়িয়ে তাঁর অন্ত্যোষ্টি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দেন, এতটাই ছিল তাঁর সন্ত প্রীতি।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রাগুলি ফিরোজাবাদ / পাণ্ডুয়া, সাতগাঁও, সোনার গাঁও এবং শহর - ই - নৌ (পুরাতন মালদহ) নামের অজ্ঞাত টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল। ৭৫৮ হিজরা পর্যন্ত (১৩৫৭ খ্রীঃ) ইলিয়াস শাহের মুদ্রাগুলি পাওয়া যায়।

সমসাময়িক গ্রন্থ সিরাৎ - ই - ফিরোজ শাহী এবং কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী তারিখ - ই - মুবারক শাহীতে লেখা আছে যে ইলিয়াস শাহ ৭৫৯ হিজরায় পরলোক গমন করেন।

আবুল মুজাহিদ সুলতান সিকন্দর শাহ : (১৩৫৯ - ১৩৯০)

সিকন্দর শাহ ইলিয়াস শাহর সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী। পিতার মৃত্যুর পর তিনি নির্বিঘ্নে ও সর্ব সম্মতিক্রমে সিংহাসনে আরোহন করেন। তবকাৎ - ই - আকবরীর মতে সিকন্দর শাহ ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর তৃতীয় দিনে সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসে তিনি প্রজাদের যে সুশাসন ও সুবিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেও দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ বাংলাদেশ জয় করতে আসেন কিন্তু সেই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করতে পারেন নি। তিনি সিকন্দর শাহ এর সাথে সন্ধি করে দিল্লী ফিরে যান। এরপর সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর সিকান্দর অপ্রতিহত ভাবে রাজত্ব করেন। বাংলাদেশের আর কোন মুসলমান শাসক এত দীর্ঘ দিন বাংলাদেশ শাসন করেন নি।

সিকন্দরের একটি অক্ষয় কীর্তি আদিনা মসজিদ নির্মান করা। স্থাপত্য সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এই মসজিদটি অতুলনীয়। ভারতবর্ষে নির্মিত সমস্ত মসজিদের মধ্যে এটি আয়তনের দিক থেকে দ্বিতীয়। এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও হিন্দু মন্দিরের উপকরণ দেখতে পাওয়া যায়। এই সিকান্দর শাহের আদেশে বিভিন্ন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে আদিনা মসজিদের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। এই অনুমান সত্য হলে বলতে হবে ধর্মের ব্যাপারে সিকন্দর শাহের মনোভাব খুব উদার ছিল না। তবে এই তথ্য সম্পূর্ণ সত্য নাও হতে পারে। আদিনা মসজিদের বাইরের দেওয়ালে একটি শিলালিপি আছে, তাতে সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে এই মসজিদ নির্মিত হওয়ার কথা আছে। শিলালিপিটির তারিখ ৭৭০ হিজরা ৬ ই রজব অর্থাৎ ১৪ ই ফেব্রুয়ারী, ১৩৬৯ খ্রীঃ। বলা হয় শিলালিপিটি স্বয়ং

সিকান্দার শাহের লেখা। তাছাড়া আরও তিনটি শিলালিপি ও বেশকিছু মুদ্রা আবুল মুজাহিদ (ধর্ম যুদ্ধে জয়ী) শিকান্দার শাহ নামে আবিস্কৃত হয়েছে। দেবী,কোটের মোল্লা আতার দরগাহে একটি মসজিদ নির্মান করেন। বাংলার সুলতানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইমাম বা খলিফা (ঈশ্বরের প্রতিনিধি) 'ইমাম - উল - আজম' উপাধি গ্রহন করেন। আদিনা মসজিদের ভিতর সিকান্দার শাহর সমাধি রয়েছে। সিকান্দর শাহের রাজত্বকালেই দিল্লীর সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আদিনা মসজিদের এক মাইল পূর্বে সাতাশঘরা নামক স্থানে একটি প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। জনশ্রুতি এই যে এটিই ছিল সিকান্দার শাহের প্রসাদ, এই প্রাসাদে স্নানাগারটি এখনও বর্তমান আছে।

৭৯২ হিজরী থেকে ৭৯৩ হিজরীতে সিকান্দর শাহের মৃত্যু হয়েছিল।

গিয়াসুদ্দীন আবুল মুজঃফর শাহ ঃ

সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন সিকন্দর পুত্র গিয়াসুদ্দীন আবুল মুজঃফর শাহ। রিয়াজ - উস - সালাতীনে গিযাসুদ্দিন আজম শাহ এব রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে যে কাহিনী বর্ণিত আছে তা যদি সত্যি হয, তাহলে দেখা যাচ্ছে গিয়াসুদ্দিন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও পিতাকে যুদ্ধে নিহত করে রাজা হয়েছিলেন। শুধু তাই নয গিযাসুদ্দিন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁর জীবদ্দশাতেই বাংলাদেশের একাংশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন। এব প্রমাণ হিসাবে বলা যায যে, পশ্চিমবঙ্গেব সাতগাঁওয়ে পাওযা মুদ্রাগুলি সিকন্দর শাহের রাজত্বকালেই মুদ্রিত। মনে হয়, ৭৭৭ হিজবার পরবর্তী ৭৯৩ হিজবাব পূর্ববর্তী কোন এক সময়ে গিয়াসুদ্দীন তাঁর পিতা সিকান্দর শাহেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এবং সোনাব গাঁও ও সাতগাঁও সমেত বাংলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের স্বাধীন রাজা হয়েছিলেন। কোন কোন গবেষক আবাব নির্দিষ্ট করে বলেন ৭৯০ বা ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দেই গিযাসুদ্দীন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

শাসক হিসাবে গিয়াসুদ্দিন কিন্তু পিতারই মত দক্ষ এবং প্রজা পরায়ন ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন বিদ্বান, ধার্মিক, কবিদেব পৃষ্ঠপোষক, সুফী সাধকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি নিজেও কাব্য রসিক ছিলেন, কবিতা লিখতেন, তৎকালীন মহাকবি হাফিজের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। মক্কা ও মদিনায় তিনি সুফী সাধকদের জন্য সরাইখানা নির্মান করেন এবং খাল খনন করেন।

গিয়াসুদ্দিন তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে ধর্মান্ধ হয়ে হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠেন। এর ফলে প্রশাসনিক পদ থেকে অনেক হিন্দু অমাত্যদের বিতাড়িত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাজা গনেশ। রিয়াজ - উস - সালাতীনের মতে ভাতুরিয়ার প্রসিদ্ধ রাজা কংস বা গণেশের চক্রান্তেই গিয়াস - উদ - দীন নিহত হন (১৪১০ - ১১ খ্রী)।

সৈফুদ্দিন আবুল মুজাহিদ হামজা শাহ ঃ

গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সৈফুদ্দিন হামজা শাহ রাজা হলেন। মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, ইনি ৮১৩ হিজরায় (১৪১০ - ১১ খ্রী) সিংহাসনে আরোহণ

কারণ এবং ৮১৫ হিজরায় (১৪১২ - ১৩ খ্রীঃ) এঁর রাজত্ব শেষ হয়। তবকাৎ - ই - আকবরী, তারিখ - ই - ফিরিশতা এবং রিয়াজ উস সালাতীনের মতে সৈফুদ্দিন হামজা শাহের অমাত্য ও সেনাপতিরা তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'সুলতান - উস - সালাতীন' (রাজাধিরাজ) উপাধি দেন। যদিও তার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যহীন দুবছর রাজত্বে এই উপাধির যোগ্যতার কোন প্রমান পাওযা যায় না।

সৈফুদ্দিন হামজা শাহের যে সমস্ত মুদ্রা এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি সাতগাঁও, মুয়াজ্জমাবাদ এবং ফিরোজাবাদ বা পান্ডুয়ার টাঁকশালে উৎকীর্ণ হয়েছিলে। তাঁর কোন শিলালিপি এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

দু বছর রাজত্বের পর সৈফুদ্দিন তাঁর ক্রীতদাস শিহার - উদ - দীন বায়োজিদ শাহ কর্তৃক নিহত হন (১৪১০ - ১১ খ্রীঃ)। সম্ভবত এই হত্যাকান্ড রাজা গনেশের চক্রান্তেই সংঘটিত হয়।

বায়োজিদ শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর শিশুপুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ। তিনি কেবল নামমাত্রই সিংহাসনে ছিলেন আসল রাজ্যশাসন ক্ষমতা ছিল গনেশেরই হাতে। কয়েকমাস এইভাবে থাকার পর গনেশ তাকে সিংহাসন চ্যুত করে নিজেই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসেন।

হিন্দু রাজত্ব ঃ

রাজা গণেশ ঃ

বাংলাদেশে মধ্যযুগের ইতিহাসে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য রাজা গণেশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ এই পাঁচ শতাধিক ইসলাম শাসনাধীন বাংলাদেশে একমাত্র গণেশই ছিলেন হিন্দুরাজা। শুধু তাই নয় দোর্দন্ড প্রতাপশালী এই রাজার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল সমগ্র বাংলাকে একই শাসনাধীনে রাখা। গণেশের ব্যক্তিগত শ্রম ও নিষ্ঠায় গড়া হিন্দু রাজত্বের এই সময়কাল যদিও দীর্ঘস্থায়ী করা যায়নি, গণেশ পরবর্তী বংশধররা পারস্পরিক অবস্থার চাপে ধর্মান্তর গ্রহনে বাধ্য হয়েছিলেন তবুও স্বল্প কালীন সময়েও বাংলাদেশের শাসন, সংস্কৃতি ও জনসাধারণের সঙ্গে এই রাজার এক আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

দরবেশ নুর - কুতুব - উল - আলম ও আশরফ সিমনানীর লেখা চিঠিতে গণেশের পরিচয়ে যে নাম পাওয়া যায় তা হল কানস রায়, অন্যান্য ফরাসী ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে তিনি কনিস্, কানস্ বা কান্সি। এর বাংলা হিসেবেও কখনও পেয়েছি রাজা কংস এর নাম। যদিও সমসাময়িক দুটি বাংলা বই অদ্বৈত প্রকাশ (১৫৬৮ খ্রীঃ), প্রেমবিলাস (১৬০০ খ্রীঃ) এবং একটি সংস্কৃত গ্রন্থ 'বাল্যলীলা সূত্র' (১৪৮৭ খ্রীঃ) এগুলিতে এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্টে এই রাজার নাম গনেশ হিসাবেই পাওয়া যায়।

গণেশের পূর্ব পরিচয় বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে 'রাজা গণেশ ভাতুরিয়া পরগণার জমিদার ছিলেন। কারোর মতে গণেশ ভাদুড়ী পদবিধারী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্টেপলটনের মতে তিনি ভোট বংশীয় কোচ, আবার কারোর মতে তার নাম একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মূলক। উত্তরবঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে 'গণেশ' নামে এক

সম্প্রদায় আছে, যাঁরা জাতে তাঁতি, তিনি সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। এই মতের স্বপক্ষেও কোন জোরালো যুক্তি পাওয়া যায় না। রাজা গণেশ 'দনুজমর্দন দেব' এই উপাধি গ্রহন করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর মুদ্রা থেকে। এই উপাধি তিনি ৮১৯ হিজরাতে পুত্রের কাছ থেকে ক্ষমতা পুনরায় ছিনিয়ে নিয়ে যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তখনই গ্রহণ করেছিলেন। ৮২০ হিজরাতে এই উপাধি সহ তিনি মুদ্রাও প্রকাশ করেছিলেন যা মুদ্রিত হয়েছিল মালদহের পাণ্ডুয়া নগরীর টাকশাল থেকে, এই মুদ্রার অন্যপিঠে রয়েছে 'শ্রী চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য' এই কথাটি। কারণ রাজা গণেশ পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ক্ষমতায় থাকাকালীন তিনি সর্বপ্রকার হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি ফিরিয়ে এনেছিলেন। শুধু তাই নয় ইসলাম ধর্মান্তরিত অনেককে তিনি হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে এনেছিলেন বলেও শোনা যায়।

রাজা গণেশের আমলে নির্মিত বলে যে সব স্থাপত্য কীর্তিগুলি সুপরিচিত তার মধ্যে অন্যতম হল পাণ্ডুয়ার একলাখী প্রসাদ। স্থাপত্য ও সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এই প্রাসাদটি আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পোড়া মাটির নিখুত কারুকাজে বাংলাদেশের শিল্প যে কতদূর উন্নতি করেছিল এই প্রাসাদটি তার প্রমান। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই প্রসাদটি নির্মিত হয়েছিল। এটি বর্তমানে একটি সমাধি মন্দির। এর ভেতর তিনটি সমাধি আছে। রিয়াজের মতে এই সমাধিগুলি গণেশ পুত্র জালালুদ্দিন, তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের।

পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদের সংস্কার করিয়ে তিনি সেটিকে কাছারী বাড়িতে পরিণত করেছিলেন এমনটি শোনা যায়।

গৌড়ে ফতে খানের সমাধিভবন নামে পরিচিত দো চালা রীতির যে ছোট বাড়িটি আছে সেটিও সম্ভবত রাজা গণেশ - ই তৈরী করিয়েছিলেন কোন মন্দির করবার উদ্দেশ্যে। কারণ এর গঠনরীতি এবং উৎকীর্ণ মোটিফগুলি কোন সমাধি ভবনের পরিচয় বহন করে না।

রাজা কংসের সাম্প্রদায়িক নীতি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মতবাদ প্রচলিত আছে। ফিরিশতার মতে — তিনি মুসলমানদের এত প্রিয় ছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর মুসলমানরা তাঁকে সমাহিত করার চেষ্টা করেছিলো। আর রিয়াজ এর লেখক এর মতে - রাজা কংসের অত্যাচারে মুসলমানেরা এতদূর ব্যতিব্যস্ত ছিল যে তারা নুর - কুতুব আলমের শরণাপন্ন হয়। ইসলাম বিপন্ন, এই সত্য উপলব্ধি করে নুর কুতুব জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেন। ইব্রাহিম শর্কী তখন কাজী শিহাবুদ্দিন জৌনপুরীর সঙ্গে পরামর্শ করে বাংলা আক্রমণ করতে মনস্থ করেন। মালদহের সরাই ফিরোজপুরে তিনি তাঁর সামরিক শিবির সন্নিবেশিত করলেন। সৈন্যবলের আধিক্যেই হোক অথবা অহেতুক প্রাণনাশ এড়াবার জন্যেই হোক তিনি নুর কুতুবের শরণাপন্ন হন। সেই সঙ্গে তিনি ইসলাম ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রতিশ্রুতিও দরবেশ কে দেন। কুতুবের নির্দেশে শর্কী ফিরে গেলে শেষ পর্যন্ত রাজা গণেশ ধর্মান্তরিত হন নি। উপরন্তু পূর্বেই ধর্মান্তরিত পুত্র যদুকে আবার প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন। অবশ্য হিন্দু মুসলমানের সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য তিনি নাকি সত্যপীরের পূজার প্রচলন করেছিলেন।

মধ্যযুগের ইতিহাসে রাজা গণেশ একজন উল্লেখযোগ্য রাজা। তিনি তাঁর বুদ্ধি ও শক্তিবলে তাঁর রাজ্যের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন।

রাজা গণেশের মৃত্যু সম্পর্কে রিয়াজ রচয়িতা বলেন - তাঁর ছেলে যদু বা জালালুদ্দিন যিনি বন্দী ছিলেন পিতার আদেশে, তিনিই ভৃত্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পিতাকে হত্যা করেছিলেন। আরবী ঐতিহাসিক ইবন - ই - হজরও তাঁর লেখা 'ইনবাউল গুমর' নামক বইতে এই গণেশের মৃত্যু সম্পর্কে এই কথাই স্বীকার করে নিয়েছেন। ঐতিহাসিক সুখময় মুখোপাধ্যায় অবশ্য এই সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দেহ না হয়ে তার বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর বইয়ে বলেন — জালালুদ্দিন কোন কোন মুদ্রায় নিজেকে বিন্ - কান্স (গনেশ) শাহ বলে অভিহিত করেছেন। পিতৃঘাতক হলে বোধহয় এইরকমটি সম্ভব হত না।

জালালুদ্দিন আবুল মুজঃফর মহম্মদ শাহ / মহেন্দ্রদেব ঃ

১৩৪০ শকাব্দের পর মহেন্দ্রদেব নামে একজন রাজার মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি দনুজমর্দন দেবেরই মত একপিঠে মহেন্দ্রদেব নাম অন্যদিকে 'চন্ডীচরণ পরায়ণস্য' লেখা। এগুলি মুদ্রনের স্থান পাভুয়া ও চাটগার এর টাকশাল। এর থেকে অনুমিত হয় মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দন দেবের পুত্র। কিন্তু দনুজমর্দন দেবের পুত্র হিসাবে ইতিহাসে যিনি বিখ্যাত তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। এবং যতদূর জানা যায় যদু পিতার বর্তমানেই ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তাই চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য' তাঁর পক্ষে ব্যবহার করা অসম্ভব বলেই মনে হয়। তারিখ - ই - ফিরিস্তার মত মেনে নিলে বলা যায় মহেন্দ্রদেব রাজা গণেশেরই এক পুত্র। অন্য বিধর্মীপুত্রের প্রতি বিরক্ত হয়েই তিনি এই পুত্রকে সিংহাসন দেন। তার কাছ থেকে সিংহাসনের অধিকার ছিনিয়ে নেন অন্য পুত্র জালালুদ্দিন।

জালালুদ্দিনের হিন্দু নামের সঠিকতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ফিরিস্তার মতে তার নাম জিতমল্ল বা জিৎমল। রিয়াজ - এর মতে তার নাম যদু বা যদু সেন। তার যদু নামটিই সঠিক বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন।

নিষ্ঠাবান হিন্দু পিতার সন্তান জালালুদ্দিনের ধর্মান্তর সম্পর্কে অনেক গল্প কথা প্রচলিত থাকলেও ইসলাম ধর্ম গ্রহনের পর তিনি যে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানে পরিণত হন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি আবু হানিফা সম্প্রদায়ের মতবাদকেই অনুসরণ করে চলতেন। তিনি তাঁর মুদ্রায় কলমা খোদাই করতেন এমনকি জীবনের শেষ দিককার মুদ্রায় নিজেকে "খলীফৎ আল্লাহ্" বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি' এই উপাধিতেও ভূষিত করেছেন। ইবন - ই - হজরের 'ইনবাউল গুমর' গ্রন্থ থেকে তার ইসলাম নিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। তাঁর পিতা যে সমস্ত ইসলাম স্থাপত্য ও মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন তিনি সেগুলির সংস্কার করে পুনরায় নির্মাণ করিয়ে দেন। বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন, বিশেষত সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে গোমাংস দ্বারা জাতিচ্যুত করেন যারা তার পিতার কাছ থেকে তার হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তনের প্রায়শ্চিত্তের কাজে স্বর্ণ নির্মিত গাভী লাভ করেছিলেন।

জালালুদ্দিনের সময় পাভুয়া অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে পরিচিত হয়। বহু জলাশয়, পুষ্করিনি, মসজিদ ও সমাধিগৃহ তিনি নির্মাণ করেন। তাঁর সময়েই পুরাতন মালদহ, বালিয়া নবাবগঞ্জ, রায়খাঁ দিঘী ও পীরগঞ্জ বহির্বানিজ্যের কেন্দ্ররূপে সুপরিচিত হয়ে ওঠে।

১৭ বছর রাজত্বের পর জালালুদ্দিনের মৃত্যু হয় (১৪৩৩ খ্রী)। এরপর তাঁর পুত্র শামস - উদ্দিন - আহমেদ সিংহাসনে বসেন।

শামস - উদ্দিন আবুল মুজাহিদ আহম্মদ শাহ ঃ

১৪৩৩ খ্রীঃ জালালুদ্দিনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র শামস উদ্দিন। স্বল্পস্থায়ী এই সুলতানের রাজনৈতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নেই। ঐতিহাসিকদের পরস্পর বিরোধী মত থেকে তাঁর সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন ধারণা লাভ করা যায় না। রিয়াজ - উস - সালাতীনের মতে, — "তিনি অত্যন্ত বদমেজাজী, অত্যাচারী এবং রক্ত পিপাসু ছিলেন।" অথচ ফিরিস্তার মতে, — "তিনি তাঁর মহান পিতার আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন এবং ন্যায় পরায়ণ ও উদারতার আদর্শ প্রাণপণে রক্ষা করেছিলেন।" তাঁর রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নেই।

তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি কিছু না লিখলেও রিয়াজ - উস - সালাতীন এবং বুকাননের বিবরণ থেকে জানা যায় — তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শামসুদ্দিনের দুই ক্রীতদাস সাদী খান ও নাসির খান ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করেছিলেন। একলাখীর সমাধিভবনে এই শামসুদ্দিনের সমাধি রয়েছে। তাঁর রাজত্বের সময়সীমা বছর তিনেক, সময়টা ৮৩৯ হিজরা (১৪৩৬ খ্রীঃ)। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রাজা গণেশের বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মাহমুদ শাহী বংশ / (পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ) ঃ

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ ঃ

শামস উদ্দিন আহমেদ শাহের অমাত্যরা এরপর ইলিয়াস শাহী বংশের সন্তান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহকে সিংহাসনে বসান। এই বংশ তাই মাহমুদ শাহী বংশ নামেও সুপরিচিত।

সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থগুলি থেকে এই রাজার সম্পর্কে যা জানা যায় তাতে বোঝা যায় তিনি অত্যন্ত সাধারণ মানুষ ছিলেন। তারিখ - ই - ফিরিস্তার বর্ণনায় এই নাসিরুদ্দিন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের এক সাধারণ কৃষক ছিলেন। কৃষিকাজ করেই তাঁর দিন অতিবাহিত হোত। রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরেরা যতদিন পর্যন্ত বাংলার সিংহাসনে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত ইলিয়াস শাহী বংশের লোক ও তাঁর সমর্থকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। শামসউদ্দিনের হত্যায় তারা আবার উৎসাহিত হয়ে একত্রিত হলেন। এরপর সিংহাসনে বসলেন ইলিয়াস শাহী বংশের নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ। এই রাজার রাজত্বকালে জৌনপুর, দিল্লী ও বাংলার সুলতানদের মধ্যে রেষারেষি দূব হয়ে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। রিয়াজ - উস - সালাতীন মুক্ত কণ্ঠে এই রাজার গুণগান করে বলেছেন নাসির শাহ সমস্ত কাজ ন্যায়পরায়ণতা এবং উদারতার সঙ্গে করতেন, ফলে রাজ্যের লোক অত্যন্ত স্বস্তিতে এবং শান্তিতে বসবাস করত। এই সুলতান গৌড়ে তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে গৌড়েব বিখ্যাত সেলামী দরওয়াজা বা কোতয়ালী দরওয়াজার নির্মাতা নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ।

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ চব্বিশ / পঁচিশ বছর একটানা রাজত্ব করেছিলেন। ১৪৫৯ - ৬০ খ্রীঃ নাসিরুদ্দিনের মৃত্যু হয়।

রুকন - উদ - দীন বারবক শাহ ঃ

নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর (১৪৫৯ - ৬০ খ্রীঃ) তাঁর পুত্র রুকনউদ্দিন বারবক শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। ইনি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান তো বটেই সর্বদেশের ও সর্বকালের নরপতিদের মধ্যে তিনি অন্যতম এমন কথাও বলা চলে। অথচ তাঁর সম্পর্কে সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি আশ্চর্যরকম ভাবে নীরব। কেবল ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী রচিত 'শয়ফ নামা' নামে একটি ফরাসী গ্রন্থ, কিছু সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লেখা দু একটি গ্রন্থ ও কয়েকটি শিলালিপি থেকেই তাঁর সম্পর্কে যৎসামান্য কিছু জানা যায়।

রুকন - উদ - দীন বারবক শাহ দীর্ঘকাল (প্রায় একুশ বছর) গৌড়ের মসনদে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ৮৬৩ থেকে ৮৭৮ হিজরা পর্যন্ত তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রাপ্তির কারনেই এই সময় সীমাকেই তাঁর রাজত্বকালীন সময় বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে।

কেবলমাত্র যুদ্ধ বিগ্রহে সাফল্য লাভ করা ও রাজ্য জয়ই বারবক শাহের প্রধান কীর্তি নয়। তিনি সুশাসক ছিলেন, শুধু তাই নয় তিনি রাজ্যের গুণী মানুষদের সম্মান দিতে জানতেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত শিলালিপিতে তার নাম এবং বিভিন্ন রাজকীয় উপাধির সঙ্গে তার আরও দুটি উপাধি দেখা যায় - অল - ফাজিল' এবং অল - কামিল। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক আহমেদ হাসান দানী বলেন — "Al fadal and Al - Kamal' suggest that he attained the highest accademic qualification."

বারবক শাহের আমলে কেবল মুসলমান কবি পন্ডিতেরাই নয়, হিন্দু কবি - পন্ডিতরাও তার অবাধ দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হতেন না। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন — বিশারদ, রায়মুকুট, মালাধর বসু, কৃত্তিবাস, অনন্ত সেন, কেদার রায়, ক্রন্দসী রায়, বিশ্বাস রায় সত্য খান বা শুভরাজ খান এবং নারায়ন দাস। অনুমান, তাঁর সময়েই কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় রামায়ণ লিখেছিলেন।

উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ এবং বিহারের কতকাংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। মালদহের গাজোল থানার দেওতলা গ্রাম থেকে তাঁর কয়েকটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে।

রুকন - উদ্দিন - বারবক শাহ ঠিক কোন সময়ে দেহত্যাগ করেন তা সুনিশ্চিত ভাবে বলা না গেলেও বিভিন্ন তথ্য ও মুদ্রার প্রকাশ থেকে অনুমান করা হয় যে তিনি ১৪৭৬ খ্রীঃ মার্চ মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং তারপরই তিনি পরলোক গমন করেন এমনটি মনে করা হয়।

শামস - উদ্দিন - য়ুসুফ শাহ ঃ

রুকনউদ্দিন বারবক শাহের পর তাঁর পুত্র শামস উদ্দিন য়ুসুফ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। ফিরিস্তার বিবরণ সত্য হলে জানা যায় ইউসুফ শাহ ছিলেন সচ্চরিত্র, আদর্শবাদী, ন্যায় নিষ্ঠ ও সুদক্ষ নরপতি। উপরন্তু তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তাঁর আমলে মালদহে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। যেমন — শাকমোহন মসজিদ, গৌড়ের কদমরসুল, দরাসবাড়ী জামি মসজিদ, তাঁতীপাড়া মসজিদ ও লোটন মসজিদ, তিনি নিজে নিষ্ঠাবান মুসলমান

হলেও পরধর্মে তেমন সহিষ্ণুতা দেখাতে পারেননি। অনেক হিন্দু নিদর্শন তাঁর আমলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল।

সিকান্দার শাহ :

তবকাৎ - ই - আকবরী, নাসির - ই - রহিমী, তারিখ - ই - ফিরিশতা, রিয়াজ - উস - সালাতীন এবং স্টুয়ার্টের এর মতে শামসুদ্দিন য়ুসুফ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর সিংহাসনে আরোহন থাকাকালীন সময়সীমা কারো মতে দু মাস, কারো মতে অর্ধ দিবস। আসলে তিনি উন্মাদ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন বলেই মনে হয়।

ফতে শাহ :

সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর তার অমাত্যরা দ্বিতীয় সিকান্দরের জায়গায় ইউসুফ শাহের দ্বিতীয় পুত্র ফতে শাহকে সিংহাসনে বসান। তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে জানা যায় তার পুরোনাম ছিল জালালুদ্দিন আবুল মুজফফর ফতে শাহ। তবকাৎ - ই - আকবরীর বয়ান অনুযায়ী ফতে শাহ বিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর মুদ্রায় উল্লিখিত মজাদাহ - ল্লাহ - ল - ফতেহ্ কথাটি উল্লিখিত রয়েছে। সমসাময়িক গ্রন্থ বিজয়গুপ্তের মনসা মঙ্গলে তাঁর সম্পর্কে সপ্রংশস উল্লেখ আছে। ১৪৮১ - ৮২ থেকে ১৪৮৭ - ৮৮ এই বছর খানেক তিনি রাজত্ব করেছিলেন। এরপর তিনি তারই প্রধান খোজা বারবক দ্বারা নিহত হন।

হাবসী রাজত্ব :

গিয়াসুদ্দিন বারবক শাহ / সুলতান শাহজাদা :

হাবসী খোজা গিয়াসুদ্দীন 'বারবক শাহ ফতে শাহকে হত্যা করে সুলতান শাহজাদা উপাধি নিয়ে কয়েকমাস রাজত্ব করেন। এরপর তিনি আমীর মালিক আন্দিল কর্তৃক নিহত হন।

ফিরুজ শাহ :

মালিক আন্দিল এরপর সুলতান সয়ফ উদ্দিন - ফিরুজ - শাহ উপাধি ধারন করে সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি মোটামুটি বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন। তিনি গৌড় শহরে তিনটি মসজিদ একটি এবং একটি মজধার নির্মান করান। এই মিনারটি বিখ্যাত ফিরোজ মিনার। এর মধ্যে মিনার এবং জলধারাটি এখনও রয়েছে। বাংলার এই হাবশী রাজা যোগ্যতার সঙ্গে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন করে গিয়েছেন।

তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে দুটি মত পাওয়া যায়। মাসির - ই - রহিমীতে উল্লেখ রয়েছে তিনি নায়েক-দের (পাইক) হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। তবকাৎ - ই - নাসিরী এবং ডঃ আবদুল করিম এর মতে "তিন বছর রাজত্ব করার পর ফিরোজ শাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর এই অসুস্থতাই তাঁর মৃত্যুর কারণ।

নাসির-উদ-দীন-মাহমুদ শাহ ঃ

ফিরোজ শাহ পরবর্তী নাসির - উদ - দীন মাহমুদ শাহের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা দ্বিধা বিভক্ত ছিলেন। কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে তিনি ফিরোজ শাহের জেষ্ঠ পুত্র আর ডঃ আবদুল করিমের মতে তিনি জালাল - উদ্দিন - ফতে শার পুত্র। শেষ পর্যন্ত ডঃ আবদুল করিম এর মতকেই ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় স্বীকার করে নেন, ফলে এখন একথা বলাই যায় যে তার প্রকৃত নাম ছিল কুতুব - উদ - দীন মহমুদ শাহ এবং তিনি ফিরোজ শাহের পুত্র। নাসিরুদ্দিনের স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালীন জীবনে উল্লেখ করার মত তেমন কিছু নেই। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালীন আভ্যন্তরীণ গোলযোগ চরমে উঠেছিল। তার অন্য দুই হাবসী অমাত্য হাবস খান ও সিদি বদর সর্বদা ক্ষমতার লড়াই এ ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। এর মধ্যে হাবস খান ছিলেন শক্তিশালী। বাহুবলেই রাজক্ষমতা প্রায় তার হাতের মুঠোয় ছিল। প্রকৃত রাজা নাসিরুদ্দিন ছিলেন ক্রীড়নক মাত্র। তাই ক্ষমতা লিপ্সু সিদি বদর প্রথম হাবস খানকে হত্যা করেন। পরে অনুচর দ্বারা নাসিরুদ্দিনকে হত্যা করিয়ে শামস্ - উদ্দিন - মুজফফ্র শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন।

শামস - উদ্দিন মুজাফফ্র শাহ ঃ

নাসিরুদ্দিনের পর সিংহাসনে বসলেন শামসউদ্দিন মুজফফ্র শাহ। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। ক্ষমতা লাভের পর থেকেই তিনি অসংখ্য ধার্মিক পন্ডিত ও অভিজাত মুসলমান ও হিন্দু রাজাদের হত্যা করেন। রিয়াজ ও নিজামুদ্দিনের মতানুসারে এই ঔদ্ধত্যই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছিল। মুজফফর শাহ সম্ভবত ধর্ম প্রাণ মুসলমান ছিলেন। তারই রাজত্বকালে সম্ভবত তারই উৎসাহে পান্ডুয়ায় নুর কুতুব আলমের সমাধিভবনটি পুননির্মিত হয়। গৌড়ের কাছে গঙ্গারামপুরে মৌলানা আতার দরগায় তিনি একটি মসজিদ তৈরী করান। পুত্র নুর - কুতুব আলমের সমাধি ভবনের শিলালিপিতে শামসউদ্দিনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে। অথচ সব ইতিহাস গ্রন্থই এই সাক্ষ্য বহন করছে যে তিনি ধার্মিক তথা পরজিত লোকেদের নিজ হস্তে হত্যা করতেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বলা হয় যে তাঁর উজির সৈয়দ - হোসেন পাইক সর্দার কে উৎকোচ দান করে কতিপয় যোদ্ধা সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা করেন এবং তার পর দিনই আলা - উদ - দীন উপাধি ধারন করে সিংহাসনে বসেন।

৮৯৩ হিজরায় বাংলাদেশে হাবসী রাজত্বের সূত্রপাত। ৮৯৮ হিজরায় মুজফফর শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেই রাজত্বের অবসান ঘটেছিল। হাবসী সম্প্রদায়ের এই আবিশীনীয় শাসকেরা সুদূর আফ্রিকা থেকে এদেশে এসেছিল।

হোসেন শাহী রাজত্ব ঃ

আলা - উদ - দুনিয়া - ওয়াদ - দীন - আবুল - মুজফফর - হোসেন শাহ ঃ

মোগল পূর্ববর্তী বাংলাদেশে যে সমস্ত স্বাধীন সুলতানদের জন্ম হয়েছিল তাদের মধ্যে আলাউদ্দিন হোসেন শাহই সবচেয়ে বিখ্যাত। শুধু দক্ষ শাসক হিসাবেই নয় সাহিত্য সংস্কৃতির একজন পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও ইতিহাস তাঁকে মনে রাখবে।

হোসেন শাহের বংশ পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। স্টুয়ার্টের মতে হোসেন শাহ আরব থেকে বাংলায় এসেছিলেন আর ফ্রান্সিস বুকাননের মতে হোসেন শাহ রংপুর জেলার দেবনগর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। বিভিন্ন মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে জানা যায় তিনি সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহন করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আশরফ অল - হোসেনী। রিয়াজ রচয়িতা আবার প্রচলিত জনশ্রুতির উল্লেখে বলেন - হোসেন শাহ তাঁর পিতা আশরফ অল - হোসেনী ও ভ্রাতা য়ুসুফ সুদূর তুর্কীস্থানের তারমুজ শহর থেকে বাংলার চাঁদপুর মৌজায় বসতি স্থাপন করেন। ফিরিশতার মতে সুলতান হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল 'সৈয়দ শরীফ মকী' আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে হোসেন শাহের পূর্ব নাম ছিল 'হুসন খাঁ সৈয়দ।

'১৪৯৩ খ্রীঃ অর্থাৎ ৮৯৯ হিজরা থেকে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন। শোনা যায় মুজাফ্ফর শাহের মৃত্যুর পরে প্রধান অমাত্যরা যখন পরিষদ আহ্বান করে তখন তাঁরা স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে হোসেনকেই রাজা নির্বাচিত করে। অনেকের মতে হোসেন শাহ এইসব অমাত্যদের গৌড় নগরীর মাটির উপরের ধনৈশ্বর্য উপঢোকনের প্রতিশ্রুতির বিনিময়েই রাজ পদ লাভ করেছিলেন। সুলতান হওয়ার পর তিনি রাজকীয় নাম গ্রহন করেন আলা - উদ - দুনিয়া - ওয়াদ - দীন আবুল মুজাফ্ফর হোসেন শাহ।

রাজপদে অভিষিক্ত হয়েই হোসেন শাহ অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাসাদ অভ্যন্তরে অত্যন্ত ক্ষমতাবান এবং দুর্বৃত্ত হয়ে উঠেছিল পাইক এবং হাবসীরা। তিনি পাইকদের প্রাসাদ রক্ষার ভার তুলে নিলেন এবং প্রায় সমস্ত হাবশীকেই চাকরী থেকে বরখাস্ত এবং রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন। তার বদলে তিনি সৈয়দ, মোগল ও আফগানদের উচ্চপদে নিয়োগ করলেন।

হোসেন শাহের রাজত্বলাভের দু বছর পর দিল্লীর সম্রাট সিকান্দর লোদী বাংলাদেশ আক্রমন করেন, কিন্তু এই যুদ্ধে সিকান্দর পরাজয় স্বীকার করে দিল্লী ফিরে যেতে বাধ্য হন। এরপর তিনি বাংলাদেশ সন্নিহিত একাধিক রাজ্য আক্রমণ করেন। বহু যুদ্ধ করলেও পরিপূর্ণ জয়লাভ সব জায়গায় করতে পারেন নি। তবুও বাংলার প্রায় সম্পূর্ণ এবং বিহারের এক বিরাট অংশ তাঁর রাজ্যভূক্ত হয়েছিল। আসামের 'হোসেন শাহী পরগণা' নামে পরিচিত একটি অঞ্চল এখনও হোসেন শাহের স্মৃতি বহন করছে। হোসেন শাহ উড়িষ্যার সঙ্গেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। রিয়াজ উস সালাতীনে এই যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে - "আশপাশের সমস্ত রাজাকে বশীভূত করে এবং উড়িষ্যা পর্যন্ত জয় করে তিনি কর আদায় করেছিলেন।"

সুলতান হোসেন শাহ এর নাম ইতিহাসে বিখ্যাত হওয়ার অপর একটি অন্যতম কারণ হল তাঁর আমলে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য বাংলায় আসেন। এই এই সময়টা হল ১৫১৪ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাস। এরপর ১৫১৫ খ্রীঃ জুন মাস পর্যন্ত তিনি বাংলায় ছিলেন। গৌড়ের কাছে রামকেলি গ্রাম ছিল তার অবস্থান ক্ষেত্র। এই সময় হোসেন শাহের দুজন হিন্দু আমাত্য দবীর খাস ও সাকর মল্লিক তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর রাজকার্যে বৈরাগ্য ও সুলতানের সঙ্গে উড়িষ্যা অভিযানের সঙ্গী না হওয়ার কারণে ক্রুদ্ধ সুলতান তাঁকে বন্দী করে যুদ্ধ যাত্রা করেন। কিন্তু কারারক্ষীদের উৎকোচ প্রদান করে সনাতন নাম নিয়ে (ধর্ম নেওয়ার পর) বৃন্দাবন যাত্রা করেন

এবং তার সঙ্গী হন রূপ। এরপর তাঁরা দুজন বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা হন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত আরও কিছু ব্যক্তিত্বের নাম হোসেন শাহ - র আমলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। যেমন, - যশোরাজ খান, দামোদর, কবিশেখর ইত্যাদি।

হোসেন শাহ্ তাঁর রাজধানী গৌড় নগরীর সংলগ্ন একডালায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। ইতিহাসে বিখ্যাত এই একডালা দূর্গ পান্ডুয়ার খুব কাছেই ছিল। আবিদ আলীর মতে এই একডালা পান্ডুয়ার আট মাইল পশ্চিমে অবস্থিত মুর্চা গ্রাম।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই হোসেন শাহকে 'অসাম্প্রদায়িক' বলে আখ্যায়িত করতে চান। এর অন্যতম দুটি কারণ হল, হোসেন শাহের আমলেই চৈতন্য দেব সমগ্র বাংলায় হিন্দুধর্মের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তার নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন স্বয়ং সুলতান। দ্বিতীয়ত, হোসেন শাহ - ই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ও ব্যবহারে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তবকাৎ - ই - আকবরীর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি শেখ নুর কুতুব আলমের সমাধি সংলগ্ন দানসত্রগুলির খরচ চালাবার জন্য অনেকগুলি গ্রাম দান করেছিলেন। এছাড়া তাঁর রাজধানী একডালা থেকে পান্ডুয়া আসার পথে বিনা পয়সার সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন। নিজে প্রতিবছর একডালা থেকে পান্ডুয়ার নুর কুতুব আলমের সমাধিতে আসতেন। সুতরাং তিনি যে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও ধর্মান্তরীকরণও চলত সমসাময়িক গ্রন্থগুলিতে সে প্রমাণও আছে। আবার তাঁর রাজধানীর খুব কাছেই রামকেলি, কানাই, নাটশালা প্রভৃতি গ্রামে বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বাস করতেন। সব মিলিয়ে বলা যায় হোসেন শাহ ছিলেন বিচক্ষণ ও রাজনীতিকুশল নরপতি। তাই তাঁর হিন্দু বিরোধী কার্যকলাপ সংখ্যায় অল্প না হলেও তা কোনদিনই মাত্রাতিরিক্ত ভাবে প্রকাশ পায়নি।

হোসেন শাহ্ দীর্ঘদিন বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর যে সমস্ত শিলালিপি পাওয়া যায় তার মধ্যে সোনার গাঁওয়ের গোয়ালদী মসজিদের শিলালিপিই শেষতম; এই শিলালিপিটিতে যে তারিখ উল্লিখিত আছে তা হল ৯২৫ হিজরার ১৫ই শাবান অর্থাৎ ১৫১৯ খ্রীঃ ১২ই আগষ্ট। সুতরাং এই পর্যন্ত যে হোসেন শাহ্ এর রাজত্বকাল তা মেনে নেওয়া যায়। অনুমান শারীরিক অসুস্থতাই তাঁর মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুর সময় তিনি একাধিক পুত্র সন্তান রেখে যান।

নাসিরুদ্দিন নসরৎ শাহ্ ঃ

আলাউদ্দিন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র নাসিরুদ্দিন নসরৎ শাহ (১৫১৯ খ্রীঃ) সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে আরোহন করে পিতার মতই তিনি নাসির - উদ - দুনিয়া - ওয়াদ - দীন আবুল মুজফ্ফর উপাধি ধারণ করেন। তবাকাত - ই - আকবরীতে তিনি নাসীর শাহ কিন্তু অন্যত্র তিনি নসীব খান বলেও উল্লিখিত হয়েছেন।

রাজা হিসাবে নসরতের উল্লেখযোগ্য কীর্তিগুলির অন্যতম হল পূর্ব ভারতে ক্রমবর্ধমান মোগল শক্তির বিস্তারে বাধাদান। কূটনৈতিক দূরদর্শিতার সাহায্যে প্রায় দুবছর বাবরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়ালেও ১৫২৯ খ্রীঃ সরাসরি লড়াই হয়। এই যুদ্ধে নসরৎ পরাজিত হয়ে

কেবলমাত্র মৌখিক আনুগত্যই স্বীকার করলেন। আসাম অভিযান নসরৎ শাহের আরেক গৌরবময় কীর্তি। অসমীয়া বুরুঞ্জীগুলি থেকে জানা যায় নসরৎ শাহ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত আসামের উপর তাঁর আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। তাঁর পিতা হোসেন শাহর আসাম অভিযান ব্যর্থতার প্রতিশোধ তিনি এইভাবে নিয়েছিলেন। নসরত শাহের আমলেও (পিতার সময় থেকেই শুরু) পোর্তুগীজরা তাদের ব্যবসায়ের পীঠস্থান হিসাবে এদেশে তাদের ঘাঁটি গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু নসরতের বাধাদানে তা সম্ভব হয় নি। নর্সরতের আমলে তাঁর রাজ্যের আয়তন নেহাত কম ছিল না - প্রায় সমগ্র বাংলা, ত্রিহুত, বিহারের অধিকাংশ অঞ্চল এবং উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশ।

নসরত শাহ ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। গৌড়ে তিনি অনেকগুলি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। গৌড়ের 'কদম রসুল' ভবনটি তার দ্বারা নির্মিত বলেও অনেকে মনে করেন। কিন্তু অধ্যাপক ডঃ সুখময় সুখোপাধ্যায়ের মতে ভবনটি শাসসুদ্দিন য়ুসুফ শাহের রাজত্বকালে মির্শাদ খানই প্রথম নির্মাণ করান। তখন এটি একটি সাধারণ মসজিদ ছিল। পরে হোসেন শাহ এটিকে সংস্কার করান। নসরৎ শাহ কেবল সেই মসজিদের অভ্যন্তরে মঞ্চ ও হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন যুক্ত পাথরটি স্থাপন করেন। তখন এটি কদম রসুল নামে চিহ্নিত হয়। এছাড়াও নসরত শাহ গৌড়ের প্রসিদ্ধ বারদুয়াবী মসজিদ বা বড় সোনা মসজিদেরও নির্মাতা। বিখ্যাত এই মসজিদটির নির্মাণকার্য ৯৩২ হিজরা বা ১৫২৬ খ্রীঃ সমাপ্ত হয়।

রিয়াজ - উস - সালাতীনের মতে নসরৎ শাহ শেষ জীবনে নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। এই সময় একদিন যখন তিনি পিতার সমাধিক্ষেত্রে একনাকা নামক স্থানে গিয়েছিলেন তখন এক খোজা নসরৎ শাহকে হত্যা করে । আবার বুকানন হ্যামিলটনের বিবরণীতে আছে তিনি যখন ঘুমিয়েছিলেন তখন 'খওয়াজা সেরা' অর্থাৎ প্রাসাদের খোজার দ্বারা তিনি নিহত হন। সময়টা ৯৩৮ হিজরা বা ১৫৩১ - ৩২ খ্রীষ্টাব্দ, হোসেন শাহের মৃত্যুর পর দীর্ঘ তেরো বছর তিনি সসম্মানে সিংহাসনে ছিলেন।

আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ (২য়) ঃ

নসরতের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুল বদরের সিংহাসনের অধিকারকে অগ্রাহ্য করে রাজসভার এক প্রভাবশালী গোষ্ঠী ১৪১৪ খ্রীঃ নসরত পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনে বসান। ফিরোজ শাহ সুদক্ষ শাসক তো ছিলেনই সেই সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠ পোষকও ছিলেন। এইসময় দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ বাংলার 'বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল' রচনা করেন। ফিরোজ শাহ-র আমল থেকেই পূর্ব ভারতে শূব বংশীয় সর্দার শেরশাহের নেতৃত্বে পাঠান শক্তি বিকাশ লাভ করেছিলো। শের খাঁর পুত্র জালাল খাঁ এবং শের শার বিশ্বস্ত সেনাপতি খঅওয়াস খাঁ লখনৌতি অবরোধ করেছিলেন। রিয়াজেব মতে তিনি তিন বছর রাজত্ব করেন কিন্তু বুকাননেব মতে ও মুদ্রার সাক্ষ্যে তিনি নয় মাস রাজত্ব করেন।

গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহ ঃ

দ্বিতীয় আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে হত্যা করে এরপর সিংহাসনে বসেন তারই পিতৃব্য গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ। গিয়াসুদ্দিন এর পূর্ব নাম ছিল আবদুল বদর বা আবদ শাহ বা বদর

শাহ। রাজনীতি ও সমরনীতি উভয় ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ভাবে দুর্বল। উপরন্তু অদূরদর্শী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত এই সুলতান যে সাফল্যের সঙ্গে রাজ্যশাসন করতে পারবেন না তা বলাই বাহুল্য। তাঁর এই অকর্মণ্যতা এবং অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে প্রথমেই তাঁর ভগ্নিপতি মখদুম - ই - আলম ত্রিহুতে বিদ্রোহ করেছিলেন। এই মখদুম - ই - আলমের সঙ্গেই হাত মিলিয়ে শের শাহ বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রথামিকভাবে মাহমুদের সেনাপতিরা, বিশেষত পর্তুগীজ সেনাপতি জোআ কোরিয়ার নেতৃত্বে শের শাহ তখনকার মত পরাজয় মেনে নিলেও অন্য এক ঘুরপথে সৈন্যবাহিনী সহ গৌড়ে হাজির হলেন। তখন মাহমুদ শাহ তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে শের শাহ-র সঙ্গে সন্ধি করেন। শের শাহ এই অর্থ পেয়ে তখনকার মত ফিরে গেলেও সেই অর্থেই সামরিক শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করে আবার ফিরে এসে বিরাট পরিমান অর্থ দাবী করেন মহমুদ শাহ তা দিতে অস্বীকার করায় শের শাহ গৌড় আক্রমণ করেন। সঙ্গে ছিলেন শের শা পুত্র জালাল খাঁ ও সেনাপতি খওয়াস খান। পর্তুগীজ বিবরণ থেকে জানা যায় শের শাহ গৌড় আক্রমণ করে শহরটি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং লুণ্ঠনের দ্বারা প্রায় ছয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা হস্তগত করেছিলেন। গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ তখন নিরুপায় হয়ে হুমায়ুনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। হুমায়ুন গৌড়ের দিকে যাত্রা করলে পথে তেলিয়া গড়ির গিরিপথে জালাল খাঁর দ্বারা বাধা পেলেন। একমাস পর মুক্তি পেয়ে গৌড়ের পথে আবার যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে কলহগাঁও তে গিয়াসুদ্দিন খবর পান, তাঁর দুই ছেলেকে হত্যা করেছে শের শাহের পুত্র জালাল শাহ। এই সংবাদে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এরপর আর খুব বেশি দিন তিনি বাঁচেন নি। (১৫৩৮ খ্রীঃ জুলাই মাস) গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের আমলেই সদুল্লাপুরের 'জান জাহানিয়া' মসজিদ নির্মিত হয়। মালদহের সাহাপুরে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় তিনি একটি তোরণও নির্মাণ করেছিলেন।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাঁর বিচক্ষণতায় যে বিশাল সাম্রাজ্য তৈরী করেছিলেন গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা শেষ হয়ে গেল। হোসেন শাহের মৃত্যুর পর মাত্র ১৯ বছরেই এই রাজত্ব শেষ হয়, সেই সঙ্গে বাংলা আবার পুনরায় দিল্লীর অধীনতায় চলে অসে। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই সময় থেকে বাংলার মুসলিম রাজ্য 'বঙ্গালহ্' নামে অভিহিত হতে শুরু করে।

হুমায়ুন ও আফগান রাজত্ব ঃ

মামুদ শাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড় নগর অধিকার করেন (জুলাই এর ১৫৩৮ খ্রীঃ)। গৌড় অধিকার করার পর হুমায়ুন এই বিধ্বস্ত নগরীর সংস্কার সাধনে মনোযোগ দেন। তিনি এর রাস্তাঘাট, প্রাসাদ ও দেওয়ালগুলোর সংস্কার সাধন করে এখানেই থেকে যান। হুমায়ুনের গৌড় বসবাসের সময়সীমা প্রায় ন মাস। গৌড় নগরীর সৌন্দর্য এবং এখানকার জলহাওয়ার উৎকর্ষ হুমায়ুনকে মুগ্ধ করে ফেলে। কিন্তু এই শহরের নাম নাসির - উদ - দীন - মোহম্মদ হুমায়ুনের অপছন্দ ছিল, তিনি ভেবেছিলেন শহরের নাম গৌড় / গাড় অর্থাৎ কবর, এই জন্য তিনি গৌড় নগরীর নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন 'জন্নতাবাদ'। এরপর হুমায়ুন বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে তার কর্মচারীদের জায়গীর দান করে এবং বিভিন্ন স্থানে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে বিলাসব্যসনে মগ্ন হলেন। অল্পদিনের মধ্যেই হুমায়ুনের সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের

আর্দ্র জলবায়ু এবং ভোগবিলাসের ফলে ক্রমশ অকর্মণ্য হয়ে পড়তে লাগল। এরই মধ্যে আফগান নায়ক শের খান সূর দক্ষিণ দিক অধিকার করে নিলেন। এরপর তাঁর অশ্বারেহী সৈন্যরা গৌড় নগরীর আশে পাশেও বার বার হানা দিতে লাগল, এবং গৌড় নগরীর খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাও বিঘ্নিত করতে লাগল। ওদিকে হুমায়ুনের এক ভ্রাতা মির্জা হিন্দাল আগ্রায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। অন্য ভ্রাতা আসকারি হুমায়ুনের কাছে ক্রমাগত বাংলার মুসলিম, খোজা এবং হাতি চেয়ে পাঠাতে লাগলেন। এদিকে হুমায়ুন নিজস্ব অমাত্য ও সেনানায়কেরা খুবই দুর্বিনীত হয়ে উঠেছিলো। এইসব নানা কারণে বিপর্যস্ত হুমায়ুন জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাংলার সুবাদার পদে ও সহকারী হিসাবে ইব্রাহিমকে নিযুক্ত করে গৌড় ত্যাগ করেন। মুঙ্গেরে তিনি আসকারির অধীনস্থ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মুঙ্গেরে উপস্থিত হন। চৌসায় (১৫৩৯ খ্রীঃ ১৭ ই জুন) হুমায়ুনের সঙ্গে শের খানের যুদ্ধ হল, তাতে হুমায়ুন পরাজিত হলেন এবং কোন রকমে পলায়ন করলেন।

শের শাহ্ ঃ

হুমায়ুনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে আফগান বীর শের খান বাংলার দিকে রওনা হলেন এবং অবিলম্বেই গৌড় পুনরাধিকার করলেন। হুমায়ুন কর্তৃক নিযুক্ত জাহাঙ্গীর কুলীবেগ শের খানের পুত্রদ্বয় জালাল খান ও হাজী খান বটনী কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হলেন (অক্টোবর, ১৫৩৯ খ্রীঃ)। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে মোতায়েন মোগল সৈন্যদেরও শের খানের সৈন্যরা পরাজিত করল এবং সমগ্র বাংলাদেশই শের খানের অধিকারে চলে এল, ১৫৩৯ খ্রীঃ বিহার ও বাংলা অধিকার করার পর শের খান ফকিরুদ্দিন আবুল মুজাফ্ফর শের শাহ নাম গ্রহন করে সিংহাসনে আরোহন করলেন। প্রায় এক বৎসর কাল গৌড়ে বাস করে এবং বাংলাদেশের বিশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থাকে শৃঙ্খলায় বেধে তিনি হুমায়ুনের সঙ্গে পুনরায় সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন এবং হুমায়ুনকে কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত করে (১৫৪০ খ্রীঃ) ভারতবর্ষ ত্যাগ করাতে বাধ্য করলেন। অতঃপর শের শাহ ভারতবর্ষের সম্রাট হলেন এবং দিল্লীতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর কালিঞ্জর দূর্গ জয় করার সময় অকস্মাৎ দূর্গের অভ্যন্তরস্থ বারুদের স্তূপে আগুন লাগেলে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। (১৫৮৫ খ্রীঃ) এই পাঁচ বছরের রাজত্বকালীন সময়ে (১৫৪১ খ্রীঃ) তিনি জানতে পারেন যে, তারই নিযুক্ত শাসনকর্তা খিজর খান গৌড়ের শেষ সুলতান মামুদ শাহের এক কন্যাকে বিবাহ করে স্বাধীন সুলতানের মত আচরণ করছে এই সংবাদে শের শাহ পাঞ্জাব থেকে গৌড়ে আসেন এবং খিজর খানকে পদচ্যুত করে কাজী ফজীলৎ বা ফজীহৎকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই শের শাহ বাংলায় এক সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র রাজ্যকে ১১৬০০ টি পরগণায় বিভক্ত করে প্রতিটি পরগণায় পাঁচজন করে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন এবং রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। বাংলাদেশও এই শাসন ব্যবস্থার সুফল ভোগ করেছে।

শের শাহর অন্যান্য বংশধরগণ ঃ

শের শাহ-র মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র জালাল খান সূর ইসলাম শাহ নাম গ্রহন করে সুলতান হন এবং ১৫৮৫ - ৫৩ খ্রীঃ এই আট বছর কাল রাজত্ব করেন। কালিদাস গজদানী নামের বাইশ বৎসর বয়স্ক একজন রাজপুত যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি সুলেমান

খান নাম নিয়ে ইসলাম শাহের রাজত্বকালে পূর্ববঙ্গের অংশ বিশেষ অধিকার করে সেখানকার স্বাধীন রাজা হিসাবে নিজেকে ঘোষনা করেন। ইসলাম খান তাঁকে দমন করবার জন্য তাজ খান ও দরিয়া খান নামক দুইজন সেনানায়ককে প্রেরণ করেন। তুমুল যুদ্ধের পর সুলেমান বশ্যতা স্বীকার করলেও ইনি পুনরায় আবার বিদ্রোহ ঘোষনা করেন। তখন তাজ খাঁ ও দরিয়া খাঁ কৌশলে তার সঙ্গে সাক্ষাতের আয়োজন করে তাঁকে হত্যা করেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বাদশবর্ষীয় বালক পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসলে শেরশাহ-র ভ্রাতুস্পুত্র মুবারিজ খান কর্তৃক নিহত হন। মুবারিজ খান মহম্মদ আদিল শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তাঁর অত্যাচার অমাত্যদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরী করে। আদিলের দুর্বলতার সুযোগে অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও স্বাধীনতা ঘোষনা করে। বাংলার শাসনকর্তা মুহম্মদ খানও স্বাধীনতা ঘোষণা করে শাম - উদ - দীন - মুহম্মদ শাহ গাজী নাম নিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসেন (১৫৫৩ খ্রীঃ) সুলতান হয়ে তিনি একদিকে আরাকানের উপর হানা দিলেন অন্যদিকে জৌনপুর অধিকার করে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হলেন। কিন্তু মুহম্মদ শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু পথিমধ্যে ছাপর ঘাটের যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করলে (১৫৫৫ খ্রীঃ) মহম্মদ শাহ আদিল শাহবাহ খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠালেন।

শামস - উদ - দীন মুহম্মদ শাহ গাজীব মৃত্যুর পর তাঁর অমাত্যরা তাঁর পুত্র খিজির খানকে গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহ উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসান, বাহাদুর শাহ সিংহাসনে বসে শাহাবাজকে পরাজিত করে গৌড় অধিকার করেন এবং পিতৃহন্তা আদিল শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আদিল শাহের দুই সেনাপতি তাজ খাঁ করবানী ও তার ভাই বাহাদুর শাহর সঙ্গে যোগ দেওয়ায় আদিল শাহ এই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। বাহাদুর শা তখন তাজ খাঁ করবানীকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে নিজে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫৬১ খ্রীঃ বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়। গিয়াস - উদ - দীন বাহাদুর শাহের পর তাঁর ভ্রাতা দ্বিতীয় গিয়াস-উদ -দীন, জালাল-উদ-দীন শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ১৫৬১ খ্রীঃ ১৫৬৩ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলাদেশের কিছু অংশ রাজত্ব করেন বলে অনুমান জালাল শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিংহাসনে বসেন। প্রায় সাত মাস তিনি রাজত্ব করলেও তাঁর নাম পাওয়া যায় না। জনৈক ব্যক্তি জালাল শাহ-র পুত্রকে হত্যা করে তৃতীয় গিয়াস - উদ - দীন নাম ধারণ করে সুলতান হন। ইনি বছর দুয়েক সিংহাসনে থাকার পর শের শাহর প্রধান কর্মচারী ও অমাত্য কররানী বংশের তাজ খান তাঁকে হত্যা করে বাংলার সুলতান হন (১৫৬৪ খ্রীঃ)।

কররানী বংশ ঃ

তাজ খাঁ কররানী ঃ

কররানীরা আফগান বা পাঠান জাতিরই একটি প্রধান শাখা। তাদের আদি বাসস্থান বাঙ্গাশে যার অধুনিক নাম কুররম। শের খানের প্রধান অমাত্যদের মধ্যে করবানী বংশের অনেকে ছিলেন; তাদের মধ্যে তাজ খাঁ অন্যতম, ইনি মুহম্মদ আদিল শাহের সিংহাসন লাভের পর রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যান এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় অঞ্চলের একাংশ অধিকার

করেন। কিন্তু আদিল শাহ তাঁকে পরাজিত করলে তাজ খাঁ খাওয়াসপুর টান্ডায় পালিয়ে তাঁর অন্যান্য ভ্রাতা ইমাদ, সুলেমান, ও ইলিয়াসের সঙ্গে মিলিত হন। আদিল শাহের সেনাপতি হিমুর দ্বারা পুনরায় যুদ্ধে পরাস্ত হলে তাজ খাঁ বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন এবং তৃতীয় গিয়াসুদ্দিনকে হত্যা করে বাংলার অধিপতি হন (১৫৬৪ খ্রীঃ)। কিন্তু সিংহাসন আরোহনের এক বছরের মধ্যেই তিনি মৃত্যুপথে পতিত হলে তাঁর ভ্রাতা সুলেমান বাংলার সুলতান হলেন।

সুলেমান কররানী :

কররানী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন সুলেমান কররানী। তিনি ভ্রাতা তাজ খাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসে প্রায় ৮ বছর রাজত্ব করেছিলেন (১৫৭২ খ্রীঃ) দিল্লী, অযোধ্যা, গোয়ালীয়র, এলাহাবাদ ইত্যাদি অঞ্চল মোগল রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে আফগান নায়কদের অনেকেই বাংলাদেশে সুলেমান কররানীর আশ্রয়ে চলে এসেছিল। এছাড়া সুলেমান কররানীর ছিল সহস্রাধিক উৎকৃষ্ট হাতি। ফলে সব মিলিয়ে সুলেমান কররানী সামরিক শক্তিতে অপরাজেয় হয়ে উঠেছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রাজত্বের সীমা বিস্তারে। দক্ষিণে পুরী, পশ্চিমে শোন নদ, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এই সীমা বিস্তৃত হয়েছিল। সুর বংশের বিভিন্ন শাখা বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে এই সময়ে সুলেমান - ই ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। শুধু রাজত্বের বিস্তারই নয় তিনি একজন সুশাসক ন্যায় বিচারকও ছিলেন। তাঁর আমলে রাজত্বের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি মুসলমান আলিম ও দরবেশদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মুসলিম শরিয়তের বিধান তিনি নিজে যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন তাঁর প্রজাগণও যাতে এই নির্দেশ কোনমতে অমান্য করতে না পারে তাও দেখতেন। সোলেমান অস্বাস্থ্যকর গৌড় নগর ত্যাগ করে টাড়া বা তান্ডায় (বর্তমান কালিয়াচকের কাছে জালুয়াবাথান গ্রাম) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি সম্রাট আকবরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধ এড়িয়ে চলেন। তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় পুরীর জগন্নাথ মন্দির লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে আসেন। মালদা জেলার গুয়া মালতীতে কালাপাহাড়ের বাড়ী ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। সোলেমান যতদিন রাজত্ব করেছিলেন তাঁকে মোগল আক্রমণে প্রতিহত করতে হয়নি। মোটামুটি নির্বিঘ্নে রাজত্ব করার পর ১৫৭২ খ্রীঃ ১১ই অক্টোবর সোলেমানের মৃত্যু হয়।

বায়াজিদ কররানী :

সুলেমানের মৃত্যুর পর তাঁর জেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ কররানী সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর অসংযত, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে নিজের ব্যর্থতা প্রমাণ করে অমাত্যদের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠলেন। এদের মধ্যে একদল অমাত্য যাদের মধ্যে লোহানীরাই প্রধান তাঁরাই তাঁর বিরূদ্ধে চক্রান্ত করলেন। সুলেমানের ভাগিনেয় ও জামাতা হনসুও এদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এদের হাতে বায়াজিদ নিহত হলেন। বায়াজিদ এর রাজত্বের সময়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নাই। কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যেই তিনি দিল্লির সম্রাট আকবরের অধীনতা অস্বীকার করেছিলেন এবং নিজের নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন।

দাউদ কররানী :

বায়াজিদ হত্যাকারীদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্খী সুলেমান ও ভাগিনেয় জামাতা হনসু ছিলেন

সিংহাসন পদের অন্যতম দাবিদার। কিন্তু তিনিও লোদী খান ও অন্যান্য বিশ্বস্ত অমাত্যদের হাতে বন্দী হয়ে নিহত হলেন। অমাত্যরা এরপর সুলেমানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদকে সিংহাসনে বসালেন।

তরুন বয়স্ক দাউদ কররানী এক কথায় অবিবেচক এবং দুশ্চরিত্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। অমাত্যদের অপমান এবং জাতিদের মধ্যে অনেককেই হত্যা করে তিনি নিজ প্রাসাদ মধ্যেই বহু শত্রু সৃষ্টি করলেন। কুৎব খান, গুজর্ কররানী প্রভৃতি স্বার্থপর অমাত্যদের কুমন্ত্রণায় দাউদ লোদী খানের মত বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য মন্ত্রীর প্রতি বিরূপ হলেন এমনকি লোদী খানের জামাতা য়ুসুফকে হত্যা করলেন। দাউদ বায়াজিদের মতোই আকবরের অধীনতা অস্বীকার ও নিজের নামে খুৎবা পাঠ করান। এই সংবাদে অসন্তুষ্ট আকবর প্রথমে বিহার জয় করার জন্য খান - ই খানান মুনিম খানকে প্রেরণ করেছিলেন। করণ দাউদের অকর্মন্যতার সুযোগে আফগানদের প্রধান সেনাপতি গুজর খান বায়াজিদের পুত্রকে বিহারের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এরপর আকবর স্বয়ং বহু কামান ও বিশাল রণহস্তী সমেত এক নৌবহর নিয়ে বিহারে এসে মুনিম খানের সঙ্গে যোগ দিলেন (৩রা আগষ্ট, ১৫৭৪)। তিনি প্রথমে পাটনার হাজীপুর দুর্গ অধিকার করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন (৬ই আগষ্ট)। এতে দাউদ খাঁ অত্যন্ত ভীত হয়ে সেই রাত্রেই সদলবলে জলপথে বাংলায় পালিয়ে গেলেন। এরপর মুনিম খাঁ বিনা বাধায় বাংলার রাজধানী টান্ডায় প্রবেশ করলেন (২৫ শে সেপ্টম্বর, ১৫৭৪ খ্রীঃ) রাজধানী স্থাপনের জন্য টান্ডা তখন অনুপযুক্ত ছিল কারণ বর্ষায় টান্ডায় নীচু জলা অংশগুলিতে প্রচুর পরিমানে জল থাকত। মুনিম খাঁ সেই কারণে গৌড় জয় করেন। কিন্তু এক কালের রাজধানী গৌড় ও অনেকদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে (১৫৭৫ খ্রীঃ) অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় হাজার হাজার মানুষ মহামারীর কবলে প্রাণ হারিয়েছিল। সুবাদাব এই পরিস্থিতিতে আবাব তাঁর রাজধানী পুনরায় টাড়ায় নিয়ে যান। কিন্তু এরপর তিনি আর মাত্র দশদিন তিনি বেঁচে ছিলেন। ১৫৭৫ খ্রীঃ ২৩ এ অক্টোবর মুনিম খাঁর মৃত্যু হয়। মুনিম খানের মৃত্যুর পর আফগানরা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে মোগলদের বিরূদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। মুনিম খাঁ-র মৃত্যু সংবাদে আকবর ততদিনে হাসান কুলী বেগ ওরফে খান- ই - জাহানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠালেন। খান- ই - জাহান দাউদ করবানীর বিদ্রোহের বংবাদের বাংলার দিকে অগ্রসর হল। ১৫৭৬ খ্রীঃ ১৩ই জুলাই বিহারের মোগল সৈন্যবাহিনী রাজমহলে এসে খান - ই - জাহানের সঙ্গে যোগ দিল। ১২ই জুলাই মোগলদের সঙ্গে আফগানদের এক প্রচন্ড যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে আফগানরা সম্পূর্ণ পরাজিত হল। দাউদ করবানী বন্দী হল। খান - ই - জাহান দাউদ কররানীর প্রাণ ভিক্ষা দিতে সম্মত থাকলেও আমীরদের ইচ্ছায় দাউদকে সন্ধিভঙ্গের অপরাধে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করলেন। দাউদ কররানীর ছিন্ন শির দিল্লীতে আকবরের কাছে পাঠান হল।

বাংলার প্রথম আফগান শাসক শের শাহ এবং শেষ আফগান শাসক দাউদ কররানী। আফগানরা মোট সাঁইত্রিশ বছর এদেশ শাসন কবেছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীঃ দাউদের পরাজয় ও হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ থেকে আফগান শাসন শেষ হয়ে গেল। অবশ্য দাউদের মৃত্যুর পরেও বাংলাদেশেব অনেক জায়গায় আফগানরা নিজ নিজ আধিপত্য বজায় রেখেছিল। আধিপত্য বজায় রাখার জন্য এর পর অনেকদিন পর্যন্ত আফগানদের সঙ্গে মোগলদের লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছিল।

মোগল যুগ :

১৫৭৫ খ্রীঃ দাউদ খানের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ পুনরায় মুগল সম্রাটের অধিকারভুক্ত হল। কিন্তু তবুও আফগান শাসন পরবর্তী প্রায় কুড়ি বৎসর পর্যন্ত মুঘলের রাজ্যশাসন এদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। বাংলাদেশে একজন মুঘল সুবাদার ছিলেন এবং মাত্র কয়েকটি সেনানিবাস ছিল। এই সেনানিবাসগুলির নিকটবর্তী জনপদগুলি কেবল মুঘল শাসন স্বীকার করে নিয়েছিলো কিন্তু অন্যান্য জায়গাগুলি ছিল জায়গীরদারদের দখলে। শুধু তাই নয় আফগান সৈন্য এবং মুঘল সৈন্য যথেষ্ট ভাবে লুঠতরাজ এবং সাধারন মানুষের উপর অত্যাচার করত। বাংলার জমিদাররাও গায়ের জোরে যে যার মত নিজস্ব এলাকা ভুক্ত জমির পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছিলেন। এককথায় বাংলাদেশে আটশত বছর পরে আবার মাৎস্যন্যায়ের আবির্ভাব হল।

দাউদ খানকে পরাজিত ও হত্যা করার পর তিন বৎসর এর কিছু বেশি দিন দক্ষতার সঙ্গে শাসন করে খান-ই- জাহানের মৃত্যু হল (১৯ শে ডিসেম্বর, ১৫৭৮ খ্রীঃ)। পরবর্তী সুবাদার হন মুজাফফর খান। তিনি এই পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। এই সময় আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই শাসন নীতি প্রবর্তন করলেন। রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হল। এর ফলে প্রাদেশিক মুঘল কর্মচারীদের যথেষ্ট অর্থ উপায়ের সম্ভাবনা বিনষ্ট হল। বিদ্রোহ করলেন বাংলা ও বিহারের মুঘল কর্মচারীগণ। আকবরের ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্তা মীর্জা হাকিম একদল ষড়যন্ত্রকারীর প্ররোচনায় দিল্লীর সিংহাসনে বসার আয়োজন করছিলেন। তার দলের লোকেরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হল, মুজাফফর খান এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলেন। বিদ্রোহীরা তাঁকে টাডায় হত্যা করল (১৯ শে এপ্রিল, ১৫৮০ খ্রীঃ)। মীর্জা হাকিম নতুন সুলতান বলে ঘোষিত হলেন। এরপর বাংলায় নবনিযুক্ত সুবাদারের আমলে মোগল সাম্রাজ্য থেকে বাংলা সাময়িক ভাবে আবার বিচ্ছিন্ন হল। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে আকবর (১৫৮২ খ্রীঃ) খান - ই - আজমকে সুবাদার এর দায়িত্ব দিয়ে বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করে করলেন। তিনি তেলিয়াগড়ির কাছে মাসুম - কবুলীর অধীনে সম্মিলিত পাঠান বিদ্রোহীদের পরাজিত করলেন(২৪ শে এপ্রিল, ১৫৮৩ খ্রীঃ)। কিন্তু পরাজয় না মেনে মাসুম - কাবুলী - ঈশা খানের সঙ্গে যোগ দিলেন। পরবর্তী সুবাদার এই বিদ্রোহ দমনে বহুদিন ঈশা খানের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু তাঁকে পরাজিত করতে না পেরে রাজধানী টান্ডায় ফিরে গেলে, সুযোগ বুঝে মাসুম ও অন্যান্য পাঠান সেনাপতিরা মালদহ পর্যন্ত অগ্রসর হল। ১৫৮৫ খ্রীঃ বাংলায় বিদ্রোহ দমন করার জন্য আকবর অনেক নতুন নতুন ব্যবস্থা নিলেন, কিন্তু বাংলাকে তবুও সম্পূর্ণ বশে আনা গেল না। অবশেষে শাহবাজ খান যুদ্ধের পরিবর্তে তোষন ও উৎকোচ প্রদান পদ্ধতির প্রচলন করে পাঠান বিদ্রোহীদের বশীভূত করলেন। ঈশা খান মাসুম উভয়েই মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করে নিল (১৫৮৬ খ্রীঃ)। সুতরাং এই সময়ে বাংলাদেশ পুনরায় মোঘল অধিকারে এল। ১৫৮৭ খ্রীঃ শেষভাগ থেকে বাংলাদেশে নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। এই ব্যবস্থা অনুসারে ওয়াজির খান প্রথম সিপাহসালার নিযুক্ত হলেন কিন্তু ঐ বছরেই (১৫৮৭ খ্রীঃ) আগষ্ট মাসে তাঁর মৃত্যু হলে সৈয়দ খান নতুন সিপাহশালার নিযুক্ত হলেন। তাঁর সুদীর্ঘ শাসনকালে (১৫৮৭ - ১৫৯৪ খ্রীঃ) বাংলাদেশে আবার পাঠানেরা ও জমিদাররা শক্তিশালী হয়ে উঠল।

মান সিংহ ঃ

১৫৯৪ খ্রীঃ রাজা মানসিংহ বাংলাদেশের শাসনকর্তা হয়ে এলেন। পাঁচ হাজার মুঘল সৈন্যকে তিনি জায়গীর দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করিয়ে নিলেন। এরপর তিনি নিজে রাজধানী টান্ডায় থেকে বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য চতুর্দিকে সৈন্য পাঠালেন। তাঁর পুত্র হিম্মৎ সিংহ ভূষনা দুর্গ দখল করে নিল (এপ্রিল, ১৫৯৫ খ্রীঃ)। ১৫৯৫ খ্রীঃ ৭ই নভেম্বর মানসিংহ তাঁর রাজধানী টান্ডা থেকে সরিয়ে রাজমহলে নিয়ে যান। নাম দেন আকবরনগর। এখান থেকে তিনি ঈশা খানের বিরূদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে ঈশা খানের জমিদারীর অধিকাংশ মুঘল অধিকারভুক্ত করে নেন। ঈশা খান তার জমিদারী পুনরূদ্ধারের জন্য শ্রীপুরের জমিদার কেদার রায়ের সঙ্গে মিলিত হন। কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ন মুঘলদের পক্ষে ছিলেন বলে তারই জ্ঞাতি রঘুপতিকে নিজ দলে টেনে নিয়ে ঈশা খান কুচবিহার আক্রমণ করলেন। এই বিদ্রোহ প্রতিরোধ করার জন্য মানসিংহ তাঁর পুত্র দুর্জন সিংহকে পাঠালেন। ১৫৯৭ খ্রীঃ ৫ ই সেপ্টেম্বর ঈশা খান ও মাসুম খানের বিপুল রনতরীর কাছে মুঘলেরা বিপর্যস্ত হল এবং দুর্জন সিংহ নিহত হলেন (সেপ্টেম্বর ১৫৯৯ খ্রীঃ)। এর আগে ভূষণা বিজেতা মানসিংহের অপর আর একটি পুত্র হিম্মৎ সিংহ কালবায় মারা গেলেন (মার্চ ১৫৯৭ খ্রীঃ)। এই দুই পুত্রের মৃত্যুতে শোকাতুর মানসিংহ সম্রাটের অনুমতি নিয়ে আজমীর গেলেন (১৫৯৮ খ্রীঃ)। সেই জাযগায় তাঁর জেষ্ঠ পুত্র জগৎ সিংহ বাংলার দায়িত্বে রইল। কিন্তু আগ্রা যাওয়ার পথে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর তার বালক পুত্র মহাসিংহ দায়িত্বে আসেন। এই সুযোগে বাংলার পাঠান বিদ্রোহীরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠে উড়িষ্যার উত্তরাংশ পর্যন্ত জয় করে ফেলেন। এই অবস্থায় আবার বাংলার হাল ধরেন মানসিংহ (ফেব্রুয়ারী, ১৬০১ খ্রীঃ)। এর ফলে শ্রীপুরের জমিদার কেদার রায় বশ্যতা স্বীকার করলেন। মানসিংহ একে একে পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহীদের পাঠান নায়ক কুৎলু খানের উজীর পুত্র দাউদ খান সহ অন্যান্য বিদ্রোহীদের পরাস্ত করে বিতাড়িত করেন। মালদহের বিদ্রোহীদের জন্য পৌত্র মহাসিংহ সহ কালিন্দ্রীর পরপারে পরাজিত করেন। ঢাকা অঞ্চলে আরাকানের মগ জলদস্যুদের এবং বিক্রমপুরের কাছে কেদার রায়কে পরাজিত করলেন। উসমানের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁকেও পরাজিত করলেন, এইভাবে বাংলায় আবার কিছুটা শান্তি ফিরে এল। কেদার রায় মারা গেলেন ১৬০৩ খ্রীঃ। এরপর মানসিংহ অকবরের নির্দেশে ১৬০৫ খ্রীঃ আগ্রায় ফিরে যান এবং আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকেন।

জাহাঙ্গীরের শাসনাধীন বাংলাদেশের অবস্থা ঃ

মুঘল সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন(১৬০৫ খ্রীঃ)। এই সময়ে শের আফগান ইস্তালজ নামক বর্ধমানের এক জায়গীরদার এর এক অসামান্য রূপবতী পত্নী ছিল। এই নারীরত্নকে হস্তগত করবার জন্যই মানসিংহকে সরিয়ে বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত করলেন জাহাঙ্গীর তাঁর বিশ্বস্ত ধাত্রী পুত্র কুতুবুদ্দীন খান কোকাকে। কুৎবুদ্দীনের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর কুলী খান বাংলাদেশের সুবাদার হয়ে আসেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর জায়গায় ইসলাম খান ১৬০৮ খ্রীঃ জুন মাসে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসে। তাঁর শাসনকাল মাত্র পাঁচ বছর। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি

মানসিংহের আরব্ধ কাজ করে বাংলাদেশে মুঘল ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইসলাম খানের আমলে মালদহের এক বিদ্রোহী মনসবদার আলি আকবর শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ও পরাস্ত হন (১৬১১ খ্রীঃ)। যদিও মোগলেরা মানসিংহের সময় থেকে বাংলাদেশের উপর তাদের অধিকার বজায় রেখেছিল তবুও সুযোগ পেলেই বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ দেখা দিত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ইশা খাঁ ও তাঁর পুত্র মুসা খাঁ, ভূষণার সত্রাজিৎ, সুসঙ্গের রঘুনাথ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বাকলার রামচন্দ্র, ভুলুয়ার আন্তমানিক্য এবং পশ্চিমবঙ্গের মল্লভূম ও বাঁকুরার বীরহাম্বীর, পাঁচের শামস্ খান ও হিজলীর সেলিম খান। ইসলাম খানের আমলে সুবে বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে সরে গিয়ে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হল, ইসলাম খাঁ এই নতুন রাজধানীর নাম দিলেন জাহাঙ্গীর নগর। এরপর কামরূপ জয়ের কিছুদিন পরেই ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়ালে (আগষ্ট, ১৬১৩ খ্রীঃ) তাঁর মৃত্যু হয়। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই ইসলাম খাঁ সমগ্র বাংলাদেশে মুঘল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি শৃঙ্খলা প্রণয়ণে সাহস ও রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন, বলা বাহুল্য বাংলাদেশে মুঘল আধিপত্য বিস্তারের অন্যতম কারণই ছিল মানসিংহ ও ইসলাম খাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধি ও দক্ষতা।

ইসলাম খানের মৃত্যুর পর তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশিম খান (১৬১৪ - ১৭ খ্রীঃ) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হলেন। তিনি জেষ্ঠ ভ্রাতার মত বিচক্ষণ ছিলেন না। বাংলার চতুর্দিকে ইসলাম খানের বিজিত রাজ্যগুলি কাশিম খানের আমলে হাতছাড়া হয়ে যেতে লাগল। এমনকি অমাত্যদের সঙ্গে দুর্ব্যহারের ফলে আভ্যন্তরীণ গোলযোগও তীব্র হতে লাগল। সব মিলিয়ে কাশিম খানের আমলে বাংলাদেশে মুঘল শাসন দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

পরবর্তী সুবাদার ইব্রাহিম খান ফতেহ্ জঙ্গ কাশিম খানের মত দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন না। ইব্রাহিম খতেহ খানের দক্ষতায় তাই হৃত রাজ্যসীমা আবার পুনরুদ্ধার হয়। শুধু তাই নয় তিনি মেঘনা তীরবর্ত্তী গ্রামগুলির উপর আরাকান দস্যুদের অত্যাচার থেকে জনগণকে মুক্ত করেন। ইব্রাহিম খানের আমলে তাই বাংলাদেশে সুখ ও শান্তি কিছুদিনের জন্য হলেও ফিরে এসেছিল।

সম্রাট শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের শাসনাধীন বাংলাদেশের অবস্থা ঃ

ইব্রাহিম খানের শাসনাধীন কালে জাহাঙ্গীর পুত্র সাজাহান পিতার বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করলেন এবং পরাজিত হয়ে বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হলেন। তিনি পুরাতন বিদ্রোহী মুসা খানের পুত্র এবং শত্রু আরাকানরাজ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের সহায়তায় বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। পিতা পুত্রের এই যুদ্ধে ইব্রাহিম দিল্লী অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের পক্ষ অবলম্বন করেন। শাহজাহান রাজমহল দখল করলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইব্রাহিম নিহত হলে, শাহজাহান জাহাঙ্গীরনগর অধিকার করে স্বাধীন রাজার মত রাজত্ব করতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বাদশাহী ফোজের হাতে পরাজিত হয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে দাক্ষিণাতে চলে যান। এর চার বছর পর জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হলে শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে বসেন (১৬২৮ খ্রীঃ)।

সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসন আরোহন থেকে (১৬২৮ খ্রীঃ) ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত (১৭০৭ খ্রীঃ) পর্যন্ত বাংলাদেশে মোটামুটি শান্তি বজায় ছিল। এই দীর্ঘদিন বাংলার কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস পাওয়া যায় না। তা মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন প্রণালীর নির্দিষ্ট নিয়মেই চলত এবং

বাংলাদেশের ইতিহাস মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসেরই একটি খন্ডিত অংশে পরিণত হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ মোগল রাজনৈতিক ইতিহাসে বাংলাদেশে তিনজন সুবাদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১) শাহজাহানের পুত্র শুজা (১৬৩৯ - ১৬৫৯ খ্রীঃ), ২) শায়েস্তা খান (১৬৬৪ - ১৬৬৮ খ্রীঃ) এবং ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজিমুস্সান (১৬৯৮ - ১৭০৭ খ্রীঃ)।

শাহজাহানের আমলে শুজা বাংলাদেশের সুবাদার হয়ে এসে হুগলী বন্দর থেকে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের বিতাড়িত করেন। ফলে বাংলার নিজস্ব ব্যবসা - বানিজ্য থেকে বাঙ্গালীব্যবসায়ীদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়, তিনি দেশে শান্তি শৃঙ্খলারও ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সিংহাসন লাভের জন্য ভ্রাতা ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে বিরোধের ফলে শুজা খাজয়ার যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে আরাকানে পালিয়ে গেলেন (মে, ১৬৬০ খ্রীঃ)। কিন্তু দুই বছর পর আরাকান রাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অভিযোগে তিনি নিহত হন।

এরপর বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন মীরজুমলা (জুন, ১৬৬০ খ্রীঃ)। মীরজুমলা বাংলার সুবাদার হয়েই কুচবিহার ও কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন (১৬৬১ খ্রীঃ) কুচবিহার রাজ পলায়ন করলেন কিন্তু অহোম রাজকে পরাস্ত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল। এরই মধ্যে হঠাৎ করে তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়লেন তখন অহোমরাজের সঙ্গে সন্ধি করে মুঘল সৈন্য বাংলাদেশে ফিরে এল। ঢাকার পথে গন্তব্যের মাত্র কয়েক মাইল দূরে তাঁর মৃত্যু হল (মার্চ,১৬৬৩ খ্রীঃ)। মীরজুমলার সময় থেকে পর্তুগীজদের সঙ্গে ইংরেজ বণিকেরাও এদেশে যাতায়াত শুরু করল। মীরজুমলার সময়ে ইংরেজ কুঠিয়ালদের সঙ্গে হুগলীতে শুল্ক ও বালেশ্বরের সংক্রান্ত শুল্কের ব্যাপারে তার বিরোধ হয়। যদিও তিনি বিভিন্ন ব্যাপারে পর্তুগীজ এবং ইংরেজ বণিকদের সাহায্য নিতেন এবং মোগল সৈন্যদলে কিছু পরিমান পর্তুগীজদেরও নিয়েছিলেন। মীরজুমলার মৃত্যুতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবার অশান্ত হয়ে উঠল।

মীরজুমলার মৃত্যুর পর ৬৩ বছর বয়সে বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন শায়েস্তা খাঁন (মার্চ, ১৬৬৪ খ্রীঃ)। তিনি সবচাইতে বেশিদিন বাংলার সুবাদার ছিলেন। দীর্ঘ ২২ বছর তার রাজত্বের সময়সীমা। শায়েস্তা খান বাংলাদেশে এসে অত্যন্ত বিলাস - ব্যাসনে দিন কাটাতেন। দিল্লীতেও তিনি প্রচুর অর্থ প্রেরণ করতেন সম্রাটকে খুশী রাখার জন্য। সমসাময়িক ইংরেজদের রিপোর্টগুলির মাধ্যমে জানা যায় এই অর্থ তিনি আদায় করতেন প্রজাদের কাছ থেকে, তার নিজস্ব কিছু একচেটিয়া ব্যবসাও ছিল। তিনি সুবাদারীর ১৩ বছরে ৩৮ কোটি টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। এরপর বৃদ্ধ শায়েস্তা খাঁ নিজে যুদ্ধেও যেতেন না। উপযুক্ত সেনাবাহিনী এবং বিশ্বস্ত লোক দ্বারা নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতেন। এই ভাবেই তিনি কুচবিহারের বিদ্রোহী রাজাকে তাড়িয়ে কুচবিহার রাজ্য পুনরায় মোগল অধীনে নিয়ে আসেন এবং দেশের চারদিকের ছোট খাট বিদ্রোহ দমন করেন। তার শাসনাধীন বাংলার উল্লেখযোগ্য কাজ হল চট্টগ্রাম বিজয় (জানুয়ারী, ১৬৬৬ খ্রীঃ)। চট্টগ্রাম বিজয়ের পর ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে এখানকার নতুন নামকরণ হয় ইসলামাবাদ। নানা করাণে শায়েস্তা খান বাংলাদেশে একটি পরিচিত নাম। তার সম্পর্কে সমধিক প্রচলিত লোক কথাটি হল তাঁর দৈনিক ব্যয় ছিল একলক্ষ টাকা এবং আয় ছিল দুই লক্ষ টাকা। তাঁর আমলে বাংলাদেশে টাকায় আটমন চাল পাওয়া যেত। যেখানে তার রাজত্বের বহু আগে (১৬৩২ খ্রীঃ) এই চালের দাম ছিল টাকায় পাঁচ মন। শায়েস্তা খানের নিজস্ব জায়গীর ছিল মালদহে। তার

আমলে ইংরেজরা পাকাপাকি ভাবে ঢাকা (১৬৬৮ খ্রীঃ) রাজমহল ও মালদহে (১৬৮০ খ্রীঃ) তাদের কুঠি স্থাপন করে। যদিও নানা কারণে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে শায়েস্তা খাঁর বিবাদ শুরু হয়। ১৬৮৮ খ্রীঃ জুন মাসে তাঁর সুবাদারী শেষ হয়।

শায়েস্তা খানের পর ঔরঙ্গজেবের ধাত্রীপুত্র অপদার্থ খান - ই - জাহান বাহাদুর বাংলার সুবাদার হলেন। এক বৎসরের মধ্যে এই অপদার্থ সুবাদারকে পদচ্যুত করা হল।

খান - ই - জাহানের পর সুবাদার নিযুক্ত হলেন ইব্রাহিম খান। এই ইব্রাহিম খান ছিলেন বহু ফার্সী গ্রন্থের একনিষ্ঠ পাঠক। তার আমলে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল চন্দ্রকোণা মহকুমার ছোট - বর্দার জমিদার শোভা সিংহ রাজা উপাধি গ্রহণ করেন এবং উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খানের সহায়তায় বিরাট ভূখন্ডের মালিক হন। এই শোভা সিংহ কৃষ্ণরামের সাহসিনী কন্যার দ্বারা ছুরিকাঘাতে নিহত হলে রহিম খান রহিম শাহ্ নাম নিয়ে বিরাট বাহিনী সহ মখসুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) লুণ্ঠন এবং রাজমহল ও মালদহ অধিকার করলেন। এই সংবাদে ঔরঙ্গজেব ইব্রাহিম খানকে পদচ্যুত করে নিজের পৌত্র আজিমুদ্দিনকে যিনি আজিমস্ খান নামেই পরিচিত বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ততদিনে জবরদস্ত খান বিদ্রোহী রহিম শাহকে পরাজিত করে রাজমহল, মালদহ, মখসুদাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান পুনরুদ্ধার করলেন।

আজি মুসসান ১৬৯৭ খ্রীঃ থেকে ১৭১২ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন। শেষ দশ বৎসর তিনি বিহারেরও সুবাদার ছিলেন। তিনি জানতেন বৃদ্ধ সম্রাট ওরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে শক্ত হাতে দিল্লীর শাসনভার ধরার মত আর তেমন কেউ নেই। অভিভাবকহীন সেই দিনের ছবি সামনে রেখেই তিনি নানা অবৈধ উপায়ে এবং প্রজা উৎপীড়নের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতেন। কিন্তু দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ অত্যন্ত দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। তিনি আজিমুসসানের অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রাহের পথ বন্ধ করে দিয়ে দিল্লীর সম্রাটকে সমস্ত বিষয়টি গোচরীভূত করে খুব তাড়াতাড়িই দেওয়ানী বিভাগ মখসুদাবাদে স্থানান্তরিত করলেন। ক্রুদ্ধ আজিমুসসান মুর্শিদকুলী খানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন কিন্তু সফল হলেন না। বহু বৎসর পরে আওরঙ্গজেবের অনুমতিক্রমে মখসুদাবাদ মুর্শিদাবাদ এই নামে রূপান্তরিত হয়।

মুর্শিদকুলী খান ঃ

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সম্রাট হলেন বাহাদুর শাহ (১৭০৭ খ্রীঃ)। তিনি পুত্র আজিমুম খানের প্ররোচনায় মুর্শিদকুলী খানকে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান হিসাবে প্রেরণ করেন। কিন্তু বাংলার নবনিযুক্ত দেওয়ান জিয়াউল্লাহ খান বিদ্রোহী নাকদীদের দ্বারা কিছুদিনের মধ্যেই নিহত হন (২০ শে জানুয়ারী, ১৭১০ খ্রীঃ)। সুতরাং মুর্শিদকুলী খানকে পুনরায় বাংলার দেওয়ান পদে (২০ শে ফেব্রুয়ারী, ১৭১০ খ্রীঃ) ফিরিয়ে আনা হয়। শুধু তাই নয় তাকে উচ্চতম তিন হাজার জাঠ সৈন্য এবং দামামা দ্বারা সম্মানিত করা হয়। এই পর্বে দিল্লীর সম্রাটেরা অকর্মণ্য ও দুর্বল চিত্তের হয়ে পড়লে এবং পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা ষড়যন্ত্র ও আত্ম কলহে লিপ্ত হয়ে পড়লে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। তাই এই সময় থেকে বাংলার সুবাদাররা প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করতে শুরু করেন। বলা যায় এই সময় থেকে বাংলায় নবাবী আমল শুরু হল যদিও দিল্লীর দরবারে রাজস্ব পাঠান হত এবং বাদশাহী সনদের বলেই নতুন সুবাদার নিয়োগ হত।

বাংলার এই স্বাধীন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সম্পর্কে জানা যায় যে তিনি এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু একেবারে ছেলেবেলায় একজন মুসলমান তাঁকে কিনে পারস্য দেশে নিয়ে যান এবং সেখানে পুত্র স্নেহে পালন করেন। নাম হয় মুহম্মদ হাদী। সেইখানেই তিনি পারসিক ভাষা ও সংস্কৃতিতে শিক্ষিত হন। এরপর দেশে ফিরে সম্রাট ওরঙ্গজেবের রাজসভায় নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতার যথাযোগ্য মর্যাদা আদায় করলেন।

সুজা - উদ - দীন - মুহম্মদ খান ঃ

মুর্শিদকুলী খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর তাঁর মনোনীত দৌহিত্র তথা উত্তরাধিকারী সরফরাজ খানকে অস্বীকার করে তাঁর জামাতা সুজা - উদ - দীন মুহম্মদ খান নিজে বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার পদে নিযুক্ত হলেন (জুন, ১৭২৭ খ্রীঃ)। তাব আমলে হাজী আহমদ এবং আলীবর্দী খান নামক দুই ভ্রাতা, রাজত্ব বিভাগের বিচক্ষণ কর্মচারী আলমচাঁদ এবং বিখ্যাত ধনী জগৎ শেঠ, ফতে চাঁদ ইত্যাদি ধনকুবের দের প্রভাব প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৩৩ খ্রীঃ বিহার প্রদেশ বাংলা সুবার সঙ্গে যুক্ত হল। তখন সুজাউদ্দিন বাংলাকে দুই ভাগ করে পশ্চিম, মধ্য ও উত্তরভাগের কতক অংশের শাসনভার নিজের হাতে রেখে, পূর্ব দক্ষিণ ও উত্তর বাংলার অবশিষ্ট অংশের জন্য দুজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত করলেন। আলীবর্দী খান বিহারের প্রথম নায়েব নাজিম নিযুক্ত হলেন। সুজাউদ্দিনের নানাবিধ গুণ ছিল কিন্তু তিনি ক্রমে বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ন হয়ে পড়ায় রাজকার্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশের চালক শক্তি চলে গেল নবাবের অনুগ্রহ ভাজন বিশ্বস্ত কর্মচারীদের হাতে। তারা নবাবের রাজকার্যের প্রতি এই উদাসীনতার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন নানাবিধ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, তবে উল্লেখযোগ্য এই যে, সুজাউদ্দিনের আমলেই ঢাকায় আবার চালের দর টাকায় আট মন হয়েছিল।

সরফরাজ খান ঃ

সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খান বাংলার নবাব হলেন (মার্চ, ১৭৩৯ খ্রীঃ)। সরফরাজ নবাবী পদের একেবারেই অযোগ্য ছিলেন। তার অধিকাংশ সময়ই কাটত হারেমে, সুতরাং শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হল। হাজী আহমদ ও আলীবর্দী খান এই সুযোগে দুজনেই বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করতে লাগলেন। হাজী আহমদ দরবারে থেকে নবাবের বিশ্বস্ত কর্মচারীর মুখোশে তাঁকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রাখলেন - অন্যদিকে আলীবর্দী খান পাটনা থেকে সৈন্যসহ বাংলায় উপস্থিত হলেন (মার্চ, ১৭৪৩ খ্রীঃ)। হাজী আহমদ তখন আলীবর্দীব সঙ্গে যোগ দিলেন। সরফরাজ খান এই অভিযানের জবাব দিতে বর্তমান সুতীর কাছে গিরিয়াতে পৌছলেন। এখানে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয় (১০ ই এপ্রিল, ১৭৪০ খ্রীঃ)। কিন্তু এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন। দুই তিন পর আলীবর্দী মুর্শিদাবাদ অধিকার করলেন।

আলীবর্দী-খান ঃ

আলীবর্দী খান এরপর সুবাদারী পদের বাদসাহী সনদ লাভের জন্য মৃত নবাব পরিবারের প্রতি অত্যান্ত সদয় ব্যবহার করলেন তাদের উপযুক্ত মাসোহারার ব্যবস্থা করলেন এমনকি নিজ

দুষ্কর্মের স্মৃতি জনসাধারনের মন থেকে দূর করার জন্য সকলের সঙ্গে সদয় ব্যবহার এমনকি অনেক অর্থ ব্যবহার করলেন। শুধু তাই নয়, এজন্য তাঁকে দিল্লীর বাদশাহ্ এবং তার প্রধান সভাসদদের প্রচুর উৎকোচ প্রদান করতে হয়েছিল। এইভাবেই তিনি বাংলার সুবাদারী পদের বাদশাহী সনদ লাভ করেছিলেন।

আলীবর্দী খানও সুখে শান্তিতে বাংলার নবাবী করতে পারেন নি। অধিকাংশ সময়েই তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ বিগ্রহে কাটাতে হয়েছিল। নবাব শুজাউদ্দিনের জামাতা রুস্তম জং উড়িষ্যার নায়েব নাজিম ছিলেন, তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠলে আলীবর্দী তাঁর বিরূদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করে তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করলেন (মার্চ, ১৭৪১ খ্রীঃ)। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই নায়েবের অকর্মন্যতার সুযোগে রুস্তম জং মারাঠা সৈন্যের সাহায্যে পুনরায় উড়িষ্যা দখল নেন। আলীবর্দী আবার উড়িষ্যায় গিয়ে পুনরায় উড়িষ্যা দখল নেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদ থেকে ফেরার পথে তিনি মারাঠা সৈন্যের আক্রমণের মুখে পড়েন, মারাঠা বর্গীদের সঙ্গে নবাবের সৈন্যদের এই যুদ্ধ দীর্ঘদীন ধরে চলেছিল অবশ্য মীর হবির ও মারাঠাদের সঙ্গে দশ বৎসর ব্যাপী এই যুদ্ধে ৭৫ বৎসর বয়সের এই বৃদ্ধ নবাব অপূর্ব সাহস, অধ্যাবসায় ও সুদক্ষ রণকৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন। এরপর মারাঠা ও নবাব সৈন্য উভয় পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়লে ১৭৫১ খ্রীঃ মে মাসে নিম্নলিখিত তিনটি শর্তের বিনিময়ে যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয়।

১। মীর হবির আলীবর্দীর অধীনে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হবেন - কিন্তু এই প্রদেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব মারাঠা সৈন্যের ব্যয় বাবদ রঘুজী ভোঁসলে পবেন।

২। 'চৌথ' কর বাবাদ রঘুজী ভোঁসলেকে দিতে হবে বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা।

৩। মারাঠা সৈন্য সুবর্ণরেখা পার হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে না।

উল্লেখযোগ্য তিনটি চুক্তি দ্বারা যুদ্ধবিরতির পর বাংলাদেশে শান্তি ফিরে এলেও বিগত দশ বারে বৎসরের যুদ্ধ বিগ্রহ অর্ন্তদ্বন্দ্বে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। আলীবর্দী শাসন সংক্রান্ত অনেক পরিবর্তন করেও বিপর্যস্ত অবস্থাকে সম্পূর্ণ সামাল দিতে পরলেন না। তারপর ১৭৫৮ খ্রীঃ তাঁর এক দৌহিত্র ও পর বৎসর তাঁর দুই জামাতা ও ভ্রাতুস্পুত্রের মৃত্যু হল, আশী বছরের বৃদ্ধ নবাব এই শোক সহ্য করতে না পেরে ১৭৫৬ খ্রীঃ ১০ ই এপ্রিল পরলোক গমন করেন।

সিরাজউদ্দৌলা ঃ

নবাব আলীবর্দীর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁর তিনকন্যার সঙ্গে তিন ভ্রাতুস্পুত্রের বিবাহ হয়েছিল। এদের মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যা আমিলা বেগমের পুত্র মুর্শিদাবাদে মাতামহ আলীবর্দীর কাছে থাকতেন। এই শিশুপুত্রের জন্মের পরই তিনি বিহারের শাসনকর্তা হওয়ায় তিনি এই শিশুটিকে তাঁর সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করতেন। তাঁরই অত্যাধিক প্রশ্রয়ে সিরাজ শিক্ষা - দীক্ষা হীন, স্বেচ্ছাচারী কামাসক্ত এবং দুর্নীতি পরায়ণ যুবকে পরিণত হলেন। এই সিরাজকেই আলীবর্দী তার সিংহাসনের উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। কিন্তু বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যুর পর এই সিংহাসনের দাবীদার ছিল আরও অনেক। আলীবর্দীর মধ্যমা কন্যা ঘসেটি বেগম, মধ্যমা কন্যার পুত্র শওকত জঙ্গ এবং নবাব সৈন্যের সেনাপতি মীরজাফর। মীরজাফর আলীবর্দীর বৈমাত্রেয় ভগ্নিকে বিবাহ

করেন এবং ক্রমে সেনাপতির পদ লাভ করেন। আলীবর্দী প্রতিপালক প্রভুর পুত্রকে হত্যা করে যেমন করে নবাবী লাভ করেছিলেন মীরজাফর এই একই রকম দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নবাব হবেন এতটাই ছিল তার উচ্চাকাঙ্খা। সিরাজ সিংহাসন আরোহন করে এইরকম পরিস্থিতির খানিকটা আঁচ পেলেন। যদিও মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের কথা তিনি বোধহয় তেমন করে জানতেন না। ঘসেটি বেগম ও শওকত জঙ্গকেই প্রধান শত্রু মনে করে তিনি প্রথমে মতিঝিল আক্রমন করে ঘসেটি বেগমকে বন্দী করলেন ও তার ধনরত্ন লুঠ করলেন। এরপর সৈন্যসহ শওকত জঙ্গের (১৬ ই মে, ১৭৫৬) বিরূদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজরাও সিরাজের অনুমতি না নিয়েই কলকাতা দুর্গের সংস্কার ও আয়তন বৃদ্ধি করছিল এবং সিরাজের বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিয়েছিল। সুতরাং প্রথমে শওকত জঙ্গের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করলেন (১৬ ই মে, ১৭৫৬ খ্রীঃ) এবং ৫ ই জুন ইংরেজদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কলকাতায় পৌছলেন। ২০ শে জুন কলকাতার নতুন গভর্নর হলওয়েল আত্মসমর্পন করলেন এবং বিজয়ী সিরাজ কলকাতা দুর্গে প্রবেশ করলেন। কলকাতা জয় করে নবাব তার কর্মচারী মানিকচাঁদকে এই দুর্গ তথা কলকাতার দায়িত্ব দিয়ে দুর্গ রক্ষার অন্য কোন সুবন্দোবস্ত না করেই তিনি ফিরে গেলেন। এদিকে ইংরেজ কোম্পানী মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভের অধীনে একদল সৈন্য ও ওযাটসনের অধীনে এক নৌবহর কোলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করল। এই মিলিত বাহিনী আবার কলকতা দূর্গ থেকে বিতাড়িত ইংরেজ সৈন্যদের একত্র করে কলকাতা পুনরূদ্ধারের জন্য যাত্রা করে (২৭ শে ডিসেম্বর, ১৭৫৬)। তারা নবাবের কলকাতাস্থিত বজবজের দুর্গ ধ্বংস করল এবং বিনা বাধায় কলকাতা অধিকার করে নিল। কলকাতা অধিকার করেই ইংরেজরা সিরাজের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করল (৩রা জানুয়ারী, ১৭৫৭ খ্রীঃ)। পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ খ্রীঃ ২২ শে জুন ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইব ও নবাবের সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হল। নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহনলাল ও ফরাসী সেনাপতি সিনফ্রে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন, তারপর সিরাজের আদেশে যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। ইংরেজ সৈন্য নবাবের শিবির লুঠ করল এবং পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইবের সম্পূর্ণ জয়লাভ হল। পরদিন (২৪ শে জুন) দাউদপুরের ইংরেজ শিবিরে মীরজাফর ক্লাইবের সঙ্গে দেখা করলেন। ক্লাইব তাকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলে অভ্যর্থনা করলেন। ২৬ শে জুন মুর্শিদাবাদে মীরজাফরের অভিষেক হল। হৃতরাজ্য নবাব এই সুযোগে পালাতে গিয়ে ৩০ শে জুন রাজমহলের পথে মালদহে ধরা পড়লেন। ২ রা জুলাই রাত্রে গোপনে তাঁকে মুর্শিদাবাদে আনা হল। সেই রাত্রেই মীরজাফর পুত্র মীরণ সিরাজকে হত্যা করে।

যদিও ব্যক্তিগত কারনেই অনেকে তাঁর বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তবুও সিরাজ চরিত্রের অস্থিরমতিত্ব, অদূরদর্শিতা, লোক চরিত্র অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি ছাড়াও তাঁর চরিত্রে আরও অনেক দোষ ছিল। সিরাজ সম্পর্কে তাঁর বন্ধু ফরাসী অধ্যক্ষ জ্যাঁ ল লিখেছেন — "আলীবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই সিরাজ অত্যন্ত দুশ্চরিত্র বলে কুখ্যাত ছিলেন। তিনি যেমন কামাসক্ত তেমনই নিষ্ঠুর ছিলেন। গঙ্গার ঘাটে যে সকল হিন্দু মেয়েরা স্নান করিতে আসিত তাহাদের মধ্যে সুন্দরী কেহ থাকিলে সিরাজ তাঁহাব অনুচর পাঠাইয়া ছোট ডিঙ্গিতে করিয়া তাহাদের ধরিয়া আনিতেন। লোক বোঝাই ফেরী নৌকা ডুবাইয়া দিয়া জলমগ্ন পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুদের অবস্থা দেখিয়া সিরাজ আনন্দ অনুভব করতেন। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বধ করিবার প্রয়োজন হইলে আলীবর্দী একাকী সিরাজের

হাতে ইহার ভার দিয়া নিজে দূরে থাকিতেন, যাহাতে কোন আর্তনাদ তাঁহার কানে না যায়। সিরাজের ভয়ে সকলের অন্তরাত্মা কাঁপিত ও তাঁহার জঘন্য চরত্রের জন্য সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত।"

মীরজাফর ঃ

বাংলার স্বাধীন নবাবদের ইতিহাসের আর এক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল নবাব সিরাজদৌল্লার মৃত্যুতে। বাংলার নবাব হলেন মীরজাফর। কিন্তু তিনি ঐ নামে মাত্রই নবাব। ২৯ শে জুন সকালে ক্লাইব মুর্শিদাবাদ পৌছে সন্ধ্যা বেলা এক অনুষ্ঠানে ক্লাইব মীরজাফরকে নিজ হস্তে মসনদে বসায় এবং স্বয়ং অভিবাদন করেন। এই অভিনব প্রাপ্তির মূল্য মীরজাফরকে কড়ায় - গন্ডায় বুঝিয়ে দিয়ে হয়েছিল, মীরজাফর ইংরেজদের যে পরিমাণ টাকা রাজকোষে দিতে স্বীকৃত হলেন সেই পরিমাণ টাকা না থাকায় জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় অর্ধেক টাকা দেওয়া স্থির হল বাকি টাকা তিন কিস্তিতে শোধ করতে হবে ঠিক হল। এই ব্যবস্থার ফলে ১৭৫৭ খ্রীঃ ১৭৬০ খ্রীঃ মধ্যে ইংরেজ কোম্পানীকে নগদ দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্মচারীকে আটান্ন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা দিয়েছিলেন। ক্লাইব ব্যক্তিগত ভাবে যে জমিদারী পেলেন তার বার্ষিক আয় ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। বাংলার পরাধীনতার ইতিহাসে নাটকীয় মুহুর্তটি আঁকা হল ১৭৫৭ খ্রীঃ ৩রা জুলাই, যেদিন একদিকে সিরাজদৌল্লার ছিন্নভিন্ন শব হাতির পিঠে মুর্শিদাবাদের পথে পথে শোভাযাত্রা করল, অন্যদিকে সামরিক বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা করে প্রথম কিস্তির টাকা দুইশত নৌকা বোঝাই করে গঙ্গা পথে কলকাতা অভিমুখে রওয়ানা হল। এরপর থেকে বাংলা শাসন করার জন্য রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয় দিক থেকেই মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানী তথা লর্ড ক্লাইবের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তবুও প্রতিনিয়ত ইংরেজ কর্তৃক অসম্মানিত হওয়া পুত্র মীরনের বজ্রাঘাতে মৃত্যু বৃদ্ধ মীরজাফরকে একেবারে বিপর্যস্ত করে ফেলল। তদুপরি অর্থলিপ্ত ভান্সিটার্ট কলকাতার গভর্নর হবার হওয়ার পর মীরজাফরের বউ অভিযোগ করে লর্ড ক্লাইবের কাছে, এবং পরবর্তীতে ক্লাইব মীরজাফর জামাতা মীরকাশিমের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ ও সুযোগ সুবিধা নিয়ে তাঁকে মসনদে বসান হয় (১৭৬০ খ্রীঃ)।

বাংলার সাধারন মানুষ মীরজাফরকে বিশ্বাস ঘাতক এইরকম আখ্যা দিয়ে থাকে, কারণ তার বিশ্বাসঘাতক মূলক দেশদ্রোহিতার ফলেই বাংলাদেশ বিদেশী শক্তির কাছে দীর্ঘদিন পরাধীন ছিল। নবাব মীরজাফর যে অযোগ্য ও অপদার্থ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর দেশদ্রোহিতাই বাংলা তথা ভারতবর্ষের পরাধীনতার মূল কারণ এ অভিযোগ পুরোপুরি সত্য নয়। এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে কোন নতুন কথা নয়, তাছাড়া এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল যে ইংরেজদের হাতে দীর্ঘকালের জন্য দেশের স্বাধীনতা বিসর্জন এ কথা সেই সময় কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করে নি। ১৭৬৫ খ্রীঃ মীরজাফরের মৃত্যু হয়।

মীরকাশিম ঃ

মীরজাফরের অযোগ্যতায় ইংরেজ কোম্পানী তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ছিল। পুত্র মীরণ ইংরেজদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন তদুপরি তিনিই ছিলেন পিতা মীরজাফরের প্রকৃত পরামর্শদাতা এই খবর ইংরেজদের কাছে ছিল। এই সময় বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যু (৩ রা জুলাই, ১৭৬০ খ্রীঃ)

বাংলার রাজকোষ থেকে আরও অর্থ আদায় এবং বাংলাব রাজনীতিতে আরও বেশি পরিমানে হস্তক্ষেপে ইংরেজদের উৎসাহিত করে তোলেন। কিন্তু সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে এই ভেবে তারা চিন্তিত ছিলেন যে, মীরণের পুত্র বাজা হলে দেওয়ান হিসাবে পাওযা যাবে ধনী রাজবল্লভকে যিনি আবার ইংরেজদেব বন্ধুও বটে আর অন্যদিকে মীরজাফর জামাতা মীরকাশিম যিনি নিজেই ধনকুবের, এমতবস্থায় ১৭৬০ খ্রীঃ জুলাই মাসে ভ্যানসিটার্ট যিনি কলকাতার নতুন গভর্নব ছিলেন তিনি মীরকাশিমেব পক্ষ অবলম্বন করেন। মীরকাশিম ও এই সুযোগে ইংবেজ গভর্নবকে বলেন যে, নবাবের বর্তমান পরামশদাতাদেব সরিয়ে তাকে বাংলাব শাসনভার দেওয়া হলে তিনি কোম্পানীকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ কবতে পারেন। এবফলে মীবকাশিম ও ইংরেজদেব মধ্যে এই শর্তে সন্ধি হল যে, মীবজাফব নামে মাত্র নবাব থাকবেন কিন্তু শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতাই থাকবে মীবকাশিমেব হাতে। প্রয়োজনে ইংবেজবা সৈন্য দিয়েও মীরকাশিমকে সাহায্য করবে, এই সৈন্য সামগ্রর ব্যয়ভার বহন কবরে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জেলা থেকে আদায়ী বাজস্ব। বিনিময়ে মীবকাশিম ইংরেজদেব প্রাপ্য টাকা কিস্তিতে শোধ দেবেন। এরপর বৃদ্ধ মীরজাফব নানা অশান্তিতে বিপর্যস্ত বোধ কবলে (২২ শে অক্টোবর, ১৭৬০ খ্রীঃ) তিনি কলকাতায় বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। বাংলার নবাব হলেন মীরকাশিম। মীরকাশিম যখন বাংলাব মসনদে বসলেন তখন বাজকোষ একেবারে তলানিতে। তখন রাজপ্রাসাদের অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় করে এবং ব্যক্তিগত বহু অর্থ তিনি ব্যয় করলেন ইংরেজদের কিস্তি শোধের জন্য। সুতরাং তিনি নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। কূটনীতিতে ধুরন্ধর ইংরেজরা এরপব নানাদিক দিয়ে মীবকাশিমকে ব্যতিব্যস্ত কবে তোলে। তাই নবাবী শাসনেব বছর খানেকেব মধ্যে মীবকাশিম ইংবেজদেব ক্রীড়নক না হয়ে তাদেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষেব পথে চলে যান। এই সময় কলকাতার বিখ্যাত আর্মানী বণিক খোজা পিদ্রুব ভ্রাতা গ্রেগবী মীবকাশিমেব প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন, এই গ্রেগবীব সহাযতায অনেক আর্মানীকে তিনি সৈন্য হিসাবে সেনাদলে পেয়েছিলেন এবং গোপনে অনেক ইউবোপীয় অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় কবেছিলেন। শুধু তাই নয তিনি তাঁব নতুন সামরিক নীতি কৌশল গোপন বাখার জন্য রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেবে স্থানান্তবিত করেছিলেন। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও কাটোযা, গিরিয়া এবং উদয নালার যুদ্ধে পরাজিত নবাব আবার বক্সারের যুদ্ধে ইংবেজ বাহিনীর কাছে শোচনীয ভাবে পবাজিত হয়ে পলাতক জীবন যাপনের পর ১৭৭৩ খ্রীঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাশিমকে 'বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব' আখ্যা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে মীরকাশিম তাঁর চার বৎসর নবাবীর আমলে প্রথম তিন বৎসর প্রায় কিছুই করতে পাবেনি। শেষের একটি বৎসর তিনি প্রাণপন চেষ্টা করেছিলেন সত্য কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেন নি।

মীরকাশিমের জীবনের কলঙ্কিত অধ্যায় বোধহয় মুঙ্গের হত্যাকাণ্ডের কাহিনী। কাটোয়ার যুদ্ধ, গিরিয়ার যুদ্ধ এবং উধুয়ানালার সুরক্ষিত দুর্গ জয়ে সেনানায়কদের একের পর এক বিশ্বাসঘাতকতায় ও পরাজয়ে মীরকাশিম হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছিলেন। তিনি ৯ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ সেনাপতিকে পত্র মারফত জানিয়েছিলেন যে তারা যদি বাংলাদেশ ত্যাগ না করে তবে তিনি এলিস ও অন্যান্য ইংরেজ বন্দিদের হত্যা করবেন। শুধু তাই নয় তিনি মুঙ্গের দুর্গে বন্দি

জগৎশেঠ, মহারাজা রাজবল্লভ, স্বরূপচাঁদ, রামনারায়ণ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এবং আরও অনেক বন্দিদের গলায় বালি বা পাথর ভরা বস্তা বেঁধে দুর্গ প্রাকার থেকে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করে নির্মম ভাবে হত্যা করেছিলেন। এসব সত্ত্বেও মীরকাশিমের পতনের কিছুদিন পর গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট তার সম্পর্কে লিখেছিলেন — "মুঙ্গের হত্যাকান্ডের পূর্বে মীরকাশিম কোন নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন নাই। কিন্তু তিন বৎসর পর্যন্ত তিনি যাহা সহ্য করিয়াছিলেন, তাহার কথা এবং তাহার গুরুতর ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা স্মরন করিলে এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড জনিত অপরাধ ও তত গুরুতর মনে হইবে না। ধনসম্পদশালী দেশের আধিপত্য হইতে কর্পদকহীন ভিখারী অবস্থায় প্রাণের জন্য পলায়ন এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার ফলে ও সাময়িক উত্তেজনার ফলে তিন বৎসরের পুঞ্জীভূত অপমানের প্রতিহিংসা গ্রহণে প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই দুষ্কর্ম করিয়াছিলেন, একথা স্মরণ করিলে আমরা তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক ধরণা করিতে পারিব।"

মীরকাশিম পরবর্তী বাংলাদেশ ঃ

চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করে মীরকাশিম ইংরেজ বিরোধী নানারকম কাজ করার কারণ স্বরূপ ইংরেজরা তাঁকে সিংহাসন চ্যুত করে মীরজাফরকে আবার মসনদে বসাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই অনুযায়ী ১৭৬৩ খ্রীঃ ১০ই জুলাই মীরজাফরের সঙ্গে ইংরেজদের নতুন করে চুক্তি হয়। মীরজাফর ইংরেজ সৈন্যদের খরচ চালাবার জন্য বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ইংরেজদের দিলেন। কেবল লবণ ছাড়া (আড়াই টাকা) তারা বিনা শুল্কে বাংলাদেশে ব্যবসা করার অনুমতি পেল, ইংরেজদের একজন স্থায়ী প্রতিনিধি মুর্শিদাবাদে থাকার ব্যবস্থা হল, মীরজাফরের সামরিক ক্ষমতাও অনেক কমিয়ে আনা হল, এর অল্পদিনের মধ্যে (জানুয়ারী, ১৭৬৫ খ্রীঃ) মীরজাফর গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মৃত্যু আসন্ন জেনে তিনি ইংরেজ ও রাজকর্মচারীদের সামনে পুত্র নজমুদ্দৌল্লাকে উত্তরাধিকারী ঘোষনা করলেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী মীরজাফরের মৃত্যু হয়। মীরজাফরের মৃত্যুর পর ইংরজ কাউন্সিল এই শর্তে নজমুদৌল্লাকে নবাব হিসাবে মানতে স্বীকৃত হলেন যে, তিনি নামে মাত্র নবাব থাকবেন কিন্তু সমস্ত শাসনক্ষমতা একজন নায়েব সুবাদারের হাতে থাকবে। ইংরেজ অনুমোদন ছাড়া তিনি নিজে কোন সুবাদার নিযুক্ত বা বরখাস্ত করতে পারবেন না। এই সব শর্ত মেনে নিয়ে নজমুদৌল্লা নবাবী পাওয়ার নজরানা স্বরূপ ইংরেজ গভর্ণন ও অন্যান্য কর্মচারীদের চৌদ্দ লক্ষ টাকা দিলেন। এই সময় থেকে ইংরেজরা পরোক্ষভাবে বাংলার শাসনভার গ্রহন করল। এই ব্যবস্থার অল্পকিছুদিনের মধ্যেই বাদশাহ আলম লর্ড ক্লাইব তথা ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করে এক ফরমান দিলেন। দেওয়ানী পাবার পর রাজস্ব আদায়ের ভারও ইংরেজরা পেল। ঠিক হল যে, আদায়ী রাজস্ব থেকে মুর্শিদাবাদের নবাব ৫৩ লক্ষ এবং দিল্লীর বাদশাহ ২৬ লক্ষ টাকা পাবেন। বাকী টাকা ইংরেজরা ব্যয় করবে। ক্রমে ইংরেজরা নবাব ও বাদশাহ-র এই বৃত্তির পরিমান ১৭৬৯ খ্রীঃ ৪১ এবং ৩২ লক্ষ করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে বাংলার নবাবী আমল ১৭৬৫ খ্রীঃ শেষ হয়েছিল।

আধুনিক যুগ ঃ

বাংলা তথা মালদহে ইংরেজদের প্রভাব বিস্তার ঃ

সপ্তদশ শতকের গোড়া থেকেই মালদহ জেলা ছিল ব্যবসা-বানিজ্যের মূলকেন্দ্র। বলা যায়, ১৬৩৩ খ্রীঃ মুঘলরাজ শক্তি হুগলী থেকে পর্তুগীজদের উৎখাত করার পর থেকেই ইংরেজরা বাংলায় ব্যবসা করার সুযোগ পায়। এই সময় কাশিমবাজার ও উত্তর বাংলার তুঁত চাষও খুব বিখ্যাত ছিল। এখানকার সংগৃহিত কাঁচা রেশম সুতা সারা ভারতে জনপ্রিয় ছিল। এর আগে ইউরোপীয়ান বয়ন শিল্প কেন্দ্র গুলি ফ্রান্স, ইটালি এবং পারস্য থেকে রেশমি সুতা আমদানি করত। কিন্তু ইউরোপের অভিজাত শ্রেণীর কাছে বাংলার মসলিনের চাহিদা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ইউরোপীয়ান কোম্পানীগুলি নতুন বাজার খুঁজতে মালদায় এসে হাজির হয়।

১৭৪০ খ্রীঃ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার আলিবর্দী খান মোগল অধিনতা অস্বীকার করে স্বাধীন নবাব হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেন। কিন্তু এই সময় বাংলা যে নতুন সংকটের সামনে এসে দাঁড়াল তা হল বর্গীর আক্রমণ। অনবরত এই বর্গী আক্রমনের ফলে দেশের সর্বত্র খাদ্যশস্যের অভাব এবং আভ্যন্তরীন ও বর্হিবানিজ্যে নানারকম অসুবিধা দেখা যায়। সুতি ও সিল্ক বস্ত্র প্রস্তুত কারকেরা আড়ং ছেড়ে দলে দলে পূর্ববাংলায় পালিয়ে যেতে থাকে। বর্গীদের সাথে চুক্তির ফলে মোটা অঙ্কের টাকা মুক্তিপণ ও মূলধন স্থানান্তরের ফলে অর্থের ঘাটতিও দেখা দেয়।

এই সার্বিক অব্যবস্থার মধ্যেই সদ্য স্বাধীন নবাব আলিবর্দীর আরোপিত নতুন শুল্কের ফলে বাংলার অর্ন্তদেশীয় বানিজ্য কেবল অযোধ্যা ও আসামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্য ১৭৪০-৫০ এর মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়।

এই সময় থেকে বাংলায় আগত বিদেশী বণিকেরা, বিশেষ করে আর্মেনিয়ানরা, সিল্ক সুতা বয়ন কেন্দ্র খুলেছিলেন। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর থেকে এই সিল্ক সুতার ব্যবসা ইংরেজরা এক চেটিয়া করে অন্যান্য সিল্ক কুঠিগুলি ধ্বংস করে ফেলছিল। এরপর তারা নিজেদের সিল্ক সুতাগুলির উন্নতির দিকে নজর দেয়। কারণ তুরস্ক থেকে আমদানি করা সিল্কের সুতোর চেয়ে বাংলার সিল্ক সুতো ছিল অমসৃণ ও জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। অথচ বাহিরে থেকে সুতা আনার খরচ ছিল অনেক বেশি। তাই পলাশির যুদ্ধের পর ক্ষমতা দখল করেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই সুতা বয়নের উন্নতিকল্পে মিঃ ওয়াইন্ডার নামে এক ব্যক্তিকে কোম্পানি বাংলায় পাঠায়, যার কাজ হল স্থানীয় উৎপাদনও বয়নের ত্রুটিগুলি অনুসন্ধান করা। ১৭৬৫ খ্রীঃ বাদশাহ শাহ আলমের সঙ্গে লর্ড ক্লাইভের সন্ধি হয়। এই সন্ধির ফলে বাদশাহ ইংরেজ কোম্পানিকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করে এক ফরমান অর্পন করেন। বাংলার সৈন্যগণ ও শাসনক্ষমতা ইংরেজরা আগেই হস্তগত করেছিল; এই সন্ধির ফলে রাজত্ব আদায়ের ক্ষমতাও ইংরেজদের হাতে আসে। মালদহ অঞ্চলও এই সময় ইংরেজদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে আসে। ফলে এই অঞ্চলের ব্যবসা বানিজ্য থেকে বেশি লাভের আশায় কোম্পানী মূলধনের লগ্নি বাড়ানোর ব্যবস্থা করেন। উন্নত মানের রেশম সূতা পাওয়ার জন্য জনৈক ফরাসী ব্যক্তির সাহায্যে বাংলায় প্রথম গুটি

থেকে রেশম সুতা বার করা আরম্ভ হয়। মালদহে প্রথম এই ধরনের কুঠি স্থাপিত হয় জর্জ উডনির উদ্যোগে সিঙ্গাতলায়। এরপর টমাস হেঞ্চম্যান সিল্ক কাপড়ের উপর লাক্ষার কাজ করার জন্যে পুরস্কৃত হন। এখানে তখন বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র নির্মিত হোত, যেমন— চান্দেয়ী, ইলাচী, চারকোনী, নেহালেওয়ার, মন্দিল, মলমল, তানজীব ইত্যাদি। ১৬৭৬ খ্রীঃ-র অক্টোবর মাসে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠির ডাইরিতে প্রথম প্রথাগত ভাবে মালদায় একটি কুঠি খোলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয়। ১৬৭৬ এর ১৪ই অক্টোবর ইংরেজ স্পেশাল কমিশনার স্টেইনহ্যাম এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করেন। প্রস্তাবমত পরীক্ষা মূলক ভাবে চার থেকে পাঁচ শত টাকার মোটা ধরনের কাপড় কেনার সিদ্ধান্ত বোর্ড নেয়। এবং ব্যবসার উপযুক্ত একটি রিপোর্ট রিচার্ড এডওযার্ড প্রস্তুত করে। সেই অনুযায়ী তিনি জানান — "গঙ্গার একটি শাখা কালিন্দ্রী ও মোরাগু থেকে উৎপন্ন একটি ছোট নদী মহানন্দার সংযোগ স্থলের খানিকটা নীচে অবস্থিত মালদা শহরটি ছোট হলেও ত্রিশ-চাল্লিশ মাইল দূর থেকেও এখানকার মূল পণ্য দ্রব্য কাপড় আমদানি করা হয়। মূলত আগ্রা, গুজরাট ও বেনারসের কুঠিয়াল ব্যবসায়ীরা বাৎসরিক পনের থেকে পঁচিশটি 'পটেলা' ভর্তি মাল স্বদেশে পাঠায় এবং এই এক একটি 'পাটেলায়' প্রায় এক লক্ষ টাকার পণ্য দ্রব্য বোঝই করা যেত। এর মধ্যে থাকে দেড় থেকে পাঁচ টাকা মূল্যের কোশা, মলমল, মস্তীল ও এলাচী।"— এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইংরেজরা মালদার মির্জাপুরে ইটের তৈরী একটি অপরিচ্ছন্ন ভাড়া বাড়িতে কুঠি চালু করে। কিন্তু মুঘলদের আধিপত্যে সেখানে ব্যবসা-বানিজ্যের বিশেষ সুবিধা করতে না পারায় ঐ বছরের আগষ্ট থেকেই তারা মহানন্দা নদীর অপর পারে কুঠি খোলার চেষ্টা চালাতে থাকে। অবশেষে ১৬৮০ সালের ১লা ডিসেম্বর মালদা শহর থেকে প্রায় দু মাইল দূরে বর্তমান ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত মকদুমপুরে জমিদার রাজা রায় চৌধুরীর কাছ থেকে ১৫ বিঘা জমি তিনশত টাকায় ক্রয় করে। জমিদার রাজা রায়চৌধুরী এই জমিটি ইংরেজদের কাছে বিক্রয় করার প্রাথমিক কারণ ছিল তাঁর অর্থের প্রয়োজনীয়তা। দ্বিতীয়ত, তিনি মনে করেছিলেন ইংরেজদের কুঠি খোলার জন্য তার গ্রাম একসময় শহরে উন্নীত হবে, জমির দাম ছাড়াও তাঁকে আরও তিনশত টাকা দেওয়া হয়, বর্ষাকালে নৌকো করে গৌড় থেকে ইট ও পাথর এনে দেওয়ার জন্যে। এছাড়া এই অর্থের বিনিময়ে ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তির আরও শর্ত ছিল যে, তিনি কোনও ভাবেই ইংরেজদের ব্যবসায়ের কোনওরকম বাধার সৃষ্টি করবেন না। ১৬৬১-র ফেব্রুয়ারীতে পূর্ণিয়া থেকে কাঠ এনে কুঠি গড়ার কাজ শুরু হয়। ইংরেজরা তাঁদের এলাকাটি ঘিরে তিন-চার গজের একটা খাল কাটার সিদ্ধান্ত নেয় অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্যে। ১৬৬১-র এপ্রিল থেকে ডাচ্‌দের সাথে মালদার জায়গীরদারদের গন্ডগোল বাধে এবং এই গন্ডগোলের প্রভাব পড়ে ইংরেজ শিবিরেও, কেননা তৎকালীন জায়গীরদার, ফৌজদার ইত্যাদি নবাবের কর্মচারীরা মকদুমপুরের কুঠি নির্মাণকে ভালো চোখে দেখছিল না। কিন্তু ইংরেজরা এই বাধা বিপত্তির তোয়াক্কা না করে ১৬৮১-র ২৫শে জুলাই রাজা রায় চৌধুরীর কাছ থেকে আরও আট বিঘা জমি কেনার প্রস্তাব গ্রহণ করে। এরই সাথে রাজা রায়কে তারা আরও দুই হাজার টাকা দেয় গৌড় থেকে দু সের চৌদ্দ ছটাক ওজনের পাঁচ লাখ ইট, প্রতি টাকায় সাড়ে তিন হাজার দরে এনে দেওয়ার জন্য। এই বন্দোবস্ত চলাকালীন একই বছরের আগষ্টের মধ্যেই ইঙ্গলেজাবাদ কুঠি চালু হয়ে যায়।

এই ভাবে ধীরে ধীরে ইংরেজরা তাদের ব্যবসার মূলকেন্দ্র মালদা থেকে সরিয়ে নিয়ে এল ইঙ্গলেজাবাদে। কিন্তু তাতেই সার্বিক স্বস্তি তারা পায়নি। কারণ মালদার ইজারাদার বুলচাঁদ ও ফৌজদার সামসের জঙ্গ প্রায়ই ইংরেজদের মালদায় ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি মালদা থেকে একটি হাট তুলে এনে ইংরেজদের কুঠির পাশে বসিয়েছিল। নাম দিয়েছিল 'নয়া হাট'। এতে ইংরেজদের ব্যবসা-বানিজ্যের বাড়তি সুবিধা হওয়ায় ইজারাদার ও ফৌজদার এই হাটের পাইকারদের উপরও জোর জুলুম চালাতে থাকে। তাদের জিনিষপত্র হাটে আসার আগেই রাস্তায় লুটপাত করে নেওয়া হত। ফৌজদারদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের এইরকম পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয় ১৬৮৬-র ডিসেম্বরে। জব চার্নকের অধীনস্থ দু জন ইংরেজকে মুঘল সৈনাধ্যক্ষ গ্রেপ্তার করায় এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তারা ছাড়ল না। তারা হুগলি শহর লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে দেয়। একটি মুঘল জাহাজ জোর করে অধিকার করে এবং গঙ্গাবক্ষের বহু নৌকা ও বজরায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এইসব ঘটনায় ক্ষিপ্ত মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খাঁ তাঁর এলাকাধীন সমস্ত ইংরেজ কুঠি ক্রোক করেন। কিন্তু এর প্রতিফলন আবার ঘটে ইংরেজ কর্তৃক হজ যাত্রীদের উপর এবং মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনায়। একের পর এক ঘটে যাওয়া এইসব ঘটনায় দিল্লির সম্রাট আওরঙ্গজেব অবশেষে ১৬৯০ খ্রীঃ ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

আপাত এই জয়ে খুশী ইংরেজ কোম্পানী জব চার্নককে আবার তাড়াতাড়ি কাশিমবাজার ও ইঙ্গলেজাবাদ কুঠির কাজকর্ম শুরু করার নির্দেশ দেয়। কারণ বিনিয়োগের তুলনায় এইসব জায়গা থেকে লাভের অংশ অনেক বেশি ছিল। এই সুপারিশের ফলস্বরূপ জব চার্নক শায়েস্তা খাঁকে মুঘলদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত ইঙ্গলেজাবাদ কুঠির পুর্ন নির্মানে বাধ্য করান, এমনকি তাদের দিয়ে অপহৃত টাকাকড়িও উদ্ধার করান।

১৬৯৬-র এপ্রিলে মেদিনিপুরের চেতুয়া করছার বিদ্রোহী ভূস্বামী শোভা সিংহ ইংরেজদের দেওয়া মুঘল নজরানার রূপো ভর্তি নৌকো আটকে দেয়। তখন ইংরেজরা শোভা সিংহের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে চুক্তি করে বিনা শুল্কে গঙ্গাবক্ষে মাল চলাচলের সুবিধা আদায় করে। শোভা সিংহের মৃত্যুর পর হিম্মৎ সিংহের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা মখসুদাবাদ জয় করলে ইংরেজদের ব্যবসার স্বাভাবিক গতি আবার ব্যহত হয়। ১৬৯৬-র ৩০ শে ডিসেম্বর ইংরেজরা বিদ্রোহীদের কাছে আবেদন করে নিশান ও দস্তক লাভ করে ব্যবসা চালাতে থাকে, তা সত্ত্বেও ১৬৯৭-র জানুয়ারী বিদ্রোহীরা কাশিমবাজার শহর রাজমহল এবং ইংরেজদের কুঠি লুঠ করে। তারপর তারা মালদহ শহরে এসে উপস্থিত হয় এবং তৎকালীন মুঘল মনসবদার মহম্মদ তকিকে পরাজিত করে মালদহ শহর লুঠতরাজ করে প্রচুর অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহ করে। ইঙ্গলেজাবাদ কুঠিও লুঠতরাজের আওতা থেকে বাদ যায় না। এরপর যুবরাজ আজিমুসমান ও জবরদস্ত খাঁর নেতৃত্বে এক বিশাল মুঘল বাহিনী বিদ্রোহীদের কাছ থেকে রাজমহল ও মালদহ পুনরুদ্ধার করে। ১৬৯৭-র জুন মাসে কোম্পানী প্রচুর উপঢৌকন সহ প্রভাবশালী আর্মেনীয় বণিক খোজা সরহাদকে জবরদস্ত খাঁ এর শিবিরে পাঠায়, এই আর্জি নিয়ে যাতে রাজমহল ও মালদহের লুণ্ঠিত সম্পত্তি ফিরে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় ব্যবসার প্রতিবন্ধক ফড়েদের অত্যাচার থেকেরক্ষা পাওয়াও এই দৌত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সফল এই দৌত্যকার্যের ফল স্বরূপ ইংরেজরা অন্যান্য জায়গার কুঠির মত

ইঙ্গলেজাবাদের কুঠিতেও প্রাচীর ও মুর্চা নির্মানের অধিকার অর্জন করে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রীঃ) সম্রাট বাহাদুর শাহ ও বাংলার শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খাঁ ইংরেজদের একাধিক অধিকারের দাবিকে স্বীকৃতি দেয়।

১৭৮০খ্রীঃ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার আলিবর্দী খান মোগল অধিনতা অস্বীকার করে স্বাধীন নবাব হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেন। কিন্তু এই সময় বাংলা যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল তা হল বর্গীর আক্রমণ। অনবরত এই বর্গীর আক্রমণের ফলে দেশের সর্বত্র খাদ্যশস্যের অভাব এবং অভ্যন্তরীন ও বর্হিবানিজ্যে নানারকম অসুবিধা দেখা যায়। সূতি ও সিল্ক বস্ত্র প্রস্তুত কারকরা আড়ং ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান পূর্ববাংলায় পালিয়ে যায়। বর্গীদের দেওয়া মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ ও মূলধন স্থানান্তরের ফলে অর্থের ঘাটতি দেখা দেয়। এই সার্বিক অব্যবস্থার মধ্যেই সদ্য স্বাধীন নবাব আলিবর্দীর আরোপিত শুল্কের ফলে বাংলার অন্তর্দেশীয় বানিজ্য কেবল অযোধ্যা ও আসামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৭৪০ - ৫০ এর দশকে বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য পূর্বের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই সময় বিদেশী বণিকেরা বিশেষত আর্মেনিয় বণিকেরা সিল্ক সূতো বয়ন কেন্দ্র খুলেছিলো। কিন্তু ইংরেজ বণিকদের সাথে প্রতিযোগিতা ও বুদ্ধিতে তারা পেরে উঠেছিলো না। উপরন্তু পলাশির যুদ্ধের পর থেকে এই সিল্ক সুতোর ব্যবসা ইংরেজরা একচেটিয়া করে নেয় এবং তারা অন্যান্য সিল্ক কুঠিগুলি ধ্বংস করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে বাংলার সিল্ক সূতোগুলির মান উন্নত করার দিকে মনোযোগ দেয়। ১৭৫৭ খ্রীঃ স্থানীয় বয়নের ত্রুটি গুলির কারণ অনুসন্ধান করে মিঃ ওয়হিন্ডার নামে এক ব্যক্তিকে কোম্পানী বাংলায় পাঠায়। সে সুতা বয়নের উন্নতি করন এবং হলুদ ছাড়া অন্য রঙ দিয়ে রঞ্জন করার কাজের উপর জোর দেয়।

১৭৬৫ খ্রীঃ বার্ষিক ভাতা-র ভিত্তিতে বাদশাহ আলমের সঙ্গে লর্ড ক্লাইবের সন্ধি হয়। বাদশাহ ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করে এক ফরমাণ অর্পন করেন। বাংলা থেকে প্রচুর অর্থ ইংরেজরা আগেই উপার্জন করেছিল। সৈন্যদল ও শাসন ক্ষমতাও অনেকটা ছিল ইংরেজদের হাতে। এই সন্ধির ফলে রাজত্ব আদায়ের ক্ষমতাও ইংরেজদের হাতে আসে। মালদহ অঞ্চলের উপর ইংরেজদের অধিকার অনেকটাই কায়েম হয়, যা তারা অনেকদিন আগে থেকেই চাইছিল। ফলে এই অঞ্চলের ব্যবসা-বানিজ্য থেকে বেশি লাভের আশায় কোম্পানী মূলধনের লগ্নি বাড়ানোর ব্যবস্থা করে। উন্নত মানের রেশম সুতা পাওয়ার জন্য জনৈক ফরাসী ব্যক্তির সাহায্যে বাংলায় প্রথম গুটি থেকে রেশম সুতো বার করা হয়। মালদহে প্রথম এই ধরনের কুঠি স্থাপিত হয় জর্জ উডনির উদ্যোগে সিঙ্গাতলায়। এরপর টমাস হেঞ্চম্যান ১৭৭০ খ্রীঃ ইঙ্গলেজাবাদে কমার্শিয়াল রেসিডেন্সি ও সিল্ক কাপড়ের উপর লাক্ষার কাজ করার জন্য কুঠি নির্মান করেন। এই কুঠিতে বিভিন্ন ধরণের বস্ত্র যেমন, চান্দেয়ী, ইলাচী, চারকোনা, নেহালেওয়ার, মন্দিল, মলমল, তনজীব ইত্যাদি নানাধরনের কাপড়ের সুতো তৈরী হত। উন্নত মানের এইসব রেশম সুতা নির্মানের জন্য হেঞ্চম্যান পুরস্কৃতও হন।

১৭৭০ থেকেই ইঙ্গলেজাবাদ আস্তে আস্তে ইংরেজবাজার নামে পরিচিতি পায়। ফরাসী 'আবদ্দ' শব্দের আভিধানিক অর্থ জনবসতিপূর্ণ স্থান। আর 'রংরেজ'-দের আবাদ বা বাসভূমি ছিল এই স্থানটি বহু আগে থেকেই। রঙ করার লোকেরা যারা এখানে বাস করত তারা ছিল

বেশির ভাগই জাতিতে মুসলমান, পরে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরাও এই কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলো জীবিকার তাড়নায়, এদের বলা হতো 'রংরেজ'। তাই প্রথমদিকে ছিল রংরেজ + আবাদ = রংরেজাবাদ। পরে ইংরেজদের অধিকারে আসার পর তা হয় ইংলিশ + আবাদ = ইঙ্গলেজাবাদ = আংরেজাবাদ = ইংলিশবাজার = ইংরেজবাজার।

মালদহে নীল চাষ ঃ

রেশম সংক্রান্ত ব্যবসা থেকে ইংরেজরা প্রভূত অর্থ উপার্জন তথা লাভবান হওয়ার কারণে এবার তারা নীলচাষের দিকে নজর দেয়। কারণ তারা বুঝেছিলেন গঙ্গা তথা একাধিক নদী বিধৌত পলিমাটি যুক্ত উর্বর জমি নীলচাষের পক্ষে উপযুক্ত। শুধু তাই নয় বানিজ্য ফসল রূপে নীলকে এদেশের মাটিতে প্রচুর ফলাতে পারলে এবং সেই নীল ইংলন্ড তথা ইউরোপীয় রাজ্যগুলিতে পৌঁছে দিতে পারলে যে পরিমান লাভ হবে অন্য কোন বানিজ্য ফসল দ্বারা তা সম্ভব নয়।

১৭৮০ খ্রীঃ (অন্য মতে ১৭৮৩) থেকেই মালদহে নীলচাষ শুরু হয়। চার্লস গ্রান্ট ১৭৮০ থেকে ১৭৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত নিজের খরচায় মালদহে নীলচাষ করেন। লাভের যথেষ্ট সম্ভবনা থাকলেও এই জেলার নীল চাষ আরও বিস্তৃত ভাবে শুরু হয় দু দশক পরে। মালদহের নীল চাষ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করেন ডাঃ ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন তাঁর অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ্ দি ডিস্ট্রিক্ট অফ্ পূর্নিয়া বইতে। তাঁর বর্ণনা মত নীলচাষ থেকে লাভের অঙ্কটা ছিল এইরকম, প্রতি বান্ডিল নীলগাছের জন্য চাষী পেত ৮ পয়সা থেকে ১ পাই এবং ৩৫০ বান্ডিলে ১ মন নীল উৎপন্ন হয়ে সমসাময়িক কলকাতার বাজার দরে ১৪০ টাকায় বিক্রী হতো। সুতরাং বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত মালদহে বানিজ্য করতে আসা ইংরেজরা নীলচাষের উপযুক্ত জায়গায় নীলকুঠি স্থাপন করে নীল ব্যবসা চালিয়ে যেতে লাগল।

গোয়ামালতী কুঠি ঃ

বর্তমান ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত পুরনো গোয়ামালতীর কুঠিটিই মালদহ জেলার প্রাচীনতম কুঠি বলে পরিচিত। গৌড় মালদা রেল- স্টেশনের অনতিদূরে বর্তমান কাঁটাগড় বলে পরিচিত জায়গাটিতে অবস্থিত একটি ভগ্নস্তুপ-ই প্রাচীন নীলকুঠি বলে বর্তমানে পরিচিত। ১৭৮০ খ্রীঃ চার্লস গ্রান্ট কমার্শিয়াল রেসিডেন্টরূপে এখানে আসেন ও নিজের খরচায় এখানে নীলচাষ শুরু করেন। ১৭৮৭ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি এই কুঠি চালান তারপরে তাঁর এজেন্ট রূপে মেসার্স ক্রোটিন এন্ড এলাটন'কে নিয়োগ করেন। তিনি এই কুঠির তত্ত্বাবধান শুরু করেন ও গোয়ামালতীকে প্রধান কার্যালয়ে পরিণত করে তৎকালীন পুর্ণিয়া জেলার দক্ষিণ পুর্বাংশে ৫টি বিভাগে অবস্থিত ৫টি কুঠিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। এই কুঠিগুলিতে ৩০ জোড়া চৌবাচ্চা ছিল। বুকাননের দেওয়া এক হিসাব মতো এলার্টনের নিয়ন্ত্রণাধীনে ৫টি কুঠিতে দাদন দেওয়া ২৬ হাজার বিঘা জমির মধ্যে ২০ হাজার বিঘায় নীলচাষ করে ২ লক্ষ ৪০ হাজার বান্ডিল নীল গাছ পাওয়া যেত। যা থেকে পাওয়া যেত ৬৪০ মন নীল যার তৎকালীন বাজার মূল্য নব্বই হাজার টাকার মতো। পরে তা প্রায় লক্ষাধিক টাকায় দাঁড়ায়। এরপর ১৮৩৪ খ্রীঃ কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট

প্রথা বিলোপের পর গোয়ামালতীর গুরুত্ব কমে যায় এবং ১৮৭০ খ্রীঃ হান্টারের দেওয়া নীলকুঠির পরিসংখ্যানে এই কুঠির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কালিয়াচক কুঠি ঃ

গোয়ামালতী কুঠির উত্তরাধিকার রূপে ১৮৭০ খ্রীঃ এই কুঠি পূর্ণ গৌরবে নিজে কে প্রতিষ্ঠিত করে (নীল বিদ্রোহ সংগঠিত হওয়ার ১২/১৩ বছর পরেও)। এই কুঠিটি বর্তমান কালিয়াচক থানার আলিপুর ও কয়ালি চাঁদপুর (জে.এল ৭০, ৬৯) মৌজা দুটির সীমান্তে মারোয়াবাদী নামের একটি জায়গায় প্রায় ৩২ বিঘার মত জায়গা নিয়ে অবস্থিত ছিল। বিরাট দোতলা কুঠি বাড়িটিতে বড় বড় দরজা জানালা ওয়ালা ষোলোটি ঘর ছিল। পার্শ্ববর্তী পাগলা নদী থেকে কুঠির প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ হোত 'চুনিয়ানালা' নামে একটি খালের মাধ্যমে, তারপর কুঠির এলাকাধীন একটি পুকুরে। ১৮৭০ খ্রীঃ এ এই কুঠির অধীনে ২৮ হাজার বিঘা জমিতে নীলচাষের জন্য বার্ষিক গড়ে এক লক্ষ টাকা মূলধন নিয়োগ করে প্রায় ১১ শত মন নীল উৎপন্ন করা হতো যার চলতি বাজার দর ছিল দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। ১৯৩৪ খ্রীঃ এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পে কুঠিটির দোতলা অংশ ভেঙ্গে পড়ে। তথাপি এখনও এক তলার বেশ কিছু অংশ বসতবাড়ী রূপে ব্যবহৃত হয়। এই কুঠিটির দেওয়ান রূপে নিযুক্ত কর্মচারীদের বংশধরেরা এখনও আছেন এবং ধর্মমত নির্বিশেষে তারা এখনও দেওয়ান উপাধিই ব্যবহার করে থাকেন।

মথুরাপুর কুঠি ঃ

মানিকচক থানার মথুরাপুরে (জে এল ২৩) এই নীল কুঠি অবস্থিত। এখন এই কুঠিটির কাছেই আছে মথুরাপুর হাইস্কুল। এখানে এখনও একটি বিরাট পুকুর রয়েছে যা সংরক্ষিত জলাধার হিসাবে ব্যবহৃত হতো। কুঠির কারখানা অংশটি সম্প্রতি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। কিন্তু মূল কুঠি বাড়ীটি এখনও অনেকটাই অক্ষত রয়েছে। কুঠির প্রধান কার্যালয় হিসাবে দোতলা বাড়ীর একতলায় বিরাট খোলা বারান্দা ও বিশাল বিশাল দরজায় শোভিত ঘরগুলি বর্তমানে ডাক ঘর অন্যান্য সরকারী কার্যালয়ে রূপান্তরিত। এই কুঠির কাছেই আছে ম্যানেজারের বাসভবন। ১৮৭০ খ্রীঃ এই কুঠির এলাকাধীন ১৩ হাজার বিঘা জমিতে নীলচাষ হতো, যেখানে ইংরেজরা ৭৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে পাঁচশত মন নীল উৎপন্ন করত। যার তৎকালীন বাজার মূল্য ছিল এক লক্ষ টাকা। এই কুঠিতে রায়ত, কামাতকুলি, মাঝিমাল্লা, কারখানার কুলি, গাড়োয়ান, মাসিক বেতন ভুক্ত ও অন্যান্য লোকসহ লোক সংখ্যা ছিল ৭,৬৮৯জন। এই কুঠি থেকে উৎপাদিত পণ্য গঙ্গা দিয়ে পরিবাহিত হোত।

বাকরাবাদ কুঠি ঃ

কালিয়াচক থানাতে রয়েছে অন্য আর একটি নীলকুঠি। যেটি বাকরাবাদ নীলকুঠি নামেই পরিচিত (জে এল নং ৪৭)। এই কুঠিটি কালিয়াচকের অন্য কুঠির মত আকারে বিশাল না হলেও নীল বিদ্রোহের ইতিহাসের সঙ্গে এর নাম জড়িয়ে যাওয়ায় এটি বিখ্যাত হয়ে আছে।

১৮৫৯ - ৬০ খ্রীঃ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলায় সংগৃহীত নীল বিদ্রোহীদের মমরেজপুর নিবাসী মোরাদ বিশ্বাস, সৌহাস বিশ্বাস, লালচাঁদ সাহার নেতৃত্বে শত

শত রায়ত ডেভিড অ্যানড্রুসের মালিকানাধীন এই কুঠি আক্রমণ করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ ২০ শে মার্চ ক্ষিপ্ত রায়তরা এই কুঠি আক্রমণ করে সমস্ত কাগজপত্র জ্বালিয়ে দেয়, অফিসের অন্যান্য জিনিসপত্র ও ভাঙচুর করে। তারপর ম্যানেজারের কুঠি আক্রমণ করে বন্দুক, তলোয়ার প্রভৃতি লুঠ করা হয়। এই খানেই থেমে না থেকে ক্ষিপ্ত বায়তরা মিস্টার লিয়নস্ এর মালিকাধীন অন্য একটি কুঠি আক্রমণ করে। মিস্টার লিয়নসের পূর্বতন কালেকটর ছিলেন মোরাদ বিশ্বাস, তার নেতৃত্বে বহু মুসলিম রায়ত এই কাজে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন। ২১ শে মার্চ সকালে কুঠার, সড়কি, তলোয়ার সহ বহু সংখ্যক রায়ত লিয়নসের কুঠি আক্রমণ করে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত লিয়নস্ কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গী নিয়ে গুলি চালনা করেন। এই গুলি চালনার ফলে ঘটনাস্থলে রায়তদের দুজন নিহত ও পাঁচজন গুরুতররূপে আহত হয়। এই সময় পার্শ্ববর্তী গঙ্গা নদীতে এইচ.এম.এম. পায়োনীয়ার নামে একটি স্টীমার এসে পড়ায় লিয়নস্ রক্ষা পান। এরপর এই বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করা হয়। মোরাদ বিশ্বাস, লালচাঁদ সাহা, রতন মন্ডল ইত্যাদি নেতার সাথে ধরা পড়েন আরও চৌত্রিশ জন বিদ্রোহী। তাদের বিচারের জন্য বহরমপুরের সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। মূল গঙ্গা নদীর সাথে এই কুঠিটির উৎপাদিত দ্রব্যের পরিবহন ব্যবস্থা চালু ছিল।

নাজিরপুর কুঠি ঃ

কালিয়াচক থানার অন্তর্গত অন্য একটি নীলকুঠি ছিল নাজিরপুর মৌজায় (জে.এল.নং - ১১৯)। ভাগীরথী নদীর ধারে এই কুঠির কাছেই বিখ্যাত আমানিগঞ্জের হাট বসত।

নারায়ণপুর কুঠি ঃ

কালিয়াচক থানার নারায়নপুর মৌজায় (জে.এল.নং - ১৬৫) আরও একটি নীলকুঠি ছিল। এখানকার নীলচাষী রফিক মন্ডলের নেতৃত্বে চাষীরা নীলবিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করেছিলো। পাগলা নদীর মাধ্যমে এই কুঠির উৎপাদিত দ্রব্য পরিবাহিত হতো।

সিঙ্গাতলা কুঠি ঃ

ইংরেজবাজার থানার অধীন সিঙ্গাতলা নীলকুঠি তৎকালীন ব্যস্ততম নীলকুঠি গুলির অন্যতম ছিল। ১৮১০ খ্রীঃ উইলিয়াম ফ্রাঙ্কলিনের গৌড় সফরের ডাইরিতে এই কুঠিটির উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিপদ লাহিড়ি তাঁর 'গৌড় ও পান্ডুয়া' বইটিতে এই কুঠিটির উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে পুরাতন সদর হাসপাতাল বলে যেটি ব্যবহৃত হয় সেটিই সিঙ্গাতলা কুঠি। এই কুঠির ম্যানেজার এর বাসস্থান ছিল ইংরেজবাজার এর জেলা স্কুল-এ। হান্টার তার বিবরণীতে জানিয়েছেন যে ১৮৭০ খ্রীঃ এই কুঠির অন্তর্ভুক্ত ছিল ৫ হাজার বিঘা জমি। এই পরিমান জমিতে নীলচাষ করে এবং ৩০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে ২৫০ মন নীল উৎপন্ন হতো। ৬৬.৬ শতাংশ হারে জমিতে লাভের পরিমান ছিল ৫০ হাজার টাকা। মহানন্দা নদী ছিল এর জল ও পন্য পরিবহনের মাধ্যম।

মাধববাটী কুঠি ঃ

বামনগোলা থানার অন্তর্গত মাধববাটী মৌজায় (জে.এল.নং - ৫) মাধববাটী কুঠি অবস্থিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এই মৌজার মদনাবতী ও মহীপাল দীঘি সহ টাঙন নদের তীরে কয়েকটি নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মালদহস্থিত রেসিডেন্স উডনী সাহেবের অর্থে; মদনাবতীর নীলকুঠিতে ম্যানেজার ছিলেন উইলিয়াম কেরী। আর মহীপাল দীঘির নীলকুঠির ম্যানেজার ছিলেন মিঃ টমাস। মাধববাটী নীলকুঠির ম্যানেজার উইলিয়াম কেরী আর পাঁচজন নীলকুঠির ম্যানেজারের তুলনায় অবশ্যই আলাদা। তিনি আদতে নীল ব্যবসায় লাভবান হবেন বলে এদেশে আসেন নি। ১৭৯২ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত ব্যাপটিষ্ট মিশন বাংলাদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৭৯৩ খ্রীঃ উইলিয়াম কেরী ও জন টমাস নামে দুজন মিশনারীকে বাংলাদেশে পাঠায়। বাংলাদেশে পৌছানোর পর সাড়ে সাত মাস ধরে কেরী কলকাতা, ব্যান্ডেল, নদীয়া, মানিকতলা ও শেষে সুন্দরবনের দেহট্রে কাজের সন্ধানে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। এই অনিশ্চয়তা ও অত্যধিক পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে কেরী পত্নী ডরোথি অর্ধোন্মাদ হয়ে গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় ডর্মে উডনী নামে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী কেরী ও টমাসের কথা জানতে পরেন। ওডনী ছিলেন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মালদহস্থিত রেশম কুঠির কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট। মালদহ শহরে মহানন্দা নদীর তীরে তাঁর একটি ব্যবসা কেন্দ্র ছিল, আর বিভিন্ন স্থানে ছিল তাঁর নীলকুঠি। বাংলাদেশে কেরী এসেছেন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য এই সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনিই প্রস্তাব দেন মহীপাল দীঘি এবং মদনাবতীতে তাঁর নীলকুঠি দুটি দেখাশোনা করার জন্য। আকূল পাথারে কেরী এই ভাবে একটুআশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীঃ ১৫ই জুন উইলিয়াম কেরী সপরিবারে মদনাবতীতে পৌছান। কিন্তু ব্যবসা চালাবার মত মানসিকতা কেরীর ছিল না। মদনাবতীর নীলকুঠি তাই ভালভাবে চলছিল না। উডনী পর পর কয়েক বছর ক্ষতি স্বীকার করার পর শেষ পর্যন্ত সেখানকার কুঠি উঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন, এর ফলে কেরী আবার অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়লেন। মদনাবতী থেকে প্রায় ছ মাইল টাঙ্গন নদীর তীরে খিদিরপুরে উডনীর আর একটি ছোট নীলকুঠি ছিল। কেরী ৩০০ পাউন্ডের বিনিময়ে সেটি কিনে নিলেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ প্রথম দিকে কেরী মদনাবতীর বাস উঠিয়ে সেখানে চলে যান। এই মৌজায় এবং কুয়ারসই এর পার্শ্ববর্তী মৌজায় এই নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। পালযুগে স্থাপিত এবং উইলিয়াম কেরীর স্মৃতি বিজড়িত এই গ্রামে গেলে এখনও দেখা যাবে পাল আমলে খনিত বিশাল মেঘডম্বুর দিঘি। তার এক পাড়ে কেরী পুত্র ফেলিক্সের সমাধি। দীঘির উত্তর পাড়ে বড় বড় চৌবাচ্চা। দীঘির উত্তর - পশ্চিম কোণে ইটের তৈরী নীলকুঠি এবং কেরীর বাসস্থানের ভিতের ভগ্নাংশ এখনও রয়েছে। ব্রাহ্মণী নদীর একটি ছোট উপনদী দিয়ে এই কুঠিতে জল সরবরাহ ও পণ্য পরিবহন করা হত।

আর্তিপুর কুঠি ঃ

মালদহের আর্তিপুর নীলকুঠিটি কোথায় ছিল তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যাচ্ছে না। কারণ এই নামের কোন মৌজা বর্তমান মালদহ জেলায় নেই। অনুমান করা হয় এই স্থানটি গাজোল থানার তীরপুর (জে.এল.নং - ১৮০), অথবা বামনগোলা থানার তীতপুরে (জে.এল.নং - ৮৯)

ঐ কুঠি ছিল। আবার এমনও হতে পারে দেশবিভাগে স্থানটি প্রতিবেশি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। তবে ১৮৭০ সালের হিসাব মত কুঠি উল্লেখযোগ্য লাভের মুখ দেখেছিল। এই কুঠির এলাকাধীন ছিল ১৫ হাজার বিঘা জমি। এই জমিতে ১ লক্ষ টাকার বিনিয়োগে জমি চাষ করে ৬ শত মন নীল উৎপাদিত হয়েছিল। যা তৎকালীন বাজার দামে ২০ শতাংশ লাভের অঙ্কে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় বিক্রী হয়েছিল। তাছাড়া আরও ছোটখাট যে সমস্ত নীলকুঠির সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি হল কালিয়াচক থানাব কুম্ভীরা মৌজা (জে.এল.নং - ৪৫), গঙ্গার চর এলাকায় গোলাপগঞ্জ (জে.এল.নং - ১৭৬) শ্মশানী (জে এল.নং - ১৭৭) ও বৈষ্ণবনগরের (জে.এল.- ৩২) নীলকুঠি।

A Statistical account of Bengal গ্রন্থের এর বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে যে নীলবিদ্রোহের ১২ / ১৩ বছর পরেও নীলচাষ ও নীলকুঠি মালদহ জেলায় ছিল। ১৮৭৩ খ্রীঃ জেলা কালেকটরেটের রিপোর্টে বলা হয়েছে সাতটি নীলকর ব্যবসায়ীর অধীনে জেলায় কুড়িটি নীলকুঠি সম্পূর্ণ অর্থে সচল ছিল এবং এই বছরই জেলায় নীল উৎপাদীত হয় ৪০০০ মন, যার সমসাময়িক বাজার মূল্য ছিল ৮ লক্ষ টাকা। এই ৪০০০ মন নীল উৎপাদনের জন্যে ব্যবহৃত হত ৭০ / ৮০ হাজার বিঘা জমি। আরও উল্লেখ্য এই যে বাংলার অন্যান্য জেলাগুলি সবই ইউরোপীয় নীলকরদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছিল কিন্তু মালদহে নীলচাষের ব্যবসায়ে বেশ কিছু দেশীয় ধনী ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ভাবেই অংশগ্রহন করতেন।

এরপর ১৮৮০ খ্রীঃ জার্মানীতে কৃত্রিম নীল আবিস্কার হওয়ায় সারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে এদেশেও নীলচাষ আস্তে আস্তে অবলুপ্ত হয়ে যায়। মালদহে নীলচাষের জায়গায় রেশমকীটের অত্যাবশ্যক খাদ্য তুঁত ও আমবাগান লাভ জনক ব্যবসা হিসাবে ভারতীয় বাজারে প্রয়োজনীয় জায়গা করে নিতে থাকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদহ জেলার ভূমিকা ঃ

মালদহ জেলা চিরদিনই জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাবপুষ্ট। ভারতবর্ষের জাতীয়তা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৫ খ্রীঃ। জন্মলগ্নের পর থেকে ১ম দশক পর্যন্ত কংগ্রেস বড় কোন রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ন হয় নি। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রচেষ্টার পটভূমিকায় সারা দেশে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের বীজস্বরূপ। তার পরিপ্রেক্ষিতটা ছিল এইরকম -- ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে উত্তর ভারতের ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল বাংলাদেশের গভর্নর জেনারেলের প্রত্যক্ষ শাসনের অধীনে ছিল, আর অবশিষ্ট অধিকৃত দেশগুলি মাদ্রাজ ও বোম্বের গভর্ণরের অধীনে ছিল। ১৮৭৪ সালে আসাম এবং বঙ্গ ভাষাভাষি গোয়ালাপাড়া, কাছাড় ও শ্রীহট্ট নিয়ে একটি ভিন্ন প্রদেশ গঠিত হয় এবং একজন চীফ কমিশনারের হাতে শাসনভার ন্যস্ত হয়। বাংলাদেশের অবশিষ্ট অংশের পরিমান ছিল ১৮৯, ৯০০ বর্গ মাইল। এর লোকসংখ্যা ছিল সাত কোটি পঁচাশী লক্ষ এবং এর রাজস্বের পবিমান ছিল এগারো কোটি টাকারও বেশি। এই বিরাট প্রদেশ একজন ব্যক্তির পক্ষে শাসন করা দুঃসাধ্য বিবেচিত হওয়ায় এর প্রতিকারার্থে

নানারকম প্রস্তাব হয়। কিন্তু রাজনীতি গত ভাবে কোনটাই গৃহিত হয় নি। ১৯০৩ খ্রীঃ লর্ড কার্জন বড়লাট হয়ে আসবার পর তিনি এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। তিনি পূর্বোক্ত প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখেন। শিক্ষা - দীক্ষায় অধিকতর অগ্রসর প্রায় আট কোটি বাঙ্গালীকে একত্র রাখা যে সমীচীন নয় ১৮৯৬ সালে এই কথা উপলব্ধি করেন চট্টগ্রাম বিভাবের কমিশনার W.B.Oldham তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে পূর্ববঙ্গকে একটি আলাদা প্রদেশরূপে গঠন করা হোক; তা হলে রাজনীতির দিক দিয়ে ভয়ের কারণ হিন্দু বাঙ্গালীরা এই নতুন প্রদেশে মুসলমানদের অপেক্ষা সংখ্যালঘু হবে এবং তাদের শক্তি ও প্রভাব হ্রাস পাবে। কয়েক বছর পর বাংলার ছোটলাট Sir Andrew Frosen বড়লাট লর্ড কার্জনকে লিখে জানালেন, বাংলার রাজনৈতিক মতগঠনে পূর্ব বাংলার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। এই জনাই এটিকে একটি পৃথক প্রদেশে পরিনত করে বাঙ্গালীর প্রভাব খর্ব করা রাজনৈতিক কারনে বিশেষ প্রয়োজন। এই সব মতের ভিত্তিতে ১৯০৩ সালের ১০ ই নভেম্বর লর্ড কার্জনের নিজস্ব মত লিপিবদ্ধ হয় - পূর্ববঙ্গ ইংরেজ শাসনের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন বাঙ্গালীর প্রধান কেন্দ্র। অন্য অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও এই একটি কারনেই পূর্ববঙ্গকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এই যুক্তিটি খুব গোপন রাখিতে হইবে। প্রকাশ্যভাবে ইহা যেন কোন নথিপত্রে উল্লিখিত না হয়, কারণ তাহা হইলে একটি ভীষণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে।" — সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের এই ঘৃণ্য অভিসন্ধির বিরূদ্ধে ভারবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিগন জনসাধারনকে ইংরেজ শাসন বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানায়। বস্তুত এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেই ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলনকে বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার পথ প্রদর্শক হিসাবে চিহ্নিত। শিক্ষা - দীক্ষায় অনগ্রসর মালদহ জেলায় এই আন্দোলনের ঢেউ মারাত্মক আকার না নিলেও সাধারন মানুষের মধ্যে স্বাদেশিকতার উন্মেষ দেখা দিল। মালদহ জেলায় ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম বহিঃপ্রকাশ দেখা দেয় নীলকর সাহেবদের বিরূদ্ধে আন্দোলনে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই জেলার রফিক মন্ডল। বলা হয় ১৯০১ - ১৯০২ এই সময়ের মধ্যে সারা বাংলা যেভাবে গোপনে গোপনে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল, সেই তুলনায় মালদহ ছিল নেহাতই নিস্তরঙ্গ। মালদহ সেই সময় ছিল ব্রিটিশ রাজভক্ত ও রাজানুরক্ত সমস্ত জমিদারদের অবাধ লীলাভূমি। অন্যদিকে ইংরেজ বিরোধিতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। পরাধীনতার এই অনুর্বর জমিতে স্বাধীনতার প্রথম বীজ বপন করেছিলেন অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার। ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় ঘটল সেই বিখ্যাত ঘটনা। বাঙলার দুই দামাল ছেলে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে নিহত হলেন দুজন ইংরেজ। এই ঘটনার জেরে ২ রা মে কলকাতার সন্দেহজনক স্বদেশী আন্দোলনের আড্ডাগুলি পুলিশ ভেঙে দিল। পেল বহু অস্ত্রশস্ত্র, বোমা ও কাগজপত্র। ১৫নং গোপীদত্ত লেন, ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড এবং ৩৮/৪ নং রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট থেকে প্রায় ৪১ জনকে গ্রেপ্তার করা হল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কনসার্ট নামক বর্ধিষ্ণু গ্রামের জমিদার পুত্র কৃষ্ণজীবন সান্যাল। আলিপুর বোমার মামলা চলাকালীন যে কজন বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন কৃষ্ণজীবন ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম।

এরপব ১৯১০ ১ম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল, মালদহ জেলাতে বিপ্লবী দল হিসাবে চিহ্নিত অনুশীলন পার্টি তার সংগঠনের কাজ শুরু করে দিল। তৎকালীন বিশিষ্ট নেতৃবর্গ মালদহে

এসে বিপ্লবী গোষ্ঠী তৈরী করতে তৎপর হয়ে উঠল। সেই সময় মালদহ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নবীনচন্দ্র বসু বৃটিশ সরকারের চর হিসাবে কাজ করছিলেন। নবীনবাবুর এই চরবৃত্তি মালদহে বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালানোর পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তাই ১৯১৬ খ্রীঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী নবীনবাবু প্রাত্যহিক বৈকালিক ভ্রমন সেরে জেলা স্কুলেরই মাঠ দিয়ে ঘরে ফেরার পথে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে ছুরিকাহত হয়ে নিহত হলেন। এই সময় এই রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরছিলেন গাজোল থানার আলাল গ্রামের মহেন্দ্রনাথ দাস। তিনি তখন অক্রুরমনি স্কুলের ছাত্র। খুনী সন্দেহে তাঁকেই ধরা হল সর্বাগ্রে। এরপর একে একে হরিমোহন ঝা, পশুপতি ঝা, গোপাল মাঝি, কালিপদ ঘোষ, নারায়ন সাহা, নরোত্তম দাস, অনুকুল ঠাকুর। এঁদের মধ্যে কেবল অনুকূল ঠাকুরই বেকসুর ছাড়া পেলেন। মহেন্দ্র দাস ছাড়া অন্যান্য অভিযুক্তদের বিভিন্ন মেয়াদের জেল হয়ে গেল, আর মহেন্দ্র নাথ দাস যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশে আন্দামানে নির্বাসিত হয়ে গেলেন। দন্ডভোগ কালে তাঁর যক্ষা হল। পরে তিনি মুক্তি :পেয়ে ফিরে এলেনও ঐ মারাত্মক রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়। স্বাধীনতা লাভের অনেক পরে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ও কমিউনিষ্ট নেতা সতীশ পাকড়াশীর স্মৃতি চারন থেকে জানা যায় নবীন বসুর প্রকৃত হত্যাকারী ছিলেন জনৈক নগেন দাস নামের একজন বিপ্লবী, যিনি হত্যাকান্ডের কিছুদিন আগে থেকেই একজন হোমিওপ্যাথী ডাক্তারের সহকারী হিসাবে মালদহে কাজ করছিলেন।

১৯২১ খ্রীঃ গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। এর প্রভাবে মালদহ জেলায় ব্যাপক সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ইংরেজ শোষণ ভিত্তিক অত্যাচার ও অপশাসনের বিরূদ্ধে মালদহ জেলাবাসী ব্যাপকভাবে আন্দোলনে সামিল হন। খিলাফৎ আন্দোলনে যখন মুসলমান ভারতীয় গণ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ভাবে ব্রিটিশ কুশাসন বিরোধী আন্দোলন সমর্থন করে সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত আন্দোলনের সামিল হন তখন মালদহ জেলাতেও হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। এই সময় মুসলমান অধ্যুষিত কালিয়াচক অঞ্চলেই এই আন্দোলনের গতি সবচেয়ে বেশি দানা বাঁধে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন যে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ না থাকলেও কিন্তু এই আন্দোলন ই যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের একমাত্র কারণ একথা ভাবার কোনও কারণ নেই। অসহযোগ আন্দোলনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা সেইময়কার তরুণ স্বদেশীদের অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি। তখন থেকেই বাংলায় বিপ্লবীদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হয় এবং সন্ত্রাসবাদ নামক সশস্ত্র আন্দোলনের সূচনা হয়। এই বিপ্লববাদের জন্ম হল অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই সমিতির প্রথম আস্তানা ছিল সুকিয়া স্ট্রীট থানার কাছে এক ভাড়টে বাড়িতে। পরে যার কর্মসূচী একটু পরিবর্তিত হয়ে ৪৯ নং কর্মওয়ালিশ স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। এইখানে স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপ ও কর্মপন্থা নির্ধারণ ইত্যাদি ছাড়াও ব্যায়াম, লাঠিখেলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চরিত্রগঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হত। অনুশীলন সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী লিখেছেন "অনুশীলন পরিকল্পিত সমাজে নিরক্ষর, দুর্নীতি পরায়ন, চরিত্রহীন, ভীরু লোক থাকতে পারবে না।... মানব সমাজ থেকে ধন বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, প্রাদেশিক বৈষম্য দুর করিয়া সকল মানুষের মধ্যে সমতা আনিতে হইবে। ইহা একমাত্র জাতীয় গভর্নমেন্ট দ্বারাই সম্ভবপর,

তাই পরাধীনতার বিরূদ্ধে অনুশীলনের বিদ্রোহ ঘোষনা। অনুশীলন চায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।"

মালদহ জেলাতেও এই বিপ্লব বাদের প্রভাব পড়ল। অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি বিপ্লবী গুপ্ত সংঠনের নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মালদহে গোপনে যাতায়াত করে সংগঠিত বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। প্রতুল গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, সতীশ পাকড়াশী, প্রভাস লাহিড়ী প্রমুখ বিশিষ্ট বিপ্লবীরা এই সংগঠনকে মজবুত রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যান। মালদহে এই সংগঠনকে সক্রিয় রাখতে যাদের তাঁরা পাশে পেলেন তাঁরা হলেন (১৯২২ থেকে ১৯২৫ খ্রীঃ মধ্যে) হরিনারায়ন দাস, মনীন্দ্র নাথ গোস্বামী, মনি ঘোষ, নরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, ভগবান বসাক, দ্বারিকা দাস বিহানী, ফনি গোস্বামী, শুভ নারায়ন গিরি ইত্যাদিরা। এইসব মানুষেরা নিজেদের এবং অন্যান্যদের বিপ্লবের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার জন্য মালদহ জেলার নানাস্থানে শরীরচর্চা কেন্দ্র স্থাপন করলেন। গোলাপট্টির 'সরস্বতী পাঠাগারে' ছিল এইরকমই একটি বিপ্লবীদের মিলন কেন্দ্র। এছাড়া অভিরামপুর ব্যায়াম সংঘ, পুড়াটুলী ব্যয়াম সমিতি, গান্ধী ধর্মশালা প্রভৃতি জায়গায় বিপ্লবীরা নিজেদের নানারকম ভাবে অনুশীলিত করতেন। শুভ নারায়ন গিরির বাড়িতেও একটি ব্যায়ামাগার ছিল, সেখানে বিপ্লবীরা এসে আশ্রয় নিতেন। পাবনা থেকে আসতেন শরীর বিদ্যা বিশেষজ্ঞ মনি দাস।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই দুরন্ত দামাল দিনগুলিতে অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন, যাদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টাতেই ত্বরান্বিত হয়েছিল দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি। যে কয়টি জেলা এ ব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিলো তাদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, কালিয়াচক অন্যতম। ১৯২১ খ্রীঃ থেকে ১৯৪২ খ্রীঃ পর্যন্ত অসহযোগ ও সন্ত্রাসবাদী এই দ্বিমুখী আন্দোলনই চলছিল একই সথে। কারণ খিলাফৎ আন্দোলনে মুসলমান ভারতীয় গণ কংগ্রেসের সাথে যোগ দিয়ে বৃটিশ কুশাসন বিরোধী আন্দোলন সমর্থন করে যোগ দেন। এই সিদ্ধান্ত মুসলমান অধ্যুষিত কালিয়াচক অঞ্চলে সবচাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। এই অঞ্চলের লোকেরা ব্রিটিশ বিরোধীতায় এতটাই উত্তেজিত ছিল যে শাসক গোষ্ঠীর সমর্থক কর্মচারী এবং বিভেদকামী লোকজনকে তারা সমাজিক বয়কট করে দূরে সরিয়ে রাখত। এরপর যে গ্রামটির কথা উল্লেখযোগ্য তা হল চাঁচল থানার অন্তর্গত কলিগ্রাম। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকেই কলিগ্রাম একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ। জনসংখ্যা এবং সংস্কৃতির দিক থেকে ইংবেজবাজার এবং কলিগ্রাম প্রায় তুল্যমূল্য। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লর্ড কার্জন এর বঙ্গ বিভাগের কারনে যে আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারন করে সেই সময় কলিগ্রামের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য, এই সময় বিদেশী পন্য বর্জনের প্রতিবাদে দেশীয় কাপড় এবং জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়। এইসময় মালদহের সু সন্তান বিনয় কুমার সরকারের অনুপ্রেরণায় কলিগ্রামে শ্রী কৃষ্ণচরন সরকার মহাশয় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নিস্কর ভূমি দান করেন। এ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করতেন বিনয় সরকার স্বয়ং। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শ্রী রামনিধি মজুমদার, জগবন্ধু সরকার, রামচন্দ্র লাহিড়ী, মদন গোপাল রায় চৌধুরী, ঘনশ্যাম রায় চৌধুরী ইত্যাদিরা হরিদাস পালিত, বানেশ্বর দাস, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, নবীনচন্দ্র দাস, খগেন চন্দ দাস, ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী ইত্যাদিরা জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা কলিগ্রামের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এক সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছিল। শ্রী চারুচন্দ্র সরকার, শ্রী মনীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, গিরীন্দ্র নারায়ন বিশ্বাস, কৃষ্ণ বিনোদ গোস্বামী, গৌরচন্দ্র সরকার প্রভৃতি যুবকেরা কলেজের

পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরন করেন। ১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাব ও এই গ্রামে পড়েছিল। তখন এই বিদেশী পণ্য বর্জন, চরকার প্রবর্তন ও মাদক দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন শুরু হয়। এরই জেরে চাঁচোলে নীলমনী বিশ্বাসের গাঁজার দোকান ভাঙচুর হয়। খবর পেয়ে আসেন মালদহের ম্যাজিস্ট্রেট জন কার্টার। অমানুষিক লাঠিচার্জ হয়, কারাবরন করেন রামরাঘব লাহিড়ী, রাম প্রদ্যোৎ লাহিড়ী, সুধাংশু লাহিড়ী, চারুচন্দ্র সরকার, গিরিন্দ্র নারায়ন বিশ্বস, জগবন্ধু রায় চৌধুরী, কান্তিচরন সরকার, কমলাচরন সরকার প্রভৃতিরা। এরপর ১৯৪২ সালে কলিগ্রামে রামরাঘব লাহিড়ীর নেতৃত্বে সংগঠিত হয় ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি।

মালদহের স্বাধীনতা আন্দোলনে হরিশ্চন্দ্রপুরের অবদানও কম নয়। কেউ কেউ হরিশ্চন্দ্রপুরকেই স্বাধীনতা পূর্ব মালদহ জেলার রাজনৈতিক রাজধানী বলে চিহ্নিত করতে চান। কারণ জেলার দ্বিমুখী রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগেই ছিলেন এই অঞ্চলের মানুষেরা। ভালুকার দ্যুতিধর রায়, শ্রীমতি সুরেন্দ্র বালা রায়, সৌরেন্দ্র মোহন মিশ্র, হরিশ্চন্দ্রপুরের রামব্রহ্ম বায়, রামবিধু রায়, রামহরি রায়, শচীন্দ্র নাথ মিশ্র, পিপলার সুবোধ কুমার মিশ্র, বিষ্টুপুরের অসিত সিংহ, গোহিলার সুরেন্দ্র নাথ মন্ডল। আর ১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এই এলাকার মানুষেরা হলেন দেবেন্দ্র নাথ ঝা, ভূপেন্দ্র নাথ ঝা, সতীশ চন্দ্র আগরওয়ালা, সত্যরঞ্জন সেন, মতিলাল বিহানী, নিকুঞ্জবিহারী গুপ্ত, অতুল কুমার, মুকুট ধারী সিং, সিংহাবাদের হরিন্দন ব্রহ্মচাবী ইত্যাদি। এছাড়া পঞ্চানন্দপুরের পূর্ণ মন্ডল, কালিয়াচকের সর্বেশ্বর রবি দাস ৪২ এর আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

১৯৩৭ এর মাঝামাঝি সময় থেকে মাহাত্মা গান্ধী পরিকল্পিত আদর্শ অনুযায়ী মালদহে চলছিল পল্লী সংগঠন, কুটির শিল্প উন্নয়ন, হরিজন সেবা প্রভৃতির কাজ। অন্যদিকে ১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনের প্রভাবে স্বাধীনতা অর্জনের অন্যান্য চরম প্রতিবাদী কাজগুলিও চলতে থাকে। জেলার নেতৃস্থানীয় কর্মীবৃন্দ জেলার রেললাইন সংলগ্ন অঞ্চল গুলিতে একেব পর এক যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করে দেন। হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চলে সুবোধ মিশ্রের নেতৃত্বে যুবকেরা স্থানীয় থানা আক্রমন করে। রেলস্টেশনে অগ্নিসংযোগ কবে রেললাইন অকেজো করে দেয়। ভালুকা অঞ্চলেও রেল লাইন তুলে ফেলে দেওয়া হয। একলক্ষ্মী আদিনা রেল স্টেশনেও অগ্নিসংযোগ করা হয়। মুচিয়া সিংহাবাদ নাচোল স্টেশন অচল করার জন্য যুবকেরা সচেষ্ট হয়। জেলার কোন কোন জাযগার টেলিগ্রাফ যোগাযোগ ব্যবস্থাও অচল করে চেওয়া হয়।

এরপর ১৯৪৭ সাল, রাজনৈতিক নানা উত্থান পতনে ভারতের স্বাধীনতা আসে, কিন্তু ভারত দ্বিখন্ডিত হয়। ফল স্বরূপ সারা দেশ জুড়ে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বাঙলাদেশের ভৌগোলিক মানচিত্রে পরিবর্তন ঘটে। প্রাথমিক সিদ্ধান্তে মালদহ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশেষে তিনদিনের রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার পর জেলার ১৫ টির মধ্যে ১০ টি থানা সহ মালদহ জেলা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী মালদহ জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা ঃ

বিনয় কুমার সরকার ঃ

১৮৮৭ সালে ২৬ শে ডিসেম্বর মালদহের পুড়াটুলিতে জন্মগ্রহন করেন মহা মনিষী আচার্য বিনয় কুমার সরকার। তাঁর পিতার নাম সুধন্য কুমার সরকার মাতার নাম মনোমোহনী দেবী। ১৯০২ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হয়ছিলেন আচার্য বিনয়। তারপর সারা জীবনের শিক্ষা গ্রহণের ইতিহাসে এই ধারাবাহিকতা বাধা প্রাপ্ত হয়নি কোথাও। তিনি রচনা করেছেন ৮৮ টি বই, তার মধ্যে ৪৪ টি ইংরেজীতে, ৩৪ টি বাংলায়, বাকিগুলি ফরাসী, জার্মান ও ইতালি ভাষায়।

আপাত মস্তক শিক্ষিত এই মানুষটি যে কোন উচ্চপদ গ্রহন করে বিলাসী জীবন যাপন করতে পারতেন, কিন্তু তবুও দেশমাতৃকার সেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর বিপ্লবী জীবনের শুরু ১৯০৫ সালের 'বঙ্গভঙ্গ রোধ' আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। এই সময়ে তিনি ডন সোসাইটি নামে পরিচিত সতীশ মুখার্জীর বিপ্লবের আখড়ায় যোগ দেন। ১৯০৬ সালে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পবিষদ প্রতিষ্ঠিত হলে এখানে প্রতিষ্ঠাতা এবং কর্মী হিসাবে ছিলেন আচার্য বিনয়। একই সময়ে অনুশীলন সমিতি স্থাপন হল তাতেও যোগ দিলেন বিনয় সরকার। এই সময় বিনয় সরকার জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে সারা পৃথিবীর একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জনপ্রিয় শিক্ষক হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছেন অপরদিকে তিনি একাধিক বিপ্লবাত্মক কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রেখেছেন। বৃটিশের ঘুম কেড়ে নেওয়া গদর পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডঃ তারকনাথ দাস ছিলেন বিনয় কুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু। গদর পার্টির প্রেরিত ভারতে অস্ত্র বোঝাই জাহাজটির প্রেরক ছিলেন আচার্য বিনয়, শুধু তাই নয় ১৯২০ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত বার্লিনে যে ভারতীয় বিপ্লবী কমিটি কাজ করত তারও অন্যতম সদস্য ছিলেন বিনয় কুমার সরকার।

১৯১০ সালে বিনয় একটি সংস্থা গড়ে তোলেন যার কাজ ছিল বিপ্লবীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণ করা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই মহান ব্যক্তিটি ছিলেন বিপ্লবী, অন্যায়ের বিরূদ্ধে আপোষহীন লড়াই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। এদেশে থাকাকালীন তো বটেই বিদেশে থাকতেও দেশীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল নিয়মিত। এ বিষয়ে তিনি একাধিক বই ও রচনা করেছেন।

১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে তিনি আমেরিকার ওয়াশিংটনে এক বক্তৃতা দিয়ে ফেরার পথে কারোনারি থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হন এবং ঐ বছরই ২৪ শে নভেম্বর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন মালদহের চিরন্তন গর্বের সন্তান আচার্য বিনয় কুমার সরকার।

রাধেশ চন্দ্র শেঠ ঃ

১৮৬৪ খ্রীঃ রাধেশচন্দ্র শেঠ পুরাতন মালদহে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম হরিশচন্দ্র শেঠ। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী। ছোট বেলায় বাল্যবন্ধুদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে 'কুসুম' নামে একটি ছোট মাসিক পত্রিকা বের করতেন। এই সময় 'অরণ্য প্রয়াণ' নামে একটি কাব্য গ্রন্থও লিখে ফেলেন। তিনি পুরাতন-মালদহে একটি পাঠাগারও স্থাপন করেন।

যে কোন বিষয়ে গঠনমূলক কাজ ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব। ছাত্রবৃত্তি পাশ করে তিনি মালদহ জেলা স্কুলে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ে পড়া কালীনই তিনি 'মালদহ সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ভর্তি হন হুগলী কলেজে সেখান থেকে রাজশাহী কলেজে। এই সময়েই তিনি 'হিন্দুরঞ্জিকা' পত্রিকা সম্পাদনার ভার নেন এবং মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে মালদহের প্রতিনিধি হয়ে যোগ দেন।

ছাত্রজীবন শেষ করে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় পুলিশ সাব ইনসপেক্টর এর কাজ নিয়ে, তারপর শিক্ষকতা, এছাড়া ওকালতিও করেন কিছুদিন। এই সময় তিনি 'কৃষ্ণকলি প্রেস' নামে একটি মুদ্রণালয় ও প্রতিষ্ঠিত করেন। এরই মাধ্যমে তিনি মালদহের সমাজ প্রচলিত যাবতীয় অন্যায় কাজের জন্য লেখালেখির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও কর্মবহুল ছিল। মালদহের জনসাধারণ কে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি 'স্বদেশী ভান্ডার' প্রতিষ্ঠা করেন। সমাচার পত্রিকায় স্বদেশী বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ লিখতেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া 'গৌড়দূত' পত্রিকা পুনরায় প্রকাশ করে (১৯১০ সালে) সেখানেও মালদহের জনসাধারণের সুপ্ত আশা আকাঙ্খার কথা লিপিবদ্ধ করতেন। এরপর আচার্য বিনয়কুমার সরকারের উদ্যোগে যখন জাতীয় শিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় বিপিন বিহারী ঘোষ এবং হরিদাস পালিতের সঙ্গে তিনিও ছিলেন এই কর্মযজ্ঞের অন্যতম একজন। তিনি এই শিক্ষার উপযুক্ত একাধিক পুস্তক রচনা করেছিলেন, শুধু তাই নয় জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্ররিদর্শক এর পদ গ্রহণ করে তাঁর নিজস্ব ওকালতি ব্যবসায় সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিলেন। জাতীয় শিক্ষা এই কর্মসূচী এতদূর ব্যপ্ত হয়েছিল যে এখান থেকে শিক্ষা লাভ করে মির্জাদপুরের রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, পরানপুরের শ্রী বানেশ্বর দাস, কালিয়াচকের নবীন চন্দ্র দাস এবং খিদিরপুরের শ্রী খগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র আমেরিকায় শিক্ষা গ্রহন করার জন্য গিয়েছিলেন।

রাধেশচন্দ্র স্ত্রী শিক্ষা প্রসারেও যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। ১৯১১ খ্রীঃ মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে তিনি কলকাতাতে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর 'বসুমতী' পত্রিকা লিখেছিলো "তাঁহার মত স্বদেশ ভক্ত সাহিত্যের সুহৃদ সদানুষ্ঠানের সহায় বাংলায় অধিক নাই। প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার অনুরাগ ছিল। গৌড় ও পান্ডুয়ার লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার, মালদহের জাতীয় জীবনের উৎস প্রতিষ্ঠা রাধেশ চন্দ্রের জীবনের স্বপ্ন ছিল। তিনি মালদহের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক বহু অনুষ্ঠানের নেতা ছিলেন। তাঁহার সৎসাহস, কর্তব্য নিষ্ঠা, দেশভক্তি ও সাহিত্যানুরাগ দেশবাসীর আদর্শ হইয়া থাকুক।"

রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ঃ

১৮৮৮ সালে পরানপুরেব চাঁদপুর গ্রামে রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী জন্ম গ্রহন করেন। পিতার নাম শ্রী গোঁরাচাদ চৌধুরী। আড়াইডাঙ্গার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাজেনবাবু শিক্ষা গ্রহন করেন। তারপর দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা মালদহের জিলা স্কুলে। প্রতিভাবান রাজেন্দ্র নারায়ণ এই সময় ন্যাশনাল স্কুলে চলে যান এবং অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। ন্যাশনাল স্কুল থেকে মাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তিনি ঋষি অরবিন্দ,

স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, আশুতোষ মুখার্জী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দীপিত হন। ঢাকা পানিহাটী ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় পুলিন বিহারী দাসের সংস্পর্শে এসে জাতীয় আন্দোলনের উপযুক্ত করে নিজেকে লাঠিখেলা ইত্যাদি নানাভাবে নিজেকে অনুশীলিত করেন। এরপর বিদেশে চলে যান উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এবং সেখানেই বৎসরাধিক কাল শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতা করেন এদেশের বেনারস এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৩/৪ বৎসর সেখানে শিক্ষকতার পর মালদহে ফিরে এলে তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়। তবুও শিক্ষার প্রাসারে তাঁর উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। বিদেশে অথবা স্বদেশের যে কোন জায়গায় উচ্চপদের চাকরী যার অনায়াসে প্রাপ্য ছিল, সেখানে তিনি আড়াইডাঙ্গায় একটি উচ্চবিদ্যালয় স্থাপন করে বিনা বেতনে প্রধান শিক্ষক হিসাবে ২ বৎসর শিক্ষকতা করেন। শুধু তাই নয় এরই সঙ্গে সঙ্গে নানারকম সেবামূলক কাজ তথা সামাজিক নানবিধ কুসংস্কারের বিরূদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত লড়াই উল্লেখযোগ্য।

কুমুদনাথ লাহিড়ী ঃ

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও মালদহ জেলার মানুষের মনে স্বাধীনতার বীজবপন করেছিলেন কুমুদনাথ লাহিড়ী। ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ২২ শে মাঘ বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত কোঁতকন্দী গ্রামে কুমুদনাথ জন্মগ্রহন করেন। পিতা দ্বারকনাথ লাহিড়ীর আটটি সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই মালদহ জেলার উকিল প্রানকৃষ্ণ ভাদুড়ি মহাশয়ের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯০৪ সালে তিনি রেঙ্গুনে চাকরি নিয়ে চলে যান। ১৯০৫ সালে বাংলাদেশে যে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয় সে আন্দোলনে কুমুদনাথ সুদূর রেঙ্গুন থেকে গোপনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে থাকেন। সে কথা প্রকাশ হয়ে পড়ায় তিনি সরকার কর্তৃক সেই চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। এরপর ১৯১০ সালে রেঙ্গুন থেকে মালদহে এসে জাতীয় শিক্ষা সমিতিতে যোগদান করেন, এই সমিতির নির্দেশ অনুযায়ী তিনি দিনাজপুরের জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। তখনও তিনি নিয়মিত মালদহে আসতেন এবং জাতীয় বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের সঙ্গে নানান বিষয়ে আলোচনা করতেন। কুমুদবাবুর সঙ্গে বিনয় সরকারের গভীর বন্ধুত্ব ছিল, তারই নির্দেশ অনুসারে তিনি শিক্ষা সমিতির নানা বিভাগে কাজ করতেন। শুধু শিক্ষা প্রচারই নয় মালদহের লোক সংস্কৃতি 'গম্ভীরা' শিল্পটির পুনরুজ্জীবনের জন্যেও তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল না। গম্ভীরা উৎসব সম্পর্কে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি গম্ভিরা গানের দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। গম্ভীরার গান ও নৃত্য যাতে আকর্ষণীয় হয় তার জন্য তিনি গম্ভীরা গানের মধ্যে তাঁর বেশ কিছু সুর ও গম্ভীরা নৃত্য কৌশল চালু করেন। এছাড়া মালদহ ও মালদহের একাধিক পত্র পত্রিকায় তিনি কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। 'গৃহস্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই কবিতাটি তাঁর স্বদেশানুরাগের পরিচয়ই বহন করে —

চাহ চাহ মতিমান
দেখ চাহি বিশাল জগতে,
মানবের কর্মধারা
শতদিকে আবর্তিয়া যায়।

এছাড়া মালদহের শিক্ষা ও সার্বিক উন্নতির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তারা হলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী,অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, মনীন্দ্রনাথ বসু, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। এইসব মানুষদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে মালদহের মানুষের নিস্তরঙ্গ, শান্ত ও রাজভক্ত হৃদয়েও ধীরে ধীরে রূপান্তর ঘটছিল। বিপিনবিহারী ঘোষ, অমরেন্দ্র কৃষ্ণ ভাদুড়ী, আদিত্য নাথ মৈত্র, হরিদাস পালিত ইত্যাদি শিক্ষিত মানুষেরা মালদহ জেলার শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হল। মেয়েদের জন্য তৈরী হল মহাকালী পাঠাশালা এবং একটি গ্রন্থাগার। তারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে এইসব বিদ্যালয়ের জন্য ছেলে ও মেয়েদের জোগাড় করে আনতেন। তাদের বিনা পয়সায় এই খাতা শ্লেট পেন্সিল ইত্যাদিও দেওয়া হত। জাতীয় শিক্ষার একনিষ্ঠ প্রচার ও প্রচেষ্টার ফলে জেলায় নানা স্থানে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা সহস্রাধিক ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

যতীন্দ্র নাথ সিংহ ঃ

১৯২১ সালে যতীন্দ্রনাথ সিংহ তাঁর বেশ কয়েকজন অনুগতকে নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন ইংরেজবাজার নঘরিয়া গ্রামের অধিবাসী। তারা প্রায় প্রত্যেকই বন্দী হন। ও বিভিন্ন মেয়াদে জেল খাটেন। পরে যতীন্দ্রনাথ সিংহ জেল থেকে মুক্তিলাভ করে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন।

বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী ঃ

হরিশ্চন্দ্রপুর পিপলার বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী অসযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। অবশ্য স্বাধীনতার সঙ্গে সংযুক্ত অনেক ব্যাপারেই তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। বেশ কয়েকবার তিনি জেল খাটেন এবং বন্দী জীবন ভোগ করেন।

ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ মিশ্র ঃ

ছাত্র জীবনে অত্যন্ত মেধাবী এই যুবক ১৯২০ খ্রীঃ অখন্ড বাংলাদেশের (রাজশাহী বিভাগের অটটি জেলাতে মালদহ সহ) প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করে বৃত্তি পেয়েছিলেন। এরপর ১৯৩০ এর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। কিছুদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার হন ও বেশ কিছুদিন জেল খাটেন। সেই সময় থেকেই তিনি আজীবন গান্ধীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় কংগ্রেস সংগঠন তৈরী করা, প্রসারিত করার গঠনমূলক কাজে তার বিশেষ ভূমিকা ছিল।

শচীন্দ্রনাথ মিশ্র ঃ

হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামের কালো তরফের জমিদার পুত্র শচীন্দ্রনাথ মিশ্র অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংক্রান্ত কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারনে তিনিও বছর খানেক জেলে বন্দী ছিলেন। পরে ১৯৩৯ সালে তারই জাহাজবাড়ীতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়।

বিপিন বিহারী ঘোষ ঃ

অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের কাজের সঙ্গে বিপিন বিহারী ঘোষের নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় মাত্র ৩০ বছর বয়সে তিনি মালদহে ওকালতি করতেন। কিন্তু এদেশীয় নেতাদের ডাকে তিনি ইংরেজদের আদালত বর্জন করলেন। স্বদেশ সেবায় তিনি ব্রতী হলেন। দীর্ঘদিন জেলের অভ্যন্তরে কাটিয়েছিলেন। তিনি মালদহে স্বদেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। বিপিন বিহারী ঘোষ মালদহ জেলার কংগ্রেসের মূখ্য কর্মকর্তা ছিলেন। ইংরেজ আমলের তৈরী (১৯৩৭ খ্রীঃ) এডোয়ার্ড সেভেন মেমোরিয়াল টাউন হলের নাম স্বাধীনতার পর রাখা হয়েছে বিপিন বিহারী ঘোষ মেমোরিয়াল টাউন হল।

ভূপেন্দ্রনাথ ঝা ঃ

ইংরেজবাজার বাঙ্গীটোলা গ্রামের ভূপনদ্রনাথ ঝা ও ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের এক একনিষ্ঠ সৈনিক। আইন আমান্য ও ভারতছাড়ো আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলেন। স্বাধীনতার লড়াই এ অংশগ্রহন করতে গিয়ে বার বার কারা বরন করে দীর্ঘ বন্দী জীবন করেন।

কৃষ্ণগোপাল সেন ঃ

অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে পুরাতন মালদহ জেলার বাচামারী গ্রামের কৃষ্ণগোপাল সেনের নামও জড়িয়ে আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলা কর্মী হিসাবে যার নাম জড়িয়ে রয়েছে সেই তরুবালা সেন তাঁর সহধর্মিনী ছিলেন।

প্রিয়নাথ সেন ঃ

অখন্ড মালদহ জেলার গোমস্তাপুর থানার মেহেরপুর গ্রামের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারর সন্তান প্রিয়নাথ সেন ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের একজন অক্লান্ত সৈনিক। ১৯১৬ সালে মালদহ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নবীন বসু নিহত হন ঐ বছর তিনি জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। অসহযোগ আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তিনি এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার হন। হিজলি জেল সহ দেশের নানা জেলে তিনি দীর্ঘ বন্দিজীবন কাটান।

গিরিজা মুখার্জী ঃ

গিরিজা মুখার্জী ছিলেন অসযোগ আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি মালদহ জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। যতদূর সম্ভব স্বাধীনতার কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তাঁকে জেলা স্কুল ছাড়তে হয়। তিনি চাঁচল সিদ্ধেশ্বরীতে ভর্তি হন, এবং বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ খ্রীঃ সবার অলক্ষ্যে তিনি ইংলন্ডে চলে যান সেখান থেকেই স্বাধীনতার কাজকর্ম চালাতে থাকেন। ১৯৩১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে যোগ দেন। অথচ তিনি একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী ছিলেন একথাও খুব জোড় দিয়ে বলা যাবে না। কারণ এরপর ১৯৪১ খ্রীঃ সুভাষচন্দ্র বসু সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে

বার্লিনে উপস্থিত হলে এই গিরিজা মুখার্জীই নিজস্ব উদ্যোগে হিটলারের সঙ্গে নেতাজীর যোগাযোগ করিয়ে দেন।

সরযুপ্রসাদ বিহানী ঃ

রাজপুতানা থেকে মালদহে এসেছিলেন রেশম এর ব্যবসা করবেন বলে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নিজস্ব বুদ্ধি ও পরিশ্রমে এই ব্যবসার সাহায্যেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু এইটেই তার যথার্থ পরিচয় নয়। তিনি আন্তরিক ভাবে ছিলেন গান্ধীপন্থী। তিনি মালদহ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। খদ্দর শিল্পের উন্নতি করণের পাশাপাশি বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯২২ সালে তাঁর নেতৃত্বে গান্ধী হিন্দু ধর্মশালা নির্মিত হয়।

প্রিয়নাথ ঘোষ ঃ

মালদহ জেলার সিংহাবাদে (?) প্রিয়নাথ ঘোষ জন্মগ্রহন করেন। পিতার নাম শিবচন্দ্র ঘোষ, মাতা দ্রবময়ী ঘোষ। ১৯১৬ সালে মালদহ জেলা স্কুল থেকে মাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ সালেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ইংরেজ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল এবং হিজলী জেলে দীর্ঘদিন বন্দী থাকেন। ছাড়া পেয়ে নিজের বাসগৃহে নজর বন্দী থাকেন আরও মাস ছয়েক। পরবর্তী কালে গান্ধীজীর আদর্শে বহুমূখী উন্নয়নমূলক কাজের সাথেও যুক্ত হন। দেশ বিভাগের পর ইংরেজবাজার থানার পুড়াটুলীতে বসবাস করেন। সেখানে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়া আরও অনেক অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। একাধিক পুস্করিনী সংস্কার করেন।

সুধারানী মিশ্র ঃ

বহরমপুর গোরাবাজারে ১৯০১ সালে জন্ম গ্রহন করেন সুধারানী মিশ্র। পিতা পূর্ণচন্দ্র দোবে, মাতা ভবভাবিনী দোবে। ১৯১৩ সালে তাঁর বিবাহ হয় শেরশাহীর রক্ষণশীল জমিদার হরেন্দ্রনাথ অগস্থী চৌধুরীর সঙ্গে, ১৯২০ সালে তিনি বিধবা হন। জমিদারী দেখাশোনার ভার তখন থেকেই তার উপর পড়ে। তখন থেকেই শেরশাহীর বাড়ীতে তিনি মেয়েদের নিয়ে চরকা কাটা, কাঁথা তৈরী করা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করতেন। এই সময়েই তাঁর বাড়ীতে আসত দেবেন ঝা, অতুল কুমার, সম্বল সান্যাল, নলিনাক্ষ সান্যাল, সুশীল ধারা, প্রফুল্ল ঘোষ, রেজাউল করিম, নির্মল চন্দ্র চন্দ্র, বিজয় সিং নাহার, অতুল্য ঘোষ, রেনুকা রায় ইত্যাদি কংগ্রেস নেতারা, বসত কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের গোপন বৈঠক ১৯৩৭ সালে নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ এই শেরশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলে যে সঙ্ঘকে বে আইনি বলে ঘোষনা করা হয়। শেরশাহীতে তিনি 'দেবী চৌধুরানী' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইংরেজদের অত্যাচার উপেক্ষা করেও বিভিন্ন সময়ে বিপ্লবীদের নিজ গৃহে আশ্রয় দিতেন। ৭২ বৎসর বয়সে এই তেজস্বিনী মহিলার জীবনাবসান হয়।

দেবেন ঝা ঃ

১৮৮৯ খ্রীঃ বিহার প্রদেশের মানভূম জেলার হটমুড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

পিতার নাম মাধব ঝা, মাতার নাম সর্বদেব্যা ঝা। আনুমানিক ১৯০৭ - ১৯০৮ সাল থেকেই রাজনীতির সঙ্গে তার যোগাযোগ। আইন অমান্য ও ভারতছাড় আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত থাকার কারনে বহরমপুর ও রাজশাহী জেলে দীর্ঘদিন বন্দী ছিলেন। এরপর বাঁকুড়া জেলায় নজরবন্দীও ছিলেন কিছুদিন। দীর্ঘদিন তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মালদহ শাখার সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সংস্পর্শে ও অনুপ্রেরনায় ফরওয়ার্ড ব্লক দলে যেগাদান করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই দলের হয়েই কাজ করে গেছেন।

ভূপেন ঝা ঃ

মালদহ জেলার মানিকচক থানার ধরমপুর গ্রামে ভূপেন ঝা জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরিমোহন ঝা। পরে তিনি ইংরজবাজার থানার সিঙ্গাতলায় থাকতেন। তিনি নঘরিয়া হাইস্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯২১ সাল থেকেই রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন। অসহযোগ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ভারত ছাড় ইত্যাদি আন্দোলনের সঙ্গে সরাসবি যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের সংগঠন পরিচালনার কাজে তিনি মাঝে মাঝে ধরা পড়তেন মাঝে মাঝে আত্মগোপন করে থাকতেন। অন্যদিকে যাত্রাদল তৈরী এবং অভিনয়েও তার সাংঘাতিক আকর্ষণ ছিল। কিছু বই ও লেখেন। শেষ জীবনটা এই পরিশ্রমী এবং সৎ মানুষটার খুব একটা সুখে কাটে নি। তিনি গান্ধী ধর্মশালা রক্ষণের কাজ করতেন। ১৯৯০ সালের ২৫শে বৈশাখ দীর্ঘ রোগ ভোগের পর তিনি পরলোক গমন করেন।

হরিনন্দন ব্রহ্মচারী ঃ

হরিনন্দন ব্রহ্মচারী একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী কর্মী ছিলেন। তিনি গান্ধীজীর জীবন, বাণী ও আদর্শের কর্মপন্থা নিয়ে একাধিক পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন। আবার ৪২ এর আন্দোলনে হরিনন্দন ব্রহ্মচারী তার সহযোগী মুকুটধারী সিং হবিবপুর এলাকার সংগ্রামী মানুষদের নেতৃত্ব দিয়ে সিংহাবাদ স্টেশন পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই কাজে তাঁর সঙ্গী ছিলেন তিলাসনের সুখিত মন্ডল, মোহনাকান্দরের অমৃতলাল মিরধা, চকসপুর অঞ্চলের দুবাই পোলিয়া, সিংহাবাদের ছবিলাল সাহা, সুবোধ পান্ডে, ন্যাংরা তুরী, তারাপদ শীল, খোকা দাস, চান্দা চৌধুরী, আশুতোষ রায়, ধনঞ্জয় চৌধুরী, যুধিষ্ঠির রায়, হরিপদ সরকার, বাঘা দাস, রাধাগোবিন্দ সরকার, শ্যামসন্তোষ রায়, হরিপদ সরকার ইত্যাদিরা। এদের প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। হরিন্দন ব্রহ্মচারী এক বছর নয় মাস রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে বন্দী থাকেন।

বলদেবানন্দ গিরি ঃ

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ না থাকলেও তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। বলদেবান্দ গিরি ছিলেন যদুনন্দন গিরির শিষ্য। মালদহের বিখ্যাত জাহাজবাড়ি-র যা একাধিক স্বনামধন্য ব্যক্তির পদস্পর্শে গৌরবান্বিত তিনি তার মালিক ছিলেন। পরে অবশ্য সেটি তার কাছে থেকে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। এই বাড়ির একতলায় তিনি গুরুদেবের নামানুসারে 'যদুনন্দন মহাকালী পাঠাশালা' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই বাড়িটি কংগ্রেস কর্মীদের আশ্রয় স্থলও ছিল।

রামহরি রায় ঃ

১৯১৪ সালে (১৯০৬) রামহরি রায় পশ্চিম দিনাজপুর জেলার পোরসা থানার আইহাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানার জমিদার বংশের সন্তান। ছাত্রাবস্থায় তিনি ১৯৩১ সালে লবণ আইন আন্দোলনে যোগ দেন। তারপর এই সংগ্রাম তাঁর চলেছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ৪২ এর ভারতছাড় আন্দোলনের মালদা শাখা পরিচালনার দায়িত্ব ছিল এই রামহরি রায়ের উপর। হরিশ্চন্দ্রপুরের তরুনেরা যেমন ব্যোমকেশ রায়, রমাপ্রসন্ন রায়, জগদীন্দ্রনাথ মিশ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ মিশ্র, গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেক তরুণ তখন রামহরি রায়ের নেতৃত্বে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এরা প্রায় প্রত্যেকেই ধরা পড়েন এবং রামহরি রায়ের এক বছরের জেল হয়েছিল। এরপর ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি পরাজিত হলে পুরোপুরি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তখন তিনি জেলা কংগ্রোসের সভাপতি ছিলেন। জেলার সমবায় সমিতি গড়ে ওঠার পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এই সমবায়ের কাজেই তিনি কলকাতায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেই অবস্থায় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। এরপর ১৯৬৬ সালের ২৬শে জানুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন। উল্লেখযোগ্য যে তাঁর স্ত্রী উমা রায় ও ছিলেন একজন একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী।

সুরেন্দ্র বালা রায় ঃ

১৯০১ সালে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে শ্রীযুক্তা সুরেন্দ্র বালা রায়ের জন্ম হয়। পিতার নাম মোহিনী মোহন মিশ্র। বিবাহ হয় দিনাজপুর জেলার দ্যুতিধর রায় এর সঙ্গে। শ্বশুর বাড়ীতে দ্যুতিধর রায়ের কাছেই স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তখন থেকেই বিলিতি শাড়ী বর্জন করে বঙ্গ লক্ষী মিলের মোটা শাড়ী পড়তে শুরু করেন। তখন থেকেই স্বামীর অনুপ্রেরনায় আশপাশের গ্রামের আদিবাসী সাঁওতাল পোলিয়া প্রভৃতি মেয়েদের জড়ো করে তাদের মধ্যে স্বাধীনতার অর্থ বোঝাতে থাকেন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহন করতে থাকেন। প্রথাগত কোনওরকম শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারন। সভা সমিতিতে তাঁর সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত, আন্তরিকতাপূর্ণ অথচ স্বাভাবিক তেজস্বিতা সাধারন মানুষকে মুগ্ধ করত। ১৯৩০ সালের পত্নীতলা থানার কংগ্রেস অফিস দখল এবং পতাকা উত্তোলন সংক্রান্ত আইন অমান্য করার জন্য আদিবাসী প্রায় দু হাজার মেয়েদের নিয়ে জেলে যান। বালুরঘাট থানায় তাঁরা বন্দী থাকেন। ছাড়া পেয়ে আবার কংগ্রেস অফিস দখল করতে যান, এবারের বিচারে সুরেন্দ্রবালার এক বছরের জেল হয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে মালদহ জেলার সঙ্গেই তার সম্পর্ক ছিল বেশি। এরপর একের পর এক পারিবারিক ও শারীরিক দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করে ১৯৭৩ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ঃ

পন্ডিত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ১২৯১ সালের ১৪ই কার্ত্তিক পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কাওয়াখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম যাদবচন্দ্র শিরোরত্ন, মাতার নাম বরদা দেবী। পন্ডিত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ছিলেন কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী তথা সিরাজগঞ্জ ও মালদহ জেলা কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি। মালদহ জেলা কৃষক প্রজা মজদুর

পার্টির সভাপতি। কিন্তু এই পন্ডিত ব্যক্তির কৃতিত্ব কেবল কংগ্রেস কর্মী হিসাবে কার্যকলাপেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মালদহের মানুষ তাঁকে মনে রাখবে একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা হিসাবে, নিপীড়িত মানুষের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে। তাঁর লেখা 'জাতিভেদ' বইখানি পড়ে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন 'সিরাজগঞ্জে যদি যান 'জাতিভেদ' বইখানির রচয়িতা দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিবেন। তিনি ভীমরুলের চাকে বসেই ভীমরুলের দলকে খোঁচা দিচ্ছেন, এটা বড় সহজ কাজ নয়। কলিকাতায় বসে সমাজ সংস্কারের কথা বলা সহজ, কিন্তু পল্লী সমাজের বুকে বসে সমাজকে ঘা দেওয়া কঠিন, তিনি তাই করেছেন''। তিনি প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থ প্রণেতা হলেও এই একখানি বই এর বিষয় গভীরতা তৎকালীন শিক্ষিত জনমানসকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিল। তাঁর সমগ্র জীবন ধরে তিনি নিপীড়িত জনগণকে পুনরায় স্বশক্তিতে স্বশক্তিমান হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন এইজন্য তিনি মালদহের মানুষের কাছে শ্রদ্ধাবহ হয়ে থাকবেন চিরদিন।

মালদহ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অতুল চন্দ্র কুমার এক উজ্জ্বল নাম। ভারতবর্ষের এই প্রত্যন্ত জেলায় থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজকে ত্বরান্বিত করার কাজে তাঁর অনলস প্রয়াস দেশের মানুষ চিরদিন মনে রাখবে। অতুলচন্দ্র কুমার ১৩১১ সালের ২১শে চৈত্র (ইং ১৯০৫, এপ্রিল) মালদহ জেলার আড়াইডাঙ্গা গ্রামে এক মৈথিল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। পিতার নাম শ্রী দীননাথ কুমার, মাতা ক্যাতায়নী দেবী। অতুল চন্দ্র ১৯২৩ সালে মালদহ জিলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর আগেই অর্থাৎ ১৯২১ সাল থেকেই তিনি মহাত্মাগান্ধীর অহসযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন। তিনি কলেজে এসে ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সরোজিনী নাইডু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৯ সালে গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন মালদহে এলে অতুলচন্দ্র সেই অনুষ্ঠান বয়কট করার নেতৃত্ব দেন ফলে প্রথমবার তিনি কারারুদ্ধ হন। পরে স্ট্যানলি বহরমপুর গেলে তিনি তাঁকে জুতো ছুড়ে মারেন। এরফলে অতুলচন্দ্রকে বহরমপুর কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর তিনি আশুতোষ কলেজ এবং বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩০ সালে তিনি মালদহ জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক থাকাকালীন লবন সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দেন। ফলে এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড হয় তার। ছাড়া পেয়ে আবার সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে তিনি ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। এরপর ১৯৩১-৩২ সালে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময়ে আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে পুনরায় তিনি বন্দী হন। তাকে ফরিদপুর কালকিনিতে নজরবন্দী রাখা হয়, মুক্তি পেয়ে আবার বন্দী হন এবারও দীর্ঘদিন নজর বন্দী থাকেন রাজনগর ও রামপুর হাটে। ১৯৩৮ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস ছেড়ে একটি নতুন বামপন্থী দল গঠন করলে অতুলচন্দ্র কুমারের আহ্বানে তিনি মালদহে আসেন এবং নঘরিয়া গ্রামের জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অতুল চন্দ্র এই সময় ফরোয়ার্ড ব্লক এ যোগদান করলে নেতাজী স্বহস্তে তাকে একটি প্রীতিজ্ঞাপক গুরুত্বপূর্ণ পত্র দেন। নেতাজীর দেশত্যাগের পর ১৯৮২ সালে এ.কে.ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর নেতৃত্বে প্রগতিশীল কোয়ালিশন দল গঠিত হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত

এইভাবে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজ গ্রামে ''দীননাথ ভোলানাথ মডেল একাডেমি হাইস্কুল'' ও 'দীননাথ দাতব্য চিকিৎসালয়' তৈরী করেন। দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতির মূল সংগঠক ও তিনি ছিলেন। আড়াইডাঙা গ্রামে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজেও তার অবদান কম নয়। এছাড়া 'মিথিলা ইন ইন্ডিয়া' নামে একটি বইও রচনা করেন যেটির রচনায় সহায়তা করেন আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহেরু রুশ নেতা ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিনকে ঐ পুস্তক তিনি উপহার দেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় ও কর্মসঙ্গী এই মানুষটি ১৯৬৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় পরলোক গমন করেন। অতুল চন্দ্রের সহধর্মিনী শ্রীমতি বিজলী প্রভা দেবীও তাঁর স্বামীর অনুপ্রেরনায় দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

কৃষ্ণজীবন সান্যাল ঃ

ফরিদপুর জেলার কোটালীপালা গ্রামে কৃষ্ণজীবন সান্যাল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জগবন্ধু আচার্য মাতার নাম শচীদেবী। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল জীবন কৃষ্ণ সান্যাল, তিনি মালদহ জেলা স্কুলে পাঠরত অবস্থায় 'বন্দেমাতরম' গান করার জন্য স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন, তারপর বিহারের গিরিডির হাইস্কুলে কৃষ্ণজীবন নাম নিয়ে ভর্তি হন। সেইখানে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় বারীন্দ্র কুমার ঘোষের অনুপ্রেরনায় বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। এরপর ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে ঘটল সেই বিখ্যাত ঘটনা। বাঙলার দুই দামাল কিশোর ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর নিক্ষিপ্ত বোমায় নিহত হল দুজন ইংরেজ। এই ঘটনার জেরে ২রা মে কলকাতার সন্দেহ জনক স্বদেশী আন্দোলনেব আড্ডাগুলি পুলিশ ভেঙে দিল। ১৫নং গোপীকৃষ্ণ লেন, ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড এবং ৩৮/৪ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট থেকে প্রায় ৪১ জনকে গ্রেপ্তার করা হল। খানা তল্লাসীর সময় বহু জিনিসের মধ্যে একটি স্যুটকেশে কৃষ্ণজীবন সান্যালের নাম লেখা একটি গীতা, বোমা তৈরী সম্বন্ধে একটি পুস্তক এবং অন্যান্য জিনিস পাওয়া যায়। পুলিশ তখন কানসাটের বাড়ী থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত করে। বিখ্যাত এই মামলায় ৬/৭ জনের ফাঁসী এবং ১০/১২ জনের দ্বীপান্তরের আদেশ হয়েছিল। কৃষ্ণজীবনের বয়স তখন যেহেতু ১৬ বৎসর ছিল সেইজন্য তাঁকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এই রায়ের বিরূদ্ধে চিত্তরঞ্জন দাশ হাইকোর্টে আপীল করলে কৃষ্ণজীবন দুবছর পরই মুক্তি পান। এরপর গান্ধীজীর ডাকে খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করেন। তারপর চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহেরুর স্বরাজ পার্টিতে যোগদান করেন। আজীবন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজশাহীতে মামলা করতে গিয়ে পায়ে সেপ্‌টিক হয়ে তিনি মারা যান ১৯২৬ সালে।

সতীশ চাঁদ আগরওয়ালা ঃ

১৮৮৭ খ্রীঃ পুরাতন মালদার সর্বরী গ্রামে সতীশ চাঁদ আগরওয়ালা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তরুন বয়স থেকেই স্বাধীনতা সচেতন ছিলেন। তাই ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব শ্যালক বাসুদেব সাটিয়ারের উপর ন্যস্ত করে নিজে গান্ধীজীর আদর্শে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। এরপর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন।

নানাবিধ কুসংস্কার রোধ, বাল্য বিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, অস্পৃশ্যতা বর্জন, স্কুল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি জনহিতকর কাজের সঙ্গে তিনি সবসময় অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় ইংরেজদের অত্যাচারের হাত বাঁচাতে তৎকালীন বিপ্লবীদের তিনি নিজ গৃহে আশ্রয় এবং খাদ্য এবং অর্থ দিয়েও সাহায্য করতেন। দানশীল, মহান সতীশ চাঁদ আগরওয়াল ১৯৫৫ সালের ৬ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন।

রমেশচন্দ্র বাগচী ঃ

মালদহের চাঁপাই নবাবগঞ্জের অধিবাসী ও সেখানকার বিখ্যাত আইনজীবী রমেশচন্দ্র বাগচী ১৯২৬ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯২৭ সালে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। একসময় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন।

শান্তি গোপাল সেন ঃ

১৯১৬ খ্রীঃ ২৫ শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরে শান্তিগোপাল সেনের জন্ম হয়। পিতা নরেন্দ্র নাথ সেন বিখ্যাত আইন জীবী ও মাতা সুশীলা সুন্দরী। পারিবারিক কারনে খুব অল্প বয়সেই মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, শওকত আলী, কাজী নজরুল ইসলাম, শচীনদেব বর্মন, ত্রিপুরা সেন, সরোজ গুহ, অলোকনাথ বল ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে মনের ভিতর দেশাত্মবোধের চেতনা জন্মেছিল।

পিতার মৃত্যুর পর ১৯২৮ সালে তিনি মালদহে আসেন এবং পিতৃব্য এর গৃহে থেকে মালদহ জেলা স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখান থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে মেদিনীপুর কলেজে ভর্তি হন।

শান্তি সেন নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকেই গোপনে বি.ভি. বা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স -এ যোগ দেন। মেদিনিপুরে সেই সময় শহীদ দীনেশ গুপ্তের নেতৃত্বে এই সংগঠন অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। পর পর তিনজন অত্যাচারী জেলা ম্যাজিস্টেট বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ দেন। এরা হলেন মিঃ জেমস্ পেডি, মিঃ ডগলাস এবং ১৯৩৩ এ ২রা সেপ্টেম্বর মিঃ বার্জ। শান্তিগোপাল সেন এই বার্জ হত্যার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। চারমাস পলাতক জীবন যাপনের পর কলকাতায় তিনি ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর ফাঁসীর আদেশ হয় কিন্তু ১৮ বছর বয়স না হওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়। দীর্ঘ ১৪ বছর ৮ মাস চরম যন্ত্রনাদায়ক কারাবাস করে স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই দীর্ঘ কারাবাসের অনেকটাই তাঁর কেটেছে আন্দামানের সেলুলার জেলে।

১৯৪৯ সালে তিনি স্থায়ী ভাবে মালদহে চলে আসেন ১৯৫০ সালে জাতীয় কংগ্রেসের মালদা জেলার সভাপতি নির্বাচিত হয। ১৯৫৫ সালে মালদহে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হন। ইউ.এন.ডেবর লালবাহাদুর শাস্ত্রি, অতুল্য ঘোষ সহ বিশিষ্ট কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই সম্মেলনে যোগ দেন। শান্তি সেন এই সম্মেলন এর অভ্যর্থনা সমিতির সাধারন সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৭ থেকে পরপর তিনবার তিনি ইংরেজবাজার বিধানসভাকেন্দ্র থেকে বিধায়ক

নির্বাচিত হন। বিধায়ক থাকাকালীন তিনি বি.এ.পাশ করেন। এরপর তিনি 'জাতীয় কল্যাণ কর্ম পরিষদ' সংস্থা গঠন করে এই পিছিয়ে পড়া জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর ধ্যান জ্ঞান ছিল তাঁর নিজে হাতে গড়া মালদা উচ্চবালিকা বিদ্যালয়। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, মহিলা মহাবিদ্যালয়, প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ। মালদা পলিটেকনিক, রাষ্ট্রীয় শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, শোভানগর বেসিক ট্রেনিং স্কুল, চিন্তামণি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতিও ছিলেন।

১৯৯৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ইংরেজবাজার সিঙ্গাতলার নিজ বাসভবনে তিনি পরলোক গমন করেন।

উপেন্দ্র নারায়ণ গুহ :

উপেন্দ্র নারায়ণ গুহ ১৯০৭ সালের ১লা মার্চ পাবনা জেলার হাসামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গোবিন্দ চন্দ্র গুহ। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও কোন চাকুরী না পেয়ে ১৯২৭ সালের ১ লা মার্চ বার্মা সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে চলে যান। ১৯৪৩ সালের ১লা আগষ্ট রেঙ্গুনে নেতাজীর আহ্বানে চাকরী ছেড়ে দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের দলে যোগদান করেন। এরপর ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে কুমারপুর গ্রামেই বসবাস করতে থাকেন। পরে তিনি পুরাতন মালদহে স্থায়ী বসবাস নির্মান করেন। ১৯৫২ সালের শেষ দিকে স্বল্প মাইনের সহকারী শিক্ষকের পদে গনসাঁকরোল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দেন। এবং ১৯৭২ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগষ্ট তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ তিনি বিশ্বাস করতেন না। কারণ এই সময়ের পরও নেতাজীর অনেক গোপন সংবাদ তিনি জানতেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের একনিষ্ঠ দেশ সেবক, আদর্শ শিক্ষক উপেন্দ্র নাথ গুহ মহাশয় ১৯৭৮ সালের ৭ ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন।

হংসগোপাল আগরওয়ালা :

আনুমানিক ১৮৮৭ খ্রীঃ মালদহের সর্বরী গ্রামে হংসগোপাল আগরওয়ালা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মধুসূদন দাস ও মাতা কৃষ্ণকামিনী দেবী। এই হংসগোপাল ব্যরিষ্টার প্রথম নাথ মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (১৯০২) অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তিনি রাজশাহীতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে চট্টগ্রামে পলায়ন করেন। সেখানেই এন্ট্র্যান্স পরীক্ষার সময় লক্ষ্য করেন পুলিশ তাঁর খোজ করছে। তিনি মনস্থির করে ফেলেন এবং তখনই ডেস্কে হাতঘড়ি ও কলম রেখে পরীক্ষার হল থেকে পালিয়ে যান। তাঁর সুদীর্ঘ বিপ্লবী জীবনে তিনি বহুবার কারাজীবন যাপন করেছেন। মালদহ, রাজশাহী, শান্তিপুর, বহরমপুর প্রভৃতি জেলে তিনি একাধিকবার গেছেন। বন্দী জীবনের মেয়াদ শেষ হতেই আবার বিপ্লবী জীবন। তাঁর দীর্ঘ কারাবাস হয়েছিল ১৯৩২ সালে। এইসময় তিনি রাজশাহী জেলে প্রেরিত হন এবং ১৯৩৮ সালে মুক্তি পান। এরপর তাঁকে আর পুলিশ বন্দী করতে পারে নি।

কারণ বিভিন্ন জায়গায় তিনি বিভিন্ন ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। আজন্ম বিপ্লবী হংসগোপাল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে দেশমাতৃকার জন্য উৎসর্গকৃত মনে করতেন।

বিপ্লবী হরিমোহন ঃ

১৮৯৬ সালে ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত নঘরিয়া গ্রামে হরিমোহন ঝা জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামগোবিন্দ ঝা ছিলেন এই গ্রামেরই একজন বড় জোতদার। গ্রামের পাঠশালার পাঠ সমাপন করে হরিমোহন মালদা জিলা স্কুলে আসেন পড়াশুনা করার জন্য। এইখানেই তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক সতীশ পাকড়াশীর সংস্পর্শে আসেন। সতীশ পাকড়াশী তখন মকদুমপুরের এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কম্পাউন্ডারের ছদ্মবেশে থাকতেন। তিনিই এখানকার সংগঠন গড়ার দায়িত্ব দেন তরুন হরিমোহনের উপর। অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে সেই গুরুদায়িত্ব তিনি পালন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর সঙ্গী ছিল মেজ ভাই মনমোহন, চৌকির কুমুদ ঝা, ধরমপুরের সতীশ ঝা, ও বাঙ্গীটোলার ফনীভূষণ আচার্য। এর কিছুদিনের মধ্যেই জিলা স্কুলের হেডমাস্টার নবীন বসু হত্যার ঘটনা। সন্দেহের তালিকায় চলে এলেন হরিমোহন। তারপর থেকে হরিমোহন ও সতীশ পাকড়াশী পলাতক। প্রায় একবছর পর পুলিশ তাকে বহরমপুর থেকে গ্রেপ্তার করে এবং বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করে। দীর্ঘদিন পর তিনি ছাড়া পান, আরও দীর্ঘদিন তাঁকে নজর বন্দী করে রাখা হয়। এরপর তিনি বিবাহ করেন। মথুরাপুরের হেনসি সাহেবের কুঠিতে ম্যানেজারের পদে কিছুদিন কাজ করেন, কিছুদিন করেন কোতুয়ালীর জমিদারের সেরেস্তার কাজ। সক্রিয় রাজনীতি থেকে তিনি সরে আসলেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বামপন্থী কর্মপন্থাকে সমর্থন করে গেছেন। ১৯৪৮ সালের ৩১ শে জানুয়ারী বিপ্লবী হরিমোহনের জীবনাবসান ঘটে।

প্রমথ নাথ সাহা ঃ

চাঁপাই নবাবগঞ্জ থানার কালীনগর গ্রামে প্রমথনাথ সাহা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৩ সালে অনুশীলন পাটির সদস্য হন। ১৯৩৫ সাল থেকেই নজরবন্দী। এরই মধ্যে চলতে থাকে সরকার বিরোধী কাজ। ১৯৩৯ সালে তিনি আবার গৃহবন্দী হন। দুবছর গৃহবন্দী থাকার পর সরকার তাঁর বিরূদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে, তিনি ত্রিদিব চৌধুরী, রবি সেন, নরেন দাস ও শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে মিলে বৃটিশ সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। সুতরাং আবার কারাবাস। দীর্ঘ জেল জীবন কাটিয়ে তিনি মুক্তি পান। এরপর তিনি আমৃত্যু অর.এস.পি. সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ফনী গোঁসাই ঃ

প্রখ্যাত আইনজীবী কৃষ্ণশশী গোস্বামীর পুত্র ছিলেন ফনী গোঁসাই। অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের তিনি একজন ছিলেন। কুখ্যাত আই.বি. ইন্সপেক্টর বঙ্কিম ব্যানার্জীর সর্তক দৃষ্টি ছিল এই ফনী গোঁসাই-এর উপর, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে মাঝে মধ্যেই তাই তিনি চড়াও হতেন এই বিপ্লবীর উপর। বঙ্গিম ব্যানার্জীর অত্যাচার তথা মানসিক স্নায়ুর চাপ সইতে না পেরে তিনি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

মনি গোঁসাই ঃ

ফনী গোঁসাই-এর বড়ভাই ছিলেন মনি গোঁসাই। তিনি অনুশীলন দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনিও দীর্ঘকাল জেলে ছিলেন। ১৯৩৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে আসেন। ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু মালদহে এলে তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ১৯৪২ এর 'ভাবত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে আবার দীর্ঘকাল জেল খাটেন। পরে মুক্তিলাভ করে আর রাজনীতিতে ফিরে যান নি।

নরেন চক্রবর্তী ঃ

মালদহ জেলা স্কুলের শিক্ষক ইচ্ছামোহন চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র নরেন চক্রবর্তী। বিপ্লবী মতিলাল বিহানীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে তিনি বিপ্লবী দলের সদস্য হন এবং ১৯৩২ সালে বাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অজুহাতে তিনি বন্দী হন। জেলের মধ্যে থেকেই তিনি কমিউনিষ্ট মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হন। দীর্ঘকাল বাদে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি মালদহ জেলায় বামপন্থী সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তখন সরাসরি বামপন্থী আন্দোলন চালানোর কাজে অসুবিধা থাকার কাবণে তিনি কংগ্রস মঞ্চ থেকেই পার্টির কাজকর্ম চালাতেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন সুভাষচন্দ্র বসু মালদহে আসেন তখন তিনি মালদহ জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন এবং সে দায়িত্ব ১৯৪২ সাল পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন।

হরিনারায়ণ দাস ঃ

পুরাতন মালদহের অত্যন্ত গোঁড়া ধর্মভীরু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হরিনারায়ণ দাস। এই পবিবারের একমাত্র পুত্র ছিলেন তিনি। উত্তরবঙ্গের বন্যার জন্য 'গণভিক্ষায়' গিযে অনুশীলন পার্টির সদস্য হয়ে যান। এরপর ১৯৩৩ সালে হিলিতে ট্রেন ডাকাতি হয়। সমগ্র উত্তরবাংলা জুড়ে খানাতল্লাসীব ফলে বহু যুবক গ্রেপ্তার হন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হরিনারায়ণ দাস। দীর্ঘ বন্দী জীবন কাটিয়ে তিনি ১৯৪০ সালে মুক্তি পান। এরপর নজরবন্দী অবস্থাতেও কেটেছে অনেকদিন। কারা জীবনেই তিনি বামপন্থী মতবাদে দীক্ষিত হন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই মতবাদেই বিশ্বাস করতেন।

ধরণীধর সরকার ঃ

আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল জেলার সদর কাছারিতে। খালি গায়ে রাস্তায় শুয়ে পড়ে কাছারিতে প্রবেশ ইচ্ছুকদের যারা বাধা দিচ্ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন ধরণীধর সরকার। বৃটিশ পুলিশের পায়েব তলায় নিষ্পেষিত হয়েও তিনি নিজের স্থান ত্যাগ করেন নি। ফলে গ্রেপ্তাব হন তিনি। দীর্ঘ বন্দী জীবন কাটিয়ে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু অন্তরীণ থাকাকালীনই দীক্ষিত হন কমিউনিষ্ট মতবাদে। পরে এই মতাদর্শেই নিষ্ঠাবান থেকেছেন আজীবন এবং অবিভক্ত সি.পি.আই. পার্টি সংগঠনে মনোনিবেশ করেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

ক্ষিতীশচন্দ্র দাস ঃ

১৯২১ সালে নঘরিয়ায় যতীন্দ্রনাথ সিংহ তাঁর কয়েকজন অনুগতকে নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র দাস। ১৯৩০ সালের আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। ফলে দীর্ঘ কারাজীবন ভোগ করেন। দীর্ঘকাল নজরবন্দীও ছিলেন। এই সময় থেকেই বামপন্থী মতাদর্শের তিনি অনুগামী হন। অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই মতাদর্শেই ছিলেন দায়বদ্ধ।

সুবোধ কুমার মিশ্র ঃ

১৯০৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পিপ্‌লা গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে সুবোধ কুমার মিশ্রর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর জমিদারী সেরেস্তার একজন সাধারণ কর্মচারী। সুবোধ কুমার লালগোলা হাইস্কুল থেকে মাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর ভাগলপুর টি. এন. বি. কলেজে। বি. এ. পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর তিনি রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণ করেন। তারপর থেকে রাজনীতি তথা পরাধীনতা থেকে দেশের মুক্তিই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সুবোধ কুমার মিশ্র অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। আন্দোলনকে জোরালো ও ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে সাধারণ মানুষই শুধু নয়, কৃষকদেরও সংগঠিত করেন। সংগঠিত এই আন্দোলন হরিশ্চন্দ্রপুর ও রতুয়া থানার কিছু অংশে চরম আকার ধারণ করে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা অবরোধ করা হয়। ব্রিটিশ ফৌজ যাতে উচ্চমহলের সাথে যোগাযোগ করতে না পারে তার জন্য টেলিগ্রাফের তার কেটে, রেললাইন উপড়ে ফেলা হয়। সুবোধ কুমারের নেতৃত্বে প্রায় চার-পাঁচ হাজার কর্মী এই আন্দোলনে যোগ দেন। জেলা সদর থেকে পুলিশ ফৌজ পাঠিয়ে আন্দোলনকারী বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সুবোধ মিশ্র চার পাঁচ দিন আত্মগোপন করে থাকার পর পুলিশের হাতে ধরা পড়েন, বিচারে তার ৬ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

শুধু সাম্রাজ্যবাদী শোষনের বিরুদ্ধে তিনি সক্রিয় ছিলেন না, সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সমান সরব। সেই সময় (অর্থাৎ ১৯৪৫-৪৬ সালে) জমিদারী শাসনব্যবস্থায় হরিশ্চন্দ্রপুর ও ভালুকার জমিদাররা আশেপাশের বহু গ্রামে পাইক ও পেয়াদা পাঠিয়ে কৃষকদের উপর অত্যাচার চালাত, তাদের জমি কেড়ে নিয়ে তাদের জমি থেকে উৎখাত করত। সুবোধ কুমার এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেও আন্দোলন সংগঠিত করেন। তাঁর প্রেরণায় ও উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে কৃষকেরা পাইকারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কাশিমপুর, পিপলা, বারডাঙ্গী, হলদীবাড়ী, বাংরুয়া প্রভৃতি বহু গ্রামের কৃষকেরা পাইকারদের হাত থেকে ৬/৭ বিঘা করে জমি উদ্ধার করে। জমি উদ্ধারকারী এই কৃষকেরা তখন 'পাইকা' নামে পরিচিত ছিল। 'পাইকা' সফল হওয়ায় তিনি সেই অঞ্চলের একজন নেতা হিসাবে পরিচিত হন। এরপর 'জমিদারী প্রথা বিলোপ' এই আইন পাশ হওয়ার দিন সুবোধ কুমারের নেতৃত্বে ৭/৮ হাজার কৃষকের এক বিজয় মিছিল হরিশ্চন্দ্রপুর পরিক্রমা করে।

স্বাধীনতা লাভের পর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। ১৯৫১ সালে সোসালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন, জয়প্রকাশ নারায়ণের 'সর্বোদয় আদর্শের' সঙ্গেও জড়িত হয়ে পড়েন ১৯৫৬ সালে। এরপর থেকে যতদিন বেচে ছিলেন গঠনমূলক কাজের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। তাঁর নিজের গ্রাম পিপ্‌লা পল্লীতে বহু শিক্ষাকেন্দ্র ও সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরী করেন, যেমন মাদার ট্রেনিং সেন্টার, বুনিয়াদী বিদ্যালয়, বালোয়ারী কেন্দ্র, হরিজন শিশু বিকাশ কেন্দ্র লাইব্রেরী, কাষ্ঠ শিল্প ও মৃৎশিল্প ইত্যাদি।

তিনি বিশ্বাস করতেন দেশের প্রকৃত স্বরাজ মানে পরাধীনতা থেকে মুক্তি নয়, দেশের মানুষের আর্থিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি। তার জন্য কৃষকদের চাষের জমি দিতে হবে এবং অন্যান্য সাধারন মানুষের জন্য চাই কুটির শিল্পের বিস্তার। আর এই দু'য়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষার বিকাশে তিনি কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থাকেই আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করেন।

দেশদরদী এই মানুষটি ১৯৮৪ সালের ২১শে সেপ্টে ম্বর তাঁর নিজের প্রিয় গ্রাম পিপ্‌লাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দেবেন সাহা ঃ

দেবেন সাহা ছিলেন মালদহ জেলার প্রথম দিককার ছাত্রনেতাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৩৭ সালে ছাত্র ফেডারেশন তৈরী হয়। তখন এই ফেডারেশনে প্রথম যে ৪ জন ছাত্র যোগ দিয়েছিল তাদের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ধীরেন মজুমদার মহাশয় স্কুল থেকে বহিস্কার করেন। এই সিদ্ধান্ত না মেনে নিয়ে এই ছাত্রদের বহিস্কারের প্রতিবাদে যে তীব্র আন্দোলন তৈরী হয় তারই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই দেবেন সাহা।

নেতাজী সুভাষ বসুর মালদহ আগমন অথবা নঘরিয়ার ঐতিহাসিক কৃষক সমাবেশ সবেতেই দেবেন সাহা তাঁর ছাত্রসাথীদের নিয়ে উপস্থিত হতেন।

এবপর তিনি ভারতের বে-আইনি কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে যুক্ত হন এবং গোপনে ছাত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময়ে তাঁর নেতৃত্বে মালদহের কৃষক সভা ২৪শে আগষ্ট এবং ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রসমাজ ২৯শে আগষ্ট বিশাল মিছিল করে। এই মিছিল থেকেই পুলিশ দেবেন সাহা সহ ৪ জন ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করে। ছয় মাস করে তাদের জেল হয়। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি বহরমপুর কৃষ্ণলাল কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানেও ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করার কাজে নিজেকে লিপ্ত রাখেন।

এরই সঙ্গে ছিল সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ। যেমন ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ খাদ্যাভাবের দিনে বহরমপুব গোরাবাজারে তাঁর নেতৃত্বে একটি লঙ্গরখানা চালু হয়। বহরমপুর জেলা সমাহর্তার কাছে ধর্না দিয়ে সস্তায় চাল বিক্রির ব্যবস্থা করা। আবার একই ভাবে ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের দিনে মিলিটারী ডাক্তাব রানের নেতৃত্বে খরবার মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এরপর দেবেন কৃষক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই সময় কৃষক সভা তোলা বন্ধ আন্দোলন শুরু করে। সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে তিনি পুরাতন মালদা ও গাজোলে প্রেরিত হন। তাঁর

নেতৃত্বে এই দুই অঞ্চলে আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে, পরে যা তেভাগা আন্দোলনের রূপ নেয়। নানা কারণে ব্রিটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। তবুও আপোষহীন দেবেন সাহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মালদহের কৃষক আন্দোলনের তিনিই ছিলেন সামনের সারিতে। ১৯৬৪ সালের ৪ঠা জুন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মহেন্দ্র দাস সরকার ঃ

১২৯৭ সনের ৯ই আষাঢ় মহেন্দ্রনাথ দাস জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কৃষ্ণজীবন সরকার, মাতা ইন্দ্রানী দাস সরকার। আলাল প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মালদহ জেলা স্কুলে ভর্তি হন। এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সারা জীবনে দৈব দুর্বিপাকের হাত থেকে তিনি আর নিস্তার পান নি। ঘটনাটি ঘটে তিনি মালদহ জেলা স্কুলে পড়াকালীন, তৎকালীন প্রধানশিক্ষক নবীন বোস মালদহ জেলার বিপ্লবীদের যাবতীয় সংবাদ প্রেরণ করতেন। ব্রিটিশ শাসকদের কাছে এইরকম একটি সংবাদের ভিত্তিতে জেলার বিপ্লবীগন তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। যথারীতি একদিন তিনি নিজের বিদ্যালয় চত্বরের মধ্যেই ছুরিকাহত হলেন। তরুন মহেন্দ্রনাথ দাস তখন ঐ পথেই বাড়ী ফিরছিলেন। প্রধান শিক্ষককে ঐ অবস্থায় দেখে তিনি প্রাণভয়ে ছুটে পালান। কিন্তু ততক্ষনে পুলিশ এসে গেছে। গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন মহেন্দ্রনাথ দাস। এই অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার মত কোন তথ্যপ্রমাণ দেখাতে না পেরে তার শাস্তি হয়। ১১ বছর তিনি আন্দামানের জেলে ছিলেন। এরপর আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। (১৯২৪)। পরে সিউড়ি জেলে থাকেন (১৯২৫-২৬)। পরে আবারও ১৯২৬ সালের নভেম্বরে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হন। তারপরে আবার হুগলি জেলে। ১৯২৭ এ মুক্তি পান। এতদিন ধরে শরীরের উপর অত্যাচার-অনাচারের ফলে ফুসফুসের ক্ষয়রোগ তাঁর শরীরে বাসা বাঁধে। ফলে মুক্তি পাওয়ার পর অসুস্থ শরীরে তাঁর নিজস্ব বাসভবন আলালেই তিনি থাকতেন। ১৯৪১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন।

নারায়ণ রায় ঃ

গোমস্তাপুর থানার মেহেরপুর গ্রামের নারায়ণ রায় ১৯৩০ সাল থেকেই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। ছিলেন ৪২-এর ভারতছাড় আন্দোলনেও। আত্মগোপন করে সারা মালদার গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই আন্দোলকে দৃঢ় ও মজবুত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন।

সৌরীন্দ্র মোহন মিশ্র ঃ

কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। সংগঠনকে জোরদার করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ১৯৪০-এ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগ দেন। এরপর ১৯৪২-এর ভারতছাড় আন্দোলনে যোগ দিয়ে অনেকদিন জেল খাটেন।

বীর বীরসা ওঁরাও ঃ

ইনি হরিশ্চন্দ্রপুরের অধিবাসী। আসল নাম বীরসা ওঁরাও। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর একনিষ্ঠতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর গ্রামবাসীরা তাঁকে বীর খেতাব দেন। ভারতছাড় আন্দোলনের তিনি

ছিলেন সক্রিয় কর্মী। সহকর্মীদের সাথে তিনিও ধরা পড়ে দু'বছর জেল খাটেন। স্বাধীনতার প্রথম বছর নির্বাচনে আদিবাসী সমাজের হয়ে সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে স্বজাতির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন।

এছাড়া হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামের কৃষক কর্মী রামলক্ষ্মণ পাসমান, এবং ভালুকা গ্রামের জ্যোতিষচন্দ্র সাহাও ভারতছাড় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে দুই বৎসরাধিককাল জেল খাটেন।

এই রকম আরো অনেক অখ্যাত বিখ্যাত স্বদেশীদের দেশমাতৃকার প্রতি অকৃত্রিম আন্তরিক ভালবাসার ফসলই আজকের স্বাধীনতা। আমাদের অজ্ঞতা এবং ঔদাসীন্যের ফলে এই রকম আরও অনেক আত্মত্যাগীদের নাম বিস্মৃতির অতলে আজ চলে গেছে। তবুও তাঁদের অস্তিত্ব এবং অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা স্বীকার করি।

● তথ্য সহায়তা

১ বৃহৎ বঙ্গ --- দীনেশ চন্দ্র সেন (১ম খণ্ড)।
২. বৃহৎ বঙ্গ --- দীনেশ চন্দ্র সেন (২য় খণ্ড)।
৩. বাংলায় মুসলীম অধিকারের আদিপর্ব --- সুখময় মুখোপাধ্যায়।
৪ বাংলা ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল --- সুখময় মুখোপাধ্যায়।
৫ গৌড়ের ইতিহাস --- রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
৬. গৌড় ও পাণ্ডুয়া --- শ্রীকালিপদ লাহিড়ী।
৭ গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ধারাস্নানে মালদহ --- সুধীর কুমার চক্রবর্ত্তী।
৮. বাঙ্গালীর ইতিহাস --- শ্রীনীহাররঞ্জন রায়।
৯. বাঙ্গালার ইতিহাস --- রমেশচন্দ্র মজুমদার (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড)।
১০ তবকাত-ই নাসিরী --- মীনহাজ-ই-সিরাজ।
১১ রিয়াজ-উস-সালাতীন --- গোলাম হোসেন।
১২ মালদা জেলার ইতিহাস --- ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ।
১৩. বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর বিবর্তন --- ডঃ অতুল সুর।
১৪ গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতিকথা --- এম. আবিদ আলি খান মালদহী।
১৫ বাংলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা --- এম এ. করিম (১ম, ২য় খণ্ড)
১৬ ইতিহাস ও সমাজ চিন্তা --- আহমদ শরীফ।
১৭ ইতিহাস ও ঐতিহাসিক --- মমতাজুর রহমান তরফদার।
১৮. বঙ্গ, বাঙ্গালী, বাঙ্গালীত্ব --- আহমদ শরীফ।
১৯. স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদহের অবদান --- ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ সম্পাদিত।
২০ বিনয় সরকারের বৈঠক --- ১ম, ২য় খণ্ড (সম্পাদিত)।
২১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস --- শ্রীসুকুমার সেন।
২২. মালদহ --- শ্রীসিদ্ধার্থ গুহ রায়।
২৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস --- ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৪. বাঙ্গালার ইতিহাস --- রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১ম, ২য় খণ্ড)।
২৫. গৌড় কথা --- অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়।
২৬ পুরাতন মালদার ইতিহাস --- ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ সম্পাদিত।

'মালদহ' স্থান নামের ইতিহাস অনুসন্ধান

আঞ্চলিক লোকজীবন ভিত্তিক ইতিহাস রচনায় স্থান নামচর্চা একটি অপরিহার্য উপাদান। কালে কালে, যুগে যুগে গড়ে ওঠা নামের প্রত্নফসিলের ভেতর থেকে প্রকৃত রহস্য উদ্ধার করা দুরূহ কাজ। কারণ স্থান নাম এই শাব্দিক পরিচিতির অন্দর মহলে বহুবিধ পরিবর্তন, রূপান্তর, এবং বিকৃতিকরণ রয়েছে। যদিও ভাষাবিজ্ঞানের সহায়তায় তার মূল অবয়বের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য শব্দের শব ব্যবচ্ছেদ তখনই অর্থবহ হয়ে উঠে যদি তাকে সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবন মুকুরে প্রতিফলিত করা যায়, ভূমি পরিবেশ এবং অন্যান্য ইতিকথার প্রেক্ষিতে বিচার করা যায়।

বিশেষিত করতে গেলেই নামের প্রয়োজন হয়। সেই নাম মানুষেবই দেওয়া, অধিবাসীদের মুখের ভাষা থেকেই আহরিত। সেই আদি রূপটি ক্ষয়িত, বিকৃত হয়ে কোনও এক জায়গায় এসে স্থায়ীত্ব লাভ করে। আবার অঞ্চলটির নির্দিষ্ট ভৌগোলিক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্যও একটি সময় সীমার প্রয়োজন হয়। এই রকম নানাবিধ কারণে একটি অঞ্চলের একাধিক নাম মানুষের চিন্তা-চেতনায়, লেখায়-রেখায় মুখে মুখে ফিরতে থাকে। তারপর কোনও একটি নামই সংবিধানগত ভাবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। স্থান নাম চর্চার ধারায় কালানুক্রমিক ইতিহাসও তাই প্রয়োজনীয় একটি অনুষঙ্গ।

জেলা হিসাবে মালদহের বয়স দুশো বছরের কম হলেও (১৮১৩ সালে) বাণিজ্য কেন্দ্র ও নগর হিসাবে বয়স পাঁচশো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তাছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র হলো বর্তমান মালদহ জেলার বিরাট অংশ। পৌন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্রী প্রভৃতি ঐতিহাসিক অঞ্চলের বিশেষ অংশ মালদহ জেলার অর্ন্তগত। বঙ্গদেশের রাজধানী নগর রামাবতী, গৌড়, পাণ্ডুয়া, টাঁড়া প্রভৃতি অঞ্চল মালদহে অবস্থিত ছিল। রাজমহলও বৃহত্তর মালদহ জেলার অংশ ছিল। (রাজমহলের সহিত পৌন্ড্র ক্ষেত্রের সম্বন্ধ/হরিদাস পালিত)।

মালদহ এই নামটির প্রাচীনতম সূত্রটি পাওয়া যায় শাহাগাদা নামে এক ফকিরের সমাধির প্রবেশদ্বারের দেয়ালের একটি উৎকীর্ণ লিপিতে। এই লিপিতে যে সময়ের উল্লেখ আছে তা হলো ১৯শাবান ৮৫৯ হিজরি (৪ঠা আগষ্ট, ১৪৫৫ সাল)। এ সময়ে নাসিরুদ্দিনমুহম্মদ শাহ রাজত্ব করতেন (গৌড়ের ইতিহাস/ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী)। এরপরে সুলতান হোসেন শাহের আমলের

নয় খানি লিপিতে মালদহ নামের সূত্র পাওয়া গিয়েছে। এই লিপিগুলির সময়কাল হলো ৮৯৯ থেকে ৯৩৮ হিজরি (১৮৯৬ থেকে ১৫৩১ সাল শারদীয়া গৌড়ভূমি ১৩৯০)। টোডরমলের আইন-ই-আকবরীতেও 'মালদহ' নামটির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তবে 'আকবর নামা'ই প্রথম গ্রন্থ যা মালদহকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা ও বাণিজ্যিক স্থান হিসাবে উল্লেখ করছে।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকেও মালদহ নামের সূত্র পাওয়া যায়। ১৬৬৬ সালে তার্ভানিয়ে তাঁর ভ্রমণ বৃতান্তে মালদহ নামের উল্লেখ করেন। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন লিখছেন — Maldah was a large town, well inhabited and fiequented by merchants of the different nations রেনেল লিখলেন — Malda is a pretty, neat city. This as well as Cossimbazar is a place of Trade.

বাণিজ্য বন্দর হিসাবে মালদহের পরিচিতি প্রাচীনত্বের দাবি করলেও ঠিক কোন সময় থেকে বন্দর শহর হিসাবে মালদহের উত্থান সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা যায় না। তবে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে দুজন বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় মালদহের একটি বন্দর শহরের উল্লেখ দেখতে পাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নিকালো কান্তি নামে একজন ভেনিসীয় বণিক মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় ভ্রমণকালে বাংলাদেশে আসেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ব্রাচ্চিওলিনি লিপিবদ্ধ করলেন এইভাবে — "স্থল ও জলপথে বহু ভ্রমণ করে তিনি পনেরো দিন যাবার পর 'শেরনোভ' (শহর-ই-নৌ) নামে এক বিরাট ও বর্ধিষ্ণু নগরে এসে উপনীত হলেন।" অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীর ভারথোমার (১৫০৩-১৫০৮ খৃঃ) রচনায় —"আমরা বাংঘেলা শহরের দিকে রওনা হলাম .. .. এখানে আমাদের কয়েকজন খৃষ্টান বণিকের সঙ্গে দেখা হল, তাঁরা বললেন যে, তাঁরা 'সার-নৌ' (শহর-ই-নৌ) নামে একটি জায়গা থেকে এসেছেন।" গবেষকদের ধারণা গঙ্গা ক্রমাগত গতি পরিবর্তন করার ফলেই গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মধ্যস্থলে মালদহ অন্যতম নতুন বন্দর শহর হিসাবে গড়ে উঠেছিল। বুকানন হ্যামিলটন-ও এই মতের সমর্থক, তিনি লিখেছেন সম্ভবত হোসেন শাহের সময়েই পাণ্ডুয়ার উপনগরী হিসাবে মালদহের উত্থান ঘটেছিল।

যে কোন দেশ, রাজ্য বা জেলার নামকরণে কোনও একটি নয়, একাধিক কারণ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। তা ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা অধিবাসী জনজাতির ভাষাগত, সংস্কৃতিগত — অথবা এর কোনটিও নাও হতে পারে, আবার হতে পারে সব কিছু কারণেরই মিলিত মিশ্রিত রূপারোপ।

মালদহ ঃ

কিংবদন্তী রয়েছে মালদহ নামকরণে। কেউ কেউ রামায়ণের সঙ্গে মালদহ নামটি সংযুক্ত করতে চান। তাঁদের মতে রামায়ণে মালদ ও করুষ নামে দুটি জনপদ ছিল। যে দুটি জনপদ তাড়কা রাক্ষসীর দৌরাত্ম্যে তাঁর নিজস্ব দুর্গম অরণ্য বলেই পরিচিতি ছিল। মালদহ সেই মালদ রাজ্য। মালদহের পূর্বদিকে ধর্মকুন্ড নামে একটি স্থান আছে। ধর্মকুন্ডের অংশ বিশেষের নাম কালিদহ ও নাগদহ। এঁদের মতে এই দুটি স্থান তাড়কা রাক্ষসীর অনুচরবৃন্দের বসতি ছিল। এরই কাছে ধর্মকুন্ড নামে এক বিরাট জলাশয় ছিল। কালিদহ ও নাগদহ অঞ্চলে যে বাড়ী ঘর ছিল তার পশচাদদিক থেকে মলরাশি এই ধর্মকুন্ডে গড়িয়ে পড়ত সেই জন্যও এই অঞ্চলের নাম মালদহ

হতে পারে। ধর্মকুন্ড বর্ষাকালে মহানন্দার সঙ্গে মিশে যায়। মালদহের পূর্বদিকে দেবকুন্ডনামে আরও একটি পুস্করিনী আছে। ইতিহাসের ধর্মপাল ও দেবপালের নাম এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বলে প্রচলিত প্রবাদ।

নদীর ভূমিকা ঃ

মালদহ জেলার ভূতাত্ত্বিক গঠনের জন্য প্রবাহিত একাধিক নদীর পরিবর্তিত গতিপথ-ই যে অনেকখানি ভূমিকা নিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মালদহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গা ছাড়াও একাধিক নদী। মহানন্দা, কালিন্দ্রী, পুনর্ভবা, টাঙন, বেহুলা, পাগলা, ভাগীরথী, শ্রীমতি ও ফুলহরা। এ ছাড়া বিহারের অন্যতম প্রাচীন নদী কুশী ও একসময় এই অঞ্চলের উপর দিয়েই প্রবাহিত হতো। কুশী এবং গঙ্গা ক্রমাগত গতিপথ পরিবর্তন করে মালদহে তৈরী করেছে একাধিক চর, দহ এবং বিল। সুতরাং মালদহ জেলার ভূতাত্ত্বিক সংস্থানে স্বাভাবিক নিয়মেই রয়েছে একাধিক 'দহ'। শুধু জেলা শহরটির সঙ্গেই 'দহ' শব্দটি জড়িয়ে গিয়েছে তাই নয়। আরও একাধিক স্থাননামে এই 'দহ' শব্দটির অস্তিত্ব অনুভব করা যাবে। যেমন — বিলদহ, চাপদহ, মশালদহ (হরিশ্চন্দ্রপুর থানা) কুশিদা, গোয়ালদহ, (রতুয়া থানা), চক্রদহ > চাকদা (গাজোল থানা), খুদাদহ, ধুলদা (বামনগোলা), দরিয়াদহ > ইংরেজবাজার, নবদহ > নওদা — মাণিকচক।

ভৌগোলিক অবস্থান ঃ

যে কোন স্থানের নামকরণের জন্য সর্বাধিক দায়ভার বহন করে স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান বা বাতাবরণ। 'মাল' শব্দটি দ্রাবিড়, অর্থ -- উঁচু জায়গা। এই অর্থে মালদহ শব্দটির একসাথে অর্থ দাঁড়ায় - "উঁচু জায়গায় দহ"। (অচিন্ত্য বিশ্বাস - অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)। শব্দের এই অর্থের সমর্থনে মালদহ ভূখণ্ডের ভৌগোলিক পটভূমিটি জেনে নেওয়া প্রয়োজন। মালদহ জেলা মোটামুটি তিনটি স্পষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত।

বরিন্দ ঃ

মহানন্দার পূর্বদিক, পুরাতন লাল পলিমাটি দিয়ে গঠিত ভূমি যাকে বরিন্দ বলা হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যার উচ্চতা প্রায় ২৮ থেকে ৩২ মিটার। এখানকার মাটি উঁচু-নীচু, কঠিন ও অনুর্বর। তাই চাষ এবং পানীয় জলের প্রয়োজনে এই অঞ্চলেই রয়েছে একাধিক খনিত পুকুর ও দীঘি।

টাল ঃ

বরিন্দ অঞ্চলকে আলাদা করে নিলে বাকি অংশকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে কালিন্দ্রী। যাব উত্তরের অংশটি আংশিক আববণশূন্য পুরাতন ও লাল পলিমাটি ও রাজমহল পাহাড়ের মধ্যে সবেগে প্রবাহিত গঙ্গা ও অন্যান্য হিমালয় পাদদেশ থেকে উৎপন্ন নদীগুলির দক্ষিণমুখী নাব্যতার ফল। অসংখ্য পুরাতন নদী খাত, বিল ও দহ'র সংমিশ্রণে গঠিত এই এলাকার নাম 'টাল'। বরিন্দ অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত নীচু এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই অঞ্চলটির উচ্চতা ১৮ থেকে ২০ মিটার।

দিয়ারা ঃ

কালিন্দ্রী নদীর দক্ষিণ অংশটি এই জেলার নবীন অংশ। (এই নদীটিকে গঙ্গার পুরাতন খাত বলেই মনে করা হয়) গঙ্গাবিধৌত পলিমাটি দিয়ে গঠিত। তিন ফসলী এই জমি মালদহের সর্বাপেক্ষা উর্বর অংশ। মাণিকচক, কালিয়াচক, রতুয়া, ইংরেজবাজার এই অঞ্চলগুলি এর মধ্যে পড়ে। এগুলি গঙ্গার মোহনা অংশ এবং ভঙ্গুর। ১৯৯৮ সালের বিধ্বংসী বন্যার পর এই অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করেই তাই আবার শুরু হয়েছে গঙ্গার ব্যাপক ভাঙন। এই অঞ্চলটিও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮ থেকে ২০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। সুতরাং খুব ব্যাপক অর্থে না হলেও মালদহের ভূতাত্ত্বিক গঠন যে অনেকটা মালভূমির মত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জাতি জনগোষ্ঠী ঃ

১৮১৩ খৃঃ মালদহ জেলা গঠিত হবার কয়েক বছর আগে (১৮০৯) ফ্রান্সিস বুকাননের দেওয়া এক বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি তৎকালীন পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ এখনকার মালদহের মহানন্দা নদীর পশ্চিমাংশে মালো জাতির বাস ছিল। এই জাতির অধিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই এখানে বসবাস করছেন। এই প্রসঙ্গে বুকাননের উদ্ধৃতিটি হল ঃ These or rheir decendents have in general deserted their original low profession of fisherman, and have been taken themselves to agriculture. These again who retain their have not weanted themselves from their impurities retain the name of Malo. Of the Malos, however many are now settled here especially on the banks of the Ganges and Mahananda where they may be about 1,600 families .... They are fisherman and boatmen, but many of them cultivate the land, although they continue in their impure manner of living." — এই মালোদের জীবিকা যেহেতু মাছধারা তাই অন্যান্য মৎস্যজীবী জাতিগোষ্ঠী ও সাধারণ জনমানসে 'মালো' নামে আখ্যাত হয়েছে। বুকাননের বর্ণনা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন মৎস্যজীবী সম্প্রদায় হলো — 'কেওট, বিন্দ (বিন), তিওর, গৌড়ের পাটনী, গাঙ্গরার, খারওয়ার, মারকেশুয়, তোরা, কোল, কাণ্ডার, কুরি, চাইন্দ, ছবি, বাড়হাই, কানডোল, রিশি ও চণ্ডাল।

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের (অবিভক্ত মালদহ জেলার অংশ) অনেক স্থাননামের সঙ্গে 'মাল' শব্দটি জড়িয়ে রয়েছে। মালদহ থানা — মালিগ্রাম, গাজোল থানা — মালডাঙ্গা ও মালিগ্রাম, রতুয়া থানা — মালোপাড়া, মহদীপুর। পশ্চিম দিনাজপুর — রায়গঞ্জ থানা ১০ নং জে. এল. ভুক্ত মালদখণ্ড। এ ছাড়াও ঐ থানায় আছে মালঞ্চি ও মালিবাড়ি। কুশমণ্ডীতে — মালাইল, মালিগাও, মৈলানহাট। তপন — মালাহার, মালঙ্গা। ইটাহার — মালিনগর, গঙ্গারামপুর — জ্যোৎমালথাঁন, বালুরঘাট — মালিকুড়া, হেমতাবাদ — মালদুয়া, কিসমৎ মালদুয়া ও মালাউ। বংশীহারী — মালিয়ান দীঘি, মালিয়ার, মালাম মৌজা। মালদহের সীমানা অঞ্চল পশ্চিম দিনাজপুরে কোচ বংশীয়রা বেশ ভালো সংখ্যায় বাস করে থাকেন এবং তাদের মধ্যে 'মাল' শাখাও যে একসময় বেশ ভালো মাত্রায় উপস্থিত ছিলেন এই নামকরণগুলি তার পরোক্ষ প্রমাণ। এ ছাড়া মালদহ থানার রসিলাদহে (জে. এল. নং - ১০৭), হবিবপুর থানার মল্লিকপুরে, গাজোলের মাজাইল, ছোটকাঁদর গ্রামে মাল পদাধিকারী ব্যক্তিদের বসবাস এখনও দেখা যায়।

সম্পদ অর্থে ঃ

একদল চিন্তাবিদদের মতে ফার্সী 'মাল' ও বাংলা 'দহ' এই শব্দদুটির মিলনে উদ্ভব হয়েছে মালদহ শব্দের। 'মাল' শব্দের অর্থ ধন দৌলত এবং 'দহ' শব্দের অর্থ 'সাগর'। এই যুগ্ম শব্দের অর্থ 'ধন-সাগর'। এই শব্দটির মধ্যে প্রাচীন ধন-গৌরবের কাহিনী লুকিয়ে আছে।
প্রাচীন তথা মধ্যযুগের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে একটা সময় মালদহ খ্যাতির তুঙ্গে ছিল। জগজ্জীবন ঘোষালের মনসার ভাসানে পাওয়া যায় যে, গৌড়ের অন্তর্গত চম্পা নগরের চন্দ্রপতি বা চন্দ্রভব (চাঁদ সওদাগর) গৌড় রাজের অধীনে করদ রাজা হিসাবে রাজত্ব করতেন। পাওয়া যায় দুঃসাহসী বণিক ভিখু শেখের কথা। মালদহ স্থাননামে একাধিক নগর, হাট, গঞ্জ, বাজার, কর্মচারিদের নাম বিভাজনে হটপতি, শৌল্কিক ও তারিক ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যায় যে শিল্প ও বাণিজ্য থেকে এ রাজ্যের যথেষ্ট আয় হতো। মুসলীম আমলে জালালুদ্দিনের রাজত্বকালে পুরাতন মালদহ, বালিয়া নবাবগঞ্জ, রায়খাঁ দীঘি ও পীরগঞ্জ পাণ্ডুয়ার বর্হিবাণিজ্য স্থান ছিল। আরও পরবর্তীতে বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে এগুলি ছাড়াও পাই নঘরিয়া, অমৃতি-র নাম। বিস্তীর্ণ গঙ্গা, মহানন্দার বুকে চলত কাঠের নির্মিত বড় বড় বাণিজ্যতরী। (মহানন্দার পশ্চিম পাড়ে শহর মালদহে বিরাট এলাকা জুড়ে এখনও রয়েছে কাঠের কারখানা, যেখানে এই নৌকাগুলি প্রস্তুত হতো)। অর্থোপার্জনের বিভিন্ন দিকগুলি একটু আলোচনা করলেই বোঝা যাবে চিন্তাবিদ্‌দের এই নামকরণ একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়।

প্রাচীনকাল থেকেই রেশম শিল্প ছিল বাংলাদেশের প্রাচীন এবং প্রধান শিল্প। এক সময় এই স্থানে মুগা ও রেশম মিলিয়ে প্রায় তিরিশ রকমের বস্ত্র প্রস্তুত হত। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার সংলগ্ন অঞ্চলগুলি ছিল সেই রেশম উৎপাদনের প্রাণকেন্দ্র। এখানে মশরু, এলাচি, দোপাট্টা, শাড়ি, ধুতি, চাদর প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র রেশমে প্রস্তুত হত। মুসলমান বিজয়ের পর এই বস্ত্রবয়ন শিল্প ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তবুও যা ছিল· তা কম নয়। পাটনা ফ্যাক্টরীর জনৈক ইংরেজ বণিক ১৬২০-২১ সালের লেখা ডায়রীতে মালদহী দুপাট্টা ও পারস্যের প্যাটার্ণে কিছু মালদহী দ্রব্যের উল্লেখ করে লিখেছেন যে মালদহে তুলায় ভরা সুজনী প্রচুর তৈরি হত। এর উপর তোলা হত সূক্ষ্ম সূচীশিল্প। এগুলি ছিল ঘরের মেয়েদের কাজ। সিল্কে তৈরি বিখ্যাত বস্ত্রের নাম ছিল — কাটাল, সিরাজ, বুলবুল, চশম, হুম্‌হুম্‌, এলায়চী ইত্যাদি। পুরাতন মালদহ, টাঁড়া, সাহাপুর, কলিগ্রাম প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্র তৈরি হত। এডোয়ার্ড নামক জনৈক ইংরেজ বণিক (যিনি মালদহে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের দায়িত্ব নিয়ে সরেজমিনে এসেছিলেন) লিখছেন — মালদহ শহর সেই আমলে নানারকম বৈচিত্র্যপূর্ণ আমদানি-রপ্তানির কেন্দ্র ছিল। এবং এই শহরকে কেন্দ্র করেই চর্তুদিকের উৎপাদিত রেশম কার্পাসজাত দ্রব্যাদি এসে জমা হোত। বণিকেরা বছরে ১৫ থেকে ২৫ পট্টেলা কাপড় রপ্তানি করতেন, যার মধ্যে বেশীরভাগই কোসিজ ও মলমল। এদের প্রতিটির দাম ছিল দেড় টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত। সবরকমের মণ্ডিল ও এলাচী — যাদের প্রতি 'পাট্টেলা'র দাম ছিল প্রায় এক লাখ টাকা। এ ছাড়া সিল্কের কাপড় যার দামও প্রায় লাখটাকার কাছাকাছি এখান থেকে রপ্তানি হতো। প্রায় তিন লাখ টাকার এলাচী ও মোটা কাপড় ঢাকায় পাঠানো হতো। প্রায় সমমূল্যের কাপড় যেত রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, দেশের অন্যান্য স্থানে এমনকি

বিদেশেও। ১৫৮৬ খৃঃ র‍্যালফ্ ফীচ এই দেশে এসে টাঁড়ার রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের প্রচুর সুখ্যাতি করেন। পরবর্তীকালে মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পারায় বস্ত্রশিল্পের অবনতি হয়। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে এই শিল্প পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। ভোলাহাট ও শিবগঞ্জ থানাগুলি পাকিস্তানের অন্তর্গত হওয়ায় বর্তমানে কালিয়াচক, মহদিপুর, আইহো, ও মুচিয়ার নিকটবর্তী মহাদেবপুর প্রভৃতি স্থানে রেশমকীট পালন করা হয়। এই সব জায়গায় যে সমস্ত রেশম সূতা প্রস্তুত হয় তার সূক্ষ্ম সূতাগুলি বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও বেনারস প্রভৃতি স্থানে চালান দেওয়া হয়। মোটা সূতা থেকে মটকার কাপড়, শাড়ী ও জামার কাপড় প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। বর্তমানে সাহাপুর, বাঁশবাড়ী, গয়েশপুর, ইংরেজবাজার, কালিয়াচক প্রভৃতি মালদহের বিভিন্ন স্থানে মটকা সূতী বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। পিয়াসবাড়ী নাসরী ও পেডী সিল্ক রিলিং ইন্‌স্টিটিউট নামে দুটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে রেশমকীট পালন, সূতা প্রস্তুতকরণ ও তার শ্রেণী বিভাজন প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। এখন প্রচুর বেসরকারী সংস্থাও রেশমকীট থেকে সূতা উৎপাদনের কাজে এগিয়ে এসেছেন। মালদহ জেলার দিয়ারা অঞ্চলের উর্বর মাটিতেই রেশমকীট পালনের উপযুক্ত খাদ্য তুঁত চাষ হয়। তাই রেশমশিল্প এদেশে এত উন্নতি লাভ করেছিল। মালদহ জেলার বহুসংখ্যক মানুষ আজও রেশমকীট প্রতিপালনের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার সেই স্বর্ণময় গৌরব যুগে চাঁদ সওদাগর, ধনপতি সওদাগর আর সওদাগর ভিখু শেখের আবির্ভাব। এই শেখ সওদাগর নিয়ে শ্রীসুভাষ সমাজদার "গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান" নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছেন। ভিখু শেখের কথা আমরা জানতে পারি W. W. Hunter এর লেখা ষ্ট্যাটিসষ্টিক্যাল অ্যাকাউণ্ট অব দি ডিষ্ট্রিক্ট অফ্ মালদা (১৮৭৬) থেকে। সেখানে তিনি লেখেন — "About three hundred years ago Shaikh Bhika who use to trade in Maldahi cloths such as Katar and Musri, set sail for Russia with three ships laden with silk cloths and that two of his ships were *wrecked some where in the neighbourhood of the Persian Gulf.*" — প্রায় তিনশ বছর আগে ভিখু শেখ নামে এক সওদাগর তিন জাহাজ বোঝাই মালদার কাতার, মুসারি রেশম বস্ত্র নিয়ে রুশ দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করেছিলেন, পারস্য উপসাগরের কাছে তাঁর দুটি জাহাজ ভেঙ্গে যায়। হাণ্টার-এর দেওয়া এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় তদানীন্তন ভারত সম্পর্কিত বিলাতের সরকারী দপ্তর 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর নথিপত্রে। সেগুলির উল্লেখ করেছেন 'কেনসিণ্টন' মিউজিয়ামের আর্ট রেফারি, জর্জ সি. এম. বার্ণউড তাঁর 'দি ইণ্ড্রাষ্ট্রিয়াল আর্টস অফ ইণ্ডিয়া' বইতে। তিনি লিখেছেন — "It is on record that in 1577 Shaikh Bhik of Maldah sent three ships of Maldahi cloths to Russia."

এ ছাড়াও ভিখু শেখের কথা পাওয়া যায় ' প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর লেখা একটি প্রবন্ধ ও হীরেন্দ্রনাথ রায়ের রচনায় (মাঘ ১৩০৬ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩২০)।

মালদহের এই সওদাগর তাঁর দুরন্ত সাহসিকতার স্মৃতি নিয়ে মালদহের গম্ভীরা গানের মধ্যেও বেঁচে রয়েছেন। গম্ভীরা শিল্পী তথা কবিয়াল সুফী মহম্মদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ শোষণে জর্জরিত বাঙ্গালীকে বাংলার অতীত ব্যবসা-বাণিজ্যের গৌরবময় স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছেন —

বাণিজ্যে বসত লক্ষ্মী
ধনপতি ভিখু তার আছে সাক্ষী
ঐ পথ দেখা দেখি বাণিজ্যে
চালা জাহাজ।

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলায় সওদাগর ভিখু শেখের আগে আর কোন বাঙ্গালীকে রুশ দেশে পাড়ি দিতে শোনা যায় নি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজরা যে সব বিষয়ে ব্যবসা করবে বলে এদেশে এসেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল নীলচাষ। কারণ এদেশের গঙ্গা সহ একাধিক নদীর উর্বর ভূমি ছিল নীলচাষের উপযুক্ত ক্ষেত্র। আর বস্ত্রশিল্পের উন্নতির কারণে ইংলণ্ডের মাটিতে নীলের চাহিদা ছিল বিপুল। তাই তারা এদেশে এসেই বুঝেছিলেন যে বাণিজ্য ফসলরূপে নীলকে এদেশের মাটিতে প্রচুর ফলাতে পারলে ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে যে মুনাফা হবে অন্য কোন বাণিজ্য ফসল দ্বারা তা সম্ভব হবে না, ১৭৮০-৮৮ খৃঃ নাগাদ কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টরূপে চার্লস গ্র্যাণ্ট নিজের খরচাতে নীলচাষের সূচনা করেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে মালদহের নীলচাষ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পেশ করেন বুকানন হ্যামিলটন (An Account of the District of the Purnea)। বুকাননের দেওয়া হিসাব পরে পরিবর্তিত হয়ে গোয়ামালতী ও তার সহযোগী কুঠিগুলির বাংসরিক নীট আয় প্রায় ১ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়।

বর্তমান ইংরেজবাজার থানা ও মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত সিঙ্গাতলা কুঠিটিই মালদহের অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী কুঠিগুলির মধ্যে অন্যতম। উইলিয়াম ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর গৌড় সফরের ডাইরিতে (১৮৯০ খৃঃ) এই কুঠির কথা লিখে গেছেন। হাণ্টার সাহেব ১৮৭০ খৃঃ তাঁর বিবরণে উল্লেখ করেছেন যে এই কুঠীর অধীনে পাঁচ হাজার বিঘা জমিতে নীলচাষের ব্যবস্থা করে ত্রিশ হাজার টাকা মূলধন নিয়োগে ইংরেজরা প্রায় ৬৭% শতাংশ লাভে ২৫০ মন নীল উৎপাদন করেছিলেন।

নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার বারো / তেরো বছর পরেও গোয়ামালতী কুঠি-র উত্তরাধিকারীরূপে ১৮৭০ খৃঃ পূর্ণরূপে কর্মব্যস্ত ছিল কালিয়াচক কুঠি। এই কুঠির অধীনে ২৮ হাজার বিঘা জমিতে নীলচাষের জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে প্রায় এগারো শত মন নীল উৎপাদন করা হয় যার চলতি বাজার দর ছিল দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। নীট লাভের পরিমাণ ছিল ষাট থেকে আশী হাজার টাকা। এ ছাড়াও ছিল বামনগোলা থানার মাধববাটী নীলকুঠী, রতুয়া থানার খৈলসানা নীলকুঠি, বাকরাবাদ কুঠি এবং মাণিকচকের মথুরাপুর কুঠি। এই সমস্ত একাধিক কুঠির কারণে উৎপাদিত নীল প্রস্তুতকরণ এবং বাণিজ্যকরণের কেন্দ্র ছিল মহানন্দার পশ্চিমপাড়ে গড়ে ওঠা বাণিজ্য নগরী। যে অঞ্চলটির নতুন নামকরণ হয় ইংরেজবাজার।

সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত'এ উল্লেখ করেছেন যে বরেন্দ্রীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম উপকরণ ছিল সেখানকার ইক্ষু বা আখের ক্ষেত। এই ভূমির প্রাচীনতর ও বৃহত্তর সংজ্ঞা হচ্ছে পুণ্ড্র। ব্রাত্য পুণ্ড্রদের বাসস্থান পুণ্ড্রদেশ। এই পুণ্ড্র-পূঁড়-কোম বোধ হয় আখের চাষে খুব দক্ষ ছিল এবং সেইজন্য আখের অন্যতম নাম-ই হচ্ছে পুঁড়; এক জাতীয় দেশী আখকে বলে পুঁড়ি। এই বিষয়ে 'গৌড়' নামটির দিকে নজর দিতে পারি। গৌড় নামটি যে গুড় শব্দ থেকেই

উৎপন্ন তার শব্দতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ সুবিদিত। এই তথ্যের মধ্যেও আখের চাষের ইঙ্গিত ধরতে পারা কঠিন নয়। সুবিখ্যাত 'সুশ্রুত' গ্রন্থে পৌণ্ড্রক নামে এক প্রকার ইক্ষুর উল্লেখ আছে, এবং বহু সংস্কৃত নিঘণ্টু রচয়িতা ও কোষকারদের মত এই যে, পুণ্ড্রদেশে যে ইক্ষু জন্মাত তাই পৌণ্ড্রক। আজকাল পৌঁড়িয়া, পুঁড়ি, পৌঁড়া প্রভৃতি নামে যে ইক্ষু ভারতের সর্বত্র চাষ হতে দেখা যায় তা এই পুণ্ড্রবর্ধন থেকেই গিয়েছে বলে অনুমান করা হয়। সুপ্রাচীন কাল থেকেও প্রাচ্যদেশের ইক্ষু ও ইক্ষুজাত দ্রব্য চিনি ও গুড় দেশে-বিদেশে পরিচিত ছিল। গ্রীক লেখক ঈলিয়ন ইক্ষুদণ্ড পেষণজাত একপ্রকার পাতলা মধুর (ঝোলা গুড়) কথা বলেছেন। ইক্ষুনল পেষণ করে এক প্রকার মিষ্টি রস আহরণ করত গঙ্গাতীরবাসীরা এ কথা বলেছেন অন্যতম গ্রীক লেখক লুক্যান। যদিও এ সমস্তই খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীর কথা। পরবর্তীকালে ইক্ষুচাষ আর ততটা প্রধান স্থান অধিকার করে না থাকলেও মালদহের কৃষিজাত উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে আখ অর্থোপার্জনের একটি অন্যতম উপায়।

'খুব ভাল বাঁশের ঝাড় ছিল বরেন্দ্রী'তে --- 'রামচরিতে' একথারও প্রমাণ আছে। এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও (ইংরেজ আগমনের পরেও) যত্র তত্র তো বটেই, মহানন্দার পশ্চিম পাড়ে চার বর্গকিলোমিটার স্থান পরিপূর্ণ ছিল ঘন বাঁশের জঙ্গলে। বাঁশ কেনা-বেচার জন্য নির্দিষ্ট ছিল বিরাট বাঁশ বাজার (বাঁশহাট্টা — পুরাতন মালদা)। পাহাড়িয়া, ডোম, চণ্ডাল ইত্যাদি উপজাতি সম্প্রদায়ের এখনও পর্যন্ত জীবিকার একমাত্র উপায় বাঁশ নির্মিত বেড়া, চাটাই, ঝুড়ি, চুপড়ি, ডালা, কুলো ইত্যাদি। পূর্বে এই বাঁশ রপ্তানি করেও প্রচুর অর্থ উপার্জন হত।

মালদহ জেলার অর্থনীতির আর এক বুনিয়াদ এ জেলার আম। কালিন্দ্রী, মহানন্দা আর গঙ্গার সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে এই সুস্বাদু ফলের উপস্থিতি। সমগ্র পশ্চিমবাংলায় উৎপাদিত আমের ২৫ শতাংশ গাছ রয়েছে এই মালদায়। আমের সময় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস। এ ছাড়া এই ফল থেকে আমসত্ত্ব, আমচুর, আমের আচার, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি থেকেও এই জেলায় প্রচুর অর্থ উপার্জন হয়। যদিও সাম্প্রতিক গঙ্গা ভাঙনে মালদহ জেলার আম চাষের নির্দিষ্ট জমির অনেকখানিই তলিয়ে গিয়েছে, তবুও আম উৎপাদনের লাভজনক বিষয়টির কথা মাথায় রেখে নতুন নতুন জমি নির্দিষ্ট হচ্ছে আমের কলম চাষের জন্য। আম উৎপাদনের গত পাঁচ বছরের হিসাব এইরকম ঃ

বছর	জমির পরিমান (একরের হিসাব)	উৎপাদন পরিমাণ (মেট্রিক টন)
১৯৯৯ —	২৪০৮০	২,৭০,০০০
২০০০ ---	২৪১২০	১,০৫,০০০
২০০১ ---	২৪২৫৯	২,৫৩,৮৭৬
২০০২ ---	২৪৫০০	৬৩,৬৭৮
২০০৩ —	২৪৮৫০	উৎপাদন লক্ষ্য ছিল ৭৫০০০ প্রকৃতিগত নানা কারণে উৎপাদন দাঁড়ায় ৪০,০০০

মুসলীমপূর্ব এবং মুসলীম সমসাময়িক সময় পর্যন্ত শাহদুল্লাপুর ছিল শিল্প-গঞ্জ। এখানকার কাঁসাজাত শিল্প-সামগ্রীর খ্যাতি ছিল এশিয়া জোড়া। বিশেষ করে এর ঘটি, কলসী ও হাঁড়ির গঠন বৈশিষ্ট্য সেদিনের বাংলার অন্যান্য এলাকায় তৈরী বাসন-কোসন থেকে পৃথক মর্যাদা ও খ্যাতিতে সমৃদ্ধ ছিল। এ ছাড়া শাদুল্লাপুর রৌপ্যশিল্পের জন্যও বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে শাদুল্লাপুরের সেই খ্যাতি না থাকলেও পিতলের চাদর থেকে প্রস্তুত এক রকমের ঘটি বর্তমানে ইংরেজবাজারে তৈরী হলেও এর নাম প্রাচীন জনপদ শাদুল্লাপুরের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। ইংরেজবাজার, কলিগ্রাম (মালদহ জেলায় অবস্থিত) এখনও পিতল-কাঁসার বাসনের জন্য বিখ্যাত। বঙ্গ বিভাগের পর পাকিস্তান থেকে আগত বহু সংখ্যক কংসবণিক সম্প্রদায়ের লোক মালদহে আসায় এই শিল্পের উন্নতি হয়েছে।

মালদহ জেলায় কাঁসার বাসনের জন্য বিখ্যাত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থান হল ঃ কাঁসারি পাড়া, কুতুবপুর, শঙ্করবাটি, নবাবগঞ্জ (থানা - মালদহ), ইংলিশবাজার ও আরাপুর (থানা - ইংরেজবাজার)। এখানে তৈরী হওয়া জিনিষগুলি প্রধানত থালা, বাটি, গেলাস ও রেকাবি। এছাড়া হাঁড়ি, বোক্‌না, কলসি অথবা ঘড়া, গামলা, কৌটা, হাতা ও খুন্তি, ঝাঁঝরি বা ধুচুনি, পানের ডাবর, পান রাখার ডিবে, প্রদীপ, পঞ্চ-প্রদীপ, পিলসুজ, ঘট এবং হোমকুণ্ড ইত্যাদি এখানে তৈরী হয়।

গত পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় গ্রামের অধিকাংশ গৃহস্থ পরিবার তাদের সংগৃহীত কাঁসা পিতল দ্রব্য অভাবের তাড়নায় মহাজনদের বিক্রি করে দিয়েছেন। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিক্রিত এইসব ধাতুশিল্প দ্রব্য ঢালাই করে যুদ্ধের নানাবিধ প্রয়োজনে মেটানো হয়েছে। বহু জমিদারী সেরেস্তার সংগৃহীত পিতল নিলাম করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তবু আজও কাঁসার বাসন তৈরীতে মালদহ জেলা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

প্রাচীনকালে গৌড় নগরে নানাবিধ স্বর্ণপাত্র ও উৎকৃষ্ট স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত হতো। সেই সময় বিত্তশালীদের গৃহে স্বর্ণনির্মিত নানারকম পাত্র ব্যবহার করা হতো। ভোজসভায় ব্যবহৃত হতো স্বর্ণনির্মিত থালা এবং পাত্র। বিত্তশালী ব্যক্তিরা স্বর্ণনির্মিত পালঙ্ক ব্যবহার করতেন। তুর্কী আক্রমণের সময় বখতিয়ার খিলজী গৌড় লুণ্ঠন করে মাটির তলা থেকে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার এবং সোনার থালা হস্তগত করেন।

পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে মালদহের অবস্থান প্রকৃতিগতভাবে বেশ দুর্বল স্থানে। প্রায় প্রতি বছর বন্যা, খরা, বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব এই জেলার নিত্য নিয়তি। এরপর আবার মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে বাংলাদেশের রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হল পরে ইংরেজ আমলে সেই রাজধানী স্থানান্তরিত হল কলকাতায়। ফলে মালদহ তার পূর্ব গৌরব হারাল। কিন্তু বাণিজ্য নগরী হিসাবে মালদহ যে সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল একাধিক পুস্তকে তার স্বীকৃতি আছে। কালের নিয়মেই অতীত গৌরবের স্বর্ণময় দিনগুলি হারিয়ে গেলেও মালদহ নামটি আজও বহন করছে 'সম্পদ-সাগর' নামটির দায়ভার।

● তথ্য সহায়তা

১. মধুপর্ণী - মালদহ জেলা সংখ্যা।

২. অতীতের মালদহ -- প্রবাল রায়।

৩. মেদিনীপুরের স্থাননাম চর্চা এবং নাম — বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি।

৪. বাঙ্গালীর রুশচর্চা — শ্রীকেশব চন্দ্র চক্রবর্তী।

৫. কৌশিকী ---- (সম্পাদক - তারাপদ সাঁতরা, ২০০২)

ব্যাক্তি ঋণ — প্রয়াত শ্রীসুধীর কুমার চক্রবর্তী, শ্রীসমরেন্দ্র নাথ খাড়া (ম্যাঙ্গো ডেভেলপমেন্ট অফিসার), শ্রীশম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীতুলসী পাল (মালদা জেলা গ্রন্থাগার)।

স্বাধীনতা উত্তর মালদহ জেলা গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আধুনিক জেলা হিসাবে মালদহের নাম ও জেলার শাসন ব্যবস্থার জন্য ঐতিহাসিকেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গর্ভনর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশকে চিহ্নিত করে থাকেন। কর্ণওয়ালিশ ইংল্যাণ্ডের জেলা গঠনের ধাঁচে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ভারতেও ইংরেজ কোম্পানীব অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে নিয়ে কতকগুলি জেলা গঠন করেছিলেন। কর্ণওয়ালিশের তত্ত্বাবধানে তাই এই সময়েই তৈরী হয়েছিল উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী প্রভৃতি জেলার। মালদহ জেলার জন্ম হয়েছিল ১৮১৩ সালে। বলা যায় মালদহ উত্তরবঙ্গেব প্রাচীনতম জেলা। এই হিসাবে মালদহ জেলার বয়স প্রায় দু'শো বছর। যদিও বাণিজ্য কেন্দ্র ও নগর হিসাবে এই জেলার বয়স প্রায় পাঁচশো বছর অতিক্রম করেছে। প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর মালদহ জেলা গঠনের ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস কম নয়।

উত্তরবঙ্গের মধ্যে মালদহ জেলাতেই ইংরেজরা এসেছিলেন সর্বপ্রথম। সময়টা ছিল ১৬৭৬ সাল। অবশ্য বিদেশী বণিক হিসাবে ইংরেজরাই প্রথম নয়, তাঁদের আগে এসেছিলেন ওলন্দাজ কোম্পানী বাণিজ্য করতে। আর ইংরেজদের প্রায় সাথে সাথেই ফারসী বণিকেরা। তখন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে মালদহের নাম দেশে এবং বিদেশে ছিল বিশেয পরিচিত। কারণ নৌ ও সড়ক যোগাযোগের উভয় দিক থেকেই মালদহ উত্তরবঙ্গের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত ছিল এবং মালদহকে বলা হত উত্তর ভারতের প্রবেশদ্বার।

মালদহ জেলায় আসার পর ইংরেজ কোম্পানী ১৬৮৬ সালে একটি অস্থায়ী ফ্যাক্টরী ভবন তৈরী করেছিল। স্থায়ী ভবন তৈরী হয়েছিল অনেক পরে। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর ১৭৭০ সালে। তৎকালীন মালদা ফ্যাক্টরী ভবনের রেসিডেন্ট টমাস হেঞ্চম্যানের তত্ত্বাবধানে এই ফ্যাক্টরী ভবন নির্মিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার পর এই সময় থেকে ইংরেজরা মহানন্দার অপর পারে নতুন স্থায়ী অঞ্চলের উন্নতির চেষ্টা শুরু করে দেয়। যার বর্তমান নাম ইংরেজবাজার। আর প্রকৃত মালদহ বলে যা ছিল তা আস্তে আস্তে গুরুত্বহীন হয়ে পুরাতন মালদহ নামে পরিচিত হয়। ১৮১৩ সালে নবগঠিত মালদহ জেলার সদর দপ্তর ইংরেজবাজারে স্থাপিত হলে এই স্থানটিই প্রশাসনিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পূর্বের স্বনামধন্য মালদহ থেকে ইংরেজরা প্রশাসনিক দপ্তর ইংরেজবাজার স্থানান্তরিত করেছিল তার পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল সুনির্দিষ্ট।

প্রথমতঃ ১৬৭৬ সালে ইংরেজরা যখন মালদহে আসে তখন মালদহের মির্জাপুরে তারা একটি ফ্যাক্টরী ভবন তৈরী করেছিল কিন্তু তখন মালদহের বাণিজ্য একচেটিয়া ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো দিল্লীর নির্দেশাধীন মোগলরা। তারা ইংরেজ নির্মিত এই ফ্যাক্টরী ভবন ভেঙ্গে দেয় এবং ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যের পথে নানারকম বাধার সৃষ্টি করে। এই বাধার জের সামলাতে হয়েছিল ইংরেজদের বহুদিন, সেই অপমান ইংরেজরা ভুলতে পারেনি। তাই জেলার সদর দপ্তর ইংরেজরা সচেতনভাবেই করেছিলেন ইংরেজবাজারে। এছাড়া ইংরেজদের তৎকালীন নীতিই ছিল সমস্ত ট্র্যাডিশনাল সেন্টারগুলোকে ধ্বংস করে নিজের মত নতুন নতুন সেন্টার তৈরী করা, যেমন করেছিলেন কলকাতা শহর তৈরীর ক্ষেত্রে, যেমন করেছিলেন বর্ধিষ্ণু শহর ময়নাগুড়িকে বাদ দিয়ে জলপাইগুড়িকে সদর দপ্তর স্থাপনের ক্ষেত্রে।

অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে ১৮১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে Lower province এর সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রাজশাহী জেলার কয়েকটি থানাতে যে ব্যাপকহারে চুরি-ডাকাতি হচ্ছে তা বন্ধ করতে হলে একটা নতুন থানা খোলা দরকার। সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশের মতে জেলার সদর দপ্তর থেকে এই থানাগুলি বিশেষতঃ শিবগঞ্জ, কালিয়াচক প্রভৃতি বহুদূরে অবস্থিত হওয়ার ফলেই চুরি-ডাকাতি বেড়েছে। কারণ জেলার সদর দপ্তর পূর্ণিয়া থেকে কালিয়াচকের দূরত্ব প্রায় ১০০ মাইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার এই সুপারিশ মেনে নিয়ে ১৮১৩ সালে এপ্রিল মাসে মালদহ নামে একটি জেলা স্থাপন করলেন। (এ ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল এ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল- হান্টার, পৃ- ১৮)। এই জেলার সঙ্গে যুক্ত হল পূর্ণিয়া জেলার শিবগঞ্জ, কালিয়াচক, ভোলাহাট, গুরগুরিক থানা দিনাজপুর জেলার মালদহ ও বামনগোলা থানা এবং রাজশাহী জেলার রোহনপুর ও চাঁপাই থানা। অর্থাৎ শুরুতে আটটি থানা নিয়ে মালদহ থানা গঠিত হয়েছিল। পরে তা বেড়ে ১৯৪৭-এ পনেরোতে দাঁড়ায়।

১৮১৩ সালে মালদহ জেলা স্থাপন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে মালদহ রূপ পেয়েছিল ১৮৫৯ সালে। কারণ ১৮১৩ থেকে ১৮৫৯ সাল অব্দি মালদহ জেলা রাজস্ব বিচার ও প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রতিবেশী দেশগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল। শুরুতে মালদহ জেলা রাজশাহী বিভাগের অধীন ছিল। কিন্তু ১৮৭৬ থেকে ১৯০৫ অবধি মালদহ জেলা ভাগলপুর বিভাগের অধীনে চলে গিয়েছিল (ডিষ্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক, ১৯৫১, এ. মিত্র, পৃ-১)। ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হলে মালদহ পুনরায় রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ অব্দি এই ব্যবস্থা বজায় ছিল। কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ের জন্য মালদহ জেলা ভাগলপুর বিভাগে চলে যাওযায় মালদহকে নিয়ে প্রথমে বিহার ও বঙ্গদেশ পরে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বিরোধ বাধে। এই বিরোধের পশ্চাতে রয়েছে মালদহ জেলা নির্মাণের প্রাক্ পটভূমি।

১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাজন প্রস্তাব গৃহীত হলে বিহারের নেতৃবৃন্দ মালদহকে বিহারের সঙ্গে সংযুক্তির দাবী জানিয়েছিলেন। বিহারের নেতৃবৃন্দ প্রস্তাব করেছিলেন মহানন্দা নদীকে

বিহার ও বঙ্গদেশের মধ্যে সীমানা হিসাবে চিহ্নিত করা হোক। তাঁদের দাবীর পিছনে মূল যুক্তি ছিল ১৮৭৬ থেকে ১৯০৫ অব্দি মালদহ ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ দাবী অবশ্য ইংরেজ সরকার মেনে নেয়নি।

১৯১১ সালের ২৩শে আগষ্ট ইংরেজ সরকার ঘোষণা করলেন যে বাংলা ভাষী অঞ্চলগুলিকে যেমন একটি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তেমনই হিন্দী ভাষী অঞ্চলগুলি নিয়েও একটি প্রদেশ গঠন করা হবে। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বিহারের দীপনারায়ণ সিংহ, সচ্চিদানন্দ সিংহ ও পরমেশ্বর লাল এক যৌথ বিবৃতিতে বললেন যে, মহানন্দার পূর্বে অবস্থিত পূর্ণিয়া ও মালদহের অংশ বঙ্গদেশে যাবে এবং অবশিষ্ট অংশ বিহারে যাবে। Indian Association (ভারত সভা) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ১৯১২ সালের ২৩শে জানুয়ারী ইংরেজ সরকারকে একটি স্মারকলিপি দিয়ে দাবী করেছিলেন যে — "The portion of Purnea and Malda to the east of the river Mahananda which is the ethnic and linguistic boundary between Bengal and Bihar should go to Bengal and the western portion of this two district come to Bihar." (জাগৃতি ও জাতীয়তা - যোগেশ চন্দ্র বাগল, পৃ-১৮৫-১৮৬)

১৯৩৭ সালে প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রস্তাব উঠলে বিহারের নেতৃবৃন্দ পুনরায় মালদহকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর ১৯৫৪ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের সময় বিহার পুনরায় মালদহকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানিয়েছিলেন (মডার্ণ রিভিউ, সেপ্টেম্বর ১৯৩৮, পৃ-২৪৮)

স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের পূর্বে মালদহের ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে বঙ্গদেশ বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হলে হিন্দু সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। স্যার যদুনাথ সরকার মালদহ ও রাজশাহীকে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির আবেদন জানিয়ে সীমানা নির্ধারণ কমিশনকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছিলেন (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ১৯শে জুলাই, ১৯৪৭)।

মালদহ জেলার ইংরেজবাজার শহর হিন্দুপ্রধান হলেও সামগ্রিকভাবে মালদহ ছিল মুসলমান প্রধান জেলা। এই জন্যই লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর ৩রা জুনের ভারত বিভাগের পরিকল্পনায় মালদহকে পাকিস্তানের অংশে দেখিয়েছিলেন। এই পরিকল্পনা সমর্থন করে জওহরলাল নেহরু, মুহম্মদ আলী জিন্না ও সর্দার বলদেব সিং বেতার ভাষণ দিয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসেই ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়ে যায়। ১৪ই আগষ্ট রাত ১২টায় সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এলেও মালদহ জেলার ভাগ্য তখনও অনিশ্চিত সেইসময় অবিভক্ত মালদহ জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জ্ঞান সিং কহলোন নামে পাঞ্জাবী সিভিলিয়ান। তখন মালদহ জেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতায় চলছিল বৈঠকের পর বৈঠক। মুসলীম লীগ চাইছিলেন মালদহ ভূখণ্ডকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে আর যথারীতি অন্যান্য দলের সদস্যরা চাইছিলেন ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে। এই টানাপোড়েনে বেশ কয়েকদিন কেটে যাবার পর, বিভাজনের সীমারেখা নির্ধারণের ব্যাপারে বাউণ্ডরী কমিশনের কাছে প্রস্তাব দাখিল করার জন্য মালদহ জেলার হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে কলকাতায় যান তৎকালীন মালদহের বিখ্যাত আইনজীবী শিবেন্দুশেখর রায়। আর মুসলীম লীগের পক্ষ থেকে তাদের প্রস্তাব নিয়ে চেষ্টা চালাতে কলকাতায়

যান তৎকালীন মুসলীম লীগ সভাপতি জহর আহম্মদ চৌধুরী এবং সম্পাদক সঈদ মিঞা। ১৫ই আগস্টের আগেই দেশ বিভাজন সম্বন্ধীয় রায় ঘোষিত হয়ে গেল। কিন্তু বঙ্গীয় সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাঁদের সেই রায়ের মধ্যে স্পষ্ট লেখা ছিল না যে, মালদহ ঠিক কোন দেশের অন্তর্ভুক্ত। তাই ১২ই আগষ্ট থেকে ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত মালদহ জেলা পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনের অধীনে ছিল; উড়েছিল পাকিস্তানের পতাকা। এরই মধ্যে পাকিস্তানের সাব ডেপুটি আবদুল করিম চৌধুরীকে মালদহ ট্রেজারীর চার্জ বুঝিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস ১৪ই আগষ্টে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা মালদহ কালেক্টরেটের মাথায় শোভা পেতে থাকে। এইভাবেই কয়েকদিন কেটে যাবার পর দুই পক্ষের চুক্তি অনুসারে ১৭ই আগষ্ট সীমানা কমিশনের পাকাপাকি সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এই বিভাগের ফলে অখণ্ড মালদহ জেলার ১৫টি থানার মধ্যে হরিশ্চন্দ্রপুর, খরবা, রতুয়া, মাণিকচক, কালিয়াচক, ইংরেজবাজার, মালদা, গাজোল, বামনগোলা ও হবিবপুর এই ১০টি থানা ভারতবর্ষের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়ল। বাকি শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল ও গোমস্তাপুর এই পাঁচটি থানা পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পড়ল। অখণ্ড মালদহ জেলার ২০০৪ বর্গমাইল আয়তনের ভূমিখণ্ডের মধ্যে মালদহ জেলার মধ্যে এল ১৪০৮ বর্গমাইল আর বাদবাকি পূর্ব পাকিস্তানের, অর্থাৎ বিতর্কিত ভূমিখণ্ডের ১০টি থানা নিয়ে তৈরী হল মালদহ জেলা আর বাদবাকি পাঁচটি থানা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলা (ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, মালদা, জে. সি. সেনগুপ্ত, পৃ-৩)। সরকারী হিসাবে তাই মালদহের স্বাধীনতা দিবস ধরা যায় ১৭ই আগষ্ট। পরদিন ১৮ই আগষ্ট সোমবার মালদহ জেলার কালেকটরেটের মাস্তুল থেকে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে ভারতীয় পতাকা সগৌরবে উত্তোলিত হল। এই আপাত নিরীহ অথচ সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করলেন তৎকালীন পাবনা জেলার এ. ডি. এম মঙ্গল আচার্য। এরপর ১৯৪৮-এর ১৬ই জানুয়ারী ভারতের মালদহ জেলার প্রথম কালেকটর হিসাবে যোগদান করেন বিখ্যাত জনগণনাতত্ত্ববিদ, চিত্র সমালোচক ও সাহিত্যরসজ্ঞ অশোক মিত্র।

এরপর ১৯৫০ সালে ট্রাইবিউনালের রায় অনুযায়ী মালদহ ও পূর্ব পাকিস্তানেরসীমানার সামান্য পরিবর্তন ঘটেছিল।

- **তথ্য সহায়তা**

১ মধুপর্ণী — মালদহ জেলা সংখ্যা।
২. সংশয়ের দিনগুলো — কমল বসাক (আমাদের মালদা, ২৫শে আগষ্ট)।
৩ Malda — G E. Lambourn

মালদহ জেলায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায় বলেছিলেন —

"কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।"

ভারতবর্ষের অন্যতম প্রান্তিক জেলা মালদহ সম্বন্ধেও একথা সমান প্রযোজ্য। গঙ্গা-পদ্মা বিধৌত, সাগর-পর্বত-ধৃত, পুণ্ড্র-বঙ্গ সমতট এই ভূখণ্ডে প্রাচীনতম কাল থেকে আরম্ভ করে তুর্কী অভ্যুদয় পর্যন্ত কত বিভিন্ন জন, কত বিচিত্র রক্ত, তাদের সংস্কৃতির ধারা বহন করে এনেছে, এবং একে একে কোথায় কে কিভাবে বিলীন হয়ে গিয়েছে অথবা তাদের উত্থান কি ভাবে ঘটেছে ইতিহাস তার সঠিক হিসাব রাখে নি। সজাগ চিত্তের ও ক্রিয়াশীল মননের রচিত কোন ইতিহাসে তার হিসাব নাই এ কথা সত্য কিন্তু মানুষ তার রক্ত ও দেহ গঠনে, ভাষায় ও সভ্যতার বাস্তব অবদানে এবং মানসিক সংস্কৃতিতে এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারে নি। কারণ বর্তমান সমাজ বিন্যাসেই এই রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা আজ আমরা দেখতে পাই।

এই সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি একটি চলমান প্রবাহ। এই প্রবাহ নিরন্তর গতিশীল। পরবর্তীকালে ইতিহাসের আবর্তনচক্রে বার বার নতুন নতুন জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের বিরোধ মিলন ঘটেছে, আজও ঘটে চলেছে, এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। চলমান প্রবাহ, বিরুদ্ধ প্রবাহ, সামাজিক প্রবাহ — এই-তো জীবনের গতিধর্ম। এই ধর্মই জীবনীশক্তি, প্রাণশক্তি। এই প্রাণধর্ম-ই কবির কণ্ঠে ধ্বনিত ঃ

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মেরুপথ গিরি পর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর —
আমার শোনিতে রয়েছে ধ্বনিতে তারি বিচিত্র সুর।

মালদহ জলপাইগুড়ি বিভাগের দক্ষিণতম জেলা ও মোটামুটিভাবে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যস্থলে

অবস্থিত। জেলার উত্তরে রয়েছে পশ্চিম দিনাজপুর ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলা। পূর্ব সীমান্তে পশ্চিম দিনাজপুর আর বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত চিহ্নিত করেছে গঙ্গা-পদ্মা নদী। গঙ্গা-পদ্মার ওপারে বিহারের সাঁওতাল পরগণা ও তার নীচে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ। মালদহ জেলার দক্ষিণাংশটি ভারতের দাক্ষিণাত্যের মত ত্রিভুজাকৃতি।

উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত মহানন্দা নদী জেলাকে মোটামুটিভাবে পূর্ব ও পশ্চিম ভাগে ভাগ করেছে। পূর্ব ভাগ বরিন্দ অঞ্চল নামে পরিচিত। এই এলাকায় আছে গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা। এখানকার মাটি লাল, কঠিন ও অনুর্বর। মহানন্দার পশ্চিম পাড়ের জমি আবার গুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দু ভাগে বিভক্ত। গঙ্গা থেকে নির্গত ও মহানন্দা নদীতে মিলিত পূর্ব পশ্চিমে প্রবাহিত কালিন্দ্রী নদীর উত্তর ভাগকে বলা হয় 'টাল' আর দক্ষিণ ভাগকে 'দিয়ারা'। এই দিয়ারা অঞ্চলটি সবচেয়ে সুফলা ও সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানকার জমি তিন ফসলা।

অবস্থানগত দিক দিয়ে এই জেলা একাধিক জেলার (বাংলাদেশ সহ) প্রান্ত সীমানা ছুঁয়ে রয়েছে। একাধিক নদী থাকায় এখানে সাধারণ মানুষের জীবিকার সম্ভাবনাও অনেক বেশী। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির মানুষ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই জেলায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। এ ছাড়া এ অঞ্চলের নিজস্ব অধিবাসী কিছু রয়েই গেছে। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিবেশী রাজ্য ও রাষ্ট্র থেকে যত মানুষ এই জেলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন তাদের আজ আর আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব না; এমনকি শারীরিক এবং সংস্কৃতিগত আচার আচরনের সুক্ষ্ম পার্থক্যও বোঝা সম্ভব না। কিন্তু তবুও বেশ কয়েক প্রজাতির জাতি ও জনজাতির নাম জনগণনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পেয়ে থাকি। সেগুলি হল এইরকম, ভড়, ভূমিজ, ধাঙ্গর, খারওয়াড়, কোল, মুন্ডা, পাহাড়িয়া, সাঁওতাল, বাগদী, বাহেলিয়া, বাউরি, বেদিয়া, ভুঁইয়া, বিন্দ, বিসা, চাঁই, চামার, মুচি, চন্ডাল, ডোম, দোসাদ, গঙ্গোতা, হাঁড়ি, কাত্তরা, করঙ্গা, কোচ, পলি, রাজবংশী, মাহিলী, মাশ, মালো, মারকান্ড, মেথর, ভুঁইমালী, মুসাহর, পাসি, রাজওয়ার, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ঘাটওয়াল, কায়স্থ, ভাট, বৈদ্য, আগরওয়ালা, সুকুল, ক্ষত্রী, অসওয়ালা, বাক্কাল, বানিয়া, সুবর্ণবনিক, গন্ধবনিক, গোয়ালা, গরেরি, গামবার, মোদক, কৈবত, আগুরি, বারুই, তামালি, সদগোপ, মালি, কোয়েরি, কুর্মী, নাগরা, ধোপা, হাজ্জাম, বেহারা, ডুলিয়া, কাহার, ধামুক, কামার, কাঁসারি, সোনার, সূত্রধর, কুমার, লাহেরি, শাঁখারি, শুঁড়ি, তেলি, কলু, তাঁতি, রজক, যোগী, গনেশ, কপালি, ধুনিয়া, বেলদার, চুনারী, নায়েক, নুনিয়া, পুন্ডারী, কান্ডারী, তুরহা, জালিয়া, মালো, মাছুয়া, তিয়র, পাটনী, পোট, গন্‌রি, বাণফোঁড়, বাথুড়া, কেওট, মারয়ারী, সুরাহিয়া, বাহতি, বৈষ্ণব, গোঁসাই, দেশী, খৃষ্টান।

বরিন্দ অঞ্চলের বসবাসকারী সম্প্রদায় ঃ

বরিন্দ অঞ্চলের দিগন্ত প্রসারিত লাল মাটির আঙ্গিনায় পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বসবাস করে সাঁওতাল, পলিয়া, বাজবংশী, কোচ, কোল ও মুণ্ডা। নমঃশূদ্ররা বাস করে ডোবা এলাকায়। তারাও নিজেদের পরিশ্রমে গড়ে তুলেছে সবুজ ঘেরাটোপের ছায়া সুনিবিড় গ্রাম। শস্যে ভরা জমি। আর শহর গঞ্জে আছে সম্পন্ন কিছু পরিবার- যারা আদিবাসী নন, মিশ্র জাতি, মিশ্র বৃত্তির। বরিন্দ অঞ্চলের বসবাসকারী সম্প্রদায় বলে কিছু জনজাতি বা অধিবাসী চিহ্নিত হলেও তারা জেলার

সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছেন। এইসব অঞ্চলেই তারা প্রথম দিকে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন এইরূপ অনুমান করেই এইরকম একটি সাধারণ বিভাজন করা হয়েছে।

সাঁওতাল ঃ

মালদহ জেলার কৃষিজীবী অমুসলমানদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় বরিন্দ অধিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কথা। এই সব সাঁওতালরা এসেছিল বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নীল চাষের ব্যবসা যখন মালদহে খুব লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠল, তখন এই ব্যবসা থেকে আরও মুনাফা লাভের আশায় নীল কারখানাগুলিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করানোর জন্য নীলকর সাহেবেরা শ্রমিক হিসাবে বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে প্রচুর সাঁওতাল এনেছিল। সেই থেকেই তারা এখানে থেকে গেছে।

মালদা জেলায় সাঁওতালদের বসতি গড়ে ওঠার আরও একটি কারণ রয়েছে। ১৮৫৫ খৃঃ বিহারের সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালেরা ঔপনিবেশিক শাসন এবং সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ফলে অনিবার্য সরকারী অকথ্য অত্যাচার চলে তাদের উপর। ক্রমাগত এই অত্যাচারে সাঁওতালদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়েছিল, তখন বেশ কিছু সাঁওতাল নিরাপদ জায়গার আশায় এদিক-ওদিক আশ্রয় নিয়েছিল। এই বিদ্রোহী সাঁওতালদেরই বেশ কিছু অংশ এসেছিল মালদাতে।

সর্বত্রই সাঁওতালরা নিজেদের 'হড়' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। 'হড়' কথাটির অর্থ হল মানুষ। সাঁওতাল ঐতিহ্য অনুসারে ' খেরওয়াড়' জনপ্রবাহ থেকে সাঁওতালদের উদ্ভব। ধর্মের দিক থেকে এই সম্প্রদায় চারটি ভাগে বিভক্ত। খ্রীষ্টান, হিন্দু, খেরোয়ার এবং সাঁওতাল। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী সাঁওতালদের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও অনুল্লেখ নয়। হিন্দু সাঁওতালদের "সত্যম শিবম্" সম্প্রদায়ের লোক বলা হয়। এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও এক সময়ে। বিহার রাজ্যের এক হিন্দুধর্ম নেতা খেরোয়ার সাঁওতাল সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন। এই সম্প্রদায়ের গায়ের রঙ অন্যান্য সাঁওতালদের থেকে কিছুটা ফর্সা।

সাধারণ সাঁওতালরা মোট ১২ টি গোত্রে বিভক্ত — মুর্মু, কিস্কু, হেমব্রোম, হাঁসদা, সোরেন, টুডু, বেসরা, বাস্কে, চোবে, বেদিয়া ও পাউরিয়া। একই গোত্রের সাঁওতাল মেয়েদের সাথে বিবাহ হয় না। সাঁওতালরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গোত্রের বাধা নিষেধ মেনে চলে এবং গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক (Totem) কে শ্রদ্ধা করে।

মুণ্ডা ঃ

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব কটি জেলাতেই মুণ্ডারা অল্পবিস্তর ছড়িয়ে আছে। 'মুণ্ডা' শব্দটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত মুণ্ড শব্দ থেকে এসেছে। 'মুণ্ড' মানে মাথা। চলতি কথায় এখনও গ্রামের মাথা বলতে গ্রামের প্রধান বা মোড়লকে বোঝায়। মুণ্ডা জাতির উৎস সম্পর্কে খোঁজ করলে জানা যায় যে, তারা মূলত এসেছে ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদি-অস্ট্রাল শ্রেণী থেকে, যাদের বলা হতো মুরা, 'হোরোহন' বা হোরো-কো। এই হোরো-কো শব্দের অর্থ হল মানুষ। কোনও এক সময়ে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা সর্দারকেই বলা হত মুণ্ডা, ক্রমে সমগ্র গোষ্ঠীই মুণ্ডা নামে পরিচিত

হয়ে উঠল। ভুমিস্বত্বের ব্যাপারে কিংবা সামাজিক রীতি-নীতির ক্ষেত্রে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য চিরকালই রক্ষা করে এসেছে। ইংরেজ আমলের আগে পর্যন্ত তাদের এই স্বতন্ত্রতা অটুট ছিল।

মুন্ডা জনজাতিরা ঠিক কোন সময়ে ভারতবর্ষে এসেছিল তা সঠিক জানা যায় না। কেউ বলেন তারা হিমালয় থেকে এসেছিল, কারো মতে সাগর পার থেকে, কেউ বলেন এই মুন্ডারাই ভারতের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিহারের ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা, ওড়িষ্যার বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, প্রাচীন বাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, দিনাজপুর ও মালদহ জেলায় বহুদিন ধরেই তারা বসবাস করছে।

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে মুন্ডারা অস্ট্রেলিয় আদি অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এদের শির দীর্ঘ, গায়ের রঙ কালো, চুল কোঁকড়া, নাক ছড়ানো এবং আকৃতিতে খর্ব। এরা মূলত কৃষিকাজে অভ্যস্ত। এরা খুব সংস্কৃতি সচেতন। ভারতীয় আর্যভাষা ও সংস্কৃতিতে এই মুন্ডা জনজাতির দান অপরিসীম।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই মুন্ডারা চরম আর্থিক সমস্যায় পড়লে এর সুযোগ নেয় তৎকালীন শাসক ইংরেজরা তাদের খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করে। বর্তমানে তাই মুন্ডাদের অনেকেই আদিবাসী নামের সঙ্গে খৃষ্টান পদবী ধারণ করতে দেখা যায়। কিন্তু আদিতে এই সম্প্রদায় সম্‌সার বা সেমি হিন্দু ছিল। এরা ভগবান হারাম্‌ এ বিশ্বাস করে যিনি জগৎ ও জীবনের স্রষ্টা। আর উপাস্য দেবতা সিঙ্গ বোঙ্গা। এদের দেবতার কোন মূর্তি নেই। এরা আদিতে সূর্য এবং প্রকৃতির উপাসক।

মুন্ডাদের ভাষার সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া, মালয় অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষার মিল আছে। আবার অনেকে দ্রাবিড় ভাষাভাষির গোষ্ঠীভুক্ত বলেও এদের মনে করেন। তবে একথা ঠিক যে, মুন্ডা সম্প্রদায় অস্ট্রো এশিয়াটিক গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাভাষির লোক। মুন্ডারী ভাষায় এখনও পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট লিপি তৈরী হয়নি। তাদের ভাষার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা রোমান হরফে মুদ্রিত।

রাজবংশী ঃ

সংখ্যায় সাঁওতালদের পরেই রাজবংশীদের স্থান। এ প্রসঙ্গে মীনহাজ-ই-সিরাজ-এ তবকাত-ই-নাসিরী জানাচ্ছেন — বাঙলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে দিনাজপুর ও রংপুর জেলার উত্তরাংশে, পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশে একটি পৃথক নরগোষ্ঠী দেখা যায়, চ্যাপ্টা নাক, উন্নত গণ্ডাস্থি, বঙ্কিম চক্ষু, উদ্দণ্ড কেশ, এবং কেশবিহীন দেহ ও মুখমণ্ডল-এর অধিকারী, এ নরগোষ্ঠী যে আদিতে মোঙ্গলিয় রক্তধারা থেকে উৎপন্ন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পলিয়া ও কোচ নামে এরা সাধারণভাবে পরিচিত যদিও এই উভয় নামই তাদের কাছে খানিকটা অপমানজনক। এরা নিজেদের রাজবংশী, বর্মণ, রায়, ভঙ্গক্ষত্রিয় ইত্যাদি নামে পরিচিত করতে অধিক আগ্রহী। ক্ষত্রিয় নিধনকারী পৌরাণিক পুরুষ পরশুরামের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য এদের ক্ষত্রিয় পূর্বপুরুষগণ নাকি আর্যাবর্ত, ক্ষাত্রধর্ম ও আচার-আচরণ পরিত্যাগ করে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত বাঙলা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে আত্মগোপন করে সেখানেই বসবাস করতে থাকে। সেই সূত্রে তারা নিজেদের ভঙ্গক্ষত্রিয় বলে পরিচিত করে এবং এদের

*মধ্যে অনেকে উপবীতও ধারণ করে। ইতিহাসগত ভাবে এই নরগোষ্ঠীর আগমন বাঙলা দেশের উত্তরাঞ্চলে ঘটেছিল বলে পণ্ডিত মহলের অভিমত। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, সপ্তম শতকে গৌড়রাজ শশাঙ্কর (মৃত্যু-৬৩৭ খৃঃ) মৃত্যুর আগে এবং কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের (মৃত্যু-*৬৪৭ খৃঃ) মৃত্যুর পরে বাঙলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অর্থাৎ গৌড়রাজ্যে মাৎস্যন্যায় নামক এক অরাজক অবস্থা প্রায় শতাব্দীকাল বিদ্যমান ছিল। সেই অরাজক অবস্থায় কোনও এক সময়ে তিব্বত রাজ স্রং-সান-গ্যাম্পো (Strong-Tsan-Gampo) গৌড়দেশ অধিকার করেন বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। সেই সময়ই বাংলাদেশের গৌড় রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও আসামের কামরূপে পূর্বোক্ত মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর মানুষের অধিক সংখ্যায় আগমন ও স্থিতিলাভ ঘটে বলে অনেকের অনুমান।

তবে রাজবংশীরা যে ভোটবর্মী বা মঙ্গোলিয়ান তা তাদের চেহারাতেই অনুমিত হয়। কোন কোন রাজবংশীরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। তাদের পদবীর মধ্যে রয়েছে সিংহ, সিংহরায় এবং সরকার। রাজবংশীরা সাধারণতঃ বঙ্গাল নামে পরিচিত। তাদের বসবাসের এলাকাকে তারা 'বঙ্গালপাড়া বলে চিহ্নিত করে। এদের নিজেদের শাসন পদ্ধতিতে এখনও একজন রাজাকে রেখেছে। এলাকার মণ্ডল বা মহতের বিধি ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হলে তারা এই রাজার কাছে সুবিচার চায়। রাজবংশীদের মধ্যে 'নিকা প্রথা' এবং 'বিধবা বিবাহ প্রথা' প্রচলিত আছে। তা ছাড়া রয়েছে 'ডাঙ্গুয়া প্রথা', এই পদ্ধতিতে মেয়েরা তাদের পছন্দের পুরুষকে ঘরে রাখতে পারে। বর-কনের বাবাকে যৌতুকও দেয়। এ ছাড়া কনের বাড়ির ভোজের খরবও বরের পরিবারকেই বহন করতে হয়।

রাজবংশীদের মধ্যে প্রায় সব ধর্মমতের মানুষ দেখা গেলেও অধিকাংশ রাজবংশীরাই বৈষ্ণব মতাবলম্বী।

কৃষিকার্যে রাজবংশীরা বিশেষ পটু। তরি-তরকারী বিশেষত তামাক চাষে এদের দক্ষতা অনস্বীকার্য।

মালদহ জেলার বামনগোলা থানার নিমডাঙ্গা , নালাগোলা, হবিবপুর থানার আত্‌লা, দোঁকলা, সিঙ্গাবাদ, গাজোল থানার রানীগঞ্জ, ওল্ড মালদার বালিয়া, নবাবগঞ্জ, কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ, সুকুলাপুর, চক বাহাদুর পুর, চাঁচল থানার দৈ ভান্ডা ইত্যাদি অঞ্চলে রাজবংশী সম্প্রদায় অধিক পরিমাণে বসবাস করে।

পলিয়া ঃ

পলিয়া সম্প্রদায় দুভাগে বিভক্ত। সাধু পলিয়া এবং বাবু পলিয়া। বাবু পলিয়াদের আচার-আচরণে রাজবংশীয়দের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। সাধু পলিয়ারা আচরণে স্বতন্ত্র ধারা অনুসরণ করে। এরা নিরামিষভোজী। সাধু পলিয়ারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবী করে এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। এদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন নেই। উচ্চবর্ণের হিন্দু আচারের সঙ্গে এদের মিল আছে। প্রচলিত আছে যে, কোনও এক সময়ে এরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছিল তাই এরা পালিয়া বা পলিয়া।

দেশী :

দেশী অর্থাৎ গৌড় দেশী। সম্ভবত গৌড় রাজ্যের পতনের পর এদের পূর্ব পুরুষেরা গৌড়ের কাছাকাছি কোন জায়গায় বসবাস শুরু করে বলে নিজেদের পরিচয়ে বলে গৌড় দেশী। এদের আচার-আচরণ অনেকটা রাজবংশীদের মতই।

কোচ :

ভোটবর্মা বা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অধিবাসীদের মধ্যে কোচেরাই সব চাইতে অনগ্রসর ও অনুন্নত। এরা শিবের উপাসক। পূজা-পার্বণে এরা পায়রা বলি দেয় ও তার রক্ত পান করে। এদের মধ্যে এখনও বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। এরা গৌড়েব আদি অধিবাসী বলে দাবী করে থাকে।

নমঃশূদ্র :

এ ছাড়া রয়েছে অন্ত্যজ নমঃশূদ্ররা। এরা প্রয়োজন অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন রকম কাজ করে জীবিকা অর্জন করে।

মারোয়াড়ী :

বরিন্দের অন্যতম থানা পুরাতন মালদহে আছে বেশ কিছু মারোয়াড়ী সম্প্রদায়। ব্যবসায়ের সূত্র ধরে এরা এসেছিল বিহার, উত্তর প্রদেশ ও গুজরাট থেকে। মূল ব্যবসা ছিল কাপড়ের। পাঠান-মুঘল এমনকি ইংরেজ আমলেও এরাই বস্ত্র-ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতেন। বহুদিন বাংলা দেশ তথা মালদহে থাকার ফলে এবং সাংস্কৃতিক মিশ্রণের ফলে এই মারোয়াড়ীরা বাঙ্গালী হয়ে গেছেন। এরা সাধারণত দু ভাগে বিভক্ত — আগরওয়ালা এবং মাহেশ্বরী। আগরওয়ালারা জৈন আর মাহেশ্বরীরা হিন্দু। কিন্তু পুরাতন মালদহে বহুদিন থাকার ফলে এবং মালদহে চৈতন্যদেবের আসার কারণে উভয় সম্প্রদায়ই এখন মোটামুটি সনাতন বৈষ্ণব ধারার মতাবলম্বী এবং নিরামিষাসী। ব্যতিক্রম ছাড়া এদের বিবাহ হয় সাধারণত নিজেদের প্রজাতি বিহার ও উত্তর প্রদেশের সাথে।

আগরওয়াল :

পুরাতন মালদহের অনেক জায়গায় এমনকি ইংরেজবাজার থানা এলাকাতেও অনেক আগরওয়াল মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করেন। ভারতের উত্তর- পশ্চিম অংশের দেশগুলি থেকেই এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এই অঞ্চলে এসেছিল কিন্তু ঠিক কতদিন আগে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও মোটামুটি সময়টা আন্দাজ করা যায়। গৌড়দেশ তখন রাজধানী হিসাবে অতি সমৃদ্ধশালী ছিল। বাংলাদেশের এই সমৃদ্ধির কথা মহানগরী দিল্লী এবং উত্তর-পশ্চিম দেশের মানুষের অজানা ছিল না। তারা ধনবৃদ্ধি এবং জীবিকার অন্বেষনে ঐ সমস্ত দেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে গৌড় দেশে এসে বসতি স্থাপন করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবসা শুরু করে। এরপর পাঠান বাদশাগণ যখন গৌড়ের সিংহাসনে তখন দিল্লীশ্বর আকবর তাঁর সেনাপতি

মানসিংহকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদার পদে বহাল করেন। মানসিংহ ৫৯২ খৃঃ এদেশে এসে গঙ্গাতীরবর্তী পশ্চিম তটভাগ অধিকার করে 'আনমহল' নামে রাজধানী স্থাপন করেন। পরে তিনি ঐ নামটি 'রাজমহল' নামে রূপান্তরিত করেন। মানসিংহ রাজমহলের শ্রীবৃদ্ধি এবং জনপ্রিয়তার কারণে পশ্চিম দেশ থেকে অনেক মহাজন পণ্য ব্যবসায়ী, শিল্পী প্রভৃতি লোককে নিয়ে আসেন। গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে ব্যবসা-বানিজ্যের প্রভূত সুবিধার কারণে সেই সময় প্রায় দুইশত ঘর এই সম্প্রদায়ের লোক এখানে আসেন। ইতিমধ্যে গৌড়ে পাঠান শাসনের অধিকার শিথিল হলে সেই সুযোগে রাজমহল তার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। তখন গৌড়দেশে বসবাসকারী ব্যবসায়ীগণ গৌড়দেশ ত্যাগ করে রাজমহলে বসতি স্থাপন করেন। গৌড় জনপদ থেকে আসায় সকলে তাদের 'গৌড়বণিক' বলতেন। এদের বেশীর ভাগের ব্যবসা তখনও মহাজনী, তেজারতি, আর কাপড়ের ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজমহলে এদের নির্দিষ্ট এলাকা ছিল 'নবাব ডেহরীর সরিফা বাজার'।

কারো কারো মতে অগ্রবাল বা আগরওয়ালারা শুঁড়ি সম্প্রদায় ভুক্ত লোক এবং এই জেলারই আদি বাসিন্দা এইরকম অনুমানের কারণ এদের কারো কারো নামের সঙ্গে এখনও 'শা' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন— রসিক শা, যোগেন শা, নরেন শা ইত্যাদি। এদের প্রকৃত পদবি দাস এইরূপ অনুমান। অনেকের আবার এই যুক্তি অগ্রাহ্য করে বলেন 'শা' পদবিযুক্ত মানেই এই নয় যে তাঁরা সকলেই শুঁড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত, সাধারনতঃ যারা পসার হাটার ব্যবসা করেন তাদের শাহজী বলা হয়। এই শাহজী থেকে ই শা কথাটির উৎপত্তি। পুরাতন মালদার শুঁড়িপাড়া বলে এখনও একটি গ্রাম আছে। তারা সকলেই শুঁড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, আবার আগরওয়াল পদাধিকারী পরিবার রা নিজেদের শুঁড়ি সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। নিজেদের পরিচয়ে এরা তাদের পূর্বপুরুষ হিসাবে রাজা উগ্রসেন বা অগ্রসেনের বংশধর একথাই বলে থাকেন।

শেঠ ঃ

পন্ডিত হরিদাস পালিত মহাশয় লিখিত 'মালদহের রাধেশ শেঠ' বইটিতে শেঠ সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তিনি শেঠ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন— 'মালদহের শেঠ সম্প্রদায়ের আদি বাসস্থান পুরাতন মালদহ নহে, যে সময়ে হজরৎ পান্ডুয়া বঙ্গের প্রধান নগরী ছিল, সে সময়ে জলঙ্গী নদী পুরাতন মালদহের উত্তর ও পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হোত, যে সময়ে মোরগাঁ, মাধাইপুর, সাকোল, সাকরমা সন্ন্যাসী, পাটন প্রভৃতি বানিজ্য প্রধান উপনগরীগুলি ধনেজনে পূর্ণ ছিল, সে সময়ে পান্ডুয়ার দক্ষিণে সূর্যাপুর নামক স্থানে সুবৃহৎ সূর্যদেব প্রতিষ্ঠিত ছিল। অনতিদূরে ছিল ঠাকুরবাড়ী, দিঘির (বর্তমান পারাদিঘি) সন্নিকটে একটি সুবিশাল উপনগর, পান্ডুয়া সেই সময় বিখ্যাত বন্দর রূপে বিদ্যমান ছিল। সেইখানে এই শেঠ বণিকদের ঘন বসতি ছিল।"— সুতরাং অনুমান এই সম্প্রদায় হিন্দু রাজাদের আমল থেকেই গৌড়ে তারা বসবাস করতেন। এরা সেই সময় গৌড়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রভুত বিত্ত উপার্জন করেছিলেন। তখন তাদের পরিচিতি ছিল শ্রেষ্ঠী বা ধনকুবের বলে। তারপর সম্ভবতঃ পাঠান রাজত্বকালে তারা শেঠ উপাধি পায়। সংস্কৃতে শ্রেষ্ঠী শব্দের তাই বণিক আর হিন্দি 'শেঠ' বলতে বৈশ্য জাতিমধ্যে শ্রেষ্ঠ এইরকম অর্থ বোঝায়।

একসময় প্রভূত অর্থের অধিকারী এই সম্প্রদায়ের সেই সম্মান অনেকটাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে শেঠ উপাধিবাচক তন্তুবায়গণ মহানন্দা নদীর তীরবর্ত্তী সর্বরীতে বসবাস করেন। পাঠান আমল এবং তারও পরবর্তীকালে এরা রেশম ও কার্পাস থেকে নানারকম রঞ্জিত ও অরঞ্জিত বস্ত্রপ্রস্তুত করত। বুলাচাঁদ শেঠ নামে একজন বস্ত্র ব্যবসায়ীর নাম পাওয়া যায় যার নির্মিত কার্পাস ও রেশমীবস্ত্র কলকাতা থেকে জাহাজযোগে বিদেশে রপ্তানী হোত। এখন আর কোন নির্দিষ্ট পারিবারিক ব্যবসায় সূত্রে এরা আবদ্ধ না।

বসাক ঃ

বসাক সম্প্রদায়ের আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণ ছিল বস্ত্র কেন্দ্রিক। তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রধানত গাজোল থানা ও তৎকালীন অবিভক্ত মালদহের রোহন পুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলো। বসাকপাড়ার তারাপুরে প্রায় প্রত্যেকের একটি করে আস্তাবল ছিল, এতটাই ছিল তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি। আদি বসাক বলতে ঢাকা জেলার তন্তুবায় সমাজকে বোঝায়। ঢাকার বসাকরা কারুকার্য খচিত সুক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন শিল্পে ভারতবর্ষ তথা ভারতের বাইরের মানুষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গৌড়-পাভুয়ার ঐতিহ্য মন্ডিত দিনগুলিতে এই বস্ত্রশিল্প নদীপথে ঢাকা ও মালদহে নিয়মিত যাতায়াত করত। শোনা যায় এরপর ইংরেজ আমলে এই সম্প্রদায় তাদের শিল্প নৈপুন্যের প্রতিভাকে ইংরেজদের কাছে সমর্পণ না করে নিজেরা বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এক ব্যাপক মহামারীর কারণে সর্বরীতে বসবাসকারী বসাকরা মালদা জেলার রায়পুর ও গোপালপুর গ্রাম পরিত্যাগ করে পুরাতন মালদহে ভিড় করে। আগে এই সম্প্রদায় দাম উপাধিতে পরিচিত হোত পরে বসাক বা অন্যান্য উপাধি গ্রহন করে। তারাপুরে বসবাসকরী বসাক গোষ্ঠীর পরিধি ছিল বিরাট। এরা নিখুঁত এবং সুক্ষ্ম কাজের সূজনী, কাঁথা শিল্পের জন্যে বিখ্যাত ছিল। এরপর এই সম্প্রদায়ের মানুষজনের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে জলঙ্গী নদীর তীরস্থ পুরাতন আবাস পরিত্যাগ করে আরাপুর, সাহাপুর, বাঁশবাড়ী, মকদুমপুর ও তারাপুরে নিজেদের বসতি স্থাপন করে। এই পাঁচটি গ্রামে তারা বসবাস করত বলে নিজেদের 'পঞ্চগ্রামের অধিবাসী' বলত।

পঞ্চগ্রামের এই বসাক সম্প্রদায় পৌষমাসের কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে বনভোজনের আয়োজন করতেন। এবং এই উপলক্ষে সকালে একত্র মিলিত হয়ে খাওয়া দাওয়া, পারিবারিক কুশল বিনিময় ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যের হাল হকিকতের খবর নেওয়া এবং বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থির করতেন।

কোম্পানির আমলে বসাক সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত পরিবারের স্ত্রীলোকেরাও সূত্র নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ছিল এবং শুধু তাই নয় সূজনী ও সুদৃশ্য কাঁথা প্রস্তুত করে তারা প্রভূত অর্থও উপার্জন করত। মালদহী এইসব নিজস্ব বস্ত্রবয়নের জন্যে সে সময় মালদহ ও তার চতুর্দিকে প্রায় আট হাজার তাঁতি ছিল। পুরাতন মালদার মোকাতিপুর গ্রামে এই সময় প্রায় আটশত তন্তুবায় ছিল। বিভাগ পূর্ব মালদহে গ্রামের পর গ্রাম এই সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল ছিল। পুরাতন মালদহ থেকে সাহাপুর পর্যন্ত এই দীর্ঘ অঞ্চলে এতটাই ঘনবসতি এবং সারা দিনরাতের কর্মব্যস্ততা ছিল যে কথিত আছে গৃহগুলির দীপ শিখার আলোকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পথিকেরা নির্ভয়ে বিনা আলোকেই যাতায়াত করতে পারত।

রজক :

পুরাতন মালদহে আর একটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। উপাধি সূত্রে তারা রজক আর জীবিকা সূত্রে যারা ধোপা। গৃহস্থের বাড়ী থেকে কাপড় সংগ্রহ করে নদী বা পুকুরে পরিস্কার করা এদের কাজ নয়। তাঁতীরা যে কাপড় বুনত সেই কাপড় পালিশ করে ঔজ্জ্বল্য আনার দায়িত্বে ছিল এই সম্প্রদায়। এইভাবে তারা একদিকে কাপড়ের গুণগত মান বৃদ্ধি করত অপরদিকে এর ফলে তাদের আর্থিক সমৃদ্ধিও ছিল উচ্চে। মালদহের বস্ত্রশিল্পের সেই সমৃদ্ধির যুগে তাঁতিদের কাছে এই রজক সম্প্রদায়ের সমাদর ছিল তুঙ্গে।

ঘোষ :

মালদহ জেলার সর্বত্র হিদুধর্মাবলম্বী যে সম্প্রদায় ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে রয়েছে তা হল ঘোষ সম্প্রদায়। এদের মধ্যে একদল শিক্ষিত শ্রেণী যেমন রয়েছেন, তেমনি অশিক্ষিতের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। মালদহ জেলায় ঠিক কবে থেকে এরা বসবাস করছেন সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা না গেলেও এরা এসেছেন সম্ভবত একদল বাংলাদেশ ঢাকা, রাজসাহী ইত্যাদি থেকে অন্যদল বিহার থেকে।

ঘোষ সম্প্রদায়ের উৎস অনুসন্ধানে প্রাচীন যে নামটি পাওয়া যায় তিনি রামায়ণোত্তর ধ্রুপদী যুগের সূচনাপর্বের কবি, নাট্যকার ও বৌদ্ধধর্মাচার্য অশ্বঘোষ, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাহিত্যিক অবদানে যিনি চিরস্মরণীয়। হিন্দুধর্মের জাতিভেদ ও রক্ষণশীলতার বিপক্ষে বৌদ্ধ ধর্মের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর আদর্শে সর্বস্তরে যখন আলোড়ন তখন এই ধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন যুগ সন্ধিক্ষণের এই কবি অশ্বঘোষ। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি বুদ্ধের ধর্মমতের প্রতি প্রবল অনুরাগবশে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শন, ব্যকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তার গভীর পান্ডিত্য ছিল, বুদ্ধচরিত ও সৌন্দর নন্দ মহাকাব্য এবং শারিপুত্ত প্রকরণ নামক নাটক অশ্বঘোষের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

দ্বিতীয় যে নামটি পাওয়া যায় সেটি মহাভারতের দমঘোষ। উনি চেদি রাজ্যের রাজা ছিলেন। চেদিরাজ্য ছিল তৎকালীন দোর্দন্ড প্রতাপশালী মগধরাজা জরাসন্ধের অনুগত রাজ্য। দমঘোষের বিবাহ হয় বাসুদেব ভগিনী শ্রুতশ্রবার সঙ্গে। এরপর তাঁদের দুই পুত্র জন্মে একজন শিশুপাল অন্যজন দন্তবক্র। মগধরাজা ছিলেন গোধন রক্ষাকারী যদুবংশের প্রতি একান্তভাবে বিরূপ। তাই তাঁর ইঙ্গিতে শিশুপালকে ক্রমাগত আত্মীয় যাদবগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করতে হয়েছিল। এই অন্যায়ের অবসান ঘটান যদুবংশের অন্যতম কর্ণধার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তাই পরবর্তী সময়ে শ্রী কৃষ্ণের বংশধর যারা যাদব নামে অভিহিত হন তারাই প্রকৃত ঘোষ নামে নিজেদের অবিহিত করতে চান। বল্লাল সেনের যুগে এই ঘোষ সম্প্রদায় তাই ব্রাহ্মণদের পরেই কুলীন কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে সমাজে উচ্চবর্ণের সম্মান লাভ করেন।

যোগী জাতি :

সংখ্যায় অল্প হলেও মালদহের বরিন্দ অঞ্চলে একটি সম্প্রদায় দেখা যায়, তারা নিজেদের পরিচয়ে যোগী বলে থাকে। এরা গায়ে ছাই ভস্ম লেপন করে কপালে ত্রিদণ্ড অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক

কাটে। গাঢ় রঙে বেরঙের বস্ত্র পরিধান করে এবং বীণা জাতীয় যন্ত্র হাতে পরিভ্রমণ করে। যতদূর সম্ভব সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে এক সময় যে নাথ সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিল এরা তারই উত্তরসূরী। জীবন থেকে মুক্তি নয়, জীবনেই মুক্তি, তার জন্য প্রয়োজন অলৌকিক অতি লৌকিক শক্তি, প্রাচীন ভারতীয় রসসিদ্ধাদের পরিচয়বাহী এই বক্তব্যই নাথ মতবাদের মূল উপাদান। এই ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য সন্ন্যাস প্রিয়তা ও নারীবিদ্বেষ। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই মতবাদ প্রচার ও প্রসারিত করেন মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা ইত্যাদি গুরুবা। যদিও পূর্বকৃত ধর্মের কঠোরতা থেকে এই সম্প্রদায় আজ অনেকটাই সরে এসেছে। এদেরই দীক্ষিত গৃহিরা বর্তমানে যোগী জাতি বলে পরিচিত।

দিয়ারা অঞ্চলের বসবাসকারী সম্প্রদায় ঃ

ডঃ সুকুমার সেন 'দিয়ারা' শব্দের মূল যে প্রতিশব্দগুলি দিয়েছেন তা হল — দেববাটক — দেবতার স্থান, দেবকবটক — দেবতার অধিষ্ঠান বটবৃক্ষ, দৈববটক — যে বটগাছ থেকে দৈববাণী হয়, দ্বীপবাটক — দ্বীপময় স্থান, দিতপাটক — দেওয়া পাড়া, দীপকপাটক — উজ্জ্বল পাড়া, দীর্ঘকবটক — উঁচু বটগাছ ইত্যাদি (বাংলার স্থান নাম ঃ সুকুমার সেন)। আর সাধারণ অর্থ হল — নদী থেকে উঠে আসা চর। এর সঙ্গে হিন্দী শব্দ 'দেহি'-র মিল আছে। 'দেহি'-র শব্দার্থ 'জলাভূমি' আর দিয়ারা শব্দের অর্থ জল থেকে উঠে আসা ভূমি। অনেকের মতে দিয়ারা শব্দটি মাগধী। ফার্সীতেও 'দিয়ারা' শব্দটি পাওয়া যায়, যার অর্থ 'শরৎকালে জলপ্লাবিত অঞ্চল।' এই অঞ্চলের থানাগুলি হল রতুয়া, ইংরেজবাজার, কালিয়াচক ও মাণিকচক। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে পরিচিত নাও হতে পারে। তারা মাগধী বা ফার্সী শব্দের সুত্র ধরেই এই অঞ্চলের নামকরণ করেছে ধরে নেওয়া যায়। এই এলাকার মুখ্য অধিবাসীদের মধ্যে আছে বাদিয়া, মৈথিল, খোট্টা, নাগর, ধানুক, চাঁই।

পণ্ডিত ঃ

মালদহ জেলার ইংরেজবাজার ও অন্যান্য জায়গায় পণ্ডিত উপাধিধারী এক সম্প্রদায় আছেন। মাটির দেবীপ্রতিমা বা পুতুল গড়ার কাজে যারা বিশেষভাবে দক্ষ। এঁরা আদিতে বিহারের দাশপুর পাটনার বাসিন্দা হলেও আজ প্রায় সাত পুরুষের অধিককাল ধরে মালদহে বসবাসের সূত্রে আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠানে প্রাক্তন বিহারের প্রভাবমুক্ত হয়ে এদেশীয় রীতি নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। কনৌজিয়া শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্রভুক্ত এই কুম্ভকার সম্প্রদায় প্রথমে গৌড় তারপর শেষে মালদহ শহরে এসে বসবাস করেন। হাটখোলা ও উত্তর বালুচর ছাড়াওমালদহের অন্যত্রও এদের দেখা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ ঐতিহ্যমণ্ডিত পণ্ডিত পদবি ত্যাগ করে পাল পদবি গ্রহণ করেছেন। বৈবাহিক সম্বন্ধের ব্যাপারে আগে এঁরা বেশ সংস্কারপন্থী ছিলেন যেমন বিহারের সাহেবগঞ্জ, পূর্ণিয়া, ও ভাগলপুরের নিজস্ব সংস্কৃতির লোক ছাড়া বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতেন না। বর্তমানে এই সংস্কার দূর করে বাংলার নানা স্থানেই তাঁদের বৈবাহিক সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে। আচার সংস্কৃতিতে বিহার ও এদেশীয় আচরণ মিলে মিশে রয়েছে। নতুন বছরের প্রথম দিনে এবং বিজয়া দশমীতে এঁরা বাস্তু দেবতা মহাবীর ও বাস্তুদেবী পরমেশ্বরীর

পূজা করেন, বিশ্বকর্মা পূজার দিন আবার বিহারের অনুকরণে 'হাতিয়ার' পূজাও করেন। আবার বিহারের 'ছট্' পূজার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ না থাকলেও যোগ আছে বাংলার 'নবান্ন' উৎসবের সঙ্গে।

জীবিকা অর্জনের প্রথম দিকে এঁরা মাটির পুতুল ও দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও দৈনন্দিন তৈজস সামগ্রী কিছু কিছু তৈরী করতেন। কিন্তু বর্তমান দু-পুরুষ এঁরা শুধু পুতুল ও দেবদেবীর প্রতিমা নির্মাণকেই প্রধান জীবিকায় পরিণত করেছেন। আছে রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, নতুনখাতা মহরৎ ও দেওয়ালির দিন গণেশ ও লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রতিমা নির্মাণ। শ্মশান, মশান, তারাকালী, কাঁচা খাওকী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ থানের বাৎসরিক স্থায়ী কালী মূর্তি নির্মাণ করেন এই পণ্ডিত পরিবার। এগুলির মধ্যে বালুচরের শ্মশান কালী ও চিত্তরঞ্জন মার্কেটের 'কাঁচা-খাওকী' কালীর মুখার স্বতন্ত্রতা লক্ষ্যনীয়। এছাড়াও শহরের বাইরে 'চুঙিয়াটুলির' কালীও বেশ কয়েক পুরুষ ধরে এঁদের হাতে নির্মিত হয়ে আসছে। এই কালী মোখাগুলি নির্মাণের মধ্যে দিয়ে এখনও তাঁরা বরেন্দ্র বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যগুলি সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন। এই মুখা তৈরীর সূত্রেই পণ্ডিত পরিবারের পূর্ব পুরুষের কয়েকজন গম্ভীরা গানের সংস্পর্শে আসেন। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ গম্ভীরা গায়ক হিসাবে অমৃতলাল পণ্ডিত, বিশ্বনাথ পণ্ডিত এবং দুর্গা পণ্ডিতেরা নিজেদের নাম সংযোজিত করতে পেরেছেন নিজস্ব প্রতিভার কারণেই।

গোস্বামী বা গোঁসাই ঃ

মালদহের ইংরেজবাজার ও অন্যান্য অঞ্চলে গোস্বামী বা গোঁসাই পদবিধারী মানুষেরা বসবাস করেন। এঁরা মূলত বৈষ্ণব। এই সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিগত আচরণের ইতিহাসের পেছনে রয়েছে চৈতন্য পরবর্তী নিত্যানন্দ গোস্বামী ও তাঁর উত্তরপুরুষদের প্রভাব।

শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে আর একজন বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক নিত্যানন্দ গোস্বামীর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী মালদহে আসেন। মালদহের মহানন্দা নদীর তীরে তিনি দলবলসহ সংকীর্তন শুরু করলে হুসেন শাহের মন্ত্রী কেশব ছত্রীর পুত্র দুর্লভ ছত্রী সেই সংবাদ পেয়ে সেখানে উপস্থিত হন। তারপর বীরভদ্রের ব্যবহার ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে সেখানে তাঁরই অর্থে বিরাট মহোৎসব হয়। শুধু তাই নয়, তিনি ও তাঁর পিতা তাঁকেএক বিরাট ভূখণ্ড ব্রহ্মোত্তর জমি হিসাবে দান করেন। দুর্লভ ছত্রীর ব্রহ্মোত্তর জমিই বর্তমান ইংরেজবাজার শহর অন্তর্গত গোস্বামী অধ্যুষিত গয়েশপুর। এরপর বীরভদ্র খড়দহে ফিরে গিয়ে মধ্যমপুত্র রামকৃষ্ণকে এই সম্পত্তি দেখাশোনা তথা ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। রামকৃষ্ণ গোস্বামী এখানে এসে পড়ে থাকা পাল সেন যুগের অনেক উপকরণ দিয়ে একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এরপর রামকৃষ্ণ গোস্বামীর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ অটল বিহারী গোস্বামীর সময়ে এই পরিবারটির প্রভাব প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি হয় এবং তিনি এক বিশাল শিষ্যমণ্ডলী গড়ে তুলতে সমর্থ হন। ফ্রান্সিস বুকাননের এক বিবরণ অনুসারে বঙ্গভাষী নিম্ন ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে তো বটেই, এমনকি উচ্চবর্ণের কিছু জাতির মধ্যেও অটলবিহারীর প্রভাব বেশ ভালো রকমের ছিল। বলা যেতে পারে গয়েশপুরকে কেন্দ্র করে এক বিশাল এলাকাভুক্ত মানুষ যাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ সকল সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন তাদের তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন বিশেষ করে যারা উচ্চবর্ণের দ্বারা সামাজিক

ও অর্থনৈতিকভাবে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে দিনযাপন করছিলেন এবং প্রায় বাধ্য হয়েই ধর্মান্তরের দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন অটলবিহারী গোস্বামী তাঁদের বৈষ্ণবধর্মের ছত্রছায়ায় এনে সংগঠিত করতে পেরেছিলেন। বর্তমানে এই পরিবার কয়েকটি শরিকে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছে। এঁরাই গয়েশপুরের বিখ্যাত গোস্বামী বংশ।

চৌধুরী :

মুসলিম আমলে পরগণার রাজস্ব প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত এক শ্রেণীর আধা সরকারী কর্মচারীকে চৌধুরী বলা হতো। পরবর্তীকালে এঁদের মধ্যে থেকে অনেকেই সরকারের কাছ থেকে সনদ লাভ করে জমিদার হয়েছিলেন। চৌধুরী সম্প্রদায়ের কাজ অথবা ভূমিকা সম্পর্কে ইবন বতুতা বলেছেন — রাজ্য প্রশাসনে চৌধুরী ছিলেন একজন হিন্দু প্রধান, বহু সংখ্যক গ্রামের সমষ্টি 'সার্দি' অথবা পরগণার রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে হিন্দুদের প্রতিনিধি। তারিখ-ই-শেরশাহী গ্রন্থে চৌধুরী সম্পর্কে যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায় যে, ভূমি জরিপ ও রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কানুনগো ও অন্যান্য রাজস্ব কর্মচারীদের মতো তাঁরও দায়িত্ব ছিল। রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ ও খাজনা তালিকা প্রণয়নে তিনি আমিনকে সাহায্য করতেন। খাজনা তালিকায় তিনি স্বাক্ষর করতেন। কারণ তার সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ও পরামর্শে খাজনা তালিকা প্রণয়ন করা হতো। রায়তের প্রতিনিধি হিসাবে পরগণা প্রশাসকের কাছে তাদের স্বার্থ ও অভাব অভিযোগ সম্পর্কে প্রতিনিধিত্ব করতেন। তিনি নিজে জামিন থেকে রায়তদের প্রয়োজনীয় কৃষিঋণ দিতেন। আবার তাঁর সুপারিশেই কৃষকের খাজনা মওকুফ করা হতো।

এটি একটি প্রশাসনিক উপাধি। মুঘল আমলে সম্রাট আকবরের সুযোগ্য মন্ত্রী টোডরমল ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কারের সময় প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলাদেশের কিছু গ্রামকে একত্রিত করে একটি 'পরগণা' তৈরী করা হয়। যে পরগণা ব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর অর্ধাংশ পর্যন্তও চালু ছিল, এইরকম প্রতিটি পরগণার জন্য একজন করে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, যাকে বলা হতো চৌধুরী। পরে ইংরেজ আমলে পাঁচশালা, দশশালা অথবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অনেকেই এই সকল জমি ক্রয় করে পাকাপাকি জমিদার শ্রেণীভুক্ত হয়ে যান।

চৌধুরী যেহেতু প্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি জীবিকা তাই এই সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট কোন আচার-আচরণ নেই। পরিবার অথবা অবস্থাগত বিশেষত্বই এঁদের পালনীয় সংস্কৃতি। উচ্চবর্ণ অথবা নিম্নবর্ণ উভয় সম্প্রদায়ের মানুষও এই চৌধুরী উপাধিযুক্ত হতে পারে। চৌধুরীদের অস্তিত্ব যেহেতু জমি সংক্রান্ত কাজের সঙ্গেই নির্দিষ্ট তাই মালদহের সর্বত্রই এঁদের বসবাসের ঠিকানা। গঙ্গা তীরবর্তী প্রচুর জেলে সম্প্রদায় ও তাদের নামের সঙ্গে চৌধুরী উপাধি ব্যবহার করে থাকেন।

পোদ্দার :

'পোদ্দার'- এই উপাধিটিও প্রশাসনিক সংক্রান্ত। অনুমান এটি 'ফোতাহদার' এই শব্দের বাংলা অপভ্রংশ। মনে হয় শব্দটি আরবি। ফোতাহদার > পোতাহদার > পোতদার > পোদ্দার > পোদ্দার এইভাবে বাংলায় এসেছে। ফোতাহ্দার শব্দের অন্য অর্থ টাকার থলি বা শস্যের থলি। আফগান শাসনকালে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকে ফোতাহ্দার বলা

হতো। আইন-ই-আকবরীতেও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। আগে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরাই কেবল এই কাজ করতেন। পরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরাও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। পোদ্দার-দের কাজ ছিল কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব বাবদ খাজনা আদায় করা। তিনি সেই সংগৃহীত অর্থ একটি কক্ষে রাখতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সংগৃহীত অর্থ গণনা করা হতো এবং কারকুনের স্বাক্ষর নিয়ে দরজায় সীলমোহর করা হতো। প্রাদেশিক দেওয়ানের খরচ সংক্রান্ত নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এ অর্থ থাকত তাঁর জিম্মায়। এক কথায় পোদ্দার ছিলেন পরগণার কোষাধ্যক্ষ। রাজস্ব গ্রহণ করাই শুধু নয়, ধনাগারের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে ও অর্থের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখাও তাঁর অন্যতম কাজ ছিল। বলাই বাহুল্য বর্তমানে আর অর্থ আদায়ের ঠিক এই প্রক্রিয়াটি বজায় নেই। পোদ্দার উপাধিধারী মানুষেরাও অন্যান্য জীবিকার সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। তবুও পোদ্দার উপাধিধারী ব্যক্তিরা আছেন। তাঁরা পূর্বপুরুষের পালনীয় আচারেই অভ্যস্ত।

শিকদার :

পঞ্চদশ শতকে পরগণার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা শিকদার নামে অভিহিত হতেন। সুলতান মুহম্মদ তুঘলকের শাসনকালেই সর্বপ্রথম শিকদার ও শিক এর উল্লেখ পাওয়া যায়। শিক একটি প্রশাসনিক বিভাগ। এর উৎপত্তি হয়েছিল বিশৃঙ্খলিত ভূখণ্ডকে শৃঙ্খলিত করার কারণে। পরগণা থেকেও 'শিক' বিভাগ বৃহত্তর ছিল। ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য ভাগবতে শিকদারের উল্লেখ পাওয়া যায়। শেরশাহের আমলে শিকদার নিয়োগ একটি নিয়মিত ব্যবস্থা ছিল। ড. কে. আর. কানুনগোর মতে শিকদার ছিলেন পরগণার প্রধান সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মচারী। শিকদার তার সামরিক বাহিনী নিয়ে পুলিশের কাজ করতেন, রাজকীয় ফরমান কার্যকর করতেন এবং এলাকায় শান্তি রক্ষা করতেন। মালদহ জেলায় 'শিকদার' উপাধিধারী মানুষ এখনও কিছু কিছু দেখা যায়।

ব্রাহ্মণ :

বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণকেই বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ বলা হোত। পরে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরাই বৈদিক যজ্ঞ ও ক্রিয়া কলাপে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠে। ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের অধিকারী এই সব মানুষেরা শর্মা ও স্বমিণ এই উপাধি নিয়ে ব্রাহ্মণ নামে সমাজে চিহ্নিত হলেন। সমসাময়িক তাম্রপট্ট সমূহ থেকে জানা যায় যে এই সকল ব্রাহ্মণেরা বেদের বিভিন্ন শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'গাঁই' প্রথার প্রচলন ছিল। গাঁই বলতে সেই গ্রামকে বোঝাত যে গ্রামে এসে তারা প্রথম বসবাস শুরু করেছিল। এই সকল 'গাঁই' এর নাম (যেমন - ভট্ট, চট্ট, বন্দ্যো ইত্যাদি) পরবর্তীকালে উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হোত। গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণদের এই সব 'গাঁই' দান করত সাধারন মানুষেরাই। কিন্তু গুপ্ত পরবর্তী পাল রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণেরা রাজাদের কাছে থেকে নিষ্কর ভূমি উপহার পেতেন। ভূমি দান করলেও পাল রাজারা কিন্তু ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। পাল পরবর্তী সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যথার্থ পৃষ্ঠপোষক। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা তথা পূজা অর্চনা ও যাগযজ্ঞ সম্পাদনে তাঁরা যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। গুপ্ত যুগে উত্তর ভারত থেকে যে ব্রাহ্মণেরা দলে দলে

বাঙ্গলাদেশে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন তারাই 'সপ্তশতী' বা 'সাতশতী' ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হতেন। রাঢ় দেশে তারা সাতটি গোত্রভুক্ত ও বরেন্দ্র দেশে পাঁচটিতে সেন যুগে এই ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট প্রাধান্য দেখা যায়। তাঁরা স্মৃতি শাস্ত্র অনুযায়ী সামাজিক নানা নিয়মের অনুশাসনে সমাজকে বেঁধে ফেলেন। এই যুগেই রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বৈদিক, শাকদ্বীপি প্রভৃতি ব্রাহ্মণরাও সমাজে প্রাধান্য লাভ করেন। বলা হয় গৌড়ের রাজা আদিশূর একটি যজ্ঞ করবার সঙ্কল্প করে কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিয়ে ছিলেন। বাংলাদেশে সাতশতী, বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণী ছাড়া আর যত যে সব ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আছেন তারা সকলেই এই পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধর। এইভাবে নানা ধরনের ব্রাহ্মণের আগমন ঘটায় সমাজে তাদের স্থান নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হলে সেন রাজা বল্লাল সেন এর আমলে নতুন আইন করে ব্রাহ্মণ্য সমাজ সংগঠিত হয় এবং তখন থেকেই আমরা কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন হতে দেখি। 'গাঁই' এর প্রাধান্য অনুযায়ী বন্দ্যে, চট্ট, মুলটী, ঘোষাল, পূতিতুন্ড, গাঙ্গুলী, কাঞ্জীলাল ও কুন্দলাল — এরাই প্রধান মুখ্য কুলীন হিসাবে পরিগণিত হন। বাকি ব্রাহ্মণেরা হন শ্রোত্রিয় শ্রেনি ভুক্ত। রাঢ়ীয়দের ৫৫ টি গাঁই (মতান্তরে ৫২ বা ৫৯)। আর বারেন্দ্রদের ১০০টি। কিন্তু বল্লাল সেন কর্তৃক বিভাজন অনুযায়ী মুখ্য কুলীনের পর পাঁচটি বারেন্দ্র গাঁই যথা— লাহিড়ী, বাগচী, মৈত্র, সান্যাল ও ভাদুড়ী ইত্যাদিরা কুলীন বলে চিহ্নিত হন। এরপর শ্রোত্রিয় ব্রহ্মণেরা আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হন, যথা — সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, সাধ্য শ্রোত্রিয় ও কাষ্ঠ শ্রোত্রিয়।

মৈথিল ঃ

দিয়ারা ও টালের একটি দীর্ঘ ভুমিরেখা বরাবর মৈথিল ব্রাহ্মণেরা বাস করে। মিথিলা রাজ্যে বসবাস কারী ব্রাহ্মণদের মৈথিলী বলা হয়।

মিথিলাকে প্রাচীনকালে বিদেহ বলা হোত। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন ছিলেন রাজর্ষি জনক, পরে রাজা হন মনু। তার দশটি সন্তানের একটি ছিলেন মুক্ষাকু। তার পুত্র নিমি। নিমির পুত্র মিথির নামানুসারে এই রাজ্যের নাম হয় মিথিলা। প্রচলিত কথা এই যে, এদের পূর্ব পুরুষেরা মহারাজা মানসিংহ কর্তৃক গৌড় অভিযানের সময় সৈনিক ও যুদ্ধ ব্যবসায়ী হিসাবে এসেছিলেন। বিহারের দ্বারভাঙ্গা এদের আদি নিবাস।

মিথিলার বিস্তৃতি ছিল বিরাট। মিথিলা থেকে আসাম কামরূপ পর্যন্ত। এই অংশকে বলা হত ত্রিলুত বা তীরহোত। মিথিলার বর্তমান নাম দ্বারভাঙ্গা। যার বুৎপত্তিগত অর্থ হল দ্বারবঙ্গ। সমগ্র উত্তর ভারত থেকে বাঙলায় প্রবেশের দ্বারপথ। হিন্দু রাজত্বকালে গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন মিথিলা ছিল গৌড় রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত একটি অংশ। ৭ম শতাব্দীর ইতিহাস অনুসারে সমগ্র উত্তরবঙ্গ সহ বৃহত্তম বাংলা ছিল বেদ বিধি বর্হিভূত। তাই সময়কার রাজা আদিত্যশূর (আদিশূর) মিথিলা থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌড়ে নিয়ে আসেন হিন্দু আর্য ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে। কারন তখন সমগ্র বাংলায় হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত তথা ব্যাপক ভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ছিল। মিথিলা থেকে আগত ব্রাহ্মণরা আদিশূরের অনুরোধে বৈদিক যজ্ঞ করেন। যজ্ঞ শেষে পুণরায় তারা মিথিলায় ফিরে গেলে নীচে বা ম্লেচ্ছ জাতি বলে সমাজ থেকে তাদের বহিস্কার করা হয়। তখন তারা আবার গৌড়ে ফিরে আসেন। এই সময় গঙ্গানদী রাজমহলের কাছে পশ্চিম থেকে পূর্বগামী

হয়ে একধারা কালিন্দ্রী নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুরাতন মালদহের বিপরীতে নিমাসরাই নামক স্থানে মহানন্দা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। নদীর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে তখন বরেন্দ্র অঞ্চল নামে পরিচিত ছিল। ফলে পুনরাগত ব্রাহ্মণেরা এইসব অঞ্চলে রাজপ্রদত্ত ভূমি লাভ করে বসতি স্থাপন করে। কিছু ব্রাহ্মণ আবার গৌড় নগরীর অন্তর্গত এবং গঙ্গা নদীর দক্ষিণপাড়ে ভাতিয়া নামক স্থানে বসবাস করে। মৈথিল সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রত্যহ গঙ্গা স্নান, তর্পন ও ইষ্টদেবতার পূজা শেষেই অন্নজল গ্রহণ করে। যে কোন ধরনের আচার গত ক্রিয়াকর্মে এরা অত্যন্ত প্রাচীন পন্থী। সামাজিক যে কোন ক্রিয়াকর্মে গঙ্গাজল তাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও অপরিহার্য একটি সামগ্রী।

কালের নিয়মে গঙ্গা ও তার শাখা নদীগুলি বারবার দিক পরিবর্তন করলেও তাদের মূল বসতি নদী তীরবর্তী স্থানেই রয়ে গেছে। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণে গর্যুদস্ত হয়ে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার মিথিলা ত্যাগ করে ভাগলপুর পুর্নিয়া প্রভৃতি স্থানে বসতি স্থাপন করে। সেখান থেকেও অনেক মৈথিলী ব্রাহ্মণ এই জেলায় প্রবেশ করে এবং জমি ক্রয় করে বসবাস শুরু করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার রাজসভার অধীনে বিভিন্ন চাকুরীগত পেশায় নিযুক্ত হয়।

দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মিথিলা গৌড়বঙ্গ নামেই অভিহিত হত। হিন্দু শাসনের পর মুসলিম আমলেও মিথিলার অবস্থান গৌড়বঙ্গের মধ্যেই ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইংরেজরা দেশ শাসনের সুবিধার্থে সমগ্র দ্বারভাঙ্গা ও পুর্ণিয়ার অংশ বিশেষকে বিহারের অর্ন্তভুক্ত করে আর মালদহ জেলা সহ উত্তরবঙ্গকে বাংলার অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

মিথিলা যে গৌড়বঙ্গের অর্ন্তভুক্ত ছিল সেকথা নীহাররঞ্জন রায় বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থেও বলেছেন "প্রাচীন বাংলার সীমা নির্দেশ ছিল উত্তর হিমালয় এবং হিমালয়কৃত নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য, উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সীমান্তরালবর্তী সমভূমি, পূর্ব দিকে গারো খাসিয়া-জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেনী বাহিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত, পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর মালভূমি, ধলভূম, কেওনঝাড় ময়ুরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভুমি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই প্রকৃতির সীমা বিবৃত ভূমিখন্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড় পুন্ড্র বরেন্দ্রী রাঢ় শুহ্ম তাম্রলিপ্তি সমতট বঙ্গ বাঙ্গাল হরিকেল প্রভৃতি জনপদ।" (১ম খন্ড) নীহাররঞ্জন রায়ের এই উদ্ধৃতি থেকে প্রমানিত হয় যে, মৈথিলীরা আদৌ বিহারের অধিবাসী কোনদিনই ছিল না, কারণ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মিথিলা ছিল গৌড়ের অধীন। সেই অর্থে মিথিলা বাংলাতেই অবস্থিত ছিল। মৈথিল সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন। আরাধ্য দেবদেবীর মধ্যে শিব, নারায়ণ, কালী, দুর্গা, মনসা ইত্যাদি রয়েছে। প্রত্যেক পরিবারে দেবদেবীর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ রয়েছে যেখানে প্রাত্যহিক পূজা-অর্চনা নিত্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্টীয় সংস্কার কর্মে, বর্তমান কালেও বৈদিক বিধি নিয়মে উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধকর্ম পালিত হয়ে আসছে। বাসন ব্যবহারে তামা ও কাঁসার বাসনই অধিক প্রচালিত। মৈথিল সম্প্রদায়ের কৃষ্টি-সংস্কৃতি প্রভৃতি কর্মপালন দ্বারভাঙ্গার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ।

বৈষ্ণব ঃ

বর্তমানে আমরা যাদের বৈষ্ণব বলে জানি তারা প্রাচীন ভাগবত অনুসারী বৈষ্ণব নন

তারা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগামী শিষ্য। সারা ভারতে এই বৈষ্ণবদের দেখা পাওয়া যায়। মালদহে এই বৈষ্ণবদের মধ্যেও নানা সম্প্রদায় আছে। তবে দীর্ঘদিন ধরে বৈষ্ণবদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু আচার-আচরণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেদের ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে ফেলায় আজ তাঁদের কিছু নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তৈরী হয়ে গেছে। মালদহ জেলায় এই বৈষ্ণবদের প্রভূত প্রভাব দেখা যায়। তার অন্যতম কারণ হলো ১৫১৫ খৃঃ এর জুন মাসে মালদহ জেলায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আগমন ও অবস্থান। এক সময় মুসলিম প্রভাবে বহু হিন্দু মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে চৈতন্যের প্রভাবে আবারবৈষ্ণব ধর্মে ফিরে আসেন। শুধু তাই নয় এরপর বহুদিন পর্যন্ত চৈতন্যশিষ্য প্রভুপাদ নিত্যানন্দ গোস্বামী ও তৎপুত্র বীরভদ্র গোস্বামী সমাজের নীচু তলার ধর্মান্তরিত মানুষদের বৈষ্ণব প্রেমধর্মে দীক্ষা দিয়ে একত্রিত করার চেষ্টা করেন। এমনকি বহিরাগত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরাও এই ধর্মে দীক্ষিত হন। ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত রামকেলি গ্রামে প্রতি জৈষ্ঠ্যমাসের সংক্রান্তিতে এই বৈষ্ণবদের মহামিলন মেলা বসে যার প্রসিদ্ধ নাম রামকেলীর মেলা। এইখানে শ্রীচৈতন্যদেব তিনদিন অবস্থান করেছিলেন এবং রূপ ও সনাতনকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। পুরাতন মালদহ সহ মালদহ জেলার সর্বত্র এই বৈষ্ণব ধর্মবলম্বীদের দেখা যায়।

গন্ধ বণিক / কংসবণিক ঃ

একসময় বৃহৎ গৌড় বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল বঙ্গদেশ। বঙ্গদেশ তখন ভিন্ন ভিন্ন সীমানায় বিভক্ত হয়ে গৌড় রাজ্যের করদ রাজ্য হিসাবে পরিচিত হোত। এইরকম একটি ক্ষুদ্র ভূ-খন্ড চম্পাই বা চম্পানী নগরের অধিপতি ছিলেন রাজা কোটিশ্বর। তাঁর পুত্রের নাম চন্দ্রভব অথবা চন্দ্রধর। ইনিই বিখ্যাত 'চাঁদ সদাগর'। এই বঙ্গদেশের অন্য ভূ-খন্ডে উজানিনগরের রাজা ছিলেন বিক্রমকেশরী। এই রাজার সুদৃঢ় বাঁশবন বেষ্টিত দুর্গ ছিল বলে জানা যায়। এই উভয় করদ রাজাই জাতিতে গন্ধবণিক। ব্যবসা - বাণিজ্য করেই এই জাতি প্রভূত ধন উপার্জন করেছিলো। সেইজন্য তারা অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতে দ্বিধাগ্রস্ত হতেন না। ব্যবসায়ে প্রভূত ধন লাভের উদ্দেশ্যেই এই সম্প্রদায়ের লোকেরা কৌশাম্বী থেকে বঙ্গদেশে এসেছিলেন। সম্ভবত সেই সময়টি পাল রাজবংশের শেষের দিকে। গন্ধ বণিকেরা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান শৈব ছিলেন। তাঁরা এদেশে এসে দেখলেন এখানে বিষহরী, মঙ্গলচন্ডীর পূজাই অধিক প্রচলিত। গন্ধ বণিকের স্ত্রী লোকেরাও এই পূজা নিজেদের ঘরে প্রবর্তন করায়, সংস্কৃতিগত যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল তাই মনসামঙ্গল বা বিষহরীর গানের বিষয় হয়ে অমর হয়ে আছে। চাঁদ সদাগরের দ্বারা যেমন করে বিষহরির বা মনসা পূজার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিক তেমনি করে উজানিনগরের ধনপতি দত্ত ও শ্রীপতি দত্তের দ্বারা মঙ্গলচন্ডী পূজার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ধনপতি দত্ত ছিলেন মূলতঃ কংস বণিক। তিনিও চাঁদ সদাগরের মত পরম শৈব ছিলেন। কিন্তু পরে দেবী চন্ডীর ভক্ত হয়ে তমলুকের সমস্ত কাঁসার দ্রব্য ক্রয় করে প্রভূত লাভ করে দেবী চন্ডীর মন্দির নির্মাণ করান তমলুকে। বাংলার এই বণিকজাতিই ছিল ঐতিহ্যময় সমৃদ্ধময় বাংলার প্রতীক। তাই বাংলার অধিকাংশ বারব্রত কথার নায়ক এই বণিক জাতি। তাদের সাহস ছিল, ঐশ্বর্য্য ছিল এমনকি সমাজে ক্ষমতাও ছিল প্রচুর। তারা বাংলাদেশে একাধিক উৎসবেরও সূচনা করেন।

সখিভাব বৈষ্ণব ঃ

এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটু অন্য ধরনের বৈষ্ণবদের দেখা যায়, যাদের বলা হয় সখি-ভাব বৈষ্ণব। চৈতন্যদেবের কিছুপরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের ধর্মপত্নী সীতা দেবী শূদ্র বংশীয় ও ব্রাহ্মণ বংশীয় উভয় সম্প্রদায়কেই রাধামাধব মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। রাধামাধব মন্ত্রে দীক্ষিত হলে পুরুষ ধর্ম ত্যাগ করে সম্পূর্ণ ব্রজগোপী ভাব অর্থাৎ নারী বেশে ভজনা করতে হতো। নারী অঙ্গের সমস্ত গুণাবলী পুরুষ অঙ্গে প্রকাশ পেলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হতো। সখি-ভাবক বৈষ্ণবগণের স্ত্রীবাচক নামকরণ হতো। তাঁরা মোহান্ত, গোস্বামী এবং শেষে ঠাকুরাণী এই রকম নামকরণে চিহ্নিত হতেন। এই সীতাদেবী কর্তৃক দীক্ষিত হয়ে শূদ্রজাত যজ্ঞেশ্বর গৌড়ের উপকণ্ঠে একটি জঙ্গলে সখিভাবে রাধাকৃষ্ণ আরাধনায় শ্রীমতি জঙ্গলী ঠাকুরাণীতে রূপান্তরিত হন। এই জঙ্গলী ঠাকুরাণী এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় তৈরী করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মান্যতায় তিনি 'জঙ্গলী পীর' বলে পরিচিত হন। বর্তমানে গৌড়ের পথে রথবাড়ী হাইস্কুলের ময়দানে এই জঙ্গলীপীরকে কেন্দ্র করে বৈশাখী সংক্রান্তিতে 'তুলসী বিহারের' মেলা বসে। বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের আর তেমন দেখা পাওয়া যায় না। কারণ উড়িষ্যা থেকে আগত অহল্যা ঠাকুরাণী যিনি সখিভাব বৈষ্ণবের নির্দেশিত দর্শনের বাইরে বেড়িয়ে সঙ্গিনী রূপে বৈষ্ণবী রাখলে কালক্রমে সখিভাব বৈষ্ণবদের উপর সাধারণ মানুষেরা আস্থা হারায়।

মালদা জেলার ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় ঃ

বাংলায় মুসলিম সমাজের পত্তন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। সাত শতকের প্রথমার্ধে আরব ভূমিতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন। কারণ হজরত মহম্মদ (৫৭১—৬৩৩)। এর পরই পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রসার ও প্রচারের উদ্দেশ্যে আরবেরা ছড়িয়ে পড়ে ভারতের ভূমধ্যসাগরে, পারস্য উপসাগরে ও ভারত মহাসাগরের উপকূল ভূমিতে।

বাংলায় তুর্কীরা ক্ষমতা দখলের অনেক আগেই চট্টগ্রামে আরব বণিকদের আগমন ঘটে। এই বণিকদের জাহাজে চড়েই ইসলাম ধর্মের প্রচারে আসেন বহু সুফী, দরবেশ, পীর, আওলিয়া। মালদা জেলাতেও এভাবেই এসেছিলেন পীর মুখদুমশাহ জালালুদ্দিন তাব্রিজী, নুর কুতুব উল আলম ইত্যাদি একাধিক পীর ও দরবেশরা। এরা এদেশে এসে স্থায়ী আস্তানা গেড়ে ইসলামের পবিত্র শান্তির বাণী প্রচার করতে থাকেন।

এরপর ১২০৩ খৃঃ ইখতিয়ার উদ্দিন কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ খৃঃ সিরাজ উদ্ দৌলার পতন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ বছরের এই মধ্যবর্তী কালে বাংলায় মুসলমান সমাজের পত্তন, গঠন, বিকাশ ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়।

বাংলায় মুসলমানদের ব্যাপক বংশবৃদ্ধি প্রসঙ্গে গ্রীয়ার্সন, হান্টার, ডাল্টন, উইলিয়াম কুক, জেমস ওয়াইজ, থাবার্ট, রিজলি, জেমস লঙ্ প্রভৃতি ইউরোপীয় এবং ভারতীয় পন্ডিতগণ যেসব মত পোষণ করেছেন তা থেকে এই চিত্রই পরিস্ফুট হয় যে, হিন্দু সমাজের জাতিভেদের কঠোরতার কারণে ও পীর দরবেশদের প্রভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়েছেন। শাসক, সৈনিক, বণিক, ধর্মপ্রচারক হিসাবে এসেছেন বহু বহিরাগত মুসলমান, ক্ষমতালিপ্সু ধর্মান্তরিত সাধারণ

মানুষ এবং বৈবাহিক সূত্রে জাত মিশ্রধারার মানুষ। এই ত্রিবিধ পদ্ধতিতে বাংলার মুসলমান সমাজের সৃজন, গঠন ও বৃদ্ধির কাজ সারা মধ্যযুগে তথা অদ্যাবধি পর্যন্ত চলে আসছে।

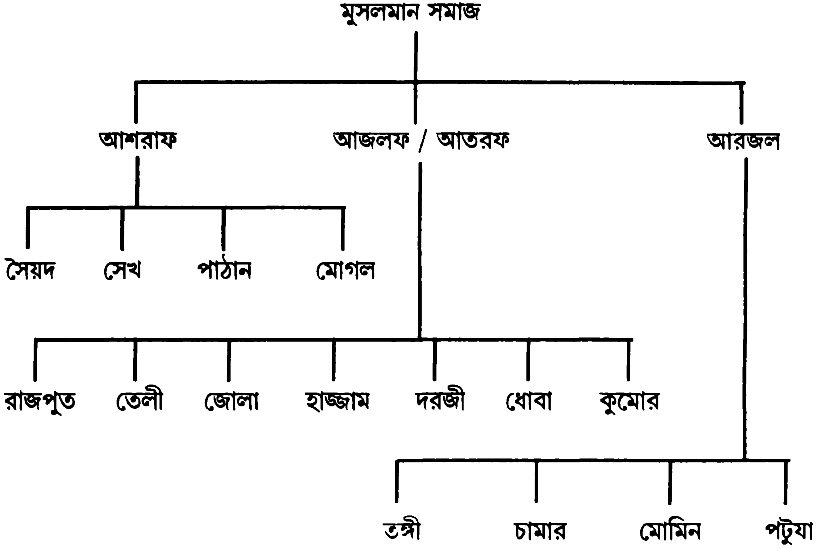
ইসলামের যে উদার মানবতাবাদ ও ভ্রাতৃত্ববোধের আকর্ষণে এক বিশাল সংখ্যক মানুষ এই ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিল সেই ধর্মের গভীরেও আত্মগোপন করে আছে বর্ণবৈষম্যবাদ। যাকে আমরা গোষ্ঠীবিভাজন বলেও চিহ্নিত করতে পারি। ইসলাম ধর্ম সাধারণত দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত শিয়া ও সুন্নী। মুসলিম বিশ্বে সুন্নীই শতকরা নব্বই শতাংশ। ইরাকই একমাত্র শিয়া প্রধান রাষ্ট্র। শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ, টিপু সুলতান এরা শেষ বয়সে কলকাতায় নির্বাসন জীবন যাপন করেন। এরা সকলেই ধরানী এবং শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত।

সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদহে সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যাই অধিক। মালদহ জেলায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন এই সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা। সুন্নিদের মধ্যে আবার হানাফী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যাই অধিক। হানাফিদের মধ্যে রায়েছে দুটি শাখা দেওবন্দ এবং ব্রেলভি। দেওবন্দিরা ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহন করেছিল। অন্যদিকে সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভির অনুগামীরা অনেকটাই রক্ষণশীল এবং পীর পরিপন্থী।

ইতিহাস স্বীকৃত ওয়াহাবি আন্দোলনের ওয়াহাবিরা একটি স্বতন্ত্র মত পোষণ করেণ। এই ওয়াহাবিদেরই একটি স্বতন্ত্র শাখা 'আহলে হাদিশ'। এরা হানাফি মত থেকে পৃথক শাফি মতের অনুসারী।

সুফীবাদ— বেদ বিরোধী গ্রামীন লোকায়ত সমাজের যে দর্শন আমরা বৌদ্ধ সহজিয়া ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম মুসলিম সমাজেও সেই সহজিয়া পন্থার দেখা পাওয়া যায় সুফীবাদের মধ্যে। শরিয়ত পন্থী কঠোর মোল্লাতন্ত্রের পরিপন্থী এই সুফীবাদ। সুফী দর্শনের এই সহজিয়া পথকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছিলেন স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের ধর্মান্তরিত নিম্নবর্গীয় মুসলমান ও কৃষক শ্রেনী। মধ্যযুগের বাংলা সমাজে সুফী দর্শনের সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের হাত ধরেই বাংলায় ইসলামের ব্যাপক প্রসার সম্ভব হয়েছিল। সুফীদের মধ্যে আবার দুটি ভাগ লক্ষ্যনীয়, (ক) শরা, (খ) বে-শরা। শরা সম্প্রদায় গৃহী, সংসারী আর বে শরা সুফীরা হলেন ফকির, দরবেশ এবং বাউল সম্প্রদায়। সুফীদের আরও ছোটখাট বিভাজন রয়েছে, যা এক একটি মুর্শিদ বা গুরুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যেমন— কাদেরিয়া, চিশতিয়া, শহারাবাদ ইত্যাদি।

হিন্দুধর্মে যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণের বর্ণবৈষম্যবাদ পরিলক্ষিত হয়, মুসলমান সমাজেও সেই একই ধরনের বর্ণভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলি যথাক্রমে, আশরাফ, আতরাফ, আজলাফ এবং আরজল নামে পরিচিত। এদের মধ্যে আবার অনেকগুলি ভাগ আছে। সেইগুলি একটি চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।



আশরাফ ঃ

আশরাফ শব্দের অর্থ ভদ্র এবং অভিজাত সম্প্রদায়। বহিরাগত সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান রক্তের বিশুদ্ধতায় এবং অর্থের কৌলিন্যে আশরাফ নামে চিহ্নিত।

আতরাফ ঃ

স্থানীয় রক্তজাত এবং ধর্মান্তরিত মিশ্রশ্রেনীর মধ্যবিত্ত মুসলমানদের বলা হয় আতরাফ। রতফ অর্থাৎ শ্রম শব্দজাত আতরাফ।

আরজল ঃ

রজীল বা ইতর শব্দজাত আরজল। নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে যারা মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন তারা আরজল, অর্থাৎ এক কথায় এরা জল অচল কিংবা স্পর্শের বাইরে। যদিও এই ভেদ ইসলামী আইন সম্মত নয়, বিভিন্ন সময়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার থেকেও এক বিশাল অংশের বিহারী মুসলমানগণ্ এ জেলায় এসে বসবাস শুরু করেন। নিকিরি মুসলমানেরা মাছ ও শুটকির ব্যবসা করেন। গরু, ছাগল, মোষ, খাসী করেন আবদাল সম্প্রদায়।

হাম্বালা এবং ধাই সম্প্রদায় এর ছেলেরা ঘোড়ার নাল পরানোর কাজ করেন আর মেয়েরা সাধারনত ধাই এর কাজ। দাফালি সম্প্রদায় (কর্তাভজা) পাঁচপীর, মানিকপীর, ঘোড়াপীর, জিন্দাপীর প্রভৃতির উপাসক। এই সম্প্রদায় 'একাদিল' পীর গণের প্রবর্তক।

সেখ ঃ

মালদা জেলার দিয়ারা ও টালের বিস্তীর্ণ এলাকায় সুন্নি সম্প্রদায়ের যেসব পাঠান

মুসলমানেরা বসবাস করে তাদের বলা হয় সেখ। সেখরা অভিজাত মুসলমান বলেই নিজেদের পরিচয় দেয়। হিন্দি এবং বাংলা উভয় রকম ভাষাই তারা ব্যবহার করে নিজেদের মধ্যে এবং বাইরের আলাপ পরিচয়ে। জীবিকায় কোন নির্দিষ্ট কিছু নেই, তা প্রয়োজন ও ক্ষমতা অনুযায়ী স্থিরীকৃত হয়। হিন্দী বা বাংলা দুটি ভাষাই তারা প্রয়োজনে ব্যবহার করলেও মূল ভাষা খোট্টা। পাঠান-মুঘল আমলে এরা এসেছিল বিহারের দ্বারভাঙ্গা থেকে। তাই এদের দ্বারভাঙ্গাইয়াও বলা হয়। দিয়ারা ও টালের ইংরেজবাজার, মাণিকচক ও রতুয়া থানা এলাকায় এরা বসবাস করে।

সৈয়দ ঃ

পন্ডিত এনামূল হক এবং আবদুল করিমের মতে, হজরত মহম্মদ ও ফতেমার বংশধরেরা সৈয়দ নামে পরিচিত।

পাঁঝরা ঃ

এরা মূলতঃ মুসলমান ধর্মাবলম্বী। বলা চলে ধর্মান্তরিত মুসলমান। এক সময়ে এদের মেয়েরা সিঁদুর পড়তো। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রবল আপত্তিতে ঐ প্রথাটি বর্তমানে উঠে গেছে। এদেব মূল জীবিকা মাছের ব্যবসা করা। এরা মূলতঃ খোট্টা ভাষায় কথা বলে। বসবাস শহর মালদহতেই সীমাবদ্ধ।

কুঁঝড়া ঃ

এরাও ধর্মান্তরিত মুসলমান। মূল জীবিকা তরি-তরকারীর ব্যবসা করা। মূলতঃ খোট্টা ভাষায় কথা বলে। তবে আশার কথা এই যে এদের মধ্যে কেউ কেউ এখন লেখাপড়া শিখছে।

বাদিয়া ঃ

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এসেছে মূলতঃ মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে। গঙ্গা নদীর ধার ও চর বরাবর এরা গড়ে তুলেছে বড় বড় গ্রাম ও গঞ্জ।

বাদিয়া শব্দের আক্ষরিক অর্থ রাগী বা গোঁয়ার। ইতিহাসের অর্থে এরা শেরশাহবাদ পরগণার অধিবাসী,যার মধ্যে এককালে মুর্শিদাবাদের একটা অংশ জঙ্গীপুর মহকুমা ছিল। তাই এরা শেরশাহবাদিয়া মালদহী উচ্চারণে 'শির্শাবাদিয়া' বলা হয়। কেউ কেউ বলেন শেরশাহ মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে যখন পরাস্ত করে গৌড় থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন এই সব সৈন্যেরা শেরশাহ-র সঙ্গে ছিল। এদের আদি বাসস্থান ছিল আফগানিস্থানের উষর অঞ্চল। অঞ্চলের প্রভাবেই এই সমস্ত সৈন্যেরা ছিল জেদী, একগুঁয়ে স্বভাবের। সেই হিসাবেই তারা বাদিয়া। আবার কারো কারো মতে শেরশাহ-র সঙ্গে আসা এই সমস্ত সৈন্যেরা যুদ্ধান্তে আর দেশে ফিরে না গিয়ে এই দেশেই থেকে গিয়েছিল। গড়ে তুলেছিল 'আবাদ', তাদের ভাষায় 'আবাদ' শব্দের অর্থ জনবহুল নগর। ঐ ঘন বসতিকে শেরশাহ-র নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল 'শেরশাহবাদ'। মালদহের কালিয়াচক, মাণিকচক এবং রতুয়ার সব কটি থানাতেই বাদিয়ারা বাস করে।

বাদিয়ারা ধর্মে মুসলমান। তবে মুসলমান ধর্মের কোন মতবাদকে এরা অনুসরণ করে তাই নিয়ে মত বিরোধ আছে। একটি মতের বক্তব্য হল যে এরা অধিকাংশই হানিফী সম্প্রদায়ের

মুসলমান। অন্য মতে হানিফী, শায়োফি, মালেকি ও হাম্বলী — মুসলমান ধর্মের এই চারটি মতধারার মধ্যে এরা কো নটাই অনুসরণ করে না। এদের নিজেদের বক্তব্যে এরা খোদ মহম্মদের অনুসারী। পরিচয়ে বলে লা-মজহাবী। এই কথার অর্থ হল এরা মুসলিম প্রচলিত চারটি সম্প্রদায়ের বাইরে। 'মজহর' মানে ধর্ম এবং 'লা' মানে নয়। অনেকে বাদিয়াদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে প্রচলিত দুটি মতবাদের মধ্যে শেষেরটিকেই সঠিক বলে মনে করেন।

নদেগুষ্টি / নাড়েগুস্তি ঃ

মালদহ জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্ভুক্ত দলদলি গ্রাম নদেগুষ্টি মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বিখ্যাত। এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয় এরা আদিতে নদীয়া জেলার আদিবাসী ছিল এবং ধর্মে কট্টর হিন্দু। ষোড়শ শতকে নদীয়া জেলায় চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও সর্বধর্ম তথা উচ্চ নীচ ভেদাভেদমুক্ত এক উদার হিন্দুনীতির কথা তার দ্বারা প্রচারিত হওয়ায় সেই ধর্মই জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। ফলে এই কট্টর প্রাচীনপন্থী হিন্দুরা এই ব্যাপারটি ভালভাবে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা নদীয়ায় নিযুক্ত দোর্দণ্ডপ্রতাপ চাঁদ গাজীর কাছে নিত্য অভিযোগ জানাতে থাকেন। বৈষ্ণবদের প্রচারিত হরি-সংকীর্তন ও অন্যান্য বেআইনি কাজকর্মের বিরুদ্ধে। বিক্ষুব্ধ গাজী এই ব্যাপারে বিশদ বিবরণ গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের কাছে প্রেরণ করেন। হোসেন শাহ নিজে সরেজমিন তদন্ত করে চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন অপরাধ দেখতে না পেয়ে কাজীকে নিরস্ত করেন। হোসেন শাহের এই ফরমানে চৈতন্যপন্থীরা নিজেদের জয় বলে মনে করেন, এবং দ্বিগুণ উৎসাহে সংকীর্তন সহ ধর্মাচরণ করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, কাজীর কাছে অভিযোগকারী এই সব ব্যক্তিরা এইসব মানুষের চোখে হেয় বলে প্রতিপন্ন হতে থাকেন। এক সময় এমন হয় যে, তাঁরা নদীয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হন। নদীয়া ত্যাগ করে তাঁরা রাজশাহী জেলার নাটোর অঞ্চলে চলে যান। তাঁদের বসবাসের উপযুক্ত কোন জমি না পাওয়ার কারণেই হোক অথবা সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েই হোক তাঁরা মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া অঞ্চলে আসেন। চৈতন্যপন্থীদের দ্বারা সেখানেও তাঁরা নিরাপদ ছিলেন না। তখন তাঁরা গৌড়ের সম্রাট হোসেন শাহ-র শরণাপন্ন হন ধর্মান্তরীকরণের শর্তে হোসেন শাহ্ তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হন। নিরূপায় হয়ে তাঁরা ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হন এবং হোসেন শাহের দেওয়া নির্দিষ্ট জমিতে বসবাস করতে থাকেন। এটিই বর্তমান দলদলি গ্রাম। ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হলেও বহুদিনের আচরিত রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের আচার-আচরণ তাঁদের অন্তর থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে গেল না। ফলে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের আচার-আচরণই এঁরা এক অদ্ভুত মিশেল-এ পালন করে থাকেন। হোসেন শাহের আমলে এরা 'নদেগুষ্টি' বলে পরিচিত হলেও বর্তমানে লোকমুখে সেটি 'নাড়েগুস্তি' এই অপভ্রংশে পরিণত হয়েছে। জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের পেশার সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের উত্তর প্রজন্ম ব্যাপৃত রয়েছেন।

হোসেনা গোয়ালা ঃ

গৌড় মালদহের কালিয়াচক থানার অন্তর্গত দেবীপুর, জালালপুর ও সুজাপুর ইত্যাদি গ্রামগুলিতে কয়েকটি ঘর, এছাড়া ইংরেজ থানার অন্তর্গত রায়পুর ও গোবিন্দপুরে কয়েক ঘর এক বিশেষ ধরনের গোয়ালা সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের বলা হয় হোসেনা গোয়ালা।

একটা সময় এই সম্পদায়ের মূল বাসস্থান ছিল কালিয়াচকের দেবীপুর গ্রাম। আরও আগে, বাদশাহদেব আমলে গৌড়ের কাছে তাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল একটি আলাদা পাড়া। শোনা যায় হোসেন শাহের আমলে হিন্দু সম্প্রদায়ের এই গোয়ালারা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির এক আশ্চর্য মিশেলে এরা জীবন ধারন করে। যেমন এই সম্প্রদায়ের ছেলেদের নাম কোন মুসলিমদের মত নয়, মালকোঁচা মেরে ধুতিও পড়ে, কেউ দাঁড়ি রাখে না। মেয়েদের নাম আবার মুসলমানী হলেও শাখা, কপালে সিঁন্দুর থাকে তবে চালচলন বা কথা বলার ঢঙে মুসলমানি ঘরানা স্পষ্ট।

হোসেনাদের ঘর-দুয়ার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো। দরজার দুদিকের দেওয়ালে আঁকা লক্ষ্মীর পদযুগল বা স্বস্তিকা চিহ্ন, দরজার উপরে সিঁন্দুরের মাঙ্গলিক চিহ্ন। এছাড়া তারা মনসা, শীতলা, যষ্ঠী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে, দুর্গা পূজায় নতুন বস্ত্র পরিধান করে মন্ডপে যায়, আবার ইসলামধর্মের বিভিন্ন পরবও তারা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে। রমজান মাসে রোজা রাখা, আল্লাহ্ বা ইসলাম ধর্মাবলম্বী মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যে 'সিরণী' দেওয়ার প্রচলনও তাদের মধ্যে আছে। তারা খাসি ও মুরগি খাওয়ার আগে কোরবানি দেয়। কিন্তু নমাজ পড়ে না, কারণ মস্‌জিদে গিয়ে নমাজ পড়ার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। তবে আধুনিক প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা এই মিশ্র সংস্কৃতির বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করলে প্রবীণরা শঙ্কিত হয় এই ধাবনায় যে, এই প্রচলিত মিশ্র সামাজিক আইন পরিবর্তন করলে তাদের সর্বনাশের সম্ভাবনা। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরাও অবশ্য তাদের এই অন্ধবিশ্বাস ভেঙ্গে দেবার কোন উদ্যোগ নেয়নি। তবে এদেরই মধ্যে যারা স্বল্পশিক্ষিত তারা বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে পড়ে নিজেদের জীবনকে ইচ্ছেমতো পরিচালিত করছে।

মোমিন ঃ

কালিয়াচক থানার বিস্তীর্ণ এলাকা ধরে মোমিন সম্প্রদায়ের বাস। এরাও ধর্মে মুসলমান। পেশাগত জীবিকায় এরা মূলতঃ জোলা। এদের আদি পেশা ছিল তাঁতের শাড়ি, গামছা, লুঙ্গি ইত্যাদি তৈরী করা (আজও কালিয়াচকের গামছা, লুঙ্গি বিখ্যাত)। এদের মুখের ভাষা কথ্য বাংলা।

চামকাটি মুসলমান ঃ

অধুনা প্রায় লুপ্ত এই সম্প্রদায়টি ১৪৭৫ খৃঃ সুলতান ইউসুফ শাহের আমলে গৌড়স্থিত চামকাটি মসজিদে এরা নামাজ পড়ত। এরা কোথা থেকে এসেছিল অথবা সত্যিই কোন স্বতন্ত্র জাতি ছিল কিনা সে বিষয়ে জোরালো কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। এক দলের মতে এই সম্প্রদায় নিজ দেহের চামড়া কেটে ঈশ্বরকে উৎসর্গ করে তাঁর কৃপালাভ করার চেষ্টা করত বলে এদের চামকাটি মুসলমান বলা হয়। অন্য মতে এরা চামড়া-র কেনা বেচার ব্যবসা করত বলে এরা চামকাটি মুসলমান। প্রায় বিলুপ্ত এই সম্প্রদায়টির সামান্য কিছু অস্তিত্ব এখনও মালদহ জেলার চালসাপাড়া ও অন্যান্য স্থানে দেখা যায়।

এছাড়াও মুসলমান সমাজে আছেন আরও বিবিধ সম্প্রদায়ের মানুষ যাদের প্রকৃত অর্থে কোন ধর্ম নেই। তারা নিজস্ব জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। এদের মধ্যে আছে পটুয়া, সাপুড়ে, বেদে এবং লালবোগি।

চাঁই ঃ

হিন্দী শব্দ সাগরে চাঁই সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে চাঁই নেপালের বন্য জাতি বিশেষ। চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ অত্যন্ত কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। এরা শুধু ধর্মবিশ্বাসী-ই নয়, ধর্মের ক্ষেত্রে গোঁড়া প্রকৃতির। এদের মধ্যে সমস্ত দেব-দেবীর পূজোর প্রচলন আছে। তবে এরা বেশীর ভাগই মা কালীর ভক্ত। পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সম্প্রদায় মূলতঃ কৃষিজীবী। ভারতে আর্য-অনার্যগত যুদ্ধের সময় যে সব অনার্য যুদ্ধে হেরে গিয়ে বনে জঙ্গলে লুকিয়ে বসবাস করতে থাকে তারাই এখন আদিবাসী বলে পরিচিত আর বাকী যারা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করে তাদের অধীনে বসবাস ও চাষবাস করে তাদেরই একটা প্রধান অংশ অনুমান করা হয় চাঁই মণ্ডল সম্প্রদায়।

চাঁই শব্দের উদ্ভবের ইতিহাসে অনেকে চন্দ্র শব্দের কথা বলেন — চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ > চান > চাইন > চাঁই। দলপতি বা প্রভু (দলের চাঁই)। সাঁই শব্দ থেকেও চাঁই হতে পারে। যেমন চাঁই গোস্বামী >গোঁসাই >সাই। সাই শব্দের অর্থ স্বামী, প্রভু, চাঁই শব্দেরও তাই। এ ছাড়া চাঁই শব্দের একাধিক আভিধানিক অর্থ রয়েছে — প্রধান বা মণ্ডল, চতুর, ঝানু, দক্ষ বা চালাক, ঢেলা, পিণ্ড, আবার মাছ ধরার এক প্রকার যন্ত্রকেও চাঁই বলে, 'মণ্ডল' এদের পদবী।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই চাঁই জাতির দেখা মিললেও মালদহতেই তার সংখ্যা সর্বাধিক। এই বিষয়ে Chain বলেছেন — "This caste is more largeley represented in Maldah than any other District of Bengal."

বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্র চলিত মৈথিলী ভাষার সঙ্গে এবং ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণা জেলার Chhika - Chhiki অঞ্চলের মৈথিলী ভাষার সঙ্গে পশ্চিম ও পূর্ব বঙ্গের বিশেষতঃ মালদহ জেলার চাঁই সম্প্রদায়ের ভাষার ভীষণ মিল দেখা যায়।

চাঁই সম্প্রদায়ের প্রধান উপজীবিকা হল কৃষিকাজ। তাই গঙ্গার মত সুবৃহৎ নদীর তীরবর্তী এলাকাতেই এদের বসবাস বেশী। এসব কারণেই মালদহ জেলার কালিয়াচক, মাণিকচক, রতুয়া, ইংরেজবাজার ইত্যাদি থানা এলাকাতেই এদের সংখ্যা বেশী। এরা মূলতঃ কৃষিজীবী হলেও প্রাচীনকালে মাছ ধরাও এদের অনেকের জীবিকা ছিল। গাঙ্গেয় সমভূমি বা নদ-নদীর তীরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের অধিবাসী হওয়ার কারণে মৎস্যশিকারে এরা অভ্যস্ত ছিল, আজও আছে।

খোট্টা ঃ

ধর্মে নিম্নবর্ণের একদল মানুষ; যারা এসেছে মূলত বিহার অঞ্চল থেকে। এদের বর্তমান বাসস্থান দিয়ারার চরে। এরাই খোট্টা সম্প্রদায় বলে পরিচিত। যদিও কেবলমাত্র দিয়ারা অঞ্চলেই তাদের বাসস্থান সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। জীবিকায় এরা কৃষিজীবী, ছোটখাট ব্যবসার কাজেও এরা লিপ্ত থাকে। ভোজপুরী প্রভাবযুক্ত বিহারের খোঁট্টা এদের মাতৃভাষা।

পাহাড়িয়া ঃ

বীরভূম জেলার রামগড় পর্বতবাসী এবং সাঁওতাল তথা রাজমহল পর্বতের পাদদেশের জাতিবিশেষ এরা। তামিল ভাষায় 'মলয়' শব্দের অর্থে পাহাড়, তাই এদের মাল পাহাড়িয়াও বলা হয়। আবার টলেমি বলেন, পাটনার দক্ষিণ গঙ্গাতীরে সে সমস্ত মল্লী বা মলৈ জাতি বাস

করে তাদের মন্ডলী বা মাল পাহাড়িয়া জাতি বলে। অনুমান এই মাল পাহাড়িযা মালদহে প্রথম এসে বসতি স্থাপন করে।

একটা সময় এরা কৃষিকাজ জানত না। কাঠুরিয়া বৃত্তি তথা কাঠের সামগ্রী সংগ্রহ করেই জীবন ধারন করত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়।

চূড়ান্ত দরিদ্র দশার মধ্যে এরা বসবাস করে ও ধর্মকে কেন্দ্র করে একাধিক পূজা-পার্বণ, আচার-নিয়ম ইত্যাদি করে থাকে। বছরের শুরুতেই সমবেত ভাবে দেব- দেবীর নামে কবুলতি বা মানতি করে গেরাম পূজা পাহাড়িয়াদের অত্যন্ত প্রিয় উৎসব। সূর্য এদের প্রধান উপাস্য দেবতা। এরা গোঁসাই নামে সূর্যকে অভিহিত করে। সকাল সন্ধ্যায় তারা সূর্য পূজা করে। মাঘমাসের প্রথম রবিবারে সাড়ম্বরে পালিত হয় সূর্য পূজা। সূর্য বা গোঁসাই ছাড়া ধরতি মাই (পৃথিবী) তাঁর পরিচারিকা গরানী, অন্য মতে বোন। আষাঢ় ও মাঘ মাসে এই ধরতি মাই এর পূজো হয়। ডালটন মনে করেন এই ধরতি মাই আসলে ভুঁই দেব। এছাড়া হয় সিংহবাহিনীর পূজো, যিনি বাঘ, সাপ, বিছা, প্রভৃতির দেবতা। এই পূজো হয় দুর্গা পূজোর সময়। এছাড়া তারা দুর্গা, কালী, বিষহরী প্রভৃতি দেবীর পূজা করে। পরবর্তীকালে কৃষিকাজ শেখার পর অগ্রহায়ন মাসে নবান্ন উৎসব পালন করে। ভাদ্র মাসে জনপ্রিয় উৎসব জিতাষ্টমী বা জিতিয়াপরব।

পাহাড়িয়ারা নানারকম তুকতাক সংস্কারে বিশ্বাস করে। এরা ডাইনির কু দৃষ্টিকে অত্যন্ত ভয় পায়। রেষারেষি, হানাহানি অথবা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ দেখা দিলে এরা অপছন্দের ব্যক্তিকে বান মারে। সম্প্রদায়গত ভাষায় তার নাম 'চোষক মারা'। এরা ভূত এবং ভুল্লায় বিশ্বাস করে; বিশ্বাস করে কিরনী, ডিঙ্গিয়ে ইত্যাদিতে, যারা দুষ্ট লোককে পথভ্রষ্ট করে দেয়।

বারুই ঃ

ধর্মে হিন্দু এই প্রজাতিটি পানের ব্যবসা করে। পানের ক্ষেত্রকে যেহেতু বরজ বলে, সেই বরজ থেকেই বারুই নামটি এসেছে বলে মনে হয়। এরা মূলত বিহার ও উত্তরপ্রদেশে থেকে আগত। কিন্তু বর্তমানে নিজস্ব কোন সংস্কৃতি নেই। অনুন্নত এই সম্প্রদায়টির কেউ কেউ এখন শিক্ষিত হচ্ছেন। রতুয়া ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কিছু অংশে এই প্রজাতির বসবাস।

নুনিয়া ঃ

সাধারনত নুন তৈরী করাই এদের অন্যতম প্রধান জীবিকা বলে এরা নুনিয়া নামে অভিহিত হয়। এছাড়া মাটি কাটা, কৃষিকাজ ও অন্যান্য কাজও এরা করে থাকে। এদের নির্দিষ্ট কোন ধর্ম নেই। এরা শাক্ত ও বৈষ্ণব মতে বিশ্বাস করলেও অন্যান্য দেবদেবীর পূজোও এরা করে থাকে। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা বেশিরভাগ এসেছেন বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। মালদহের ইংরেজবাজার, পুরাতন মালদা, রতুয়া, অঞ্চলের গ্রামগুলিতে এরা বসবাস করেন।

নাগর-ধানুক সম্প্রদায় ঃ

প্রাচীন কাল থেকে সম্ভবতঃ বাংলার রাজধানী যখন গৌড়ে স্থানান্তরিত হল তখন থেকেই মালদহে বিভিন্ন বহিরাগত উপজাতির আগমন ঘটে। সেই সময়ই পূর্ণিয়া, দিনাজপুর ইত্যাদি

অঞ্চল থেকে নাগর, ধানুক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষের আগমন ঘটে এবং মালদহের নিম্নভূমি অংশে এরা বসতি স্থাপন করে। তখন থেকেই জীবিকা হিসাবে এরা বেছে নেয় কৃষিকার্য, নৌকা চালানো, রেশমকীটের ব্যবসা বা পলুর চাষ প্রভৃতি। তবে প্রধান উপজীবিকা কৃষিকাজ, এই কাজে নারী ও পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করে।

নাগর-ধানুক সম্প্রদায়ের ভাষাও মূলতঃ খোট্টা এবং তাতে মাগধি এবং আওধির ছাপ রয়েছে। এদের কথ্য ভাষায় ক্রিয়ার ব্যবহারে এবং শব্দের উচ্চারণে বিশেষ ঝোঁক, টান ও কথনরীতি আবার অন্যান্য সাধারণ উপজাতি থেকেসুস্পষ্টভাবে আলাদা। এরা নিজেদের জাতিগত ভাষা এবং বাংলা ভাষা উভয় প্রকার ভাষাই ব্যবহার করে।

নাগর-ধানুক এবং চাঁই সম্প্রদায়ের ভাষা সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারে সামান্য বৈসাদৃশ্য থাকলেও এদের আদি উপাধি মণ্ডল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বৈসাদৃশ্যের মূলে রয়েছে আঞ্চলিকতা ও ভৌগোলিক বৈষম্য। তাই মনে হয় সুদূর অতীতে নাগর মণ্ডল, ধানুক মণ্ডল, বিন্দ মণ্ডল, তিয়োর মণ্ডল এবং চাঁই-মণ্ডল এরা একই সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। তারপর কালে কালে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ইংরেজবাজার, মানিকচক, কালিয়াচক এবং রতুযার বিভিন্ন গ্রামগুলিতে এই সম্প্রদায়ের মানুষগুলি বসবাস করে।

তিওর / তিয়র ঃ

দ্রাবিড় সম্প্রদায়ভুক্ত বনবাসী এই জাতি প্রাচীনকালে শিকার করেই জীবিকা নির্বাহ করত বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু বর্তমানে এরা শ্রমজীবী এবং মূলত কৃষিজীবী সম্প্রদায়। ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষের মতে ধীবর থেকেই তিওর শব্দটি এসেছে। যদিও বর্তমানে জীবিকার প্রয়োজনে এরা চাষবাস ও বিভিন্ন ধরনের কাজও করে থাকে।

সাধারণত তিওররা বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাস করে। আচারগত দিক থেকে জলকেন্দ্রিক দেবী গঙ্গা এবং বিশেষ করে লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা তারা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। দেবী মনসার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তিও লক্ষ্য করা যায়। তারা কখনও সাপ মারে না, সাপে কাটা মানুষকে ওঝার সাহায্যে চিকিৎসা করায়। ধর্মান্তরিত তিওররা পীর, খাজা ইত্যাদিতে বিশ্বাস করলেও পারিবারিক ঐতিহ্যে লক্ষ্মী পূজা, গঙ্গা পূজা করতেও ভোলেনা।

ইংরেজবাজার, পুরাতন মালদা, হরিশচন্দ্রপুর, মানিকচক, কালিয়াচক ইত্যাদি অঞ্চলে এরা বসবাস করেন।

নমঃশূদ্র ও কাপালি ঃ

মালদহ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছেন নমঃশূদ্র ও কাপালি সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ। এরা সম্ভবত বর্তমান বাঙ্গলাদেশ থেকে আগত। ধর্মে হিন্দু এই সম্প্রদায় সম্ভবত বাংলাদেশের মৌলবাদী ও রেজাকর বাহিনীর অত্যাচারে এপার বাংলায় চলে আসেন। বাংলাদেশের সীমানা অঞ্চলে সংঘবদ্ধভাবে বাস করেন। সমস্ত রকম দৈহিক কাজে এরা অভ্যস্ত।

মেথর জাতি :

লক্ষ্মণ সেনের আমলে তুর্কি সন্তান বখতিয়ার খিলজী ওদন্তপুরী বৌদ্ধমঠ ধ্বংস করলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা খাদ্যাভাবে সমাজের আবর্জনা পরিস্কার করার কাজ হাতে নিল। এই কাজকে তারা মহতের কাজ বলেই মনে করত। মহৎ > মহত্তর > মহেথের >মেথর এইভাবে মেথর জাতির সৃষ্টি। তারপর থেকে সমাজের আবর্জনা পরিস্কার কাজের সঙ্গেই এরা অদ্যাবধি লিপ্ত আছে।

বরাচেইন, চেই, চেইন :

বঙ্গ বিভাগের অনেক আগে থেকেই এই চেইন প্রজাতি বিহারের মুঙ্গের ও ভাগলপুরের দিক থেকে এই মালদহে প্রবেশ করে। গাজোল, কালিয়াচক, ভূতনী, কাটাহা দিয়ারার কাছে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের সন্ধান পাওয়া যায়। মুসলমান আক্রমণ, বর্গীর হাঙ্গামা অথবা নিছকই খাদ্যশস্যের অনুসন্ধানে তারা এই জেলায় প্রবেশ করেছে বার বার। এদের মধ্যে আবার শ্রেণীগত বিভাজন তিনটি — ভাটিয়াল, শিরোয়াল, এবং ছোট্ বা ছুট চেই সম্প্রদায়। বাংলাদেশ, মুর্শিদাবাদ এবং জঙ্গীপুরের ভাটো বা ভাটার দিক থেকে এসেছে বলে একদল ভাটিয়াল সম্প্রদায়। অন্য দল বিহারের দিক থেকে উজানে বা শিরোতে বসতি বলে শিরোয়াল। আর এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে থেকে আর একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এদের স্বভাব উগ্র, নানাবিধ সামাজিক নিয়ম কানুন বহির্ভূত তথা জাতি বিরোধী কাজ করে তাদের সমাজচ্যুত করা হয়। এদের সাথে ভাটোয়াল বা শিরোয়ালরা কথা বলে না, বা বিবাহসূত্রেও আবদ্ধ হয় না। তাই এদের বলা হয় ছোট্ বা ছুট চেইন। কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত এই সম্প্রদায়টি কৃষিজীবী ও দিন-মজুরের কাজই সাধারণত করে থাকে। মূলত খোট্টা ভাষাই এরা বলে থাকে নিজস্ব ঘরানায়। এদের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যাই বেশি যদিও দু'একজন হয়ত বা লেখাপড়া শিখেছেন।

কিষান জাতি :

মালদহ জেলার দিয়ারা অঞ্চলে বিশেষত গঙ্গা ভাঙনের ফলে নতুন জেগে ওঠা চর এলাকায়, বিশেষ করে মানিকচক থানার ভূতনীর চর সহ বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক এবং ইংরেজবাজার থানার বেশ কিছু অঞ্চলে কৃষিকার্যে দক্ষ এক সম্প্রদায়ের মানুষের বাস, তারাই কিষান সম্প্রদায় বলে পরিচিত। এই কিষান জাতির পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় যে, সুদূর প্রাচীনকালে অর্থাৎ বৈদিকযুগে যে সমস্ত উপজাতিরা নিজেদের দক্ষতায় কৃষিবিদ্যা অর্জন করেছিল, তাদের বলা হতো কৃষ্টি, এরপর হলায়ুধ রত্নমালায় এই সম্প্রদায়কে 'কৃষিক' বলা হয়েছে। বর্তমানে এই প্রজাতিই 'কিষান' সম্প্রদায় বলে পরিচিত। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এই প্রজাতিরই একটি শাখা উড়িষ্যার সীমান্তরেখা পার হয়ে বাংলার রাজধানী গৌড়ে ঢুকে বসতি স্থাপন করে। এরপর এই জেলার নদী অববাহিকার চরগুলিতে অর্থাৎ পলি অধ্যুষিত নতুন জমিব সন্ধান যেখানেই তারা পেয়েছে সেখানেই তারা চাষ-আবাদ ও বসবাস শুরু করেছে। মূলত চাষ-আবাদ-ই এদের প্রধান কাজ ও জীবিকার অন্যতম উপায় হলেও অন্যান্য যেকোনও কাজও বর্তমানে করে থাকে। এদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। বিভিন্ন কাজ তথা স্থান-কাল এবং আচরণের ভিত্তিতে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার অনেক বিভাজন আছে। —

পাহাড়ীয়া — কিষান জাতির এই গোষ্ঠীর লোকেরা পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করত। রাজমহল পাহাড়ের তলদেশে এখনও কিছু পরিমাণে এদের অস্তিত্ব দেখা যায়।

চুইনা খইলা — এরাও পাহাড় অঞ্চলে চুনের খনির কাছাকাছি বাস করত ও চুনের খনিতে কাজ করত। এরাই আদি কিষান জাতি।

ধোঁয়া কষিয়া — 'ধোঁয়া কষিয়া' কিষান সম্প্রদায়ের এই বিভাজনের পেছনে সংস্কৃতিগত কোন বৈশিষ্ট্য নেই। প্রায় দেড়শত বছর গঙ্গা মহানন্দা নদী অধ্যুষিত কোনও একটি গ্রামে বাষ্পীয়পোত যখন প্রথম প্রবেশ করে (কথিত আছে রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সেই যানে) দাড়-পাল বিহীন সেই অদ্ভুত যান দেখে গ্রামের সবাই পলায়ন করেছিল। তখন থেকেই সেই জায়গার নাম থাকে 'ধোঁয়া-কষ' অর্থাৎ বাষ্পীয়পোতের বোমা বা চোঙ্গা থেকে যে ধোঁয়া বের হচ্ছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে, এক বিরাটকায় দস্যু তার গলা থেকে কষের মত ধোঁয়া উগড়ে দিচ্ছে। সেই গ্রামে বসবাসকারী লোকদের ধোঁয়া কোষিয়া' বলা হয়।

গোঙ্গা খালি — গঙ্গা নদীর তীরেই এদের বাস। সবল জাতির এই কিষান সম্প্রদায় প্রকৃতির বিরুদ্ধতার সাথেই লড়তে অভ্যস্ত। গঙ্গা তীরস্থ জমির বালু মাটিতে খাদ্যাভাব দেখা দিলে তারা সেই জায়গা ছেড়ে উর্বর জায়গার সন্ধানে অন্যত্র চলে যায়। এরাই গোঙ্গা খালি ক্ষোম নামে পরিচিত।

ঘোংঘা খালি — মরে যাওয়া গঙ্গার কাছাকাছি এরা বসবাস করে। খাদ্যাভাবে এরা মরা গঙ্গার জলাভূমি থেকে শামুক জাতীয় ঘোংঘা ঝিনুক কুড়িয়ে ভিতরের মাংস বের করে খেতো তাই তারা ঘোংঘা খালি।

চাক বোয়ালা ক্ষোম — নদীতীরে এরা চাকবন্দী অবস্থায় বাস করে। বোয়াল মাছের মত যে কোন ধরনের খাদ্যাভাসে এরা অভ্যস্ত বলে এদের চাক-বোয়ালা ক্ষোম বলা হয়।

রাধা-নগরিয়া — ঝাড়খণ্ডের রাধানগর এলাকা থেকে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা এসেছিল এই রকমটি ধরে নিয়েই এই সব মানুষদের রাধা-নগরিয়া বলা হয়।

বাখর-পুরিয়া — এরাও ঝাড়খণ্ডের বাখরপুর অঞ্চল থেকে এসেছিল বলে ধারণা।

সাহেব-গঞ্জিয়া — ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ থেকে আগত। এছাড়া মালদহের পঞ্চানন্দপুরের দক্ষিণ দিকে সাহেবগঞ্জ নামে একটি জায়গা ছিল। বর্তমানে যার অস্তিত্ব গঙ্গাগর্ভে বিলীন। ঐ এলাকার বসবাসকারী কিষান সম্প্রদায় সাহেব-গঞ্জিয়া নামে খ্যাত। একই ভাবে গোবিন্দপুরিয়া, পিয়ারপুরিয়া, ক্যালকা-পুরিয়া ইত্যাদি নামেও কিষান জাতি অভিহিত হয়।

পাঠানিয়া — সাংঘাতিক জেদী ধরনের কিযান সম্প্রদায়ের এই মানুষেরা। শাসক ব্রিটিশরা এদের একগুঁয়েমি ও জেদের কাছে মাঝে মাঝে পর্যুদস্ত হত। তারাই তাদের নাম দেয় পাঠানিয়া।

জগমোহনা — কিযান সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা লেঠেল হিসেবে নিজেদের জীবিকা বেছে নিয়েছিল তারা জগমোহনা।

সাড়ে সাত ঘরিয়া — কিষান জাতির মধ্যে শিক্ষা দীক্ষায় তুলনামূলকভাবে উন্নত। রাজমহল পাহাড়ের দিকে গঙ্গা নদীর ধারে এদের বসবাস। হয় স্থান সাড়ে সাত অথবা সাত আর অর্ধ কোন পরিবারকে কেন্দ্র করে এই সম্প্রদায়ের পরিচিতি।

২১শি ক্ষোম — শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাদপদ, ভীরু ও সরল প্রকৃতির এই মানুষেরা নিজেদের ২১শি ক্ষোম বলে পরিচয় দেয়। মালদা জেলার কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগব, মোথাবাড়ী, মানিকচক ও রতুয়া থানাতেই এদের বেশি দেখা যায়।

২৩শি ক্ষোম — সাধারণত কৃষিকাজ জানলেও দারিদ্র্যের কারণে দিন-মজুরের কাজও করে থাকে। এরা সবাই দক্ষিণ দিক থেকেই আগত। এদের ভাটিয়াল-ও বলা হয়।

টারওয়ার — কিষান জাতির মধ্যে এরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। প্রথম দিকে রাজধানী গৌড়ে বাসা বাঁধে। এরপর রাজধানী টারাঁয় স্থানান্তরিত হলে এরাও টারাঁয় চলে যায়। আবার একসময় প্রবল বন্যায় টারাঁ ডুবে গেলে এরা ধীরে ধীরে উত্তর দিকে সরে যায়। এরাই কিষান জাতির কাছে টারওয়ার ক্ষোম বলে পরিচিত।

কোইঠা হাড়ি — অন্যের কোঠা বড়িতে কাজ করেই জীবিকা অর্জন করত বলে এরা কোইঠা হাড়ি বলে পরিচিত।

দশলা — কিষান জাতির মধ্যে যে সম্প্রদায়টি উক্ত ক্ষোমগুলির রক্তের সংমিশ্রণে নিজস্বতা হারিয়েছে তারাই দশলা ক্ষোম নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

স্থান, কাল, জীবিকা ও পরিবেশগত কারণে কিষান সম্প্রদায়েব মানুষেরা একাধিক উপবিভাগে বিভক্ত হলেও এদের আচার-আচরণ, সংস্কার ও সংস্কৃতিতে মূলগত কোন প্রভেদ নেই।

গণেশ ঃ

চাঁচল থানার প্রায় সর্বত্র পুরাতন হিন্দু অধিবাসীরদের মধ্যে গণেশ নামক একটি সম্প্রদায় বসবাস করে। এদের প্রাচীন জীবিকা ছিল তাঁত বোনা। ১৮০৯ - ১০ খৃঃ বুকানন কলিগ্রামে হিন্দু তন্তুবায় শ্রেণীর ঘন বসতি লক্ষ্য করেছিলেন এবং সেই তথ্য ল্যামবোর্ণ তাঁর গেজেটিয়ারে ১৯১৮ খৃঃ সমর্থন করেছিলেন। বোধ হয় হিন্দুদের মধ্যে তন্তুবায় সম্প্রদায়রা তখন গণেশ নামে চিহ্নিত হত। এখন অবশ্য গণেশ সম্প্রদায়রা কেবল তাঁত সংক্রান্ত কাজের সঙ্গেই আর জড়িত নেই।

টাল অঞ্চলের বসবাসকারী সম্প্রদায় ঃ

দিয়ারা অঞ্চলের মাথার দিকে কালিন্দ্রী নদীর উত্তর তট বরাবর রয়েছে টাল ভূমি। এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে মহানন্দা নদীর উচ্চ প্রবাহ এবং ফুলহরা। রয়েছে বহু খাল, বিল, দাঁড়া ও পুকুর। 'টাল' শব্দের অর্থই 'ঢালু জমি বা এলাকা'। এর মুখ্য অর্থকরী ফসল হল পাট, রবিশস্য, সরষে, ধান ও আম। বর্তমানে বেশ কিছু পরিমাণে গমও জন্মায়। শীতকালে এর নীচু বিল অঞ্চলে নানা জাতের পাখী আসে। এই অঞ্চলটি নাকি কুশী নদীর পুরাতন খাত। এই অঞ্চলেও বহু সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে নিম্নবর্ণের পাঁঝ রা, কুঁঝড়া, নাড়েগুস্তি, মুণ্ডা, ওঁরাও, সেখ ছাড়াও রয়েছে পাঠান মুঘল আমলে আগত বহিরাগত কিছু সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার।

পান্ডে, সুকুল / শুক্লা, দুবে / দ্বিবেদী, তেওয়ারী / ত্রিবেদী, চৌবে / চর্তুবেদী ঃ

এই সব সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে জানা যায় যে তারা এই জেলার মানুষ না, তারা বহিরাগত। ইতিহাস অনুসন্ধানে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, পাল রাজবংশের পর সেন বংশ গৌড় অধিকার করে। বল্লাল সেন এই সেনবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি রাজা হয়ে তাঁর রাজ্য রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ি মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। তার মধ্যে পশ্চিমে মহানন্দা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে কামরূপ রাজ্য আর দক্ষিণে গঙ্গানদী এই সীমানা নিয়ে তৈরী হল বরেন্দ্রভূমি। এই বরেন্দ্রভূমিতে তখন পূজা যাগ-যঞ্জ ইত্যাদির জন্যে কোন উচ্চশ্রেনীর ব্রাহ্মণ জাতি ছিল না। তিনি তখন কান্যকুব্জ থেকে কয়েক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কে আমন্ত্রণ জানিয়ে এদেশে আনিয়েছিলেন। পান্ডে, সুকুল, দুবে, ত্রিবেদী বা তিওয়ারী ইত্যাদিরা হলেন তাদেরই কয়েকজন, শোনা যায় রাজা বল্লাল সেন তাঁদের যথাযথ সমাদরের জন্য একটি গ্রাম এবং বহু সম্পত্তি দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই সম্পত্তি রক্ষার কারণে তারা নিজস্ব লাঠিয়াল বাহিনীও নিয়োগ করেছিলেন বলে জানা যায়।

এই সব ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিজেদের পরিচয়ে আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলেন। তারা শাক্ত ধর্মাবলম্বী। কঠোর ভাবে হিন্দু রীতি নীতি আচারে বিশ্বাস করেন। শিক্ষিত এই সম্প্রদায় বিবাহের ক্ষেত্রে নিজেদের সম্প্রদায়কেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। যদিও বর্তমানে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারের মধ্যেও বিবাহ প্রচলিত হয়েছে।

মালদহ জেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে এরা থাকলেও পুরাতন মালদহ, ইংরেজবাজার ইত্যাদি অঞ্চলেই এদের বেশী দেখা যায়।

মাহালি ঃ

প্রায় একশ বছর আগে অস্ট্রিক শ্রেনীভুক্ত এই মাহালি সম্প্রদায় বিহারের ঝাড়খন্ড, ছোটনাগপুর এবং পশ্চিমবাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে এই জেলায় এসেছে। এরা সাধারণ পাল্কীবাহকএবং বেতের কাজ করত, এখন এই কাজের চাহিদা কমে যাওয়ায় যে কোন ধরনের মজুরের কাজ করে থাকে। আদিবাসী সাঁওতাল বা কোড়াদের মত মোহালিদেরও কতকগুলি গোত্র আছে। যেমন— কুড়িয়াং, হাঁসদা, ডুংরি, মাররী, সিল্লি, টিরকী, করকুসা, কেরকেটা, মারমুয়ার টাপায়ের ইত্যাদি।

গবেষকদের মতে মাহালিরা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একটি শাখা। মূল সাঁওতাল সমাজ থেকে বেড়িয়ে এসে বর্তমানে এই সম্প্রদায় মুন্ডা মাহালি, ওঁরাও মাহালি ও কোল মাহালি নামে পরিচিত হয়ে আসছে। এদের আদি ভাষা মুন্ডারি। বর্তমানে ভাঙা বাংলাতে কথাবার্তা বলে।

মাহালীদের প্রধান দেবতা ধরমবোঙ্গা, আর গৃহ দেবতা আরাবোঙ্গা। অন্যান্য উৎসবের মধ্যে গেরাম ঠাকুর আর যুগিনি দেবীর পূজো উৎসব। এরা সূর্যকে দেবী হিসাবে মান্য করে, আবার হিন্দুদের মতো মনসা, হরি, গ্রামঠাকুরের পুজো, গোয়াল পুজো, করম ইত্যাদি পূজোও করে থাকে। আদিবাসী অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মাহালিরা শিক্ষা ক্ষেত্রে খানিকটা এগিয়ে আছে।

ঝুড়ি ও বাঁশের বিভিন্ন কাজে তারা বিশেষ পারদর্শী। শুধু তাই নয় এরা জাত শিল্পী। বাস্তুবিজ্ঞান, সঙ্গীত ও শিল্পকলায় তাদের পারদর্শিতা জন্মগত। মালদা জেলাতেও এই মাহালিরা বিহার, ঝাড়খন্ড থেকে প্রবেশ করে গাজোল ও পুরাতন মালদা এবং অন্যান্য জায়গায় বসতি স্থাপন করেছে। পুরাতন মালদহ থানার শিমূলঢাব, মহুরী, গাজল থানার মঞ্জুলি ঢাব, আলমপুর, একান্দর ও চিরাকুটী ইত্যাদি গ্রামে এই মাহালিরা বসবাস করে।

সদ্‌গোপ :

তাম্রাশ্ম যুগ থেকেই গ্রামের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে যাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল তারা হলেন সদ্‌গোপ। এই সদ্‌গোপদের আদি বাসভূমি ছিল উত্তররাঢ় অঞ্চল। অনুমান করা যায় পাল ও শূরবংশীয় রাজারা সদ্‌গোপ ছিলেন। ধর্মে তারা শিব ও শক্তির উপাসক হলেও বাঙলাদেশে তন্ত্রধর্মের ব্যাপক প্রসার তাদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। বর্ধমান ও বীরভূমের অংশবিশেষ নিয়েই সদ্‌গোপদের অবস্থান ছিল, তাই এই অঞ্চল 'গোপভূম' নামে পরিচিত ছিল। সদ্‌গোপ দের বিভিন্ন শাখা, ভালকী, অমরাগড়, কাঁকশা, দিগ্‌নগর, ঢেক্করী, মঙ্গলকোট, নীলপুর প্রভৃতি স্থানে শক্তিশালী রাজ্যও স্থাপন করেছিল। পাল রাজাদের রাজত্বের সময়ই এই সদ্‌গোপেরা সামন্তরাজা হিসাবে রাজত্ব করতেন। এই সকল সামন্ত রাজাদের অন্যতম ছিলেন ইছাই ঘোষ বা ঈশ্বরী ঘোষ। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে তিনি রাজত্ব করেছিলেন, এবং তিনি পালরাজা মহীপালের (৯৭৭ - ১০২৭ খ্রীঃ) সমসাময়িক ছিলেন। রামগঞ্জের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় মহামান্ডলিক ইছাই ঘোষের পিতা ধবল ঘোষ (ধর্মমঙ্গল কাব্য অনুযায়ী সোম ঘোষ), তার পিতামহ বল ঘোষ, প্রপিতামহ ধূর্ত ঘোষ, (তথ্য - বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর বিবর্তন / ডঃ অতুল সুর)। এই সদ্‌গোপ জাতির রাজারা যে প্রভাব প্রতাপশালী ছিলেন তা বোঝা যায়, রামগঞ্জের তাম্রশাসনে ইছাই ঘোষ নামের সঙ্গে যে সকল উপাধি সূচক বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে তা পাল রাজাদের ব্যবহৃত উপাধিকেও হার মানিয়ে দেয়। ঘোষ উপাধিধারী এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এখন উচ্চশিক্ষিত ও বিভিন্ন উচ্চ সাম্মানিক কাজের সঙ্গে যুক্ত।

গোপ বা গোয়ালা :

গোপ গোয়ালারা শ্রীকৃষ্ণের ঘর্ম থেকে উৎপন্ন বলে নিজেদের মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ বংশীয়। মুখ্য পেশা পশুপালন হলেও কোন অঞ্চলে পশু বিক্রকারী আবার কোথাও ভেড়ীওয়ালা, কোথাও আহিরী গোপ,। ১৩১৮ সনে বাংলাদেশে শ্রীহট্টের গোপ-গোয়ালাদের সমাজ সভায় লেখা হয়েছে গোয়ালাদের জাতি ব্যবসা কৃষিকাজ নয়, গো-দুগ্ধ সংক্রান্ত, গোপেরা স্বজাতি ব্যবসা আজ পর্যন্ত ত্যাগ করেননি।

গোপদের উপাধি গোপ থাকলেও ইদানীং তাদের ঘোষ, যাদব ইত্যাদি উপাধিও ব্যবহার করতে দেখা যায়। মালদহে এই জাতীয় সম্পদায়ের প্রচুর বসতি আছে। পুরাতন মালদহ, ইংরেজবাজার তো বটেই মালদহের অন্যান্য অঞ্চলেও এরা প্রচুর পরিমানে বসবাস করে। মূলত শক্তিশালী এই সম্পদায় বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী এবং গো-ধন উৎপাদিত সামগ্রীর ব্যবসার সঙ্গেই নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন। যদিও ইদানীং শিক্ষিত প্রজন্ম অন্য ব্যবসাকেও জীবিকা হিসাবে গ্রহণ

করেছে। কিন্তু এদের মধ্যে যারা গরু কেনা বেচা এবং দুগ্ধ সংগ্রহ বা বিক্রয় ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত তাদের সঙ্গে যারা দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন প্রস্তুত অথবা বিক্রয় করেন তাদের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য আচার এবং মানসিকতায়।

কোড়া / কোরা ঃ

আদি অস্ত্রাল সম্প্রদায়ভুক্ত কোরা জনজাতিও একসময় বিহারের ছোটনাগপুর ও ঝাড়খন্ড থেকে এই জেলায় এসেছিল। এরা সাধারণত কৃষিজীবী সম্প্রদায় তবে জীবিকার প্রয়োজনে এবা মাটি কাটার কাজও করে থাকে। মাহালি সম্প্রদায় ছোটনাগপুর এবং দক্ষিন পশ্চিম বাংলার অধিবাসী মুন্ডা জাতিরই এক নতুন শাখা। মালদহে এই সম্প্রদায়ের যে গোত্রগুলির অস্তিত্ব দেখা যায় সেগুলি হল,— সামদোয়ার, হারদি, কোড়ি, কাঁচ, তিরকি, টিরু, নাগরু ছাগেড়। আর্থিক দুরবস্থার কারণে তেমন কোন জোরালো উৎসব এদের হয় না; সংস্কৃতিগত নিজস্ব কোন উৎসব নেই। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত এদেরও মূল উৎসব মোটামুটি তিনটি, ভাদ্রমাসে করম পূজা অঘ্রান এ নবান্ন, মাঘ মাসে সরহায়।

ছোটনাগপুর ও দক্ষিণ - পশ্চিম বাংলা থেকে আগত অস্ট্রিক মুন্ডা জাতিরই আর একটি শাখা হল এই কোড়া সম্প্রদায়। সাধারণত মাটি কাটা বা কুয়ো খোঁড়া ইত্যাদি কাজেই এদের পারদর্শিতা বেশি। এদের মধ্যে অনেক বিভাজন আছে। তার কয়েকটি হল,— সামদোয়ার, হারদি, কোড়ি, কাঁচ, তিরকি, চিরু, কিসার, নাগরু, ছাগেড় ইত্যাদি। অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের মত এদেরও প্রধান উৎসব মূলত তিনটি ভাদ্র মাসের কর্মা পূজা, অঘ্রান এর নবান্ন আর মাঘ মাসে সরহায়। গাজোল, পুরাতন মালদা এবং হবিবপুরের কিছু অংশে এদের বসবাস। এদের আদি ভাষা মুন্ডারি, কিন্তু কেউ কেউ সাঁওতালী, কুরুখ ও সাদরি ভাষা ব্যবহার করেন।

পুরাতন মালদহের নেমুয়া, কামাত, থেড়কাঠি, তুলাডাঙ্গি, সৈকদপুর, কুঁহিকুড়ি,পূর্ব বাঞ্ছাপুর, গাজোল থানার, মল্লিক পুর, পাহাড়ি ভিটা, আমলিতলা, কাগাসুরা, দক্ষিণ মালজাঙ্গা, মোল্লাদীঘি, নিজগ্রাম, হবিবপুর থানার সিমলচুরা এগুলি কোড়াদের নিজস্ব এলাকা বলে চিহ্নিত।

বিন্দ্ ঃ

বিন্দ বা বিন্ সিম্প্রদায়ের অধিবাসীরা ঠিক কোথা থেকে এসেছিল তা বলা না গেলেও বিহার রাজ্য থেকে এদের আসার সম্ভবনাই বেশি। এরা কোশি এবং গঙ্গার তীর বরাবর বাস করে। জনসংখ্যা অনুযায়ী সমগ্র বিন্ সম্প্রদায়ের মানুষের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক মানুষেরই বাস এই জেলাতেই। মাটিকাটা, মাছধরা, জন্তুজানোয়ার শিকার, গাছ গাছড়ার শিকড় ইত্যাদির ওষুধ বিক্রয় করা এদের জীবিকা।

মালদহ মানিকচক থানার কাহালা, বাঁকিপুর, ভূতনীর চর, রতুয়া, কালিয়াচক, পুরাতন মালদহ, ইংরেজবাজার ও হবিবপুর থানার বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে এদের দেখা যায়।

দোসাদ ঃ

উত্তরবঙ্গে মালদহ জেলাতেই এই সম্প্রদায়ের দেখা পাওয়া যায়। প্রধানত বিহার ও

ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকেই এরা এ জেলায় এসেছিল। কৃষিকাজ এদের প্রধান জীবিকা হলেও ঘোড়ার সহিস হিসাবেও এরা শহরে এসে জীবিকা নির্বাহ করে।

ওঁরাও :

ওঁরাওরা বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসী। আর্থিক দুরবস্থার কারণেই তারা সেখান থেকে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। মালদহ জেলাতেও এদের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

ওঁরাওরা বা নিজেদের ভাষার নাম অনুসারে নিজেদের 'কুরুখ' বলে। ওঁরাও শব্দটি 'ওরাগোরা' (বাজপাখি) থেকে উৎপত্তি হতে পারে অথবা শব্দটি 'উরণ' (অপব্যায়ী) শব্দ থেকে আসতে পারে। কারো কারো মতে রাবণপুত্র বা রাবণের বংশধর এই সম্প্রদায়। রাবণ থেকেই ওঁরাও শব্দের উৎপত্তি। ওঁরাও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর একটি শাখা। তাদের পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল কোঙ্কন অঞ্চল। দ্রাবিড়দের কুরুখ ভাষার সঙ্গে ওঁরাওদের ভাষার অনেক মিল পাওয়া যায়। তারা বর্তমানে সাদরি নামে এক মিশ্র ভাষায় কথা বলে। ওঁরাওরা ভালো শিকারী। শিকার তাদের জাতিগত নেশা। কিন্তু বর্তমানে ভূমি শ্রমিক বা কৃষিজীবী। হলুদ, বীন, পান, সুপারি এদের বিয়ে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আবার মৃত্যুর পর এরা মৃতদেহকে কবর দেয়। এরা হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বসবাস করে।

খেরওয়াড় / খেড়িয়া :

খেরওয়ার বা খেড়িয়ারা ছোটনাগপুর ও দক্ষিণ বিহারের কৃষিজীবী। অন্যান্য অস্ট্রিক উপজাতিদের মতোই খেড়িয়ারা সূর্যকেই তাদের প্রধান দেবতা বলে মনে করে। ধূপ, ধুনো জ্বালিয়ে এই দেবতার পূজা দেয়। গোত্রের বিভিন্ন ট্যাবু যেমন শোলমাছ, ইদুর, কচ্ছপ, বাঘ ইত্যাদিকে পবিত্র জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে। এই সম্প্রদায়ের আজ আর কোন নির্দিষ্ট পেশা নেই, এমনকি বাংলাদেশে এসে উৎসব ও রীতিনীতির ক্ষেত্রে তাদের নিজস্বতাও তার তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর, রতুয়া, গাজোল ইত্যাদি অঞ্চলে এদের দেখতে পাওয়া যায়।

মালো :

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে মালদা জেলা গঠিত হবার কয়েক বছর আগে (১৮০৯ খৃঃ) দেওয়া ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটনের বিবরণী থেকে তৎকালীন পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ এখনকার মালদহের মহানন্দা নদীর পশ্চিমাংশে যে 'মালো' জাতির বাস ছিল তা আমরা জানতে পারি। এই মালোদের জীবিকা যেহেতু মাছ ধরা তাই অন্যান্য মৎস্যজীবী জাতিগোষ্ঠীও সাধারণ জনমানসে 'মালো' নামে আখ্যাত হতে থাকে। বুকাননের বর্ণনা অনুযায়ী সেই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়রা হল — কেওট, বিন্দ, বাগদী, তিওর, তোরা ইত্যাদি।

ভুসুন্দর / ভূঁইমালি :

বাঁশ নির্মিত ঝুড়ি, কুলো, চাঙাড়ি ইত্যাদি তৈরী করা ছিল এই সম্প্রদায়ের প্রথমিক পেশা। এর সাথে সাথে শক্তিশালী এই সম্প্রদায় পাল্কী বাহকের কাজও করত। জীবিকার প্রয়োজনে পরবর্তীতে এরা কৃষিকাজ, ক্ষৌরকার্য ও রজকের কাজও করে থাকে। আদিবাসী এই সম্প্রদায়

বর্তমানে নিজেদের সংস্কৃতি থেকে সরে এসে হিন্দুধর্ম গ্রহন করে। অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ-ই তাদের প্রধান আরাধ্য দেবতা। মালদহের চাঁচল, গাজোল, পুরাতন মালদার বামনগোলা, হবিবপুর ইত্যাদি অঞ্চলে এদের দেখা যায়।

মুসহর/মুসাহার ঃ

বুকানন মনে করেন এই সম্প্রদায়ের এমন কোন সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য বা বৈশিষ্ট্য নেই যা দিয়ে তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। মুষিক হরন এবং মুষিক আহার থেকেই এই সম্প্রদায়ের নাম মুসাহার হয়েছে অনুমান করা যায়। এদের নির্দিষ্ট কোন জীবিকা নেই। তবে নিজেদের এরা রামভক্ত বলে পরিচিত করতে ভালবাসে। মালদহের চাঁচল, মানিকচক, রতুয়া, পুরাতন মালদহ, ইংরেজবাজার অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় এরা বসবাস করে।

চামার/মুচি/রবিদাস ঃ

মৃত গরু, ছাগল আর মোষের শরীরের চামড়া ছাড়িয়ে পাকা কবা এবং সেই চামড়া বাদ্যযন্ত্রের ছাউনির উপযুক্ত করা, জুতো তৈরী, চামড়া কেনা, এবং চামড়াজাত অন্যান্য সামগ্রী তৈরী করা, ঘোড়ার জীন তৈরী করা, ঢাক বাজান, ইত্যাদি বিবিধ ধরনের কাজ এই সম্প্রদায়ের মানুষজন করে থাকেন। ভারতের প্রায় সর্বত্র রবিদাস সম্প্রদায়ের মানুষ দেখা যায়। যদিও একেক দেশে তারা স্থানীয় নামেই পরিচিত। বাংলাদেশের পূজা পার্বণে ঢাক বাজিয়ের বেশিরভাগই এই রবিদাস সম্প্রদায়। নিজেদের আচার আচরনে তারা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। পুরাতন মালদার অন্যতম বৃহত্তম মৌজা মুচিয়া নামটি এইরকমই একজন রবিদাস মুচিপীরের নামাঙ্কিত স্থান বলেই চিহ্নিত। ইংরেজবাজার থানার মিল্কি, খালকোল, পুরাতন মালদা, রতুয়া, হরিশচন্দ্রপুর, চাঁচল, বামনগোলা, হবিবপুর অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন।

পাটনী ঃ

দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত এক শাখা সম্প্রদায় এই পাটনী। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে 'ঈশ্বরী পাটনী' নামে খেয়া পারাপারকারী এই চরিত্রটি বিখ্যাত হয়ে আছে। সাধারণত নৌচালনা ও মাছধরা এই সম্প্রদায়ের অন্যতম জীবিকা। প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল থেকে গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চলে বসবাসকারী এই সম্প্রদায় বর্তমানে মাছধরা ছাড়াও মাছ বিক্রয় এর কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। এরা হিন্দুধর্মাবলম্বী হলেও অনেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। এদের আচরণে তাই মিশ্র ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা তারা এখনও নদী এবং নৌকোকে বিশেষ ভক্তি সহকারে পূজা করে। জলদেবী 'খলকুমারীর' পূজা করে শ্রাবণ মাসে। অন্য দেবী 'বুড়িমা'। পুরাতন মালদা, বামনগোলা, হবিবপুর, চাঁচল, রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর, গাজোল প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর এদের দেখা যায়।

কৈবর্ত /কেওট/কেওড়া ঃ

কৈবর্ত জাতির ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এস.পি.লাহিড়ী, রামশরন শর্মা, বি.এন.এস.যাদবের গবেষণালব্ধ চিন্তাভাবনা যা বেঙ্গল গেজেটিয়ারে মুদ্রিত হয়েছে তা হল

কৈবর্তরা আদতে কৃষিজীবী সম্প্রদায়, এদের জাতি হচ্ছে মাহিষ্য। তারা একসময় মহিষের পিঠে চেপে দুর্দান্ত লড়াই করতে পারত বলেই বোধহয় তাদের এইরকম নাম হয়েছিল। স্থানীয় উপজাতিদের নিয়ে তৈরী এই দুর্ধর্ষ সেনাদলের নায়ক ছিলেন দিব্য। পালসম্রাট প্রথম মহীপাল এই সেনাবাহিনীকে নিজের আপৎ কালীন কাজে লাগানোর প্রয়োজনে ২১০ টি ভূখন্ড দান করেছিলেন। শর্ত ছিল যুদ্ধকালীন সময়ে সামরিক সাহায্য দান। দিব্যকের আত্মীয়রা পাল শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। চাষযোগ্য জমি পেয়ে অধিকাংশ কৈবর্তরাই একসময় কৃষিকাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এরপর পাল সম্রাট দ্বিতীয় মহীপালের আমলে সামরিক সেবার ত্রুটির কারণ হিসাবে পালরাজা তাদের দান করা জমি কৈবর্তদের কাছ থেকে কেড়ে নেন। এছাড়া রাজস্বের হার বৃদ্ধি, এবং বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করে বিরক্ত এইসব কৃষিজীবী মানুষেরা একসময় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বাংলার বরেন্দ্রী অঞ্চলে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কৈবর্তদের নেতা দিব্য। তিনি পালসম্রাট দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করেন (১০৭০ - ১০৭১)। ঐতিহাসিক রামশরন শর্মা এই বিদ্রোহের অন্য একটি কারণ হিসাবে পালরাজাদের সঙ্গে বৌদ্ধদের সুসম্পর্কের কথা বলেন। কৈবর্তরা শিব এবং ভবানীর উপাসক ছিলেন কিন্তু তাদের ধর্মীয় আবেগকে গুরুত্ব না দিয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রসার চলতে থাকে অবাধে এবং চবম ভাবে বৃদ্ধি পায় বৌদ্ধমঠের সম্পত্তির পরিমাণ। এই বৈষম্যকে তারা মেনে নিতে পারেনি। দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর দিব্য তার ভ্রাতা রুদ্দক এবং রুদ্দকের ভ্রাতা ভীম ববেন্দ্রীতে তিন পুরুষ ধরে রাজত্ব করেন। পূর্ববঙ্গের যাদব বংশীয় রাজা জাঠবর্মন দিব্যকে পরাস্ত করতে পারেন নি। এরপর পরমার বংশের রাজা লক্ষণদেব ভীমকে আক্রমন করলে পালবংশীয় রাজপাল এই সুযোগ হাতছাড়া করেন নি। তিনি ১৪ জন সামন্তরাজকে স্বর্ণভর্ত্তি কলস উপঢৌকন দিয়ে তাদের সাহায্যে ভীমকে পরাস্ত করেন। এই সময় কৈবর্তদের মধ্যে কেউ কেউ রামপালের অধীনতা স্বীকার করে নেন কেউ কেউ পালিয়ে যান অন্যত্র। বরেন্দ্রী অঞ্চলে কৈবর্ত বিদ্রোহের এইসব কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে সন্ধ্যাকর নন্দীর লেখা 'রামচরিত' গ্রন্থে, কামাউলি লেখ, মানাহালি লেখ, বেলবা পট্টলী ইত্যাদিতে।

ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা এই বিদ্রোহ কে প্রথম 'গণবিদ্রোহ' বলতে চান। যদিও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই বিদ্রোহ কে গণ বিদ্রোহ স্বীকৃতি দিতে নারাজ।

কেওট বাংলার তপশিলী জাতি। পেশাভিত্তিক দুটি শাখা হালিক (চাষী) এবং জালিক (জেলে)। কৈবর্ত বাংলার আর্য- পূর্ব জনগো ষ্ঠী। প্রাচীন বাংলার কৌম ভিত্তিক সামাজিক সংগঠনে কৌম নামেই জনপদ পবিচিত হত। কর্বট কোমের বংশধর কৈবর্ত, পরবর্তীকালে কেওট, কেওড়া। ঋক সংহিতায় কীকট, রাজসেনীর সংহিতায় কৈবর্ত, রামায়ণ-মহাভারত, মনু সংহিতায় কৈবর্ত, বৌদ্ধ-জাতকে কেবত্ত, অশোকের শিলালিপিতে কেবত।

বর্তমানে এই কেওট জাতি মালো জাতির মতই মাছ ধরে ও মাঝির কাজ করে; যদিও বেশ কিছু কেওট বিভিন্ন সময়ে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এদের প্রায় হাজার দেড়েক পবিবার মহানন্দা ও তার শাখা বরাবর বাস করে।

পুন্ড্রীক, পৌন্ড্র, পোদ, পুঁড়া ঃ

মালদহের পান্ডুয়া একসময় দীর্ঘদিন এই সম্প্রদায়ের আধিপত্যাধীনে ছিল বলে জায়গাটি

পাভুয়া বলে চিহ্নিত হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। একটা সময় সমগ্র ভারতবর্ষ তথা ভারতের বাইরেও গৌড়দেশের খ্যাতি যে কারণে ছড়িয়ে পড়েছিল তা হল ইক্ষু বা আখজাত গুড় এবং রেশম জাত বস্ত্রের জন্য। এই দুটি কাজ যারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন তারা হলেন পৌন্ড্র, পরবর্তীতে যাঁরা পোদ বা পুঁড়া সম্প্রদায় বলে পরিচিত হয়েছেন। শোনা যায় পুন্ড্রীক বা পোন্ড্ররা একসময় উচ্চবর্ণের মানুষ ছিল। তারা নিজেদের পরিচয়ে ক্ষত্রিয় বলত। কিন্তু বিশ্বামিত্রের অভিশাপে এই সম্প্রদায় অন্ত্যজ বলে পরিগনিত হয়। বর্তমান কালের বিওহীনতা সত্ত্বেও প্রাচীনকালের সেই অহমিকাটুকু আজ পর্যন্ত তারা বিসর্জন দেয়নি। জীবিকার সাথে সাথে নিজস্ব ধর্ম প্রতিপালন তাই তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, চৈতন্যদেবের প্রভাবে এই সম্প্রদায়ের অনেকে বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিপালন করে থাকেন। মালদহের হবিবপুর, পুরাতন মালদহ, ইংরেজবাজার এবং কালিয়াচকের সুজাপুর, মহদীপুরের কিছু কিছু অঞ্চলে এদের দেখা যায়।

বাগ / বাগদী ঃ

মৎস্যজীবী দ্রাবিড়ীয় জনগোষ্ঠী। মাছধরা, মাছ বেচা, জাল বোনা, নৌকা চালনা, ঝিনুক-শামুক পুড়িয়ে চুন তৈরীর পেশা নিয়ে হিন্দুধর্মী জনগোষ্ঠীর নীচের থেকে স্থান করে নিয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যক অনুযায়ী পক্ষী টোটেমে এরা আস্থাশীল। বৃহৎ ধর্মপুরাণেএদেব অসৎ-শূদ্র পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। উত্তরে গড়বেতা থানার (বক্‌ডিহি) বগড়ি পরগণা এদের আদিবাস বলে একটি মত পাওয়া যায়।

চুনারী ঃ

বাগদী কোরোঙ্গাদের অন্যতম পেশা চুন তৈরী করা। ঝিনুক, শামুক পুড়িয়ে কলিচুন তৈরী হয়। বাড়ি রঙ করানোর কাজে এই চুনের একসময় প্রচুর চাহিদা ছিল। চুনারি নামেই এইসব তফ্‌শিলী বর্ণের মানুষেরা পরিচিত।

ডোম ঃ

মালদার আর এক তফ্‌শিলী জাতি, প্রাকৃতে ডোম, এক সময়ে ঝাড়গ্রামের শিলদা অঞ্চলে ডোমদের রাজ্য ছিল (ডোমজুড়)। কোন এক অজ্ঞাতনামা ডোমরাজকে পরাজিত করে সাঁওতালরা তাদের সামন্তভূম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাকৃতে চর্যাপদে এরা পরিচিত ডোম্ব / ডোম্বী বলে। বাঁশের ঝুড়ি, চুপড়ি বোনা পেশা। নারী-পুরুষ নৃত্য-গীত পটিয়সী। বাংলার অতীত ইতিহাসে তাদের গৌরবময় ভূমিকা ছিল। সীমান্ত খণ্ডের ভূমরাজ্যগুলিতে সামরিক বাহিনীর অপরিহার্য অঙ্গ। ধর্মঠাকুরের পূজায় মুখ্য পুরোহিত ডোম-পণ্ডিত।

মালদহ জেলার স্থাননামের ক্ষেত্রে এইসব জাতি উপজাতিদের ভূমিকা অনেকখানি। এদের বহু বিচিত্র ভাষা, সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত হয়ে গেছে বহু থানা, মৌজা এবং পাড়ার নাম।

● তথ্য সহায়তা

১. অতীতের মালদহ — প্রবাল রায়।

২ মালদা জেলার ইতিহাস - ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ।
৩. ঝড় পত্রিকা মুর্শিদাবাদ থেকে সম্পাদকমণ্ডলী দ্বারা প্রকাশিত।
৪ বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন ডঃ অতুল সুর।
৫ পুরাতন মালদার ইতিহাস - ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ সম্পাদিত
৬ মালদহ - সিদ্ধার্থ গুহ রায়।

ব্যক্তি ঋণ -- ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ (বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির)· মুস্তাক আলি (গৌড় মহাবিদ্যালয়), বেলা ঘোষ (গৌড় মহাবিদ্যালয়)

ভাষা সমূহের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

যে কোন জেলার একটা নিজস্ব ভাষাবৈশিষ্ট্য থাকে। সেই ভাষাবৈশিষ্ট্য নির্ভর করে সাধারণত জেলাব ভৌগোলিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর। বহিরাগত বিভিন্ন জনজাতিব আগমনের উপরেও এই ভাষাবৈশিষ্ট্যের তারতম্য ঘটে থাকে।

"জানার" কথাকে জানানো আর হৃদয়ের কথাকে বোধে জাগানো, এছাড়া ভাষার আর একট খুব বড়ো কাজ আছে, সে হচ্ছে কল্পনাকে রূপ দেওয়া। একদিকে এইটিকে সবচেয়ে অদরকারী কাজ আর এক দিকে এইটেই মানুষের সবচেয়ে আনন্দ। .. .. বাংলাদেশের ইতিহাস খন্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্রের কেবল ভূগোলের ভাগ নয় অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে। সমাজেরও মিল ছিল না তবু এরই মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে তা ভাষার ঐক্য নিয়ে। এতকাল আমাদের যে বাঙ্গালী বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে আমরা বাংলা বলে থাকি। শাসনকর্তারা বাংলাদেশের অংশ প্রত্যংশে অন্য প্রদেশ জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সরকারী দফতরের কাচিতে তার ভাষাটাকে ছেঁটে ভালো করে কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দূর্বলতা দুই-ই আমাদের জানা নাই।" (বাংলা ভাষা পরিচয় / রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর)।

আজ থেকে ঠিক কত বছর আগে মানুষ তার মনের আশা-আকাঙ্খাগুলিকে সুসজ্জিত, সুগঠিত, লিপিবদ্ধ ধ্বনির আকারে প্রকাশ করেছিল তার সঠিক সময়কাল নিরূপন করা কঠিন। তবে বাংলা ভাষার ব্যাপারে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন — খ্রীষ্টের দশক শতকের কোনও এক সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম। জন্মেলগ্নের সে ইতিহাস পুঙ্খানু পুঙ্খু বর্ণনার উপায় নেই। কারণ ভাষার গঠনশৈলির পরিকাঠামো ধ্বনি বিজ্ঞান সেকালের মানুষের ছিলো অজানা। সে বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হল বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে যখন সুইস ভাষাবিজ্ঞানের জন্ম দিলেন। এই নব্য ভাষাবিজ্ঞানীদের প্রধান গবেষণার বিষয় ছিলো নিয়ত পরিবর্তনশীল, প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর আঞ্চলিক কথ্য ভাষা। মাটি থেকে উঠে আসা ধ্বনীর ভ্রম কিভাবে মস্তিষ্কে আশ্রয় গ্রহণ করে পরিপার্শ্বস্থ ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, জাতি, ধর্মের সোপান বেয়ে ধীরে ধীরে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে প্রবেশ করে মান্য শব্দের আকারে সাহিত্যে স্থায়ী আসন গ্রহণ করে সে এক আশ্চর্যজনক ইতিহাস।

যে কোন জেলার একটা নিজস্ব ভাষা বৈশিষ্ট্য থাকে। সেই ভাষাবৈশিষ্ট্য নির্ভর করে

সাধারণত জেলার ভৌগোলিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর। বহিরাগত বিভিন্ন জনজাতির আগমনেরউপরেও এই ভাষার বৈশিষ্ট্যের তারতম্য ঘটে থাকে। মালদহ জেলার ভাষাবৈশিষ্ট্যেও এই বিষয়গুলি লক্ষ্যণীয়।

দীর্ঘকাল প্রশাসনিক ভূ-মন্ডলের কেন্দবিন্দুতে থাকার জন্য বাংলার ইতিহাসে মালদহের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য মালদহের একটি পুরাতন অবিকৃত সামাজিক কাঠামো আছে। রাজশক্তির আকর্ষণে এই অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে বহু সম্প্রদায়ের মানুষের আগমনের প্রয়োজন ঘটেছে তার ফলে একদিকে যেমন বহু সাম্প্রদায়িক ও বহু সাংস্কৃতিক চরিত্র গড়ে উঠেছে তেমনি ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতার জন্যে এইসব অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের ভাষা আচরণ প্রাণ অবিকৃত রাখতে সক্ষম হয়েছে। তার ফলে এই জেলায় দেখা যায় একাধিক প্রাচীন ভাষাভাষী সম্প্রদায়।

ভাষা বিজ্ঞানের দিক থেকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাজধানী থেকে ভূখন্ডটির দূরত্ব। মুসলীম আমলের শেষ দিক থেকেই বাংলাব রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে যায় মুর্শিদাবাদে। কিছুদিন পরে ইংরেজ আমলে কোলকাতায়। রাজধানী থেকে অনেকটা দূরত্বে অবস্থান করার জন্যে স্বাভাবিক কারণেই মালদহেব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ রক্ষণশীল থেকে গেল। যদিও কেবল দূরত্বই একমাত্র কারণ নয়, সম্প্রদায়গত নিজস্বতা বজায় রাখা এবং সার্বিক শিক্ষা গ্রহনের আর্থিক অক্ষমতাও এর অন্যতম কারণ হিসাবে সক্রিয়। আর এই কারণে সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ ভাষা ও তাদের প্রত্নলক্ষনে থেকে গেল অবিকৃত।

প্রাচীনকালের দিকে তাকালে দেখা যাবে, সেই সময়কার রাজশক্তি যে ভাষাভাষি সম্প্রদায়ের ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই ভাষা তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। হিন্দু বা বৌদ্ধ আমালের রাজশাসনাধীন সেই ভাষাব প্রভাব এতই ক্ষীণ যে কেমলমাত্র সেই সময়ে রচিত সাহিত্য ছাড়া তার নিদর্শন পাওয়াই যায় না। বরঞ্চ সেন বংশ পরবর্ত্তী মুসলীম আমলের বিশেষতঃ হোসেনশাহী আলমের ভাষাবৈশিষ্ট্য যেমন আরবী, ফারসী, উর্দু, তুঘ্রিল ইত্যাদি ভাষার বৈশিষ্ট্য জেলার বিভিন্ন আধিবাসীদের কথার মধ্যে এখনও জীবিত আছে।

মালদহের ভাষাবৈশিষ্ট্য মূলত বরেন্দ্রী উপভাষার অর্ন্তগত। একটা সময়ে উত্তরবঙ্গের বরিন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ী উপভাষাব মধ্যে পার্থক্য খুবই কম ছিল। এবপর বরেন্দ্রী উপভাষার উপর প্রভাব পড়ে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এর কামরূপী উপভাষা, উত্তর দিনাজপুরের সূর্যপুরী এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের কোটীবর্ষী উপভাষার। বহিরাগত ভারতীয়দের মধ্যে আছে উত্তর প্রদেশের আগরওয়ালা সম্প্রদায়, মৈথিল সম্প্রদায়, এছাড়া রাজবংশী, কোচ, পোলিয়া, চাঁই, দোঘাদ, নাগর, কাহার, বিন্দ, চাষাটে পুন্ড্র, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি আরও অনাধিক ৪৭টি ভাষাভাষি অ-শিষ্ট সম্প্রদায়ের লোক আছে। আর অ-ভারতীয় বহিরাগতদের মধ্যে আছে পাঠান, আফগান, মোগল, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজরা। কালক্রমে এইসব ভাষাভাষিদের বাচনভঙ্গী একে অপরের উপরও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল।

স্বরাঘাত এবং স্বরকম্পন যে কোন ভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। একটি উপভাষার সঙ্গে অন্য একটি উপভাষাব মৌলিক পার্থক্য নির্ধারণ করে দেয় এই স্বরাঘাত এবং স্বরকম্পন।

মালদহের আঞ্চলিক উপভাষাগুলির এইকরম একটি নিজস্ব স্বরকম্পন আছে। আবার বিশেষ বিশেষ ভাষা সম্প্রদায়ের স্বরাঘাতের বিশিষ্ট প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। মালদহের যে সব অঞ্চল বিহার-সংলগ্ন, সেই অঞ্চলের উচ্চারণে হিন্দীর বিশেষ প্রভাব পড়েছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাষায় রয়েছে বিশেষ উচ্চারণ রীতি, একে বলা হয়েছে মুসলমানী বাংলা। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের মৌলিক ভাষা এক ধরণের সামাজিক উপভাষা। কারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও আছেন অভিজাত বা শিক্ষিত ছাড়াও অনেক অ-শিষ্ট সম্প্রদায় তাদের সংখ্যাটিও নেহাত কম নয়। তাদেরও ভাষা ব্যবহারের বিশেষত্ব এই যে শব্দ ব্যবহারে বা বাক্য গঠনে প্রত্নতার চিহ্ন এখনও রয়ে গেছে এদের ভাষা বৈশিষ্ট্যে। উভয় সম্প্রদায়ের ভাষার বৈশিষ্ট্যে আবার তিব্বত বর্মা ভাষা গোষ্ঠীর আদিম প্রভাবও বেশ স্পষ্ট।

বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ ঃ

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট ঃ

ক) আনুমানিক স্বরধ্বনী ববেন্দ্রী উপভাষার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য।

খ) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনী অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ যেমন, খ, ঝ, চ, য, ভ শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে, শব্দের মধ্যে ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই অল্পপ্রাণ হয়ে গেছে। যেমন - বাঘবাড়ী - বাগবাড়ী।

গ) রাড়ীতে সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে, কিন্তু বরেন্দ্রীতে শ্বাসাঘাত ততখানি সুনির্দিষ্ট স্থানে পড়ে না।

ঘ) বঙ্গালী উপভাষার প্রভাবে বরেন্দ্রীতে জ (J) প্রায়ই (Z) রূপে উচ্চরিত হয়।

ঙ) শব্দের আদিতে যেখানে 'ব' থাকার কথা নয় সেখানে 'র' এর আগমন ঘটে। যেমন - আম - রাম, আবার সেখানে 'র' থাকার কথা সেখানে 'র' লোপ পায়, যেমন রস - অস, আমের রস - রামের [illegible]

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক) বরেন্দ্রীতে অধিকরণ কারকে কখনও কখনও 'ত' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন - ঘরে - ঘরত।

খ) সামান্য অতীতকালে উত্তম পুরুষে 'লাম' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন - গেলাম।

স্বরাঘাত বা স্বরকম্পনের পার্থক্য ছাড়াও অন্যান্য যে সব আঞ্চলিক উপভাষার মতো মালদহের মৌলিক ভাষার সঙ্গে চলতি মৌলিক ভাষার অন্যতম মৌলিক পার্থক্য শব্দ ব্যবহারের। এই অঞ্চলে এমন কিছু মৌলিক শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় যা অন্য ভাষাবৈশিষ্ট্যে দেখা যায় না। আবার একই শব্দ প্রয়োগগত এবং উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যেও আলাদা মাত্রা এনে দেয়। চলতি মৌলিক ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক সামাজিক উপভাষার বা মৌলিক ভাষার এই পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত।

মালদহ জেলায় প্রচলিত বরিন্দ্র উপভাষা আবার ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী, ব্যক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ রীতিতে পবিবর্তিত হয়েছে। তাই খুব সুনির্দিষ্ট ভাবে বিভাজিত করা না গেলেও মালদহের অবস্থানগত ভাবে বিভিন্ন ভাষারীতি প্রচলিত। যেমন ঃ

১) বরিন্দা, ধারণ, কাটাল বা কাটালিয়া কথ্যবাচন ভঙ্গি। এই বাচন ভঙ্গি গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর এবং আংশিক পুরাতন মালদহ এলাকায় প্রচলিত।

২) খোট্টা বা খোট্টাই বাচনভঙ্গি। এই বাচনভঙ্গি ইংরেজবাজার থানার নিম্নাংশ, কালিয়াচক, মানিকচক ও রতুয়ার অংশবিশেষে প্রচলিত মালদহ জেলার অন্যত্র ও এই ভাষাভাষিতে অভ্যস্ত জনসংখ্যা কম নয়।

৩) চাঁচলিয়া কথ্যবাচন ভঙ্গি। সামসী, চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর ইত্যাদি অঞ্চলে এই বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি প্রচলিত।

৪) শেবশা বাদিয়া বা বাদিয়া সম্প্রদায়েব ভাষা ঃ

মালদহের মানিকচক, কালিয়াচক এবং রতুয়া এই সবকটি থানাতেই এই ভাষাভাষি সম্প্রদায়ের লোকেদের দেখা যায়।

বরিন্দা বা কাঁটালিয়া ঃ

বরিন্দ এই জেলার সবচাইতে প্রাচীন ভূখন্ড। বহু প্রাচীনকাল থেকে এই এলাকায় বসবাস করেন কোচ, রাজবংশী, দেশী, পলিয়া, সাঁওতাল, বিন্দ ইত্যাদি জনজাতির মানুযেরা, যাদের মূল বসবাসের স্থান ছিল দিনাজপুর, বংপুর, উত্তরের ডুয়ার্স অঞ্চল এবং জলপাইগুড়ি, কোচবিহার। এছাড়া কাটিহার, ভাগলপুর, রাজমহল, সাহেবগঞ্জ এবং সাঁওতাল পরগণা থেকেও মানুষ জীবিকাব সন্ধানে এখানে এসেছেন। একসময় এই অঞ্চলে গভীর জঙ্গল ছিল, যাকে বলা হতো কাঁটাল। সেই হিসাবেও এই ভাষারীতিটিকে কাঁটালিয়া বলা য়েতে পারে।

এই বাচনভঙ্গির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল —

- অ-ধ্বনি কখনো কখনো এ-ধ্বনিতে রূপাপন্তরিত হয়। তখন - তেমন।
- সাধারণভাবে আ-ধ্বনির পরিবর্তন নেই। আ কোথাও কোথাও অ-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয। মাংস - মংস।
- পদের মাঝামাঝি ই ও এর ব্যবহার থাকলে 'আ' ধ্বনিতে রূপান্তবিত হয়। বাছা - ছাওয়া - ছেওযা।
- শব্দের আদিতে 'আ' ধ্বনির ব্যবহার। ম্যালায়টি (অনেকখানি)।
- শব্দের অন্তে 'আ' ধ্বনির ব্যবহার। পাইল্যা (পাওয়া গেল)।
- ই, ও, এ - এ ধ্বনিগুলির সাধারণ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন - 'ই' - হিয়াল (ঠান্ডা), ও - উক্তি (ঐদিকে), এ - বেহা (বিয়ে), ও - মুঠা মুঠো ইত্যাদি।
- ক, খ, গ, ঘ - এই ব্যাঞ্জনধ্বনিগুলির ব্যবহার সাধারণ। মহাপ্রাণ অল্পপ্রাণ বর্ণের পরিবর্তনের নিয়মে কিছু পরিবর্তন ঘটে। কোজাগরি - খোজাগরি - খজাগরি।

- ঘোষিভবনের ফলে শব্দের মাঝে 'ক' 'গ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত।
- শ্বাসাঘাতেব ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে 'গ' মহাপ্রণিত রূপ লাভ করে। যেমন - আগে - আঘে।
- ঙ, চ, ছ, জ - এগুলির ব্যবহার সাধারণ ও স্বাভাবিক। শ্বাসাঘাত জনিত কারণে জ, ঝ, হয়ে যায়।
- ঞ ধ্বনিটি সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন - গঞ্জ - গন্‌জ।
- ট, ঠ, ড সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে 'ট' ধ্বনিটি কখনও কখনও 'ড' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়।
- ত, থ, দ, ধ, ন ব্যবহার স্বাভাবিক। তবে 'দ' ধ্বনিটি শ্বাসাঘাতের কারণে মহাপ্রাণিত রূপ পায়। শব্দের আদিতে 'ন' ধ্বনিটি অনেক সময় 'ল' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন নবান - নবান্ন - লবন।
- প, ফ, ব, ভ, ম এর ব্যবহার ও স্বাভাবিক প্রচলিত বাংলার মতো। তবে পদের শেষে সাধারণত 'ব' থাকলে 'ম' হয়ে যায়। যেমন, যাব - যাম। শব্দের আদিতে 'ম' থাকলে সেটি 'ন' হয়ে যায়। মাপা - নাপা।
- শব্দের আদিতে 'র' থাকলে 'অ' হয়ে যায়। যেমন - রাজা - আজা, কিন্তু কোথাও কোথাও আবার 'র' এর উচ্চারণ অপরিবর্তিত থাকে। যেমন - রাজি। কোনও কোনও ব্যঞ্জনে আবার 'র' এর উচ্চারণ লুপ্তও থাকে। যেমন, প্রণাম - পন্নাম।

বরিন্দ আ কাটালিয়া কথ্য বাচন রীতির কয়েকটি বিশিষ্ট শব্দ 'ঝমকরা জানে' - একসাথে অনেক বেশীগুলি, তেরেং-বেরেং-সুনির্দিষ্ট ভাবে না চলা।

নেওর - শেওর - জটিলতা মুক্ত, সাদাসিধে, কুটিল বেহেন-খুব ভোরে, সান্টে সুন্টে-ভালভাবে পরিষ্কার। হিড়িম পাক-বেহাশাহী-হঠাৎ সাড়ম্বর বিবাহ অনুষ্ঠান।

খোট্টা বা খোট্টাই বাচন ভঙ্গী :

প্রাচীন মগধ বা আজকের বিহার রাজ্যের প্রচলিত কথ্য ভাষাটি ছিল মগধী বা মগহী। পূর্বী মগধী এক সময় পূর্বসীমান্ত এলাকায় বাংলার সঙ্গে প্রশাসনিক বানিজ্যিক সংস্পর্শে আসে। বাংলা ও মগহীর মিশ্ররূপ পূর্ণিয়া জেলার উত্তরপূর্ব এলাকায় দেখা যায়। এই ভাষারই পরিবর্তিত কথ্যরূপ হল খোট্টা বা খোট্টাই। এই খোট্টা ভাষাভঙ্গির সঙ্গে কালক্রমে বাংলা কথ্যভঙ্গির মিশ্রন ঘটে। মালদহের চাঁই সম্প্রদায়ের পুরোনো মানুষদেরমৌলিক কথোপকথনে 'খোট্টা' বিভাগের পুরাতন রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। মৌলিক চলতি ভাষার গতি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে এই বিভাষার সঙ্গে ভোজপুরী, মিথিলার ভাষার নানারকম শব্দ ও মিশে গিয়েছে।

'খোট্টা' শব্দের উদ্ভব নিয়ে নানান অভিমত প্রচলিত আছে। কেউ বল্লেন কুর্মি জাতির ভাষাভঙ্গিকে বোল্ বা কুর্মাল বলা হয়। এই কুর্মাল ভাষাই কোরঠা ভাষা বলে পরিচিত। মানভূমের

পশ্চিম এলাকায় এই কোরঠা - 'ই' আবার খোট্টা এবং মালভূমের অন্যত্র নাম 'ভোট্টাহি'। এই 'খোট্টাহি' ভাষাই বাংলা সীমায়ও অনুপ্রবেশ করে 'খোট্টা' ভাষায় জনপ্রিয়তা লাভ করে।

'খোট্টা' ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গুলি হল ঃ

- মান্য বাংলার মতো অ-কারান্ত উচ্চারণ নেই, 'অ' ধ্বনি সাধারণত অ্যাত্তি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন, গৌড় - গ্যাড়র।
- নাসিক্যধ্বনির প্রাবল্য দেখা যায়। যেমন, সাঁপ, হাঁসপাতাল ইত্যাদি।
- 'ন' ধ্বনি 'ল' ধ্বনতে রূপান্তরিত হয়। যেমন, নয়া - লয়া, নদী - লদি।
- ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন, জুতা - জুত্তা।
- ও কার সাধারণত 'ও' কারে রূপান্তরিত হয়। যেমন, ডুজি, ডোলি। চুড়ি, চোড়ি।
- মান্য বাংলা কথ্যবচনে নেতিমূলক বাক্যের 'না' পদটি ক্রিয়ার পরে ব্যবহার হয়, কিন্তু খোট্টা বচনরীতিতে 'না' বাচক পদটি ক্রিয়ার পদ ব্যবহারের আগেই ব্যবহৃত হয়। যেমন - আমি আজ ভাত খাব না - হ্যাম্মা ভাত ন্যহি খাপ্।
- খোট্টা ভাষার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শব্দ ঃ অসরা - ওষ্কি (দাওয়া / বারান্দা), অটাপাশি (নিকট), কিসামকিসি (ঠেসাঠেসি), গাওাদিয়া (পড়শি), ছারাণ (চাবি), ঢেও কাওয়া (দাঁড় কাক), ঢোলশ্যাল (তলতলে), খেক্ড়ি কুত্তা (খেঁকি কুকুর), মাকলি (মাছি), খলেরা বহিন (মাসতুত বোন), মাৎলা বেটা (সতীনের ছেলে)।

শেরশাবাদিয়া বা বাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ঃ

বাংলা ভাষাভাষি মুসলমান সম্প্রদায়েরএকটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল শেরশাবাদিয়া বা বাদিয়া সম্প্রদায়। এদের মৌলিক কথারীতি স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জল এবং বিশিষ্টতার অধিকারী। বাদিয়াদের অবস্থান সম্পর্কে প্রাচীন তথ্যটি হল শেরশাহ্ তার শানকার্যের সুবিধার জন্যে অবিভক্ত মালদহ্ জেলাকে ৬০টি পরগনায় বিভক্ত করেছিলেন। এই পরগণাগুলির মধ্যে ১, ০৬, ৫৬৮ একর বিশিষ্ট সর্ববৃহৎ পরগণাটি হল শেরশাহবাদ পরগণা। অনিয়মিত আকারের এই পরগণাটি অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এই পরগণাটি অখন্ড মালদহের শিবগঞ্জ (৯৫%), নবাবগঞ্জ (৩%), গোমস্তাপুর (১%) ভোলাহাট (০.২%) এবং কালিয়াচক (০.৮%) থানার মধ্যে অবস্থিত ছিল। এই শেরশাহবাদ পরগণায় বসবাসকারী জনগণই শেরশাবাদিয়া বলে পরিচিত। বর্তমানে মালদহের কালিয়াচক, মানিকচক এবং রতুয়ার সবকটি থানাতেই বাদিয়ারা বাস করে।

এদের কথ্যরীতির বৈশিষ্টগুলি নিম্নরূপ ঃ

- চলিত শিষ্ট বাংলা ভাষার মত স্বরধ্বনিগুলি রূপিমের আদি, মধ্য ও অন্তে ব্যবহৃত হতে পারে।
- সংস্কৃত সংলগ্ন স্বরধ্বনিই মৌলিক স্বরধ্বনির তুলনায় কিছুটা নিম্নাবস্থানে ও

মুখগহ্বরের কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন, ইঁদুর - এনদুর। বেগুনী - ব্যগনা। ঢিল - ঢ্যাল।

- বিকৃত স্বরধ্বনি আ এর উচ্চাবণ অনেকটা চলতি বাংলার অনুরূপ। হাঁটু - হাইট্যা। রাত - ব্যাহত।
- শব্দ মধ্যস্থিত ব্যঞ্জনযুক্ত 'ও' ধ্বনি অনেক সময় দ্বি-মাত্রিকতার প্রভাবে লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন, দারোগা - দারগা।
- শব্দমধ্যস্থ ব্যঞ্জনযুক্ত 'ও' অনেক সময় দ্বিমাত্রিকতার প্রভাবে লুপ্ত হয়। যেমন, চিরুনি - চিরনি।
- শিষ্ট বাংলায় প্রচলিত ঐ এবং ঔ এরমধ্যে এখানে 'ঔ' এর ব্যবহার তেমন নেই তবে ঐ বর্ণটি দুরকম ভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন, ঔইগুলো - ঐগল্যা, পুকুর - পৈখোর।
- ক - বর্গের ধ্বনিগুলির উচ্চারণ ও অবস্থান চলিত বাংলার মতোই। যেমন, দেমাক - দেমাগ, সাগু - সাবু।
- চ-বর্গের ধ্বনিগুলির উচ্চারণ ও অবস্থান চলিত বাংলার মতোই। যেমন, চাচা - চাছা, মাছ - মাচ্।
- ট-বর্গের ধ্বনিগুলি রূপিমের আদি, মধ্য, অন্তে থাকতে পারে। যেমন, চিমটা - চিমঠ্যা, কাঁঠাল - কাঁহাটাল।
- ত- বর্গের অবস্থান এইরকম ঃ পুতুল - পুথলা, দাঁড়কাক - ধাড়কাহিয়া, অন্যায় - অন্নথ্যায়।
- প-বর্গের অবস্থান সুপারী - শুফারি, পটকা - ভট্‌কা, প্রভাত - পঁহাত ইত্যাদি।

চলিত বাংলার মত শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষাতেও বিভিন্ন উৎসজাত শব্দ দেখা যায়। তবে চলিত বাংলার শব্দগুলির তুলনায় কালানুক্রমিক ও পর্যায়গত দিক থেকে বাদিয়া ভাষার ব্যবহৃত শব্দগুলিতে প্রাচীনতার ভাব অনেকটা বজায় আছে। বসেছে সংস্কৃত মূল তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব শব্দ। দেশী মূলের অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়শব্দ, আগন্তুক হিন্দী, বিদেশী, আরবি, ফরাসী, তুর্কি, পর্তুগীজ, ইংরেজী ইত্যাদি শব্দ সংখ্যাও অপ্রতুল নয়। আবার হিন্দী শব্দটিকে এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন এই ভাষার মধ্যে ঢুকেছে হিন্দী ভাবাপন্ন মৈথিলী, ভোজপুরী ইত্যাদি ভাষার শব্দাবলি। এছাড়া এই উপভাষার ব্যবহৃত বেশকিছু শব্দের উৎসমূল সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না, এগুলি অজ্ঞাত মূল শব্দাবলি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

চলিত ভাষার মত এই উপভাষাতে সংস্কৃত মূল শব্দাবলির সংখ্যা বেশী। বলা যায় এই ভাষা বৈশিষ্ট্যে আরবী-ফরাসী ২% শতাংশ হিন্দী, ১০% শতাংশ আরবী-ফরাসী, ২% শতাংশ দেশি মূল আর কিছু পরিমাণে হিন্দী, অজ্ঞাতমূল ও অন্যান্য শব্দাবলি রয়েছে।

বাদিয়া কথ্য বাংলায় ব্যবহৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শব্দ হলো ঃ

মানুষগালা (মানুষগুলো), কোদ্‌ধুঠ্যা (লডিটি), বিহ্যাবাড়ি (বিয়ে বাড়ি), টপ কহর‍্যা লিয়্যা আয় (তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো) ওঠাটা নিয়ে পারছে (বাচ্চাটা ঘুমাচ্ছে), হ্যাহিশয্য দিয়া বাগুন গেলা ক্যাইট্যা লিয়্যা আয় (হাসুয়া দিয়া বেগুনগুালো কেটে নিয়ে আয়), খাটার পান জোরেই হারখে কেরঙ আছে (রাস্তার পাশেই আমাদের শ্যালো টিওবওয়েল আছে), লাহাড়ি পানি, (প্রাতরাশ) গাতহুয়া মুখা (বিকট মুখ), বল্ কিনতে কহিছো হাসি কিনুত ভুইশ লিতে চাহাদ্ধি (গরু কিনতে বলছ আমি কিন্তু মহিষ নিতে চাইছি।) উফাদিক (উচ্ছিষ্ট), কানটা (কিনারা) ওলুলি (নাবীভাযয় বিরক্তি), অ্যাঘ্‌ড়ু (কিছুক্ষণ)।

চাঁচলিয়া কথ্য ভঙ্গী :

সামসী, চাঁচল, কলিগ্রাম, হরিশ্চন্দ্রপুর এইসব অঞ্চলের ব্যবহৃত ভাষা চাঁচলিয়া কথ্য বাচন ভঙ্গী বলে সুপরিচিত। এই থানার পুরনো হিন্দু আধিবাসীদের মধ্যে তন্তুবায়, তিনিশ, সন্ত্রাস, পোদ্দার, মাহিষ্য, কামার ভুঁইমালি, সদ্‌গোপ, তিওর মান ও গোয়ালা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে জমিদারী সেরেস্তার কাজের সুবাদে পূর্ববাংলা থেকে আগত কায়স্থ তথা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বসতি গড়ে ওঠে। আবার বিগত শতাব্দীর বিশের দশকে বিহার থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রাগাঁওতে লাই যে বইঞে আদম এদা শোট্টা জোরসে বোল ম্যায় শুনে নাই পাবে।

হিন্দু এবং মুসলমান, সাঁওতাল পরগণা থেকে সাঁওতাল মুন্ডা, ওঁরাওরা প্রবেশ করে। এ ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যায় প্রবেশ করে হাড়ী, বেলদার (জীবিকা পুকুর খোঁড়া) কংসবণিক কুসীদজীবী, পোদ্দার এবং বেশ কিছু তিলি সম্প্রদায়। সুতরা এই অঞ্চলের ভাষার গঠন কাঠামোতে সাঁওতাল আলচিকি, খোট্টা ভাষা, কাটালিয়া এই সমস্ত ভাষার বৈশিষ্ট্যই একাকার হয়ে গিয়েছে।

মালদহ জেলার বিভিন্ন অংশে প্রচলিত এই সমস্ত ভাষাবৈশিষ্ট্য গুলিতে কিছু মৌলিক শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় যা অন্য ভাষাবৈশিষ্ট্যে দেখা যায় না।

পিয়াসবাড়ি অঞ্চলে নাসির মণ্ডল সম্প্রদায়ের মধ্যে 'আঘু' শব্দটি প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়। থানপুরের মৈথিল সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ইদোরিয়া' শব্দটি জ্যোৎস্না অর্থে ব্যবহৃত হয়। পুড়াটুলীর মালো ও আরো একাধিক সম্প্রদায় 'কুহরা' শব্দটি ঠাট্টা বা মজা করা অর্থে ব্যবহার করেন। পুড়াটুলীর পৌন্ড্রক্ষত্রিয়রা নদী বোঝাতে ঘাট, সাগরদীঘির ঘাটোয়াল সম্প্রদায় কেঁচো অর্থে চারা, শোভানগরের মৈথিলরা ফড়িং এর প্রতিশব্দে ব্যবহার করেন টুক্‌নি, ভুতনীর চাঁইমণ্ডল এই টুকনিকেই বলেন টিকলি। এইরকম বহু সম্প্রদায়ের বহু শব্দ সম্পদ আছে আর্থ-সামাজিক এবং ভৌগোলিক নিজস্বতার পটভূমিতে যে শব্দগুলি মালদহ বাসীর নিজস্ব সম্পদ।

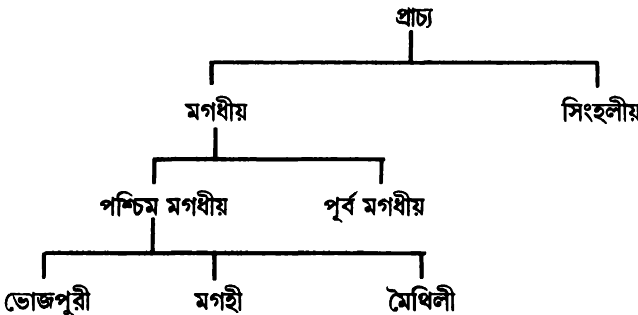
এই ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যেমন আছে তেমনি এর ভাষাতাত্ত্বিক গঠনও অদ্ভুত। কয়েকটি ভাষার বাক্যবিন্যাসগুলি পাশাপাশি রাখলেই ভাষাগত এই তারতম্যগুলি নজরে পড়বে।

অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা সমূহ ঃ

মৈথিল ভাষা ঃ

মালদহ জেলা যেহেতু অনেক জাতি, সম্প্রদায়ের বাস তাই তার ভাষা বৈশিষ্ট্য ও একাধিক। অবশ্য এগুলিকে ভাষা না বলে উপভাষা বলাই সঙ্গত। মালদহে বহু প্রচলিত এইরকমই একটি ভাষা শ্রেনি হল মৈথিল ভাষা।

মৈথিল সম্প্রদায়ের আলোচনায় প্রথমেই পাওয়া যায় আর্য সংস্কৃতির কথা, আর্যরা গ্রীস, গান্ধার (আফগানিস্থান) ইত্যাদি দেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে। প্রথমে সিন্ধু নদীর অববাহিকায় পরে সেখান থেকে নিম্ন ভারতের গঙ্গা-কুশী নদীর অববাহিকায় বসতি স্থাপন করে। গঙ্গা ও কুশী নদী প্রাচীন বিদেহ তথা বর্তমানের মিথিলায় প্রবাহিত ছিল। এখানকার স্থানীয় লোকদের ভাষা ছিল অবহট্ট। এই ভাষার সঙ্গে আর্যরা সংস্কৃতকে সহজ করে, তার সঙ্গে দেশীয় লোকদের ভাষার সংমিশ্রন ঘটিয়ে এক নতুন ভাষা নির্মাণ করে। এই ভাষাই মৈথিলী ভাষা নামে পরিচিত। ডঃ সুকুমার সেনের মতে মৈথিলী ভাষার উৎপত্তির বিবর্তন চিত্রটি এইরূপ ঃ



মৈথিল ভাষার ধ্বনি তাত্ত্বিক রূপ ঃ

- এই সম্প্রদায়ের ভাষাগত ধ্বনির উচ্চাবর্ণ প্রাকৃত ভাষা। যেমন — সুতন্দর, পন্নরহ ইত্যাদি
- প্রাকৃত বিপ্রকর্ষের প্রয়োগ এ ভাষায় প্রচুর দেখা যায়। যেমন— হ্রদ - দহর, স্নেহ - সিনেহ, প্রীতি - পিরীত।
- পদস্থিত স্বরধ্বনি কখনো কখনো শ্বাসাঘাতের অত্যন্ত অভাব বশত প্রাকৃত লোপ পেয়েছে। সংস্কৃত উদ্ধার - প্রাকৃত উদ্ধার।
- প্রাকৃতের ব্যাঞ্জনধ্বনির পরবর্তী পদান্তস্থিত স্বরধ্বনি অপভ্রংশে — ভও, রাজা শসন হয়েছে।
- প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় পদমধ্যবর্ত্তী স্বরধ্বনি (তদ্ভব ও অর্ধতৎসম পদ্য — বাংলা, গামছা, পিপঁড়া ইত্যাদি।

মৈথিলী ভাষার রূপান্তর :

- উচ্চারনে 'হ' কারের প্রয়োগ, অনেক ক্ষেত্রে লুপ্ত 'হ' এর উচ্চারন যেমন — তুঁ খুব চহ্লাক ছিহন।
- শব্দের উচ্চারনে দ্বিত্ব ভাব, যেমন— ও ত হাড্ডাহাড্ডি লড়লেছে।
- ভাষায় অনুনাসিক শব্দের ব্যবহার, যেমন— তুঁ কাঁহা যাইবহ।
- শব্দ মধ্যস্থিত 'অ' স্থানে 'আ' এর উচ্চারন। যেমন— মানুষটাক কথা পাবালক সমান।
- 'হইতে' থেকে ইত্যাদি বোঝাতে শব্দ শেষে 'স'- এর ব্যবহার। যেমন— গাছস চ্যাংড়াটা গিরি গেলে।
- বাংলা 'এ্যা' - এর উচ্চারনে 'এ'- এর ব্যবহার। যেমন— তু এখনিয়ে যো।
- এই সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায়, ক্রিয়াপদে বাড়তি 'ল' এর ব্যবহার। যেমন— হম্‌ম যাইল নই পারবো।
- মালদহে চলতি কথ্য ভাষার সঙ্গে মৈথিলী ক্রিয়াপদে 'ই'- এর আগমন। যেমন— তোর ভাই চলি গেল।

সাদরি ভাষা :

সাদরি নির্দিষ্ট কোন জনজাতির ভাষা নয়। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এই ভাষার বাচক গোষ্ঠী প্রোটো অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন জনজাতির মানুষ। সংখ্যায় অল্প এবং জীবিকার প্রয়োজনে যাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হতে হয় তাদের মধ্যে অনেকেই নিজস্ব গোষ্ঠীভাষা কালক্রমে বিস্মৃত হন। এদেরই মাতৃভাষা সাদরি। যাদের মধ্যে গোষ্ঠী ভাষা জীবিত থাকে সাদরি তাদের কাছে দ্বিতীয় মাতৃভাষা স্বরূপ। সেই হিসাবে সাদরিকে সংযোজক বা ঐক্য বিধায়ক ভাষা বলা যেতে পারে। আর ঐক্য বিষয়ক ভাষা অর্থে বিভিন্ন জনজাতির মিশ্রিত ভাষার রূপরেখা বলা যেতে পারে। উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচা অঞ্চল, সুন্দরবন, চব্বিশ পরগনা, বাঁকুড়া, মানভূম, পুরুলিয়া এবং মালদহের বেশ কিছু অঞ্চলে এই ভাষা প্রচলিত আছে।

ভাষা বৈশিষ্ট্য :

সাধারণ জনজাতির ভাষা হলেও দেবনাগরী সাদরি ভাষা, সাহিত্য চর্চার প্রতিবন্ধক নয়। বরঞ্চ রাষ্ট্রভাষা হিন্দির কাছাকাছি থাকার ফলে এর একটি ইতিবাচক দিক আছে। তবে হিন্দির কৃত্রিম প্রভাবে এই ভাষা মাঝে মাঝে যে কৃত্রিম হয়ে পড়ে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

বাঙলার মত সাদরিতে বিশিষ্ট বা মৌটালিক স্বরধ্বনি মোট ৭ টি। এগুলি যথাক্রমে — অ, আ, ইঈ, উঊ, এ , অ্যা, ও।

- ই, উ, এ, ও এই চারটি অর্ধস্বর কে স্বনিম ধরা হয়।
- ঋ, ঋৃ, ঌ, ঌ ধ্বনিগুলি সাদরিতে অপ্রচলিত।
- ঐ, ঔ যৌগিক স্বরধ্বনি।

- বাংলার মতো সাদরিতে মৌলিক স্বরধ্বনি বিচারে ঈ বা ঊ এর কোন স্থান নেই।
- সানুনাসিক উচ্চারনে উভয় ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন— 'কর্দম' অর্থে বাংলায় কাদা, সাদরিতে কাদোপানি।

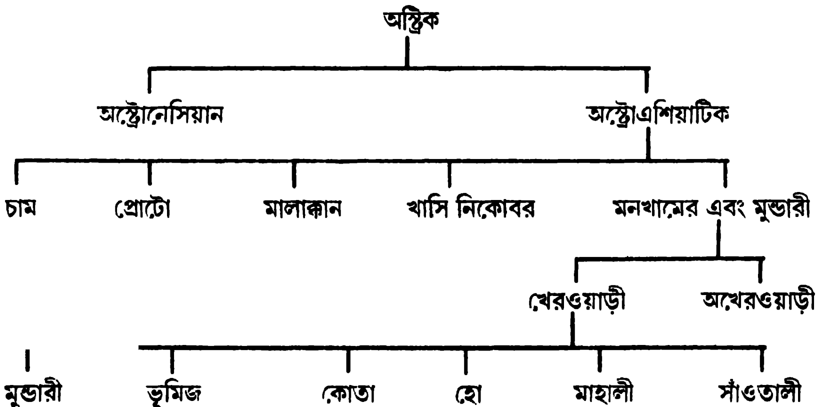
সাদরি ব্যাঞ্জন ধ্বনি অনেকটা বাংলার মতো।

ক, খ, গ, ঘ, ঙ ং, চ, ছ, জ য, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন ণ, প, ফ, ব, ভ, ম, র, ল, ড়, শ স ষ, হ — মোট ২৮ টি ব্যাঞ্জনবর্ণ। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আছে ঃ

- পদের অন্তে ও ব্যাঞ্জনে স্বরাগম, সুরত — সুরতি।
- পদের অন্তে ও মধ্যে ব্যাঞ্জন লোপ, কাপাস— কাপস।
- পদের অন্তে ঠ- স্থানে 'গ', উঠে — উগে।
- পদের মধ্যে অপিনিহিত প্রবনতায় ই - স্বরের আগম, বিবাদ— বিবাইদ।
- বাঙ্গালী উপভাষার মতো সাদরি ভাষাও অপনিহিতি প্রবণ। উভয় ক্ষেত্রে 'খ' ও 'স' স্থানে যথাক্রমে 'হ' ও 'অ' উচ্চারিত হয়, বাংলা এইখানে অহিস, সাদরিতে 'হিনে আওয়া'।
- বাঙলার রাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী উপ ভাষার মতো স্বতোনাসিক্য ভবন সাদরি ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সাঁওতালি ভাষা ঃ

আর্য পূর্ব যুগে বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র প্রাক্‌দ্রাবিড় বা প্রোটো অস্ট্রোলয়েড গোষ্ঠীর বসতি ছিল। তদের ভাষাই অস্ট্রিক ভাষা। প্রশান্ত মহাসাগরীয়, পলিনেসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলিতে, ব্রহ্মদেশ, আসাম, বঙ্গদেশ, কলিঙ্গ ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় এই ভাষা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। অস্ট্রিক থেকে সাঁওতালী ভাষার বিবর্তন। চিত্রটি নিম্নরুপ ঃ



ভারতবর্ষে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি।

জনসংখ্যার নিরিখে সাঁওতালী ভাষারস্থান ত্রয়োদশ. সাঁওতালী ভাষা পুস্তক আকারে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মিশনারী দের অবদান অনস্বীকার্য। তারা সাঁওতালদের ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে এই ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বিভিন্ন স্কুল স্থাপন করে এবং সাঁওতালী ভাষা শিক্ষাদনের ব্যবস্থা করে। ১৮৫২ খৃঃ রেভারন্ড জে ফিলিপ সাঁওতালী ভাষায় প্রথম ব্যকরণ বই প্র কাশ করেন — An Introduction to the santali language নামে। এরপর ১৯৬৮ খৃঃ ই এল পাস্কালে একটি অভিধান প্রকাশ করেন, — A vocabulary of the santali language. নামে। বেনাগতিয়া মিশন প্রেস ১৮৭৩ খৃঃ - A Grammer of santali language. প্রকাশ করল। আরও কিছু বই ছাড়াও বর্তমানে বহু সাঁওতালী লেখক সাঁওতালী ভাষায় ব্যকরণ রচনা করছেন এবং করে চলেছেন। এদের মধ্যে পন্ডিত রঘুনাথ মূর্মু, দশরথ মূর্মু, যদুনাথ টুডু, সুহৃদ কুমার ভৌমিক, বীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ইত্যাদি আরও অনেকে আছেন।

সাঁওতালী ভাষায় মোট বর্ণমালার সংখ্যা পঁয়ত্রিশটি। এগুলি যথাক্রমে— অ, অত, অগ, অং, অল, আ, আক্, আজ, আম, আও, ই, ইস্, ইহ্, ইঞ, ইর, উ, উচ্, উদ্, উড্, উয়্, এ, এপ্, এড্, এন, এত্ ও, ওট্, ওব্, ওঙ্, ওহ, মুটুডাঃ, গীহলীঃ, রেলা, কারকা, অহ্ম।

- সংস্কৃতের মত সাঁওতালীর বচন তিন প্রকার। যাকে এই ভাষায় গটাং বলা হয়।
  একবচন— আমি - ইঞ্, দ্বিবচন— আমরা (দুজন) - আলিঞ, আলাং, বহুবচন— আমরা - আলে।
- সাঁওতালীতে পুরুষের ব্যবহার বাংলার মত, একে গরণ বলে।
  উত্তম পুরুষ — আমি, আমরা — ইঞ্, আলাং, আবো, আলে।
  মধ্যম পুরুষ — তুমি, তোমরা — আম আপে
  প্রথম পুরুষ — সে, তিনি, তাহারা— উনি, আজ, উনকিন, আকো, উনকো।
- বাংলা এবং ইংরাজীর মত 'কাল'- ও তিন প্রকার। যাকে বলা লয় নাং।
  বর্তমান কাল — নিতাং নাং
  অতীত কাল — এনং নাং
  ভবিষ্যৎ কাল — দারায় নাং।
- 'জাযাং' অর্থাৎ লিঙ্গ, বাংলা ভাষার মত সাঁওতালীর লিঙ্গও তিন প্রকার।

সাঁওতালী ভাষা উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিশেষ স্বাতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। এই ভাষার উচ্চারণ সাঁওতালীর নিজস্ব লিপি ছাড়া লেখা যেমন দুষ্কর, উচ্চারনেও তেমনি তারতম্য দেখা যায়। সেইজন্য এই ভাষা অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করেও তার নিজস্বতা বজায় রাখতে পেরেছে।

চাঁই ভাষা :

চাঁই সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্বতম ভাবধাবার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে একটি নিজস্ব ঘরানায় কথা বলে এই ভাষারীতি কেই চাঁই ভাষা বলে। এই ভাষা হিন্দি, বাংলা, মৈথিলী, মাগহী ইত্যাদি বহু ভাষা ও উপভাষার সংমিশ্রণে গঠিত। চর্যাগীতির ভাষার সঙ্গেও কোথাও কোথাও এই

ভাষার একটি ক্ষীণ ঐক্য সূত্র লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে এই ভাষার উদ্ভবের ইতিহাসে প্রাচীনতার সূত্রটি আবিস্কাব করা যায়। তবে চাঁই আর্যভাষা নয়, আর্যেতর ভাষা। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই ভাষার অস্তিত্ব অনুভব করা গেলেও আজ পর্যন্ত এই ভাষার লিখিত কোন সুনির্দিষ্ট রূপ নেই। এই ভাষার নির্দিষ্ট কোন অক্ষর বা হরফও আবিষ্কৃত হয়নি। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে এই জাতি প্রাচীনকালে জমিদার বা জোতদার শ্রেনীভুক্ত হলেও যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তিরা সংখ্যা অত্যন্ত কম, এ ছাড়া এরা মূলত দ্বিভাষিক বাংলা তাদের পোষাকী আর চাঁই আটপৌরে ভাষা। কেবলমাত্র স্বজাতীয়দের মধ্যে এবং অন্তঃপুরবাসিদের মধ্যে এই ভাষা ব্যবহৃত হওয়ার কারণে সুনির্দিষ্ট রূপরেখায় এই ভাষা সুখী সমাজে পবিচিতি লাভ কবতে পাবেনি।

বৈশিষ্ট্য ঃ

চাঁই ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল — এর কোন সাধুভাষা নেই, এই ভাষাটি আদ্যন্ত চলিত বা কথ্য ভাষা। এই ভাষায় সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে কোন সম্মান সূচক পদের ব্যবহার হয় না। ইংরাজী ভাষায় You শব্দটি যেমন তুই, তুমি, আপনি সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়, সে রকম ত্যায় এই চাঁই শব্দটি দিয়ে তুই ,তুমি, আপনি, সবকিছুই বোঝান যেতে পারে।

চাঁই ভাষায় বাংলা ভাষার একার্থ প্রকাশক বিভিন্ন শব্দের সর্বাপেক্ষা সহজ শব্দটাই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন চাঁদ শব্দের একাধিক সমার্থক শব্দ রয়েছে। যেমন শশধর, সুধাংশু, হিমাংশু, মৃগাঙ্ক, বিষ্ণু, ইন্দু, নক্ষত্রেশ, রজনীকর, চন্দ্র, চাঁদ ইত্যাদি, কিন্তু চাঁই ভাষায় কেবল চাঁন শব্দটিই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

চাঁই সমাজের ব্যবহৃত যৌগিক ভাষা আর গান বা গীতের ভাষার মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, অঞ্চলভেদেও এই ভাষা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং এই ভাষার সঠিক অবয়বটি অনুধাবন করাও যথেষ্ট দুরূহ কাজ।

- বাংলা ভাষার শব্দের প্রথম অক্ষর 'অ' কিংবা অ কারান্ত হলে চাঁই ভাষায় তার উচ্চারণে 'অ্যা'- এর আগম হয়। যেমন— অংশ — অ্যাংশ, কঠিন— ক্যাঠিন।
- শব্দের প্রথম অক্ষর আ এবং দ্বিতীয় অক্ষর অ- কারান্ত হলে এই দ্বিতীয় অক্ষরের 'অ' স্থানে উচ্চারিত হয়। যেমন— চাদর — চ্যাদর, আদর — আদ্যার।
- শব্দের প্রথম অক্ষর 'অ' ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে এবং দ্বিতীয় অক্ষর অ-কারান্ত হলে এই অ স্থানে 'অ্যা' উচ্চারিত হয। যেমন— ইজ্জত— ইজ্জ্যাত, মাখন— মাখ্যান।
- বাংলা ভাষার ঔ - কারের উচ্চারন চাঁই ভাষাতে অ্যাউ- এর মতো হয়। যেমন— কৌটা— ক্যাউটা, গৌড়— গ্যাউড়।
- বাংলা শব্দের 'ঋ'- কারের উচ্চারন চাঁই ভাষায় বিকৃত হয়ে 'ইর' মতো উচ্চারন হয়। যেমন— কৃপণ— কিরপিন, হৃদয়— হিরদয়।
- শব্দের প্রথম অক্ষর 'এ' হলে তা 'অ্যা'- এর উচ্চারিত হয়। যেমন— এখন— অ্যাখনি, এদিকে— অ্যা

- শব্দের স্বরবর্ণের উ- কার প্রায়ই পরিবর্তিত হয়ে 'ও' - কারের রূপ গ্রহণ করে। যেমন-- চুরি— চোরি, রুটি— রোটি।
- বাংলা শব্দের প্রথম অক্ষর 'ন' হলে, চাঁই ভাষায় 'ন' স্থানে 'ল' উচ্চারিত হয়। যেমন— নদী— ল্যাদ্দি, নবাব— ল্যাবাব।
- চাঁই ভাষায় শব্দের উচ্চারনে ব্যাঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব করণের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। অনেক সময় শব্দটির উপর জোর দেওয়ার জন্য এরকম সংযুক্ত ব্যাঞ্জন বর্ণের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন— উপর-- উপ্যার, জুতা— জুত্তা।
- অ - কারান্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দের উচ্চারনে 'অ' স্থানে অ্যা এর আগম হয়। যেমন— ঝন্ ঝন্ করে বেজ উঠল— ঝ্যান্ ঝ্যান্ ক্যাঁরিকে ব্যাজ্জিকে উঠল্যায়।
- বাংলা ভাষায় নিষেধার্থক বাক্যে 'না' পদটি ক্রিয়ার আগেই বসে। যেমন— আমি আজ ভাত খাব না-- হ্যাম্মা অহিজ ভাত ন্যাই খাপ্।
- চাঁই ভাষাতে উত্তম, মধ্যম এবং প্রথম এই তিন প্রকার পুরুষেই দেখা যায়।
- চাঁই ভাষার বিভক্তির সঙ্গে বাংলা ভাষার বিভক্তির কোন সাদৃশ্য নেই।
- চাঁই ভাষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, বিদেশী প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন— সাহেবিয়ানা, মুরুব্বিয়ানা, কেরানীগিরি, ধান্দাবাজ ইত্যাদি।
- এই ভাষায় অনেক শব্দ উচ্চারনের সময় মুখ ও নাক উভয় পথে শ্বাসবায়ু বেড়িয়ে আসে, ফলে শব্দগুলো নাকী সুরে উচ্চারিত হয়। যেমন— কুয়ার জলে পা ধুয়ে নাও— কুয়াকে জ্যালম্যা পাঁ ধোলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিহারের দ্বারা ভাঙা জেলার নিম্নবর্ণ সম্প্রদায় ভুক্ত মৈথিলী ভাষাভাষী হিন্দু পরিবারের ভাষারীতি এবং মাধিপুরা ও ভাগলপুরের মৈথিলী ভাষার প্রচলিত রীতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদহের চাঁই সম্প্রদায়ের ভাষার প্রায় সব অর্থেই সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বৈসাদৃশ্য যেটুকু তা আঞ্চলিক, ভৌগোলিক এবং ব্যক্তি বিশেষের তারতম্যের ফলেই ঘটে থাকে।

রাজবংশী ভাষা :

উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্রদের মধ্যে বৃহত্তম জনগোষ্ঠী রাজবংশী সম্প্রদায়, এরা যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাই রাজবংশী ভাষা নাম সুপরিচিত। যদিও ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেন, ও নির্মল দাশ প্রমুখ ভাষাবিদগণ বিশেষ কোন জাতির নামে ভাষা বা উপজাতির নামকরণ সমর্থন করেননি। এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটনমন্ত্রী দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া ১৯৮০ সালে রাজবংশী ভাষা সংহতি প্রসঙ্গে 'গণশক্তি' পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লেখেন সেখানেও রাজবংশী ভাষা বলে কোন ভাষার স্বীকৃতি নেই। তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে যে রাজবংশীরা বাস করতেন, তারা নিজেদের দেশী বলে জানতেন এবং নিজেদের ব্যবহৃত ভাষাকে বলতেন 'দেশী ভাষা'।

ড ঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে - মাগধী অপভ্রংশ রাঢ়ভূমি থেকে গঙ্গা নদী

অতিক্রম করে প্রথমে পূর্ববঙ্গে এবং সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ ও কামরূপ দিয়ে অসম উপত্যকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। সেখান থেকে গঙ্গার দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগনা ও বাংলাদেশ সন্নিহিত মিথিলার ভাষাই বাংলার উপভাষার ভিত্তি নির্মান করেছে। আবার মিথিলা থেকে আর্য ভাষার সরাসরি পৌড্রবর্ধনে প্রবেশ ও অসম্ভব নয়। অন্যদিকে অনুরূপ ভাবেই গ্রীয়ার্সন মনে করেন, মগধী অপভ্রংশ সোজাসুজি উত্তরবঙ্গ ও অসমে পৌঁছেছে।

বৈশিষ্ট্য :

- বাংলা ভাষার মত রাজবংশীতে স্বরধ্বনির সংখ্যা সাতটি, ই / এ / অ্যা / আ / অ / ও / উ /
- প্রতিটি স্বরধ্বনির অনুনাসিক উচ্চারন আছে — ইট / ইঁটা, চুয়া / চুঁয়ানো।
- দুটি অর্ধস্বর সহ ব্যাঞ্জনধ্বনির সংখ্যা ২৭ টি। প / ফ / ব / ভ / ত / থ / দ / ধ / ট / ঠ / ড / ঢ / চ / ছ / জ / ঝ / ক / খ / গ / ঘ / ম / ন / ঙ / র / ল / শ / হ / য় / ওয়।
- পদমধ্যে ড় — ঢ় রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— পড়া— পঢ়া, কুড়াল— কুঢ়াল।
- অন্তঃশ্বাসমূলক মহাপ্রানতার ফলে— প- ফ , ব - ভ তে রূপান্তরিত হয়। যেমন— পেখম— ফ্যাকম, অল্প— অলফ্।
- শব্দের আদিতে র - অ এবং অ - র ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— রাম— আম, রাস্তা— আস্তা।
- পদের আদিতে ও - অ হয়। যেমন— পোকা — পকা , বোকা— বকা।
- 'ল' ধ্বনিটি সাধারনত পদের আদিতে 'ন' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন— লজ্জা— নইজ্জা, লাল— নাল, লাত— নাত।
- কামরূপী উপভাষায় মান্য বাংলা ভাষার মতোই ষ / স স্থানে কেবলমাত্র 'শ' উচ্চারিত হয়। যেমন—বিষহরি — বিশুরি, বিষাদ— বিশাদ।
- চলতি বাংলার মতো এই উপভাষাতেও শব্দের শেষে মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকলে অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিনত হয়। যেমন— দুধ— দুদ, বাধা— বাদা।
- শব্দের শেষে অঘোষ ধ্বনি থাকলে প্রায়শই ঘোষ ধ্বনিতে পরিনত হয়। যেমন— কাক— কাগ, বক— বগা ইত্যাদি।
- স্বরাগম— স্ত্রী— ইসতিরি, স্নান— সিনান, পুত্র— পুতুলা ইত্যাদি।
- অপিনিহিতি— কাড়িয়া— কাহিড়া, কলিজা— কইলজা, ভাসুরানী— ভাইসানী, কন্যা— কইন্যা।
- অভিশ্রুতি— গাহিয়া—গায়ে, যাইয়া— যায়ে।
- স্বরসঙ্গতি— বিছানা— বিছিনা, কাজলী— কাজিলী, মশারি— মুশুরি।

মুন্ডারী ভাষা :

ভাষা বিজ্ঞানীরা মুন্ডাবী ভাষাকে অষ্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর পশ্চিমী শাখার প্রাচ্য প্রশাখাব উত্তর উপশাখা খেওয়াড়ীর অন্তর্গত অন্যতম ভাষা বলে গণ্য করেছেন। আবার সাঁওতালী ও কোরওয়ার ভাষার সঙ্গেও মুন্ডারী ভাষার অতি নিকটের বলেও মনে করেন ভাষা বিজ্ঞানীরা। বর্তমানে এই ভাষা তার অবিমিশ্র রুপ ধরে রাখতে পারে নি, তার কারণ জীবন্ত যে কোন ভাষার নিযমই হল চলমানতা। গ্রহন বর্জনের মাধ্যমে নবরূপ পরিগ্রহণ। বিভিন্ন সভ্য ও বর্বর জাতির সঙ্গে ও সাহচর্যে মুন্ডাদেব জাতীয় প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে তাদের ভাষার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছিল, তাই ভাষাও হয়ে উঠেছে অধিমিশ্র। অবশ্য আদি ও অকৃত্রিম মুন্ডারী ভাষা এখন বিলুপ্তির পথে।

মুন্ডারী ভাষার সঙ্গে অনেকটা মিল দেখা যায় ইন্দোনেশিয়া ও মালয় অঞ্চলের ভাষা প্রকৃতির। মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূভাগেও এই ভাষার বিস্তার রয়েছে। অষ্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর তুরি, খাসি, মাহালি, মালপাহাড়িয়া, হো, বিন্দ, লোহার, খেড়িয়া, এবং বিহারী, রাজবংশী, মারোয়াড়ী ইত্যাদি সম্প্রদায়র মধ্যেও এই ভাষা তার অল্প বিস্তর প্রভাব বিস্তার করেছে। আবার বর্তমানে মুন্ডারী ভাষার যে রূপটি আমবা দেখতে পাই তার মধ্যে সংস্কৃত শব্দই সর্বাপেক্ষা বেশী। আবার বাংলা, ওড়িশা ও হিন্দি শব্দও বহুল পরিমাণে ঢুকে পড়েছে।

বৈশিষ্ট্য :

- মুন্ডারী ভাষার অর্ধব্যাঞ্জন ও মৃদুব্যাঞ্জন তথা স্বরাঘাত সাঁওতালী ভাষার মতোই।
- এই ভাষায় লিঙ্গ মাত্র দুটি, চেতন ও অচেতন। অচেতনের কোন বহুবচন হয় না।
- সংজ্ঞার ক্রিয়ার সঙ্গে কোন কারকীয় সম্বন্ধ এই ভাষায় নেই সেই কারণে মুন্ডারী ভাষায় কর্ম ও সম্প্রদান কারকও নেই। সম্বন্ধ কারকের প্রয়োগ বিশেষণের মতো হয়।
- স্বরাগতে আদ্যস্বর 'অ'-এর ব্যবহার দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। 'অ'এর পরিবর্তে। যেমন— খাইব— খাব, আমি যব— হাম যাব ইত্যাদি।
- এই ভাষার লিঙ্গ দুটি - পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু সম্বোধন বাচক শব্দ একইরকম।
- মুন্ডারী ভাষায় ক্রিয়াপদ উদাহরণগুলি এইরকম,— খাব— খাওয়া, পড়হব— পড়ব ইত্যাদি।
- পারস্পরিক কথোপকথনে ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করা মুন্ডারী ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন:— প্রবাদ— ঘর ঘুসনা (কুঁরে ব্যক্তি), বাত্ কুচ্না (বাচাল), ধাঁধা— *ঠক্ ঠক্ ঠকিলা নাহি মুড়ি বার ঠেং / কাঁহা দেখিল (কাঁকড়া)* ইত্যাদি।

সূর্যাপুরী ভাষা :

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার একছত্র আধিপত্য তখন নবাব সিরাজউদৌল্লা। সেই সময়ে *বিহারের পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত বিহারের কিষাণগঞ্জ থানার অধীনে সূর্যাপুর নামে একটি পরগণা* ছিল। সেখানকার অধিবাসী তথা তাদের ব্যবহৃত কথ্য ভাষাকে সূর্যাপুরী বলা হত। মালদহ

যেহেতু বিহার সংলগ্ন সেইজন্য বিহার থেকে বহু মানুষ প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি এই জেলায় প্রবেশ করেছেন। তারা এখনও তাদের নিজেদের পারিবারিক গন্ডীর ভেতর এই ভাষারীতি চালু রেখেছেন। সূর্যাপুরী ভাষা কোন নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীর ভাষা ছিল না কোন কালেই। এই অঞ্চলের আদি নিবাসী যারা সে হিন্দু হোক অথবা মুসলমান (বাদিয়া সম্প্রদায় বাদে) এই ভাষা আজও ব্যবহার করে। আদি নিবাসী বলতে কায়স্থ, গোপ, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ, রাজবংশী, দেশিয়া এবং স্থানীয় মুসলমান। সূর্যপুরী ভাষা ভাষী জনসাধারণ বর্তমানে আধুনিক পোশাক পরিচ্ছেদে অভ্যস্ত। তবে সুলতানী আমলে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পুরুষের পোশাক ছিল ধুতি আর কুর্তা, এবং মেয়েদের সাত হাতের শাড়ি আর গায়ে ওড়না।

বৈশিষ্ট্য ঃ

সূর্যাপুরী আঞ্চলিক উপভাষা বলে পরিচিত হলেও এর নির্দিষ্ট কোন লিপি নেই। তবে এক সময় জমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল দস্তাবেজে আধুনালুপ্ত 'কৈথী' লিপি ব্যবহৃত হত।

- সূর্যাপুরী এবং কৈথী ভাষার ধ্বনিগত উচ্চারনে হিন্দি ও উর্দু ভাষার সংমিশ্রন স্পষ্ট।
- সূর্যাপুরী ভাষায় হিন্দি ও উর্দু শব্দের ব্যবহার যেমন রয়েছে তেমনি বাংলা শব্দেরও বহুল ব্যবহার রয়েছে।
- বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানদের কথ্য ও লেখার মধ্যে যেমন কিছু শব্দের পার্থক্য দেখা যায় তেমনি সূর্যাপুরী হিন্দু / মুসলিম ভাষা ভাষিদের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন— হিন্দু— আলা সান (সন্ধ্যা) হয় গেল্ (এখন সন্ধ্যা হয়ে গেল), মুসলমান— আলা শাম্ হৈ গেল্ (ঐ)।

পঞ্চাশ / ষাট দশক পর্যন্তও সূর্যপুরীরা বাংলায় কথা বলতে পারত না। যারা বলতেন তাদের মধ্যে হিন্দি শব্দের ব্যবহার এবং উচ্চারনের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবল। বর্তমানে এদের মধ্যে শিক্ষিতেরা তো বটেই প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষিজীবী শ্রমজীবী মানুষেরাও পরিস্কার বাংলায় কথা বলেন।

- **তথ্য সহায়তা**

১. বাংলা ভাষাব ইতিহাস — ডঃ সুকুমাব সেন।
২. উত্তরবঙ্গের ভাষা — বতন বিশ্বাস সম্পাদিত।
৩. মধুপর্ণী — মালদা জেলা সংখ্যা।
৪ শেরশা বাদিয়া সম্প্রদায়েব ভাষা ও সংস্কৃতি — মীর রেজাউল করিম।

মালদা জেলার মানুষের সাধারণ ধর্ম

কোন জেলার সার্বিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য সেই জেলার সাধারণ মানুষের আচরিত ধর্ম এবং ধর্মীয় অনুষঙ্গ আচার-আচরনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জেলার স্থান নাম অনেকাংশেই নির্ভর করে স্থানীয় মানুষের আরাধ্য দেবমূর্তির উপর।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বাংলাদেশে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, এই রকমই অনুমান করা যেতে পারে, এর আগে বাংলাদেশের ধর্ম সম্পর্কে সঠিক করে কিছু বলা যায় না।

গৌড় ও পাণ্ডুয়ার রাজবৃত্তের ইতিহাসের পরিপেক্ষিতেই আধুনিক মালদহ জেলার জনবৃত্তের ধর্মীয় ইতিহাসকে স্থানিত করে বিচার করতে হবে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে জৈন-ধর্মের সূত্র ধরে উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়েই আর্যধর্ম বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম পা রাখে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী বা তারও আগে ঐ জায়গায় একটি জৈন বিহার ছিল। দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ বর্ণনায় বলেছেন যে, তার সময়ে এদেশে দিগম্বর জৈনের সংখ্যা বেশী ছিল। কিন্তু পরে জৈন ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেলে জৈনধর্মাবলম্বীর সংখ্যাও হ্রাস পায়।

জৈনধর্মের প্রভাব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। হিউয়েন-সাঙের বিবরণে জানা যায় যে 'জঙ্গল' অর্থাৎ রাজমহলের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে ছয়-সাত বিহারে তিনশোর অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন। পুণ্ড্রবর্ধনের (উত্তরবঙ্গ) কুড়িটি বিহারে অনধিক চারশত হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। রাজধানীর কাছে লো-টো-বি-চি বিহার অবস্থিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পালরাজগণের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম অধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, তবে এরপর থেকেই বৌদ্ধধর্ম হ্রাস পেতে থাকে এবং পরবর্তী দু-শত বছরের মধ্যেই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেউ কেউ অনুমান করেন যে মালদহ স্থিত মাধাইপুর, রহনপুর, চতে মেহেরপুর ও গনিপুরে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল।

রাজা শশাঙ্কের শাসনাধীন বাংলাদেশের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল সংযুক্ত থাকায় (কর্ণসুবর্ণ - মালদহ, মুর্শিদাবাদ) শশাঙ্কের ধর্মও বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই শশাঙ্ক ছিলেন

শিবের উপাসক (আনুমানিক ৭৫০-১১৬০ খৃঃ)। তবে তিনি অন্য ধর্ম, বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। শশাঙ্কের মুদ্রায় মহাদেবের এবং নন্দীবৃষের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। এই সময় বৌদ্ধ প্রচারকগণ দেবমন্দির নির্মাণ করে নানা প্রতিমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বৌদ্ধ উৎসবগুলিও মিশে যায় হিন্দু উৎসবের মধ্যে এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর আচার-আচরনের মধ্যে। হাড়ি ও ডোম জাতীয় আচার্যগণ প্রথমে বৌদ্ধ ধর্মপূজার পুরোহিত ছিলেন। এখনও মালদহ জেলার গাজোলে কালীপূজার পুরোহিত হন হাড়ি সম্প্রদায়। এরপর শঙ্করাচার্য কর্তৃক শৈবধর্ম প্রচারের পর শৈবধর্ম প্রসার লাভ করে। পাল বংশের রাজত্বকালে গৌড় ও তার কাছাকাছি কয়েকটি অঞ্চলে বহু শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাল বংশের পর বাংলার রাজশক্তি সেনবংশের অধিকারে আসে (আনুমানিক ১০৯৫-১২৫০)। এই সেনবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মেব পৃষ্ঠপোষক ছিল।

বাংলাদেশের দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব হওয়ায় আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন, গৌড় বঙ্গের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ-ই তাদের বংশ উদ্ভুত। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা এবং প্রস্তরলিপি প্রমাণ করে যে সপ্তম শতাব্দীর অনেক আগেই বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল কারণ এই সময়ই সবচাইতে বেশী সংখ্যক বিষ্ণুমূর্তি গুলি পাওয়া যায়। রাজা লক্ষ্ণসেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁর সময় থেকেই রাজ্যের বিষ্ণু আরাধনা প্রসার লাভ করে। হিন্দুযুগের শেষ দু-তিন শতাব্দীর যে সকল মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, তাতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্যকেই স্বীকার করতে হয়।

এরপর ১২০২ খৃষ্টাব্দে কুতুবুদ্দীনের তুর্কী সেনাপতি ইখতিয়ার-উদ্দিন-বিন-বখতিয়ার খিলজী গৌড় রাজ্য জয় করে লক্ষনাবতীতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এরপরের ইতিহাস মুসলমান শাসনের ইতিহাসে গৌড়। প্রায় চারশত বছর ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধের আগে পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ের ইসলাম ধর্ম বাংলা তথা মালদহের জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার পিছনের কারণগুলি এইরকম ঃ রাজশক্তি ইসলামধর্মে বিশ্বাসী। ইসলামধর্মে ধর্মান্তরীকরণ এক পবিত্র ধর্ম বলে পরিগনিত, দ্বিতীয়ত ঃ কেবল রাজশক্তির শাসনভয়েই নয়, সেই সময় মালদহে এসেছিলেন একাধিক সুফীসাধক, পীর। তাদেব সন্ত জীবন সমসাময়িক জনজীবনকে প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই, তৃতীয়ত ঃ হিন্দু ধর্মের জাত-পাত, উচ্চ-নীচ ভেদ নীচুতলার অন্ত্যজ শ্রেণীর মনে হিন্দু ধর্মের প্রতি যে বিরূপ মনোভাব তৈরী করেছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মান্তীকরণ সহজ হয়েছিল, চতুর্থত ঃ কেবল নীচুতলার মানুষই নয়, উচ্চ অভিজাত মানুষেরাও রাজশক্তির বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল। মালদহের জনজীবনেএই সমন্বয়ের সময়টি তাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অনেক জায়গায় স্থান নাম এই সময়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

গৌড়ের শাসন কর্তা হোসেন শাহের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যদেব নানা দেশ পর্যটন করে ১৫১৪ খৃঃ জৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন মালদহের রামকেলী গ্রামে এসে উপস্থিত হন। কথিত আছে হোসেন শাহের রাজত্বকালে যে কয়জন ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করেছিলেন দবিরখাস অর্থাৎ খাস মুন্সী সনাতন এবং টাকশালের অধিকারী সাকর মাল্লিক রূপ গোস্বামী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। এদের আহ্বানেই চৈতন্যদেব নবরূপে পরিবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মালদহে

আসেন। সঙ্গে ছিলেন মালদহ নিবাসী নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গী অদ্বৈতাচার্যের স্ত্রী ঠাকুরানী। চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রূপ, সনাতন এবং তাদের ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীজীবগোস্বামীকে সঙ্গে করে নিয়ে যান আর নিত্যানন্দ এবং হরি দাসকে ধর্ম প্রচারের জন্য রেখে যান। এই নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী যখন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতেন, সেই সময়ে বৈষ্ণব ধর্মের কেউ কেউ নিজেকে কৃষ্ণ, বলরাম, রামচন্দ্র প্রচার করায়, বীরভদ্র তাদেরকে বৈষ্ণব সমাজ থেকে বার করে দেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বহিষ্কৃত এই সব বৈষ্ণবেরাই 'নেড়া-নেড়ী' সম্প্রদায় বলে অভিহিত হোত। মালদহের ইংরেজবাজার থানার গয়েশপুরে এই সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। পরবর্ত্তীকালে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য এই সম্প্রদায়কে বৈষ্ণবমতের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনেন। চৈতন্যের ভাবময় জীবন তথা চন্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়নঃ এই শ্লোগানের অর্ন্তনিহিত সাম্যসুর জেলার সাধারণ জনজীবনের উপর দারুন প্রভাব বিস্তার করে।

ধর্মীয় আচার-আচবনের ক্ষেত্রে জনজীবনের উপর শাক্ত লৌকিক কাব্য কাহিনীর প্রভাবও কিছু কম নয়। শাক্ত লৌকিক কাব্য কাহিনীগুলির মধ্যে চন্ডীমঙ্গল অন্যতম। এই কাব্য ধারার অন্যতম কবি মানিক দত্ত মালদহ জেলার অধিবাসী ছিলেন (আনুঃ খৃঃ ১৪শ শতাব্দী)। এই মঙ্গলকাব্যে কাব্যকার চন্ডীদেবীব উদ্ভব তত্ত্বের এক ইতিহাস শুনিয়েছেন। যার সঙ্গে মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস রচিয়তার কিঞ্চিৎ মিল আছে - "বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম যখন হিন্দুধর্মের মধ্যে আত্মগোপন করিতেছিল তখন কোন তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবী এই মঙ্গলচন্ডীর মধ্যে আসিয়া আত্মগোপন করেন। মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়, আদিদেব বা ধর্মের শক্তিস্বরূপিনী আদ্যাই চন্ডীতে পরিণত হইয়াছেন।" মানিক দত্ত বর্ণিত এই সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসরণে বলা যায় ঃ চন্ডীমঙ্গলের সঙ্গে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বহু উপাদান মিশ্রিত হয়ে গেছে। মালদহ জেলার সাধারণ জাতির মধ্যে এই চন্ডীর প্রভাব মারাত্মক। জেলার স্থান নাম গুলি বিচার করলেই তা প্রমাণিত হয়। মালদহ জেলার ১১টি থানার মধ্যে ৮টিতেই চন্ডী নামযুক্ত, মৌজা আছে ২৩টি। যার মধ্যে বুলবুলচন্ডী, চৈঁচাইচন্ডী (হবিবপুর থানার ২১২ নং ২৪৪ নং মৌজা) কাপাইচন্ডী (হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ২৩ নং মৌজা) ছাড়া আছে ২০টি চন্ডীপুর নামাঙ্কিত স্থান। এছাড়া পাওয়া যায় পাটলাচন্ডী ও বনচন্ডীর নাম (গৌড়ের ইতিহাস রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী), ইংরেজবাজার থানার খ্যাতনামা জহরা কালীকে অনেকে জহরাচন্ডী বলেন, বাগবাড়ী বাঘেরাচন্ডী, হবিবপুর থানায় রামপুরে (২৭২ নং মৌজা) ঝাপড়ী কালী মন্দিরের পাশে আছে রুদ্রচন্ডী, হরিশ্চন্দ্রপুরে (৪৩ নং মৌজা) গোহিলায় ৯০ বছরের পুরনো 'গোহিলচন্ডী থান' বুলবুলচন্ডীর কিছুদূরে বুড়িতলায় বৈশাখী সংক্রান্তিতে চন্ডীপূজা হয়, উঃ দিনাজপুরের ৯০টি থানায় আছে চন্ডীনামযুক্ত ১৪টি মৌজা। চন্ডীদেবির এই রূপ প্রভাব প্রতিপত্তি দেখেই সম্ভবত বুকানন হ্যামিলটন ১৮০৯-১০ খৃঃ মালদহের কালিয়াচক ডিভিসন ভ্রমণকালে দেবী চন্ডীকেই সব গ্রামের সাধারণ দেবী বলে উল্লেখ করেছেন।

অন্যপক্ষে এই চন্ডীমঙ্গলের এই সৃষ্টিতত্ত্বে রাঢ়ের অন্যতম লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের সঙ্গেও মিল পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলকাব্যেও গৌড়ের বিশেষ ভূমিকা আছে। গৌড়ের রাজশক্তির সঙ্গে রাঢ়ের সামন্ত রাজার সংঘর্ষের বিষয় নিয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে। নাথ সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও এসে মিলিত হয়েছে এরই মধ্যে। এই ব্যাপারে পুরাণের কোন প্রভাব এই

লোকধর্মের উপর নাই একথা জোর দিয়ে বলা চলে। এই কথারই সমর্থন পাওয়া যায় মালদহ জেলার অধিবাসী জগজ্জীবন ঘোষালের মনসার পাঁচালীতেও। তাছাড়া মানিক দত্ত প্রণীত সচণ্ডী' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ নয় যতদূর সম্ভব অষ্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় ভাষা থেকে শব্দটি ধীরে ধীরে সংস্কৃত ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। মালদহ জেলা থেকে পাওয়া গিয়েছে জীবন মৈত্র এবং মানিক দত্তের লেখা দু-খানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বই।

মালদহের সাধারণ জন-জাতির ধর্মীয় ইতিহাস প্রসঙ্গে মনসাদেবীর প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যাবে না। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর অনেক আগেই বাংলার ভাস্কর্যে মনসা মূর্তির ব্যাপক অস্তিত্ব থেকেই জানা যাচ্ছে যে, সমাজে এই দেবী ইতিমধ্যেই রীতিমতো আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে ছিলেন। এই দেবীর আবির্ভাবের পিছনে কতকগুলি কারণ বর্তমান। পাল রাজত্বে জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তা ছিল যথেষ্ট। পরবর্ত্তীকালে এই ধর্ম হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জৈন দেবী পদ্মা লোকদেবী পদ্মায় পরিবর্তিত হয়ে যান। মনসার এক নাম পদ্মা। বিজয়গুপ্তের মনসা মঙ্গলের নাম পদ্মাপুরাণ। সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থানের যুগে একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধদের দেবীগণ যখন নতুন পরিচয় লাভ করছেন, তখন আবার বৌদ্ধ জাঙ্গুলীতারা মনসা নামে পরিচিত হন। কিন্তু সেনরাজাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পোষকতা বাংলার সাধারণ জনজাতি মেনে নিতে পারে নি। তাই ব্রাহ্মণ সমাজের বর্হিভাগে এই কাব্যের উদ্ভব হয় একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ সমগ্র মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে একটিও উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় শৈবধর্মের প্রভাববশতঃ মনসাকে শিবের মানস কন্যার কল্পনায় একীভূত করা হয়েছে। কাহিনীর নায়ক বৈশ্য সওদাগর। (যে বণিক জাতি বল্লাল সেনের উপর বিরূপ ছিল, বিনা কারনেই যিনি এই সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন।) এবং তাঁর প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুখ-দুঃখের কাহিনী। কাব্যোক্ত এই চরিত্রগুলির একটিও সংস্কৃত বা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবান্বিত নয়; বেহুলা, সোনেকা, লখাই, সায়বেনে ইত্যাদি চরিত্রগুলির নামকরণ এবং সমাজে তাঁদের স্থান নির্ধারণ ও এই কথাগুলিই প্রমাণ করে। এরপর তুর্কী আক্রমণ। নিরুপদ্রব সমাজের রক্ষণশীল ধর্মমতের উপর পরিবর্তনের ঝোড়ো হাওয়া স্থিতিশীল শিব এবং বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ এদেশের সমাজ থেকে সাময়িকভাবে বিদায় নিল। প্রবল রাষ্ট্রশক্তির সম্মুখে সমাজ নিজেকে অসহায় বোধ করে, তার কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য এক ভয়ঙ্করী শক্তি দেবতার কল্পনা করল। তাই মনসা গানের পালারূপে ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই বেহুলা, লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। আর চর্তুদশ শতাব্দী থেকেই বাংলার সাধারণ সমাজ নতুন করে পুনরায় এই দেবীর শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে।

জল-জঙ্গলে ভরা মালদহ জেলাতেও প্রাচীনকাল থেকেই মনসা দেবীর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। মালদহের একটি নদীর নাম বেহুলা। এই নদীতেই নাকি বেহুলা তাঁর মৃত স্বামী লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে ভেসে গেছেন। গাজোলের ময়না অঞ্চলে আজও কার্ত্তিক মাসে একটি মেলা বসে, এইখানেই চাঁদ সওদাগর সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্খায় দেবীর পূজো করেছিলেন এই জনশ্রুতির ভিত্তিতে। এইসব জনশ্রুতির ঐতিহাসিক ভিত্তিগুলি যদিও গবেষণা সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু মনসা দেবী বা সর্পপূজার এই ধারায় মালদহের বিভিন্ন জনজাতি, উপজাতিদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা

রয়েছে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত পুঁথিগুলি তার প্রমাণ দেয়। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে তন্ত্রবিভূতি বলে পরিচিত একজন মনসা মঙ্গল কবির আবির্ভাব হয়। সম্ভবতঃ কবির নাম বিভূতি। তিনি তান্ত্রিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে তন্ত্রবিভূতি নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ঠিক কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা জানা না গেলেও ডঃ আশুতোষ দাস মালদহ জেলা থেকে তাঁর একটি আনুপূর্বিক পুঁথি আবিষ্কার করেন। ক্রমে তাঁর অনুসন্ধানের ফলে আরও তিনখানি পুঁথি আবিস্কৃত হয়। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি জগজ্জীবন ঘোষাল মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। দিনাজপুর জেলার (অবিভক্ত মালদহ জেলার অংশ) কোচ আমারা বা 'কুড়িয়া মোড়া' গ্রামে জগজ্জীবন ঘোষালের বাসভূমি ছিল। শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয় সম্প্রতি মালদহ জেলার সিমলা দুর্গাপুর গ্রাম থেকে জগজ্জীবন ঘোষালের একটি সম্পূর্ণ পুঁথি আবিষ্কার করেছেন। উভয় পুঁথিতেই মনসামঙ্গল পালাগানে উত্তরবঙ্গের ধর্মীয় ঘরানায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি রূপায়িত হয়েছে।

জৈন-বৌদ্ধ, শিব-শাক্ত, চণ্ডী-মনসাকে ছাড়া আরও কিছু লৌকিক দেব দেবতার কথা বলা যায়। যাঁরা কৌলিন্য গরিমায় শিষ্ট সমাজের উপরি স্তরে বিরাজ না করেও সাধারণ মানুষের মনের মণিকোঠায় তাঁদের অধিষ্ঠান। বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস-সংস্কার, ধনোৎপাদন, শস্যোৎপাদন, সন্তানোৎপাদন ইত্যাদি আচারকে আশ্রয় করে এই সব লৌকিক দেবদেবীর উদ্ভব। প্রকৃতি পরিবেশে যেখানেই একটু বিস্ময়ের অবকাশ, আতঙ্কের ছোঁয়া, অজানা-অচেনার পরিবেশ সেখানেই লোকদেবতা, অখোদিত শিলাখণ্ড, মাটির বেদী, পোড়ামাটির হাতি অথবা ঘোড়া, হস্ত নির্মিত পুতুলে দেবতার আবয়বিক রূপ উপস্থিত। মদ্য-মাংসে দেবতার পূজার্চনা। নির্ধারিত কোন সূর্য বা চান্দ্র তিথি নয়, রোগ-মহামারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়াতে যে কোন দিন দেবীর পূজা। লোকদেবতা অথবা দেবী কেবল শুভদায়িনী নয়, অশুভপ্রদ, কোপনস্বভাব প্রতিহিংসাপরায়ণ, বলি উপচারে, যাদু আচারে তার ক্রোধের প্রশমন ঘটে। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও লোকদেবতার সর্বত্র এই চরিত্র। যূথবদ্ধতা যে সমাজের বৈশিষ্ট্য সেই আদি গন্ধী মানুষের কল্পনায় এই দেবকুলের আবির্ভাব।

আর্যীকৃত এই অভিজাত ধারার আড়ালে বাংলায় এক অনভিজাত লৌকিক ধারা বর্তমান। তা অজস্র কৌম গোষ্ঠীতে বিভক্ত আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীর দান। কৌলীয় অষ্ট্রিক সাঁওতাল মুণ্ডা, ওঁরাও আর দ্রাবিড়ীয় কেওট-কৈবর্ত্ত-আর্যধর্ম ও আর্যভাষার দ্বারা প্লাবিত হওয়ার আগে এই দুই জনজাতি পারস্পরিক আদান-প্রদানে এক মিশ্র সংস্কৃতির ধারা গড়ে তুলেছিল। এই মিশ্র সংস্কৃতির অবদান লৌকিক দেবধারা। ওঁরাও জাতির শিকারের দেবী 'চাণ্ডী' — নানা নামে নানা রূপে পূজিত। নাটাই চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, শুভচণ্ডী বা সুবচনী, খাড়া শুভচণ্ডী, রথাই চণ্ডী, ককাই চণ্ডী, ঢোলাই চণ্ডী, নিত্য মঙ্গলচণ্ডী, জয়মঙ্গল চণ্ডী, বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী, কুলুই মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কটামোচন, বিপদত্তারিনী ইত্যাদি।

প্রত্যেক ওঁরাও পল্লীতে সাধারণত কোনও পর্বতের ঢালু জায়গায় 'চাণ্ডী-টাঁড়' নামে এক কিংবা একাধিক স্থান থাকে। সেখানে এক টুকরো পাথরের মধ্যে চাণ্ডীর অধিষ্ঠান কল্পনা করা হয়। বাসুলী নামে এক লৌকিক দেবতার পূজোও আদিম সমাজের প্রস্তরোপসনার বিবর্তিত রূপ। বাংলার কৈবর্ত্ত জাতির লৌকিক দেবী বাসুলী ও দাক্ষিণাত্যের লৌকিক দেবী বিসলমরীর অভিন্নতা থেকেও বাংলায় দ্রাবিড় সংস্কারের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। মালদহের হবিবপুর থানার সিমলা

গ্রামে বাসুলী দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। সাঁওতালদের বড়াম থানের মাতৃদেবী জাহের-এরা, পরিবর্তিত হয়ে জহরা-কালী হয়ে গিয়েছেন। বড়াম থানের অন্য দেবতা মারাংবুরু অন্য পরিবেশে মহাকাল ভৈরব এ পরিণত হয়েছেন। এছাড়া আছেন বিভিন্ন গ্রাম-দেবতা। বনের বড়াম গ্রামে এসে গরাম দেবতা গ্রাম-দেবতায় পরিণত। চণ্ডীরূপে তাঁর অবয়বে কোথাও গাঢ় হরিদ্রাভ তেল রঙের প্রলেপ, কিংবা সিঁদুর লিপ্ত রক্তাভ। নিম্নবর্গীয় মানুষেরা তাঁদের গরাম দেবতার জন্য রেখে দেয় চালের প্রথম লাউ, কুমড়ো, গাইয়ের প্রথম দুধ। ক্ষেতের শস্যের পুরোভাগে তার আবাহন, বিবাহে, অন্নপ্রাশনে সুপুরি দিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ লৌকিক রীতি। লৌকিক দেবতাকে বুড়ো-বুড়ি রূপে চিহ্নিত করা অধিবাসী মানুষের প্রচলিত রীতির মধ্যেই পড়ে। সাঁওতালী লোক পুরাণে পিলচু-হাড়ম, পিলচু-এরা — আদি পিতা মাতা। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অভিজ্ঞতা এবং ভূয়োদর্শিতার উপর প্রবল আস্থা এবং শ্রদ্ধাবোধ - আদি জনজাতির দেব-দেবী কল্পনার প্রেরণা, তাঁদের অধিষ্ঠাতা ভূমি তাই তাঁদেরই নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছে বিভিন্ন গ্রামনামে। সাদ্‌রী ভাষাভাষী পাহাড়িয়া সম্প্রদায় আশ্বিন মাসের অষ্টমী তিথিতে 'জিতিয়া' উৎসব পালন করে। এই আদিবাসীদের জিতিয়ার দেবতার নাম জিৎবাহন। আর এককালে আশ্বিন মাসের অষ্টমী তিথিতে আমাদের পুরনারীরা যার পূজো করতেন তাঁর নাম জিমূতবাহন। এইভাবেই লৌকিক দেবদেবীদের আর্যীকরণ ঘটেছে।

তবে সার্বিক ভাবে মালদহ জেলার আদিবাসীদের উপর লৌকিক দেবতা শিবের প্রাধান্যই বেশী। এই রকমটি হওয়ার পেছনে সুনির্দিষ্ট কোন কারণ না থাকলেও বলা যায় - ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ দিয়ে গঙ্গানদী প্রবাহিত, এরই বহু শাখা-উপশাখা জেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জেলার আশীর্বাদ এবং অভিশাপ উভয়েরই কারণ স্বরূপ, আবার এরই বিস্তৃত অঞ্চলের মালভূমিতে বহু মানুষের রুটি-রোজগারের উৎস। প্রাচীন গৌড়ের পঁচিশ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথী ও গঙ্গা দু-ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রাচীন বাংলা অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের পূর্ব গৌড় লক্ষণাবতী ছিল গঙ্গার পশ্চিম তীরে। রাজমহল পার হয়ে গঙ্গা সম্ভবত তখন খানিকটা উত্তর ও পূর্ব বাহিনী হয়ে গৌড়কে পশ্চিমে বা ডানদিকে রেখে রাঢ় দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হোত। আজকের কালিন্দী ও মহানন্দা খুব সম্ভব এই উত্তর-পূর্ব প্রবাহের প্রাচীন স্মৃতি বহন করেছে। এই জলবাহিকাভূমি উর্বর শক্তির পোষক এবং তাকে আশ্রয় করে কৃষিদেবতা মহাদেব এই অঞ্চলের জনসমাজে এত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে।

দ্বিতীয় কারণ হিসাবে রাজনৈতিক কারণকেই দায়ী করা যেতে পারে। প্রাচীনকাল থেকেই শিব জনপ্রিয় দেবতা। তা তিনি পৌরাণিকই হোন অথবা লৌকিক। কর্ণ সুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক শৈব ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন ছিলেন বৌদ্ধধর্মের রাজকীয় মুখপাত্র, রাষ্ট্রক্ষেত্রে উভয় উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ গৌড়ে বিস্তার লাভ করেছে শিবের আধিপত্য এবং বৌদ্ধধর্মের হীনবলত্ব বা শিবের সঙ্গে সমন্বয়ের সন্ধি।

এইভাবে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা এবং ধর্মীয় আচারের প্রভাবে মালদহ জেলায় বহুমুখী সাংস্কৃতিক লক্ষণ আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং সংহত। বলা চলে লোক সংস্কৃতির সবকটি ধারাই অবশেষে নীলকণ্ঠ শিবের মধ্যে আশ্রয় লাভ করার চেষ্টা করেছে। স্থানীয় ব্যক্তিগণের মতে এখানে 'আদিনাথ' নামক শিবের জনপ্রিয়তা ছিল (সমন্বয়ের যুগেই

সম্ভবত) তারা বলেন আদিনা নামটি সম্ভবত 'আদিনাথ' নামেরই অপভ্রংশ। কোচ এবং রাজবংশী আদিবাসী সাঁওতাল, জৈন, বৌদ্ধদের আচরিত ধর্ম রূপান্তর লাভ করেছে শিবের মধ্যে (আদ্যের গম্ভীরা কথাটি সম্ভবতঃ জৈনতীর্থঙ্কর আদিনাথ থেকে এসেছে)। অথবা আদিনাথ বুদ্ধই এই পূজার্চনার লক্ষ্য বলে মনে হয়, সেইজন্য গম্ভীরা উৎসবের আব এক নাম আদ্যের গম্ভীরা। বরেন্দ্র ভুমের উচ্চ হিন্দুর প্রভাব, বৌদ্ধ প্রভাব, পরবর্ত্তীকালে পাঠান রাজশক্তি বাহিত ইসলাম ধর্মমত (গম্ভীরা নৃত্যে মুসলমান বেশধারী চরিত্রের অংশগ্রহণ ও 'নানা' সম্বোধন এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যনীয়)। ভারতীয় সকল দেবতার মধ্যে শিবের অসাধারণ শোষন শক্তির ফলেই এই জেলায় শিব প্রতীকের মাধ্যমে লোকসংস্কৃতির ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে; প্রভাব বিস্তর করেছে জেলার স্থান নামগুলির উপরও, - চাঁচল থানার গৌরীপুর (মৌজা - ২৫), (মৌজা - ১১২; গঙ্গাদেবী), থানা- পুরাতন মাল্দার হরমোরকা, মৌজা - ৪৮, ইংরেজবাজার থানার গঙ্গাবাগ।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই যেহেতু মালদহ জেলা, বাংলার রাজধানী গৌড়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ ছিল, সেহেতু রাজশক্তির ক্রমাগত পটপরিবর্তনের সাক্ষ্য চিহ্নও তাকে বহন করতে হয়েছে। বৌদ্ধ, হিন্দু, পাঠান ইংরেজ এমনকি বিভিন্ন জনজাতি, উপজাতিদের আশা-আকাঙ্খা মালদহকে ঘিরে আবর্তিত হওয়ার ফলেই ক্রমান্বয়ে বিভিন্নমুখী সংস্কৃতির ধারা অনেকখানি পরস্পর নিরপেক্ষভাবে গড়ে উঠার সুযোগ পেয়েছিল। পরিবর্তিত স্থান নামগুলির মধ্যেও সেই সমন্বয়ের চিত্র বর্তমান।

মুসলিম জনগোষ্ঠী :

বাংলায় মুসলমান সমাজের পত্তন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ১২০৩ খ্রীঃ ইখতিয়ার উদ্দিন কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ খ্রীঃ সিরাজ উ দৌলার পত্তন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ বছরের এই মধ্যবর্তী কালে বাংলায় মুসলমান সমাজের পত্তন, গঠন, বিকাশ ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। সাত শতকের প্রথমার্ধে আরব ভূমিতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন করেন হজরত মহম্মদ (৫৭১-৬৩৩)। এর পরই ধর্মপ্রচার ও বাণিজ্য প্রসারে আরবেরা ছড়িয়ে পড়েন ভারতের ভূমধ্যসাগরে, পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকূল ভূমিতে। বাংলায় তুর্কী ক্ষমতা প্রসারের আগেই চট্টগ্রামে আরব বণিকদের আগমন ঘটে। এই বণিকদের জাহাজেই ইসলাম ধর্মের প্রচারে বহু সুফী, দরবেশ, পীর, আওলিয়া এদেশে এসে আস্তানা গেড়ে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন।

বাংলায় মুসলমানদের কুলপরিচিতি ও বংশবৃদ্ধি প্রসঙ্গে গ্রিয়ার্সন, হান্টার, ডাল্টন, উইলিয়াম কুক, জেমস ওয়াইজ, হাবার্ট, রিজলি, জেমল লঙ প্রমুখ ইউরোপীয় পন্ডিতগণ যেসব মত পোষন করেছেন তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে হিন্দু সমাজের জাতিভেদের কঠোরতার কারণে ও পীর দরবেশদের প্রভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়েছেন।" শাসক, সৈনিক, বণিক, ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমান, ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ এবং বৈবাহিক সূত্রে জাত মিশ্রধারার মানুষ এই ত্রিবিধ পদ্ধতিতে বাংলার মুসলমান সমাজের সৃজন, গঠন ও বৃদ্ধির কাজ সারা মধ্যযুগ ধরে চলেছিল।

ইসলামের যে উদার মানবতাবাদ ও ভ্রাতৃত্বের আকর্ষণে এই বিশাল সংখ্যক মানুষের ধর্মান্তর করন শুরু হয়েছিল এবং যে মানবতাবাদ ও ভ্রাতৃত্বের সুবাদে ইসলামের জনপ্রিয়তা তার

গভীরে এখনও মুসলমান সমাজে আত্মগোপন করে আছে ধর্মবৈষম্যবাদ। এই ধর্মবৈষম্যবাদকে গোষ্ঠী বিভাজন বললেই হয়ত তা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। প্রধান দুটি গোষ্ঠী শিয়া ও সুন্নী। সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলিম বিশ্বে নব্বই শতাংশ। ইরানই একমাত্র শিয়া প্রধান রাষ্ট্র।

শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ, টিপু সুলতান এরা শেষ বয়সে কলকাতাতে নির্বাসন জীবন যাপন করেন, এরা সকলেই ইরানী এবং শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদহে সুন্নি সম্প্রদায় ভুক্ত লোকের সংখ্যাই অধিক। সুন্নিদের মধ্যে আবার হানাফী সম্প্রদায় ভুক্ত লোকের সংখ্যাই অধিক। হানাফিদের গুরুত্বপূর্ণ দুটি শাখা- দেওবন্দ এবং ব্রেলভি। দেওবন্দিরা ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের এদের অবদান স্বীকৃত। অন্যদিকে সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভির অনুগামীরা অনেকটাই রক্ষণশীল এবং পীর পরিপন্থী।

ইতিহাস স্বীকৃত ওয়াহাবি আন্দোলনের ওয়াহাবি ও এক স্বতন্ত্র মত। ওয়াহাবিদের একটি শাখা আহলে হাদিশ। এরা হানাফি মত থেকে পৃথক শাফি মতের অনুসারী।

দেববিরোধী গ্রামীন লোকায়ত সমাজের যে দর্শন আমরা বৌদ্ধ সহজিয়া ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম মুসলিম সমাজেও সেই সহজিয়া পন্থার দেখা পাওয়া যায় সুফীবাদের মধ্যে। শরীয়ত পন্থী কঠোর মোল্লাতন্ত্রের পরিপন্থী এই সুফীবাদ। কিন্তু সুফী দর্শনের এই সহজিয়া পন্থাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছিলেন স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের ধর্মান্তরিত মুসলমান ও কৃষক শ্রেণী। মধ্যযুগের বাংলা সমাজে সুফী দর্শনের সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের হাত ধরেই বাংলায় ইসলামের এই প্রসার সম্ভব হয়েছিল। সুফীদের মধ্যে দুটি ভাগ লক্ষ্যনীয় (ক) শরা, (খ) বে-শরা। এই বে-শরা সুফীরা হলেন ফকির দরবেশ এবং বাউল সম্প্রদায়, সুফীদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ রয়েছে। যা এক একটি মুর্শিদ বা গুরুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যেমন — কাদোরিয়া, বিশাতিয়া, শহারাবাদি ইত্যাদি। ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চর্তুবর্ণের যে বর্ণবৈষম্যবাদ পরিলক্ষিত হয় মুসলমান সমাজেও সেই ভেদরীতির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। চর্তুবর্ণের হৈ ভেদরীতির নাম আশরাফ, আতরাফ, আজলাফ এবং আরজল নামে প্রতিষ্ঠা পায়।

শরীফ (আরবী অর্থ - পরিত্র বা মান্য) শরীফের বহুবচন আশরাফ, তরফ (শ্রম) শব্দজাত আতরাফ, জিলফ (নীচ) শব্দজাত আজলাফ, রজীল (ইতর) শব্দজাত আরজল।

আশরফ শব্দের অর্থ শুদ্ধ এবং অভিজাত সম্প্রদায়। বহিরাগত শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান ইত্যাদিরা এই শ্রেণীভুক্ত। ধর্মান্তরিত মিশ্রশ্রেণীর মধ্যবিত্ত মুসলমানরা আতরাফ। আতরাফ এর অর্থ হল ইতর। পক্ষান্তরে নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিতরা আরজল। আরজল এর অর্থ হল জল অচল কিংবা স্পর্শের বাইরে। যদিও এই ভেদ ইসলামী আইন সম্মত নয়।

ডঃ শহীদুল্লাহ এর মতে তুর্কিরা মধ্য এশিয়া থেকে আগত জনগণ যারা মোগল নামে পরিচিত, আফগানেরা পাঠান এবং আরব পারস্য থেকে আগত বণিকেরা শেখ। অন্যদিকে এনামুল হক এবং আবদুল করিমের মতে, হজরত আলি ও ফতেমার বংশধরবা সৈয়দ, আরব থেকে আগত বণিকেরা শেখ, তুর্কিস্থানের অধিবাসীরা পাঠান এবং মধ্য এশিয়া থেকে আগতরা মোগল, আর এদেশীয় মুসলমানরা বাঙালী মুসলমান। বিভিন্ন সময়ে বিশাল অংশের বিহারী মুসলমানরা এই জেলায় এসে বসবাস শুরু করেন। এই বিহারী মুসলমান জাতে জোলা বা

আনসারি, মেমিন বা তাঁতি। খোট্টা বা খোট্টাই নামে এদের নিজস্ব একটি ভাষা আছে। মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী এদের অনুন্নত শ্রেণীর তালিকায় রাখা আছে। এরা বর্তমানে কেউ কেউ মুচির কাজও করে থাকেন।

নিকরি মুসলমানেরা মাছ ও শুটকির ব্যবসা করেন।

আবদাল সম্প্রদায় এরা গরু, মোষ, ছাগল খাসী কাটেন।

হাম্বেলা এবং ধাই সম্প্রদায়' — ছেলেরা ঘোড়ার নাল পরানোর কাজ করেন এবং মেয়েরা ধাই - এর কাজ।

(কর্তাভজা সম্প্রদায়) দাফালি সম্প্রদায় এরা পাঁচপীর, মানিকপীর, ঘোড়াপীর, জিন্দাপীর প্রভৃতির উপাসক। এরাই একদিন পীরগনের প্রবর্তক।

শেরপা বাদিয়া জনগোষ্ঠী, এরা বিয়েতে নাচ এবং গান করেন।

কাহার সম্প্রদায়ের মেয়েরা শাখা সিঁন্দুর পরেন।

মুসলমান সমাজের অন্ত্যজ তথা একেবারে নিচের দিকের বহু মানুষ মুর্শিদাবাদেব আছেন যারা প্রকৃত অর্থে উভধর্মী অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম নিয়ে আছেন। এরা পটুয়া, সাপুড়ে, বেদে, লালবেগি এবং আবদাল সম্প্রদায়।

পদবি ঃ

ইর্সলাম ধর্মে নাম পদবির কোনও উল্লেখ নেই। ইসলামের সূত্রানুসারে কোনও নামপদবি যেমন চোখে পড়ে না, তেমনি নামপদবি দেখে গোত্র বিচারও সম্ভব না। আর বাঙ্গালী মুসলমানদের অধিকাংশই গ্রামীন ভূমিপুত্র বা অন্ত্যজ নিম্নকোটি হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত। এইসব ভূমিপুত্র মুসলমানরা ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও আশরাফ শ্রেণী ও বর্ণ হিন্দুর পাশে তাদের নামপদবি ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন।

আশরাফ মুসলমানরা বা বর্ণহিন্দুরাই সরকারী উচ্চপদে আসীন ছিলেন। প্রশাসনের সাথে যুক্ত হওয়ার সুবাদে তারা যে সরকারী উপাধি লাভ করেন পরবর্তীতে তা নামপদবি হিসাবেই ব্যবহৃত হতে থাকে। সেনাবিভাগ, বিচার বিভাগ, রাজস্ববিভাগের উচ্চপদে যাঁরা আসীন ছিলেন তাদের উপাধিগুলি ছিল যথাক্রমে কাজী, মীর, মুন্সী, হাজারী, সরকার, তরফদার, চৌধুরী ইত্যাদি যা পরবর্তীতে নাম পদবিতেই পরিণত হয়।

আশরাফ মুসলমানরা বহু পদবি বণিক বা শাসক মুসলমানদের থেকে নিয়েছেন। যেমন . — খান, সৈয়দ, শেখ ইত্যাদি। তুর্কি মাঙ্গোলিয়দের খান বলা হত। সৈয়দ বা হজরত মহম্মদের বংশধর বলে দাবি করেন। আরব বণিকদের শেখ বলা হত। এই পদবি পরবর্তীতে ব্যাপকহারে ভূমিপুত্র মুসলমানেরাও ব্যবহার করেছেন। এভাবেই সুফী সাধক এবং পীরদের শিষ্যরা তাঁদের পদবি ব্যবহার শুরু করেন।

পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার কারণে যেসব বর্ণহিন্দুরা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছিলেন তারা খান পদবি ব্যবহার করেন। ভূমিপুত্র এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর যেসব মুসলমানরা সরকারি নিম্ন পদগুলিতে আসীন থাকতেন তাঁদেরও সরকারী উপাধি নাম পদবিতে পরিনত হয়। যেমন-

নস্কর/লস্কর, হালদার, সর্দার, মোল্লা, গাজী প্রমুখ। ধর্মান্তরিত হয়েও যাঁরা তাদের পূর্বতন নাম পদবি ব্যবহার করেন নি তারা এখনও মন্ডল, বিশ্বাস, বৈদ্য, ঢালী, মিস্ত্রী, রুদ্র, মজুমদার পদবিগুলি ব্যবহার করেন। নামেব আগে বা শেষে মহম্মদ, আলি, হোসেন, রহমান, হক, উদ্দিন, আহমেদ, বক্স, জামান শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় তা আসলে নামপদবি নয় জাতিবাচক শব্দ।

নামপদবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি দেখা যায়। সাধারণত বিয়ের আগে খাতুন, বিয়ের পর বিবি বা বেগম, বিধবা হলে বেওয়া শব্দ ব্যবহারের ব্যপকতা লক্ষ্য করা যায়।

খাতুন, নাহার, নেসা, বেগম, আরা, খানম ইত্যাদি হচ্ছে দ্বিপদী শব্দ।

শিয়াদের প্রধান উৎসব মহরম, সুন্নীদের ঈদ ঃ

হজরত মোহাম্মদ নির্দেশিত প্রত্যেকটি উৎসব ও পার্বন চন্দ্রমাস বা সৌরবর্ষ কেন্দ্রিক। চান্দ্রমাসের বছর শেষ হয় ৩৬৫ দিনে। সাধারণ বৎসরের হিসাবে যা এগারদিন কম। এর ফলে ৩৩টি মুসলিম বর্ষ ৩২ টি সৌরবর্ষের সমান। মুসলিম ব্যবহৃত বর্ষগুলি হল — মহরম, শফর, রবিয়ল আওয়াল, রবিমস সানি, জমদিয়াল আওয়াল, জমদিয়স সানি, রজব, সাবান, রমজান, শওয়াল, জেলকদ ও জেলহজ্ব।

প্রচলিত ছড়া —

মহরমে ডাহের চাঁদ দশ দিনে খানা
শফর তেজির চাঁদ ত্রিশ দিনে মানা
রবিয়ল আওয়ালের চয়াকতের চাঁদ বারো দিন বাতি,
রমজানের চারচাঁদে করিবেক শাদি।
শাবানে সেরারীতের চাঁদ চৌদ্দ দিনে বাতি,
রমজানে রোজা আর শওয়ালেতে ঈদ,
জেকদেতে কাম নাই জেলহজ্বে বকরীদ।

● তথ্য সহায়তা

১ বাংলা ও বাঙ্গালীব বিবর্তন — ডঃ অতুল সুব।

২. বঙ্গ, বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীত্ব — আহমদ্ শরীফ।

৩ ঝড — মুর্শিদাবাদ থেকে সম্পাদকমণ্ডলীব দ্বারা প্রকাশিত।

৪. বাংলায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১ম, ২য় খণ্ড) — এম এ কবিম।

মালদহ জেলার মানুষের আচরিত পাল-পার্বণ

আমরা কথায় বলি 'বারো মাসে তের পার্বণ'। প্রচলিত এই কথাটির অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য কেবল আক্ষরিক অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বছর ভর ছোট বড় একাধিক সে সমস্ত পাল-পার্বণে মুখরিত থাকে তারই ইঙ্গিত এই প্রচলিত প্রবাদে। বর্তমানে এই পার্বণ কথাটির চাইতে উৎসব কথাটিরই জনপ্রিয়তা বেশী। পাল-পার্বণের অভিধানগত অর্থ হল বিশেষ তিথিতে পালনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যা একক সাধনা বা পরিবার ভিত্তিক আচরনীয় অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর উৎসব কথাটির অর্থে রয়েছে ব্যাপকতার ইঙ্গিত। শব্দগত তাৎপর্যগুলি যথাক্রমে আরম্ভ, আনন্দ জনক ব্যাপার, উৎসেক বা ইচ্ছা প্রসব। উৎসব অর্থে - কোপ, উন্নতি, অভ্যুদয়। নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষে এর অর্থ করেছেন 'মেদিনী', হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্দ কোষ এ বলেছেন - উৎসব অর্থাৎ যা সুখ প্রসব, ইচ্ছার উৎপত্তি, ইচ্ছা প্রসব, তান্ডব, হর্ষণ, উদ্যম, রোমোৎ সব। - এই উৎসব হল আড়ম্বর বহুল, উল্লাস মুখর ক্রিয়াকর্ম, যার সঙ্গে ধর্মে যোগাযোগ থাকতেও পারে না থাকতেও পারে। আবার ব্যক্তি আচরিত পার্বণ বা ধর্ম যখন গোষ্ঠীর হাতে সার্বজনীনতায় পরিণত হল, একক সাধনার নিভৃতিকে ত্যাগ করে আমজনতার উচ্ছ্বাস প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠল তখন পার্বণ পরিণতি পেল উৎসবে। এমনি করেই দুর্গা পার্বণ আজকের দুর্গোৎসবে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের, বিশেষ করে প্রত্যন্ত বাংলার প্রচলিত লোক উৎসবগুলি বেদ পূর্ববর্তী অনার্য ধারাকে বহন করে আসছে। অন্ত্যজ মানুষের আচরিত এই সমস্ত ক্রিয়াকর্মের রীতি-নীতি আজও স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলাদেশের প্রকৃত উত্তর সূরীদের। দেশবাচক 'বঙ্গ' শব্দটির পিছনেও প্রাক্ আর্য সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট, আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বাংলা শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অস্ট্রিক শব্দ 'বোঙ্গা' শব্দটির কথা বলেন। 'বোঙ্গা' সাঁওতাল, হো, মুন্ডা, উপজাতিদের বিশিষ্ট দেবতা বা অতিপ্রাকৃত শক্তি।

কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা অথবা মাঝি, কোড়া, বাগদি, হাড়ি, ডোম তথাকথিত মেহনতি মানুষেরা তাদের জীবনযুদ্ধের অনিশ্চয়তাকে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও আনন্দে ভরে নিতে চেয়েছিল, এরই স্বতঃস্ফূর্ত বাঙ্ময় প্রতিধনি শোনা গেল উৎসবগুলির মাধ্যমে। অথবা বলা যায় কঠোর বাস্তব পরিবেশের বাইরে মানুষের বুদ্ধির অনাধিগম্য, অতিপ্রাকৃত জগতের

বিভিন্ন শক্তি নিচয়ের তুষ্টি সাধনের মাধ্যমে পার্থিব সম্পদ তথা নিরুদ্বেগ নিশ্চয়তার অধিকারী হওয়ার এক সুকৌশল ছন্দ গীতময় প্রচেষ্টা বা অভিব্যক্তি। পরবর্ত্তীকলে আর্যরাও এদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্র-তন্ত্রের নানা ব্যবহারিক প্রয়োগ, শিখেছে গ্রাম জীবনের সমাজবিন্যাস আর গ্রাম শাসনের বিবিধ কলা কৌশল।

দেবতা, ধর্ম এবং পরব এগুলির উদ্ভব ও বিকাশের অর্ন্তকাঠামোয় যে সার্বজনীনতার কথা বলা হয তাব বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীতে লুইস হেনরি মর্গ্যান এঁর লেখা 'এনসেন্ট সোসাইটি' নামক বইতে। তিনি সাধারণ মানুষের আচরিত পূজা-পার্বণ এবং দেবতা কল্পনা ইত্যাদির মধ্যে প্রাক-সভ্য মানুষের ছটি স্তরের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন।

বাঁচবার তাগিদে আদিম প্রপিতামহবা বেঁচে থাকবার প্রয়োজনে বেছে নিয়েছিলেন শিকার-বৃত্তি, শিকার চাই বাঁচবার প্রয়োজনে, অতএব শিকারের একজনে দেবতা কল্পনা করে নিয়ে তাঁকে পরিতুষ্ট করার নানারকম রীতিও আবিস্কৃত হল। গড়ে উঠল একটি আদিম পার্বণ।

কালের বিবর্তনে এক সময়ে শিকার জীবিকা অর্জনের একমাত্র মাধ্যম আর রইল না। পরবর্ত্তীতে উত্তরকালীন প্র-সন্ততিরা কৃষির উপর নির্ভর করেই নিজেদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈরী করেছিলেন। তখন কৃষি-শস্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই নতুন ভাবে সজ্জিত হলো তাদের আচরণীয় অনুষ্ঠান।

এর পরবর্ত্তী পর্যায় শিকার এবং কৃষির সমন্বয়ের যুগ। এই সময়কাব সমাজ এবং অর্থনীতি পূর্বের তুলনায় উন্নত এবং সুসংহত। তাই এই সময়কার পাল-পার্বণ দেব কল্পনায় শিকার এবং শস্য কল্পনার মিলিত মিশ্রিত রূপ।

কতকগুলি সংস্কার আদিকাল থেকেই মানুষের মনে শিকড় গেড়ে বসেছিল তার কারণ স্বরূপ ছিল ব্যাখ্যাতীত অনিবর্চনীয় বিশ্বরহস্য। পরবর্ত্তীতে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে মানুষ এব কারণ অনুসন্ধান করতে সক্ষম হলেও প্রপিতামহদের উত্তরাধিকার হিসাবে ঐ আদিম সংস্কারের প্রত্নাবশেষ থেকেই গেল আচরনীয় হিসাবে কিছু রীতি নীতির ভিতরে।

লোক উৎসবের আরও একটি অন্যতম ধারা হল উর্বরতা তন্ত্র বা যৌন প্রত্রীক উপাসনা বা বিভিন্ন ধরনের মাতৃকা মূর্তির আরাধনা। তৎকালীন সমাজ জীবনে মায়ের গুরুত্ব এবং ভূমিকাও ছিল অপরিসীম। ধর্মীয় বিশ্বাসে তাই মাতৃভবনা এবং তার আনুষঙ্গিক আচার লোক উৎসবগুলির অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল।

ভয় নামক মৌলিক প্রবৃত্তি অথবা মৃত্যু নামক অনিশ্চয় পরিনাম থেকে এল বিভিন্ন ধরনের পশুপূজা, প্রেতপূজা ইত্যাদি এবং আবশ্যই তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়া-কলাপ স্বরূপ বিভিন্ন ধরনের জাদু শক্তির প্রয়োগ।

বলা যায় এইভাবেই জাদুতে, অলৌকিক ক্ষমতায়, দৈবীসত্তায় এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে ঐকান্তিক বিশ্বাসই হল পূজা এবং পার্বণের অন্তর্নিহিত শক্তি। এইরকম নানারকম কারণেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরণের কুল প্রতীক বা টোটেম, আর এই সব কুলপ্রতীককে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বিধি নিষেধ পরিণতি পেয়েছে ট্যাবুতে। আদিম কাল থেকে সভ্য সমাজের যাত্রাপথে বিবর্তিত হতে হতে পূজা-পার্বণগুলির অঙ্গে বিচিত্র পলির আস্তরণ পড়েছে। তাই লোক উৎসব বা পার্বণগুলির রীতি নীতির আচরণগুলিকে আমরা অনেক সময় অযৌক্তিক, অহেতুক বলে মনে করি।

যে কোন জেলারই নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য সূচিত হয় জেলার ভূমিগত, প্রকৃতিগত এবং বসবাসকারী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ সমন্বয়ের মাধ্যমে। এরই আচরণগত এবং আচারগত দিকগুলিকে আমরা বলি সংস্কৃতি। বিভিন্ন সময়ে পালনীয় উৎসব, পার্বণগুলির মধ্যেই এই সংস্কৃতিগুলি সংহত অবস্থায় থাকে। কিছু কিছু উৎসবের লক্ষণগুলি থাকে জাতীয় বা আর্ন্তজাতিক আবার কিছু উৎসবের লক্ষণে থাকে আঞ্চলিকতার ছাপ। মালদহ জেলার লোক উৎসবগুলিও এই বৈচিত্র্যের অন্তর্ভুক্ত। এই জেলার লোক উৎসব বা পার্বণগুলি বিশ্লেষণ করলে এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধানই আমরা পাই।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের আচরিত অনুষ্ঠানঃ

সমগ্র উত্তরবঙ্গের মতো মালদহ জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন জনগোষ্ঠী এই রাজবংশী সম্প্রদায়। তাদের ঐতিহ্যও তাই সুপ্রাচীন।

গম্ভীরা ঃ

মালদহ জেলার অন্যতম প্রধান উৎসব হল গম্ভীরা। মালদহ দিনাজপুর সংলগ্ন এলাকা একসময় পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্ত ছিল। এই পৌন্ডবর্ধনের অর্ন্তভুক্ত বরেন্দ্র ভূমির প্রাচীন জনগোষ্ঠী হচ্ছে - পৌন্ড্রক, পৌন্ড্র, পৌন্ড্র-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। মালদহ জেলার পুরাতন মালদহ, গাজোল, বামনগোলা ও হবিবপুর থানা এলাকা 'বরিন্দ' বা 'বরিন' এলাকা নাকে পরিচিত। এই এলাকায় রাজবংশী দেশি, পলি, বাবুপলি, সাধুপলি ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর বসবাস। (কোচ, পৌন্ড্র ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ)। এই কোচ-ক্ষত্রিয় রাজবংশী- দেশি পলি গোষ্ঠীর সম্মিলিত উৎসব হচ্ছে গম্ভীরা উৎসব। কোচ, রাজবংশী ছাড়াও গম্ভীরার অন্যান্য মুখ্য অংশ গ্রহণকারীগণ হলেন নাগর, ধানুক, চাঁই, কেওট, কাহার গোয়ালা, জেলে, তাঁতী, ধোপা, নাপিত, বিন্দ ও সদ্গোপ। মালদহ জেলার বামনগোলা, হবিবপুর, গাজোল, পুরাতন মালদহ, ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, বৈষ্ণব নগর এবং চাঁচল প্রভৃতি থানা এলাকায় এই গানের জনপ্রিয়তা বেশি। অবিভক্ত মালদহ জেলার ভোলাহাট ও নবাবগঞ্জ থানাতেও এর প্রচলন ছিল ব্যাপক।

বাংলা মাসের বছরের শেষ দিনে অর্থাৎ মহা বিষুব বা চৈত্র সংক্রান্তিতে বাংলা দেশের গ্রামে গঞ্জে যে-সব নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয় উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় তারই নাম গম্ভীরা। রাঢ় বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এটি 'গাজন' নামে পরিচিত। পূর্ব বাংলায় যা 'চড়ক' নামে অভিহিত হয়। নীল সাহীযাত্রা ইত্যাদি নামেও এই অনুষ্ঠান কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে আঞ্চলিক ভাবে সীমাবদ্ধ। এছাড়াও ঘরোয়া ভাবে কয়েকটি মেয়েলি ব্রতও উদ্যাপিত হতে দেখা যায়, যেমন - এয়োসংক্রান্তি, পাঁচকুমার, ছাতুসংক্রান্তি, নিত্ সিঁদুর, আদাহলুদ, রূপহলুদ, ফলগছানো, মধুসংক্রান্তি, গুপ্তধন, যাচাপান এবং আদর সিংহাসন। অর্থাৎ এই বিশেষ দিনে গ্রামীণ বাঙ্গালীর জীবনে ঘরে -বাইরে ছোট বড় নানান উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। গম্ভীরা উৎসবের বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে এ সবেরই অর্ন্তানিহিত যোগসূত্র।

মালদহ জেলার এই বিশেষ জনপ্রিয় লোক উৎসব গম্ভীরা নামে পরিচিত হলেও প্রাচীনকালে এর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বলেছেন যে, গম্ভীর শব্দের অর্থ হল

'প্রকোষ্ঠ'। কিন্তু এই অঞ্চলে আদ্যের গম্ভীরা অর্থে আদ্য বা শিবের গাজনকেই বোঝায় (পৃঃ - ৮০)। আবার শ্রদ্ধেয় হরিদাস পালিত মহাশয় গম্ভীরা নামোৎপত্তির অনুসন্ধানে যে কথা বলেছেন তা হল মালদহ অঞ্চলে চন্ডীমন্ডপকেই গম্ভীরি বলা হত। গম্ভীরা অর্থে আরাধনা ও ধর্ম সংক্রান্ত কোন গৃহবিশেষ। যার আকার চন্ডীমন্ডপের মত। মালদহ, দিনাজপুর এবং রংপুর অঞ্চলে গম্ভীরা চন্ডীমন্ডপ হিসাবেই পরিচিত ছিল। শিবের আরাধনার স্থান ছিল এই চন্ডীমন্ডপ-ই। বর্ধমান জেলায় প্রচলিত রাঢ়ীয় শিবের গাজনে 'গম্ভীরা' অর্থে 'শিবালয়' এই কথাই গবেষক পালিত উল্লেখ করেছেন। ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষের মতে জলপাইগুড়ির 'গম্ভীরা' শব্দটি ক্রমে সংস্কৃত প্রভাবেব বশবর্ত্তী হয়ে গম্ভীরায় পরিণত হয়ে থাকতে পারে। যদিও মালদহের গম্ভীরা লোকনাটকের শাখাভুক্ত আর জলপাইগুড়িব গম্ভীরা নৃত্যবিহীন একক গান।

এক সময়ে গম্ভীরা অর্থে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী আদ্যাদেবীর ভজনগৃহ বোঝাত। সেইজন্য গম্ভীরাকে আদ্যের গম্ভীরাও বলা হয। এই আদ্যা হচ্ছেন অতীশের আর্যতারা, বজ্রতারা, চণ্ডী, বোধিসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রী। এই আদ্যাই পরবর্ত্তীতে শিবের পত্নী, যা আবাব দুর্গা এবং গৌরীতেও রূপান্তরিত গম্ভীরার শিবগড়ার বন্দনায় শূণ্য পুরাণের ধর্মঠাকুরের উল্লেখ মেলে। প্রচলিত একটি গানে -

কোথা হৈতে আইলেন গোঁসাই, কোথায় তোমার স্থিতি,
আহার নাই, পানি নাই, আইসো নিতি নিতি।
জল নাই, স্থল নাই, সকল শূণ্যাকার
কর্পূরেতে ভর কর পবন আহার। (শিবনাথ কি মহেশ)

শূণ্য মূর্তির এই পূজা আসলে সূর্য পূজা এই কথাই অনেকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে থাকেন। শূণ্য মূর্তির অর্থ বা বা বর্তুলাকার যা সূর্য পূজারই নামান্তর। এই শূণ্য বা সূর্য পূজা অন্যত্র চড়ক বা গাজন নামেও পরিচিত হওযার পেছনেও এই সূর্যপ্রতীকই ইঙ্গিত করেছে। চড়কের গাছ পুঁতে তার সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ভক্ত্যার দল ঐ দিনে শূণ্যে বৃত্তাকারে ঘোরেন গবেষকরা এই আচাবকে বর্ষান্তের অবসরে সৌবচক্র সমাপ্তির প্রতীক বলে গণ্য করেছেন। 'চড়ক' শব্দটি 'চক্র' শব্দের বর্ণবিপর্যস্ত উচ্চারনেই গড়ে উঠেছে মনে হয়। আবার গাজন গাছে চড়া-র সূত্র ধরেও 'চড়ক' শব্দটি আসতে পারে। 'শিবের গাজন' - গাজন কথাটির অন্তরালে আছে 'গর্জণ' - যা আবাব শিব নামেরই পরিচয়বাহী। এককালের সূর্যপূজা পরবর্ত্তী সময়ে শৈব ধর্মের প্রভাবে আদিবাসী মানুষের হাতে বিবর্তিত হয়ে গম্ভীরা নাম নিয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া একটা সময়ে গম্ভীরা উৎসবেব স্থানটিকে 'পদ্মফুল' দিয়ে সাজানোর রেওয়াজ ছিল। গম্ভীরা অর্থে পঙ্কজ বা পদ্মফুলকেও বোঝায়।

কথিত আছে যে, এই গম্ভীরা গীতোৎসবের প্রবক্তা ছিলেন দিনাজপুর অঞ্চলের শিবভক্ত বানরাজা। গম্ভীরা বা চড়ক উৎসবের সময় শিবভক্ত এই বাণরাজাকে স্মরণ করেই ভক্ত্যারা পিঠে শূলাবিদ্ধ হয়ে চড়কে ঘোরেন এবং বাণফোঁড়া, কাঁটাঝাঁপ, বটিঝাঁপ এবং উদ্বাহু নৃত্য ইত্যাদি রীতি নীতি পালন করেন।

গম্ভীরা বলতে যদিও সাধারন মানুষ গম্ভীরা গানকেই বুঝে থাকে, কিন্তু আসলে গম্ভীরা গান হল গম্ভীরা উৎসবের একটি অপরিহার্য অংশ। গম্ভীরা উৎসবের মূল দুটি পর্ব একটি

আনুষ্ঠানিক বিধিবিধান পরবর্ত্তীতে পালাগান পরিবেশনা। চৈত্র সংক্রান্তির চারদিন আগে থেকে শুরু হয় উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদিব প্রাসঙ্গিক ক্রিয়াকর্ম। এরপর গম্ভীরা সমাজশাসন বা গ্রামশাসনের নৃত্য গীতময় ভূমিকায় যখন জনতার দরবারে উপস্থিত হয় তখন তার কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা থাকে না। বছরের যে কোন দিনেই গম্ভীরা পালা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

ঘটভরা — গম্ভীরা আনুষ্ঠানিক পর্বের প্রথমদিন 'ঘটভরা'। ঘটভরার দিন গ্রামের সকলে একজায়গায় বসে ঐক্যমত হয়ে একজনকে এই দায়িত্ব দেন। তখন তিনিই মূল ভক্ত। তারপর তিনি গ্রাম প্রধান বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অনুমতিনিয়ে নিকটবর্তী নদী, পুকুর থেকে ঘট জলভর্তি করে আনেন, ঘট ভরার সময ঢাকীরা ঢাক বাজায়। শিব অর্থাৎ কৃষিদেবতার উৎসবের শুরুতে এই 'ঘটভরা' অনুষ্ঠান এক । ;শেষ তাৎপর্যবাহী। ঘট ভর্তি জল গর্ভবতী নারীর দ্যোতক যা মাতৃকা তন্ত্র তথা উর্বরতা তন্ত্রের স্মৃতিবাহী। গম্ভীরায় বা থানে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় জলভর্তি ঐ নতুন ঘট স্থাপন করা হয়। ঘট বসানোর আগে থানের মাটি নরম ঝুরঝুরে করে ধান, গম, যব, সরিষা, তিসি, ধুতুরা, মুগ, মুসুর, কলাই ইত্যাদি শস্যবীজ বপন করা হয। তার ওপর বসে সেই ঘট। আচার অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে গম্ভীরার মন্ডল বা প্রধান ভক্ত শস্য বীজগুলি নিরীক্ষন করে জানান কোন কোন শস্য বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে প্রচলিত শস্য বীজগুলিই চলিত বছরের ফলনদায়ী ফসল।

ছোট তামাসা — গম্ভীরা পূজার দ্বিতীয় দিনে হয় ছোট তামাশা। তামাশা কথার অর্থ মজা, আনন্দ, রঙ্গ রসিকতাপূর্ণ অনুষ্ঠান, এই দিনে শিব-দুর্গাব পূজা হয়। ছোট ছোট বালক ভক্তরা মন্ডপে উপস্থিত হয়। প্রত্যেককে এক পায়ে দাঁড়াতে হয়। প্রধান ভক্ত শিব বন্দনা পাঠ করায়। কোথাও কোথাও উপবাসী ভক্তগন কাঁটার বিছানা করে তাতে গড়াগড়ি দেয। তাই এক পায়ে লাফানো, বাঁশে পা ঝুলিয়ে আগুনে দোল খাওয়া অথবা কাঁটা ঝোপে গড়াগড়ি প্রাচীন জাদুক্রিয়ার অঙ্গবিশেষ বলে ধরে নেওয়া যায়। রাত্রিতে নাচ-গান ও মুখোশ নৃত্ত পরিবেশিত হয়। গান ও নৃত্যের মূল কাহিনী পৌরানিক, লোকায়ত বিষয়বস্তুও স্থান করে নিয়েছে।

বড় তামাশা — গম্ভীরার তৃতীয় দিনকে বলা হয় বড় তামাশা। এই দিন সূর্যোদয়ের আগে 'কিসি' নামক একটি অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় দুজন ভক্ত যৌন প্রক্রিয়াব 'ভঙ্গিতে' একে অপরের উপর লম্বালম্বি সটান গম্ভীরার সামনে মাটিতে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন। তারপর উঠে দাড়িয়ে কয়েকজন মিলে একটি লম্বা বাঁশের মাথায় কিছু কচি পাতা বেঁধে গম্ভীরের চারপাশ ঘুবে দুমড়ে মুচড়ে একবারে বাঁশটিকে ভেঙ্গে ফেলে। বাঁশ অবশ্যই যৌন প্রতীক। তাই পূজার অঙ্গ হিসাবে এইরকম যে কোন আদিম যৌন প্রতীক লিঙ্গ পূজারই ক্রমবিবর্তিত রূপ বলে গণ্য করা হয়। (কোচবিহার, জলপাইগুড়ির কোথাও কোথাও, এবং রংপুরের কোনো কোনো এলাকায় কান্দের তথা কামদেব বা মদনদেব ঠাকুরকে বাঁশের প্রতীকে পূজা করা হয়)। এরপর 'কিসি' বা কৃষি অনুষ্ঠান শুরু হয়। শিবের কাছে চাষবাস সংক্রান্ত আগাম সংবাদ নাট্যাঙ্গিকের মাধ্যমে জেনে নেওয়া কিসির প্রতীকি অনুষ্ঠান।

মশান নাচ — গম্ভীরা উৎসবের চতুর্থ দিনে মশান নাচ দিয়ে আহারা শুরু হয়। এই মশাল দেবতার দ্বিবিধ রূপ। স্ত্রীরূপে কালীর বিভিন্ন প্রতীকে মুখোশ থাকে। তখন কখনও তিনি আলুলায়িত কেশ,সালঙ্কারা, বিরাট টিপ, বিকট-বদনা, আবার কখনও তিনি সিংহ বাহিনী চর্তুভুজা। পদতলে

শিবের শয়ান মূর্তি। আর পুরুষ দেবতারূপে শিব বা শিবানুচর, কখনও বা অপদেবতার প্রতীকে নৃত্যরত। ঢাকীর 'মাতান' বাজনার সাথে সাথে মুখোশের রূপ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। পুরোহিত পূজোর উপচার ধূপ-ধুনা সামনে রাখলে কালী মুখোশ পরিহিতা ভক্ত্যা মাথা ঘুরিয়ে ধোঁয়া গ্রহণ করে শান্ত হয় এবং শেষে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, এরপর ক্লান্ত নর্তক অন্যান্য গম্ভীরায় যায় এবং মহানন্দা , টাঙন অথবা কালিন্দী নদীর জলে স্নান সমাধা করে ঘরে ফেরে। এখানে মশান অর্থে রাজবংশীদের এক অপ্দেবতাকে সন্তুষ্ট করার প্রবণতা বর্তমান। সাঁওতালদের 'মশান' - ও এক অপদেবতা মশানকে জলের অপদেবতা বলে জেলেরা বিশ্বাস করে তাই জেলেদের মধ্যে এই নৃত্যের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়।

বোলবাই/ বোলাই/আহারা — হর-পার্বতীর পূজোর পর ব্রাহ্মন বা কুমারী ভোজন এই অংশের মুখ্য অনুষ্ঠান। আহার থেকেই 'আহারা' এইরকম অনুমান করা হয়। বোলবাহি শব্দটি মাহদহের আঞ্চলিক খোট্টা উপভাষায় আবাহন, আহ্বান করা, বোলানো অর্থে ব্যবহার করা হয়। কাঁচা বাঁশ বা কঞ্চিতে কলার ফুল, আম, বেল, শস্য বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে পূজা হলে আহারা সম্পন্ন হয়। (এগুলি সবই উর্বরাতন্ত্রের সূচক)। এদিন কোথাও কোথাও সঙ বের হয়। গানের আসর বসে। গান রচনা করেন খলিফা যার আরবী অর্থ ওস্তাদ।

ঢেঁকি চুমান বা ঢেঁকি মঙ্গল — ঢেঁকি ধান মাড়াই করার গ্রাম্য প্রথা আর 'চুমান' কথাটির অর্থ - সিন্দুর লিপ্ত করা। চতুর্থ দিনেরই আর একটি অনুষ্ঠান এই ঢেঁকি চুমান। এই দিন সন্ধ্যায় ভক্তগন হলুদ ও সিঁদুরে রঞ্জিত করে নারীদের ওলুধ্বনির মধ্য দিয়ে একটি ঢেঁকি নিয়ে আসে। একজন নারদ সেজে ঢেঁকিতে বসে তারপর সেই ঢেঁকি সহ নারদকে কাঁধে নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করে শেষে ঢেঁকিকে গম্ভীরার প্রাঙ্গনে রাখে। এই সময় মেয়েদের ঢেঁকি মঙ্গল গানে লক্ষ্মীদেবীর আবাহন, শস্যোৎপাদন, গৃহস্থের আবেদন-নিবেদন এবং কল্যান কামনার কথা গানের মাধ্যমে হাজির করা হয়।

সামশোল ছাড়া — চতুর্থ দিনেরই প্রায় বিলুপ্ত একটি প্রথা সামশোল ছাড়া। গম্ভীরার কাছাকাছি কোনও একটি জায়গায় একটি গর্ত খোঁড়া হয়। তাঁর মধ্যে জল দিয়ে একটি জিইয়ে রাখা একটি শোল মাছকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভক্তগন গর্তের এপার ওপার লাফ দিয়ে পার হয়। গর্তের জলে মাছ ছাড়া অবশ্যই যৌনক্রিয়ার প্রতীক। এরপর গর্তের দুদিকে বোলবাইয়ের গুনচিহ্নের মত বাঁশ বেঁধে পোঁতা হয় এবং কণ্টকী ও সিদ্ধিগাছের ফুল তার উপর রেখে ধুনোর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ভক্তরা আড়াআড়ি বাঁশে পা ঝুলিয়ে সাতবার দোল খায়। এর নাম আগুন ঝাঁপ বা পাট ভাঙ্গা। এই রীতি-নীতির সবই আদিম জাদুক্রিয়ার প্রতি বিশ্বাসের অবশিষ্টাংশ। এরপর চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব সাঙ্গ হলে গম্ভীরা পার্বণ তথা আনুষ্ঠানিক দিকটিরও সমাপ্তি ঘটে।

রথাই ব্রত ঃ

রথাই ব্রতানুষ্ঠান মালদহ জেলার প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষীণ স্মৃতি চিহ্ন বহন করছে। আদ্যের গম্ভীরা-র লেখক হরিদাস পালিতের মতে 'রথাই ব্রত' মালদহের প্রাচীনতম উৎসব। এই উৎসব বৌদ্ধদের রথোৎসবের অবসিত রূপ। সে যুগের রথোৎসব আজকের রথাই পরবে পরিণত। বর্তমানে এই ব্রতানুষ্ঠানটি কেবল মাত্র মেয়েদের মধ্যে বেঁচে থাকলেও একসময় এই অঞ্চল যে

বৌদ্ধ অধ্যুষিত এবং রাজানুগ্রহে ঐতিহ্যপূর্ণ ছিল সে কথাও স্মরণ করায়। প্রাচীন রথোৎসবে কুড়িটি রথ বিভিন্ন দেবদেবী এবং ধ্বজ, পতাকা ও মাল্যে ভূষিত হয়ে নগর পরিক্রমা করত। প্রত্যেকটি রথে থাকত সারথীরূপী দন্ডায়মান বৌদ্ধ মূর্তি। রথের মিছিলে অংশগ্রহণ করত ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও শ্রমন প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মানুষ। বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত এই উৎসবে সমস্ত রাত ধরে চলত নৃত্য-গীত ও বাদ্য। প্রাচীন গরিমার সেই কাহিনী ব্রতের আচারের মাধ্যমে মালদহ জেলার নারী সমাজের মধ্যে আজও বেঁচে আছে।

সাধারণতঃ পলিয়া, রাজবংশী, ধানুক, চাঁই সমাজের মেয়েদের মধ্যেই এই ব্রত প্রচলিত। মেয়েরা বৈশাখ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার স্নান করে ঘরের চার পাশে গোবর নিকিয়ে সেখানে আলপনায় রথ আঁকে। অভিমন্যুর সপ্তরথী ব্যূহের অনুকরণে চারদিকে একাধিক রথ এঁকে মাঝখানে একটি বড় রথ আঁকে। মেয়েরা এই আলপনা আঁকা রথাই এর কাছে 'মানত' করে। কেউ আবার সোলার বা চিনির রথ অথবা আকন্দ ইত্যাদি ফুল দিয়েও নানারকম রথ তৈরী করে আলপনার উপর রাখে। তারপর আকন্দ ফুল ও ভেজানো মটর ডালের নৈবেদ্য সহ পূজা সম্পাদন করে। এই 'রথাই' ব্রতের অন্য নাম 'রথ ছরৎ'। এই ব্রতের অন্য কোন দেবতা নেই। 'রথাই' নিজেই এখানে দেবতা।

বৌদ্ধদের সৌরোৎসবের প্রতীকী রথ-যাত্রা বা রথ-উৎসব কতখানি সাধারণীকৃত হয়ে অশিক্ষিত জনজাতি সম্প্রদায় গ্রহণযোগ্য করে নিয়েছে। রথাই ব্রত কথা তার প্রমাণ।

রথাই ব্রত কথার গল্পটি এইরকম। রথাই ও কথাই নামে দুই বোন ছিল। রথাই এর বিয়ে হয় ধনী পরিবারে আর কথাই এর দরিদ্র পরিবারে। কথাই ও তার দিনমজুর স্বামী ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস করে। রথাই এর স্বামী ছিলেন ধনগর্বে গর্বিত অত্যন্ত অহঙ্কারী। তিনি কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। রথাই মাঝে মধ্যে স্বামীকে লুকিয়ে কিছু ব্রত পার্বণ করত। একদিন রথাই তার স্বামী ও পুত্রদের নিয়ে রথ দেখার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। অর্ধেক রাস্তা যেতেই কথাই এর স্বামী ও তিন সন্তান হাত পা ভেঙে রাস্তায় পড়ে রইল। অন্যদিকে রথাই যথাসময়ে ব্রত সমাপ্ত করে রথ দেখতে রওয়ানা হল। তার সঙ্গেই ছিল ব্রতের ঘট। রাস্তায় গিয়ে রথাই ও তার স্বামী পুত্রের দুর্দশা দেখে ঘটের জলের ছিটা দেওয়া মাত্র সকলে সুস্থ হয়ে গেল। তখন অহঙ্কারী রথাই এর স্বামীর দর্প চূর্ণ হল। তিনি তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেন। তারপর বাড়ি ফিরে তিনি রথ ব্রতের আয়োজন করলেন এবং তিনিই হলেন রথাই ব্রতের অন্যতম প্রবক্তা। তিনি বিরাট করে এই ব্রতের আয়োজন করে সবাইকে ডেকে বললেন, দেহতরী সচল রাখতে হলে এবং যে কোন মনোস্কামনার সিদ্ধিলাভে রথাই ব্রত করা একান্ত প্রয়োজন।

কালী পূজার অনুষ্ঠান ঃ

রাজবংশী সম্প্রদায়ের কাছে কালীঠাকুর বিশেষ শক্তিসম্পন্না দেবতা। এদের কাছে শিবের পরেই কালীঠাকুর বিশেষ সমাদর পেয়ে থাকেন। গরামঠাকুরের থানে ধান পোঁতার আগে যে পূজা হয় সেখানে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে কালীঠাকুরাণী সমারোহের সঙ্গে পূজিত হন। বাৎসরিক কালীপূজা ছাড়াও অন্য অসময়ে যেমন গ্রামের ওলাউঠা কলেরা, বা মহামারী ইত্যাদি দেখা দিলে গ্রামের ওঝা বা ' দেউসি' দ্বারা কালীঠাকুরাণীর পূজা করা হয়। দীপাবলীর সময়েও রাজবংশীরা

মহাসমারোহে কালীপূজা করে, কিন্তু গরামঠাকুরের থানে এই পূজা হয়না। অস্থায়ী থান তৈরী হয়। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার রাত্রে রাজবংশীগণ দীপাবলী উৎসব পালন করেন। তাদের নিজস্ব ভাষায় এই অনুষ্ঠানটির নাম 'গছা দেওয়া'। দুই দিনাজপুর ও মালদহ জেলায় এই অনুষ্ঠান হকাহকি নামে পরিচিত। বাস্তুঠাকুরের থানের সামনে চারটি, প্রতি ঘরের দরজার সামনে দুইটি, দেবস্থানেও দুইটি করে কলাগাছ পুঁতে গোবরমাটি দিয়ে সুন্দর করে লেপে দেওয়া হয়। অধিকারী বা পূজক এসে পূজো করেন। সব কয়টি প্রদীপ সারারাত জ্বলে। পরের দিন লোকজন জেগে ওঠার আগেই সকালবেলা কলাগাছগুলি কোনও জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়। এরই নাম গছা দেওয়া অনুষ্ঠান।

কালীপূজা সম্পন্ন হওয়ার পর হকাহকি অনুষ্ঠান। পাটকাঠির গুচ্ছে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। এই সময় 'হুকারে, হুকিরে' ইত্যাদি ছড়া কাটা হয়। বিশ্বাস স্বর্গস্থিত পূর্বপুরুষরা এই আলো দেখে মর্তে আসেন এবং সন্তান-সন্ততিকে আশীর্বাদ করেন।

কালীপূজার মাধ্যমে সমন্বয়ের চিত্র —

রাজবংশী সম্প্রদায়ের কালী সম্পর্কিত ধারণা যে এক সময়ে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, মুসলমান সমাজের আচরিত প্রথায় তার নিদর্শন পাওয়া যায়। মালদহ জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত জহরাতলা গ্রামের কালীর নাম জহরাকালী। জনপ্রবাদ এক সময় জহরা বিবি নামে জনৈকা মুসলমান রমণী এই থানে পূজার প্রচলন করেন।

এখন এটি হিন্দু সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় পূজাস্থল। এখানে এই সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি লক্ষ্য করা যায়। এই জেলার কালিয়াচক থানার জনৈকা মুসলমানীও সারাদিন নিরম্বু উপবাস পালন পূর্বক রাত্রে নিজ বাড়ীতে কালী পুজোর ব্যবস্থা করেন। (পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা/অশোক মিত্র)। এই পূজোয় বিশেষ কোন মন্ত্রের প্রচলন নেই। ধূপ-ধূনা, আতপচাল, চিনি, দুধ, দই, কলা ইত্যাদির সাথে ফুল ইত্যাদির নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজার্থিনী নিজেই পূজাবিধি সম্পন্ন করেন। পূজার সহায়তা দানের জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান ওঝারা আসেন। তারা মাটি দিয়ে একটি সাপের মূর্তি তৈরী করে মনসা বা সাপের দেবীর পূজাও করেন। পূজা শেষ করে তারা বিষনাশক মন্ত্রগুলি একবার দেখে নেন এবং নতুন শিষ্যকে ওঝার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

মালদহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় এই দেবী বিবিধ নামে অভিহিত হন ঃ

থানা	গ্রাম	কালীঠাকুরের নাম
ইংরেজবাজার	শৈলপুর	রাখালকালী
ইংরেজবাজার	জহরাতলা	জহরাকালী
ইংরেজবাজার	সেকেন্দরপুর	রটন্তীকালী
পুরাতন মালদহ	রসিলাদহ	সর্বমঙ্গলাকালী
হবিবপুর	বাণপুর	ঝাপড়ীকালী
মানিকচক	মথুরাপুর	বুড়ীকালী
খরবা	মহানন্দপুর	শ্মশানকালী

খরবা	কোবইয়া	রক্ষাকালী
গাজোল	কাস্তোর	গ্রামকালী, বসতিকালী,
বামনগোলা	সিমলা	ঝাপড়াকালী, তারাকালী

আমাতি উৎসব ঃ

সাধারণত হিন্দুর বিধবারা যে অম্বুবাচী ব্রত পালন করে থাকেন তাই রাজবংশীদের আমাতি উৎসব। কেউ কেউ এটিকে 'আমৈৎ' বলেও অভিহিত করেন। মালদহ এবং দিনাজপুর জেলার রাজবংশীগণই এই উৎসব বেশী পালন করেন। এই অনুষ্ঠানে ঘরের বাইরের দেওয়াল গোবর দিয়ে সাপের মাথার মত তৈরী করে ও একটি পিণ্ড তৈরী করে তাতে একটি পেঁয়াজ গেঁথে দেওয়া হয়। কেউ কেউ ঘরের দরজায় নিম গাছের ডাল ঝুলিয়ে দেন। এগুলি সবই কাল্পনিক ভাবনা, যার মধ্যে রয়েছে সর্পভীতি। বিশ্বাস এই যে এর ফলে বাইরের সাপ ঘরের ভিতর প্রবেশ করতে পারবে না। আরও বিশ্বাস এই যে, অম্বুবাচীর দিনযত ফোঁটা বৃষ্টি পড়বে সাপের ডিম থেকে তত বাচ্চা ফুটবে। এই দিনের প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা কোনও সাপের মাথায় পড়লে সাপের মণি জন্মায় এবং মানুষের মাথায় পড়লে মোতিয়াবিন্দ নামে চোখের অসুখ হয়ে থাকে। আমাতির দ্বিতীয় দিনটিকে মালদহে 'বড় আমেত' বলা হয়। এই দিনে উপবাসকারিনী রমণী স্নান করে কচুর পাতায় দুধ, খৈ, আম ইত্যাদি ফল বাস্তু দেবতার মন্দির, তুলসী মণ্ডপ ইত্যাদি জায়গায় রেখে দেন। উদ্দেশ্য সর্পদেবতাকে সন্তুষ্ট করা।

আমাতি অনুষ্ঠান মালদহ ইত্যাদি অঞ্চলে প্রচলিত হওয়ার প্রাথমিক কারণ এই জেলা জল-জঙ্গলে ভরা সাপের উপযুক্ত বাসস্থান। দ্বিতীয়ত অম্বুবাচী প্রজননী শক্তির পূজা। সাপও প্রজননেব একটি বিশিষ্ট প্রতীক।

বিষহরী দেবতার পূজা অনুষ্ঠান ঃ

উত্তরবঙ্গের সর্বত্র, মালদহে ব্যাপকভাবে যে দেবী জনপ্রিয়তার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন তিনি দেবী মনসা। রাজবংশীয়দের কাছে ব্যাথা বিষহরণ করেন যে দেবতা তিনি বিষহরী।

মহাভারতে মনসা নামে কোন চরিত্র নাই। বেদ ইত্যাদি আর্য গ্রন্থে মনসা নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলাদেশে প্রচলিত মনসা পূজার ধ্যানের মন্ত্রে বিষহরী নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

বন্দে শঙ্কর পুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদভবাং জাঙ্গুলীম্।।

এই মন্ত্রে মনসার বিষহরী, জাঙ্গুলী ইত্যাদি নামের উল্লেখ দেখতে পাই। তন্ত্রাচারী মহাযান বৌদ্ধদের এক দেবীর নাম জাঙ্গুলীতারা। এই দেবীর বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় বৌদ্ধ সাধনাগ্রন্থ 'সাধনমালায়'। এই দেবতার সঙ্গেই বাংলাদেশে পূজিতার সাযুজ্য লাভ করা যায়। রাজবংশী সম্প্রদায় যে বৌদ্ধ রীতি নীতিগুলির ধারক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গম্ভীরা গানের মত বিষহরী অনুষ্ঠানেরও দুটি দিক। একটি আচার অনুষ্ঠানের, অন্যটি মনসা পালাগানের। এই দুটিই অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। বিষহরী যা মনসা পূজা নাম নিয়ে সর্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করেছে অন্যদিকে মনসার পালা বা ভাসান গান, রাম কাহিনী

/ রাম যাত্রার মতই বাঙ্গালী মনকে প্রভাবিত করেছে। তাই একাধিক মঙ্গলকাব্য যেমন, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, কপিলমঙ্গল প্রভৃতি অসংখ্য মঙ্গলকাব্যের ভীড়ে মনসামঙ্গলের স্থান বরাবরই স্বতন্ত্র। এমনকি পরবর্তীকালের কবি শিল্পীদেরও এই কাহিনী প্রভাবিত করেছে যথেষ্ট পরিমাণে। কোন কোন চিন্তাবিদ তাই মনসামঙ্গলকে জাতীয় কাব্যের মর্যাদা দিতে চান।

'বিষহরী ' পূজার আচারগত দিক — উত্তরবঙ্গের রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় সমাজে বিষহরী ঠাকুরাণীর দ্বিবিধ পূজা পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়। একটি হল গৃহস্থের সর্বপ্রকার কল্যাণের জন্য দেবতার পূজার্চনা করা। কেউ কেউ এর জন্য মানসিক করে রাখেন। এই পূজার জন্য নির্দিষ্ট কোন দিন থাকে না। তবে সাধারণত আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি শ্রাবণ এবং ভাদ্র পর্যন্ত এই পূজার উৎকৃষ্ট সময় বলা যেতে পাবে। প্রত্যেক রাজবংশীর বাড়ীর বাইরে উত্তর বা পূর্ব দিকে মা বিষহরীর থান বা মন্দির থাকে। মন্দির না থাকলে তুলসী তলা বা অন্যেব মন্দিরেও পূজো দিয়ে আসা যায়। এই পূজোর উপকরণে তেমন কোন বৈচিত্র্য নেই। বৈচিত্র্য যেটুকু তা হল ঐ 'ভোগা' প্রক্রিয়ায। সাধারণত কাঁচা দুধ, কলা, চিনি, আতপচাল অথবা চিড়ার নৈবেদ্য দেওয়া হয়। 'ভোগা' হল পায়রার বলি দেওয়ার পদ্ধতি। পায়বাকে বলি দিয়ে তার মাথাটি থানের মধ্যে স্থাপন করে ঘি বা সরষের তেল দিয়ে সাদা কাপড় ভিজিয়ে মাথার উপর দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াটির নামই 'ভোগা'। এই সব পদ্ধতিই তন্ত্রচারী বৌদ্ধ প্রথার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অধিকারী বা 'ওঝা' সম্প্রদায়ই এই পূজা সম্পন্ন কবেন। ভক্তদের কাছে এই দেবী বিষহবী নামে জনপ্রিয় হলেও ওঝা বা পুরোহিতদের কাছে তিনি 'বর্মাণী' অর্থাৎ ব্রাহ্মণী এবং ভগবতী বলে পরিচিত। পৌরাণিক গল্প অনুযায়ী এই দেবীর একটি চোখ কানা হওয়ায় তিনি 'কানী বিষহরী' নামেও পরিচিত। এছাড়া 'শুকল' নামেও এক ধরনের সাধারণ পূজা প্রচলিত আছে। শুক্লপক্ষে এই পূজা হয় বলে এই ধরনের নাম হতে পারে। আবার শ্বেতপুষ্প এই পূজায় অপরিহার্য বলেও এই ধরনের নাম হতে পারে।

এছাড়া আছে 'গীদালী' পূজা পদ্ধতি। বিশেষ কোন মানসিক থাকলে বিবাহের সময় এই পূজা দিতে হয়, অথবা বিবাহ হয়ে যাবার পর শ্বশুরবাড়ি থেকে বধূসহ বর এলে এই পূজা ও পালাগানের ব্যবস্থা কবা হয়। বর্হিবাটিতে যে মনসা মন্দির থাকে তার সামনে অথবা মা বিষহরীর মাটির মূর্তি নির্মাণ করেও পূজা সম্পন্ন হয়। পূজার দিন অধিকারী এসে পূজা কাজ সম্পন্ন করেন। গীদালী বিযহরী পূজার একটি প্রধান অঙ্গ হল মনসার ভাসান গানের ব্যবস্থা করা।

গীদালী নামটির প্রয়োগ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, রাজবংশী ভাষায় গায়ককে বলা হয় গীদাল; সুতরাং গায়িকা গীদালী অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত। আবার গীত থেকে গীদ বা গীদালী এমনটিও হতে পারে। অর্থাৎ বিষহরীর যে পূজায় গীত বা পালাগানের ব্যবস্থা থাকে তাকেই গীদালী বলা যায়।

বিবাহেব সময় গীদালী পালাগানের বিশেষ আয়োজনের তাৎপর্যটুকু এই হতে পারে যে, ভবিষ্যৎ সাংসারিক জীবনে মা মনসার কৃপাদৃষ্টি লাভ করা। লক্ষ্মীন্দর বেহুলার মত নব দম্পতির ভাগ্য যেন বিঘ্নিত না হয়, মনসার আশীর্বাদে তারা যেন সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করতে পারেন ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, বিষহরী সর্পদেবতা, আর সাপ প্রজননের প্রতীক। সুতরাং রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে সন্তান লাভের মাধ্যমে শ্রীবৃদ্ধি কামনাও সংগুপ্ত থাকতে পারে।

মনসার পালাগান :

মনসা পূজোর চেয়ে মনসার পালাগান অংশটি অধিক জনপ্রিয়। এটি এখন আব কোন জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অন্যতম ঐতিহ্যময় লোক সংস্কৃতিশালায় পরিগণিত হয়েছে। মনসার সাথে গানের এই আন্তরিক সাযুজ্যের পেছনে অপামর জনসাধারণের ভক্তির আকৃতি সঙ্গীতের মাধ্যমে দেবীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহ রয়েছে। এছাড়া সঙ্গীতে দেবীর সঙ্গীতানুরাগের কথা জানা যায় সংস্কৃত একটি শ্লোকে। বৌদ্ধদের 'সাধনমালা' গ্রন্থে দেবীকে ময়ূরপুচ্ছ লেখনীহস্তা যেমন বলা হয়েছে তেমনি সিতরত্নালঙ্কার ভূষিতাং জীনাং বাদয়ন্তীম বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধদেবী মাঙ্গুলীর সঙ্গে আরও মিল রয়েছে যেমন, জাঙ্গুলী দেবীর বাহন হংস, সরস্বতী দেবীর বাহনও হংস। প্রাচীন ভাস্কর্যে উভয়েই চর্তুভুজা। শুক্ল পূজার একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে —

স্বর্গ হইতে নামো ব্রাহ্মণী মাও,
হংসের পৃষ্ঠে দিয়া পাও।

সরস্বতীর সঙ্গে এই ভাবসাযুজ্যের জন্যই মনসা পূজার সঙ্গে পালাগানের অংশটি জড়িয়ে গেছে।

মনসার ভাসান গানে প্রচলিত কাহিনীগুলিই পরিবেশিত হয়। যেমন, মর্ত্যলোকে মনসার পূজা প্রচারের প্রচেষ্টা, চাঁদ সদাগরের সঙ্গে বিরোধ, চাঁদ সদাগরের উপেক্ষায় মনসার বিশেষ ক্রোধ, ফলে চাঁদ-সনকার ছয় পুত্রের জীবনহানি, এরপর কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ, বিবাহবাসরেই সর্প দংশনে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু, মৃত স্বামীর শবদেহ নিয়ে বেহুলার যাত্রা, নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও বেহুলার প্রচেষ্টায় লক্ষ্মীন্দরের পুনর্জীবন লাভ। এরপর বেহুলার অনুনয়ে চন্দ্রধর কর্তৃক মনসার পূজা, হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচার।

উত্তরবঙ্গে সাধারণত জগজ্জীবন ঘোষালের লেখা পালাগান পরিবেশিত হতে দেখা যায়। যদিও ব্যক্তিগত রচনাংশও প্রয়োজনে প্রয়োগ করেন কোন কোন পালাকার। তাই অন্যান্য ধর্মনাট্যের মত এই নাট্যের গঠনে ও রূপায়ণেও একপ্রকার শিথিলতা, স্থূলতা ও অনাটকীয়তা দেখা যায়। কৃষি ও শ্রমজীবী মানুষের নিজস্ব সম্পদ এই মনসাযাত্রা। অতীতে এগুলি আসরে বসে একক নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমেই রূপায়িত হতো, কিন্তু বর্তমানে এগুলো আসরে একাধিক রাত্রিতে নাট্যাভিনয়ের আঙ্গিকেই পরিবেশিত হচ্ছে।

শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে মালদহের শিমলা গ্রামে মনসা পূজা হয়। কচুপাতায় দুধ ও খৈ দিয়ে এই পূজো হয়। এছাড়া গম্ভীরা ঘরেও মনসা পূজা হয়। উপকরণ হিসাবে আতপ চাল, কলা, বিবিধ ফলমূল, পায়রা ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। পূজারী হন ব্রাহ্মণ। এই দিন সাপের ওঝা বা গুণীন নতুন শিষ্য গ্রহণ করেন।

আকলাই নেওয়া :

সমগ্র উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে যে অনুষ্ঠান দুটির নাম 'ধানের ফুল আনা'

এবং 'নয়াখই', মালদহ অঞ্চলে সেই অনুষ্ঠানেরই নাম 'আকলাই নেওয়া'। ধানের ফুল আনা অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ধান্যচ্ছেদন এবং 'নয়াখই' অর্থাৎ 'নবান্ন' কৃষিকৃত্য দুইটি পরস্পরের পরিপূরক। সাধারণভাবে কার্ত্তিক মাসের শেষের দিকে ধানের ফুল আনা হয়ে থাকে। কেননা অঘ্রান মাসের প্রথম দিনটিতেই সাধারণত রাজবংশীদের ঘরে নবান্ন প্রতিপালিত হতে দেখা যায়।

একজন কৃষক কাঁসার থালায় সময়োচিত ফুল, একটি মাটির প্রদীপ ধূপ এবং কাস্তে নিয়ে ক্ষেতে গিয়ে তিন-চারটি ধানের থোকা সুতো দিয়ে একসাথে বাঁধে এবং সেখানকার নীচের মাটি পরিষ্কার করে প্রদীপ এবং ধূপ জ্বালিয়ে দেন। প্রণাম করে ধানের গুচ্ছগুলি থেকে অধিক ফলনযুক্ত তিনটি বা পাঁচটি শিস ডান হাতে নিয়ে কাস্তের সঙ্গে কলার পাতায় মুড়েআবৃত করেন এবং অন্য একটি ধানগাছের গুচ্ছ আলাদাভাবে লাল গামছা বা শালু কাপড়ে ঢেকে রেখে দেয়। এইভাবে ধানের গোছাগুলি থালায় সাজিয়ে কৃষক গৃহে ফেরেন। বাড়ীতে তাকে উঁচু পিঁড়িতে বসিয়ে পা ধুইয়ে দিয়ে কপালে সিঁদুর ফোঁটা ও মাথায় ধানদূর্বা দেওয়া হয়। এরপর থালাতে রাখা ধানের গুচ্ছ থেকে চারা বের করে চণ্ডীমণ্ডপে রাখা হয় এবং কলার পাতায় ঢাকা শিসগুলি গোলাঘরে রেখে দেওয়া হয়।

নতুন ধানের চাল বের করে তা রান্না করে আনুষ্ঠানিকভাবে খাওয়ার রীতি রেওয়াজকে বলে নয়াখই বা নবান্ন।

লখী ডাক ঃ ডাক দেওয়া ঃ

রাজবংশী সম্প্রদায় আশ্বিন সংক্রান্তির সন্ধ্যায় উকা পাট (পাটকাঠি) জ্বালিয়ে ক্ষেত ও অন্যান্য শস্যক্ষেত্রে ঘোরায় এবং ছড়া কেটে কেটে বেশী ফসলের প্রার্থনা জানায়। এই আচার-অনুষ্ঠানকে তারা 'লখীডাক' বলে। অপদেবতা আগুনকে ভয় পায়। এই বিশ্বাস সুপ্রাচীন কাল থেকেই সাধারণ লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত। শস্য অনিষ্টকারী অপদেবতার হাত থেকে শস্য রক্ষার আন্তরিক ইচ্ছাই এই রীতি আচারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

চাঁই সম্প্রদায়ের আচরিত অনুষ্ঠান ঃ

সোনারায়ের পূজা/ভালভুলি/কুলের মাগন/পৌষ মাগন ঃ

মালদহের কৃষি কেন্দ্রিক চাঁই সমাজে সোনারায়ের পূজার প্রচলন আছে। "সোনারায় বাঘের দেবতা । বাঘের সঙ্গে গোরুর চিরদিনের শত্রুতা। আজ বাঘ গরুর শত্রুতার কথা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এই গো কুলকে রক্ষা করতে গিয়েই মানুষ ব্যাঘ্র দেবতা সোনারায়ের পুজো করিয়াছে।"

কৃষিকেন্দ্রিক চাঁই সমাজেই এই সোনারায়ের পূজার প্রচলন আছে। তবে যে সমস্ত রাখাল বালক মাঠে গরু চরায় তাদের মধ্যেই সোনারায়ের পূজো দেওয়ার প্রবনতা বেশী। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে মাঠে এই পূজোর আয়োজন করা হয়। এরজন্যে সারা পৌষ মাস জুড়ে রাখাল বালকেরা সন্ধ্যে বেলা সোনারায়ের মাহাত্ম্য ব্যাঞ্জক গান করতে করতে গ্রামের বাড়ী বাড়ী যায় ও অর্থ সংগ্রহ করে। এই গানেরও নিজস্ব রীতি আছে। একজন মূল গায়ক সোনারায়ের পালা গান করে ও

অন্যান্যরা তার ধূয়া ধরে, শ্রুতিমধুর এই গানের ভাষা কিন্তু চাঁই ভাষা নয়। সোনারায়ের গানকে চাঁই সমাজে 'ভালভুলি' বলে। সোনারায়ের পূজোতে নারীরা কোন অংশগ্রহণ করে না।

শুধু চাঁই সমাজেই নয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত। তখন এটি কুলাই এর মাগন বা কুলের মাগন নামে জনপ্রিয়। পৌষ মাসে আমন ধান উঠে যাবার পর গ্রামস্থ বালকেরা সকল বাড়ী গিয়ে চাল, ডাল, সব্জি ইত্যাদি সংগ্রহ করে। তারপর পৌষ-সংক্রান্তির দিন মাঠের মধ্যে কুলাই-এর মূর্তি গড়ে ঘটা করে পূজা করে, রান্না করে ও সবাই মিলে প্রসাদ ভক্ষণ করে। কুলাই-এর নামে এই মাগন হয় বলে একে কুলাই-এর মাগন এবং পৌষ মাসে এই মাগন হয় বলে একে পৌষমাগনও বলা চলে। একসময় সোনারায়ের পূজা যে খুব ধূমধামের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হত কাগাচিড়া গ্রামের সোনারায়ের মন্দির ও মালদহ মিউজিয়ামে সোনারায়ের প্রস্তর মূর্তি তার সাক্ষ্য বহন করে। এই মূর্তিটি প্রায় হাজার বছরের পুরানো। বহু বিশেষজ্ঞ-ই এই মূর্তিটিকে সোনারায়ের প্রাপ্ত প্রাচীনতম মূর্তি বলে গণ্য করেন। এই মূর্তিই সোনারায়ের এক সময়ের জনপ্রিয়তার কথা নিরুচ্চারে ঘোষণা করে।

সোনারায়ের যে সমস্ত গান মেষবালক বা অন্যান্যদের মুখে শোনা যায় তা থেকে তার যে আমরা পরিচয় পাই তাতে বোঝা যায় তিনি ধর্ম ঠাকুর এবং এক গোয়ালিনীর সন্তান। গোয়ালিনীর সন্তান ব্যাপারটি সেন পাল আমলের বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে সোনা কৃষ্ণ, তার ভাই রূপা বলরাম। তাঁরা দুই ভাই মৈষাল বৃত্তি অবলম্বন করেছেন। পালায় ননি চুরী থেকে শুরু করে ষোলশো গোপিনীর সাহচর্য পর্যন্ত কৃষ্ণ কেন্দ্রিক অনেক বৃত্তান্তই এই পালায় আছে। সোনারায়কে মহাদেবের ধারাও অনুসরণ করতে দেখা যায় একাধিকবার। ভাঙ, ধুতুরা, গাঁজা - ইত্যাদি নেশাতেও তিনি পটু। মালদহের শিব ধর্মের প্রভাবও অনায়াসে ঢুকে পড়েছে এই মেঠো সঙ্গীতের মধ্যে। আবার ধর্ম ঠাকুরের নামে প্রচলিত বহু গল্পের আংশিক প্রচলন এই গানের কাহিনী বৃত্তে আছে। নাথ সম্প্রদায়ের গোরক্ষনাথের বিবরণীও বাদ যায়নি। আসলে জীবন ও জীবিকায় ভারাক্রান্ত সাধারণ মানুষের আনন্দদায়ক এই গান বা ব্রত যে কোন সম্প্রদায়ের বাধা নিষেধের বেড়া টপকে গেছে।

'সোনা' এই নামটি এইরকম একটি মিশ্র দেবতার উপর কিভাবে আরোপিত হল, সে প্রশ্ন সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করেন একসময় হয়ত ঐ নামে কোন ভূস্বামী ছিলেন। যিনি একাধিক গরুর মালিক অথবা গরু কেন্দ্রিক কোন বিশেষ রীতি বা রীচ্যুয়ালে বিশ্বাস রাখতেন। মালদহে এখনও 'সোনারায়ের গড়' নামে একটি অঞ্চল আছে। উল্লেখযোগ্য যে এই দেবতা তার বিশেষ অভিজ্ঞানেই সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এর মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম, মানসিকতার এক অভিনব জটিল জাল অন্তরীণ রয়েছে। ---- অনুষঙ্গ এই দেবতার ক্ষেত্রে এতদূর পর্যন্ত ব্যপ্ত যে, সোনারায়ের মূর্তি প্রকরণেও তার প্রতিফলন ঘটেছে; সোনারায়ের দেহবর্ণ গাঢ়নীল, রূপরায়ের হলুদ, এই গাত্রবর্ণই কৃষ্ণ এবং বলরামের স্মৃতি চিহ্ন স্মরণ করায়।

আগজী পূজা :

সাধারণত চাঁই সমাজে দোল পূর্ণিমার সূর্যোদয়ের আগে আগজী পূজা বা অগ্নিপুজো করা হয়। (অনেকটা দোল উৎসবের আগে নেড়া পুড়ানোর মত)। কোথাও কোথাও এই অনুষ্ঠানে

পুরোহিত আসেন কোথাও আসেন না, সেখানে উপস্থিত পুরুষেরাও এই কাজ করে। গ্রামের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় খড় দিয়ে একটি মন্দির আকারে গড়া হয়, সেখানে গ্রামের মেয়েরা মালপোয়া,ধূপ, সিঁদুর, পান, সুপারী ইত্যাদি দিয়ে ডালা সাজিয়ে নিয়ে যায়, পুরোহিত এইসব উপকরণ দিয়ে মন্দিরে অগ্নিদেবের পূজা করেন। এই উৎসবে কোন মূর্তির প্রচলন নেই। ভক্তরা হোলীর গান করে ও পূজা স্থানকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। এরপর পূজারী নির্মিত মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেন। আগুন নিভে এলে পূজোর প্রসাদ নিয়ে সবাই ভাগাভাগি করে খায়। এই পূজোয় পুরোহিত নতুন কাপড় ও দক্ষিণা পান। এই উৎসবকে ক্ষেত্র প্রস্তুতির অনুষ্ঠানও বলতে পারি।

ডোরা বাঁধা ঃ

ডোরা বাঁধাও চাঁই সমাজে প্রচলিত একটি অনুষ্ঠান। এটি অনুষ্ঠিত হয় দোলের পরের দিন। এটি কেবলমাত্র নারীদেরই অনুষ্ঠান। গ্রামের সমাজপতির বাড়ীতে আয়োজন হয়। পৌরোহিত্য বা মুখ্য ভূমিকায় থাকে সমাজপতির মহিষী। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীর গৃহবধূরা মালপোয়া, ধান, দূর্বা, পান, সুপারী, সিঁদুর, ধূপ, ডোরা (রাখীর মত) এই সব দিয়ে পূজা উপাচরের ডালা সাজিয়ে পূজার নির্দিষ্ট জায়গায় যায়। পূজাস্থানটিকে গোবর দিয়ে উত্তমরূপে নিকানো হয়। তারপর নিকানো স্থানের মধ্যিখানে আলপনা দিয়ে পূজোপকরণগুলি সাজিয়ে রেখে পূজা করা হয়। পূজা শেষে কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে তিনটি দাগ কেটে ধরিত্রীকে ত্রিধা বিভক্ত হতে বলে; যেন সমাজে ও পরিবারে বসবাসকারী প্রত্যেকটি মানুষের পারস্পরিক মনোমালিন্য ও মনের কলুষগুলি ধরিত্রীর মাঝে প্রবেশ করে তাদের কলুষমুক্ত করে। এরপর একে অপরের হাতে 'ডোরা' বাঁধে। ঠিক তিনমাস পরে প্রথম রবিবারে এই 'ডোরা' খোলা অনুষ্ঠান হয়। দোলের ঠিক পরদিন নারীদের আচরিত এই অনুষ্ঠান সমাজ বন্ধনের দিক থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

জঙ্গল থাসা ঃ

চাঁই সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হল 'জঙ্গল থাসা'। অগ্রাণ মাসে কেবল নারীরাই এই অনুষ্ঠান পালন করে। এটি মূলত লক্ষ্মী পূজো, শস্যক্ষেতেই হয়। পরপর তিন দিন নারীরা সন্ধ্যায় মাঠে গিয়ে সমবেতভাবে গীতের মাধ্যমে লক্ষ্মীদেবীকে আহ্বান জানায়। চতুর্থ দিন গীত গাওয়া বন্ধ থাকে। তারপর পঞ্চম দিনে সন্ধ্যায় পূজোর ব্যবস্থা হয়। এই পূজোয় কোন প্রতিমা, পুরোহিত বা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয় না। পূজো শেষ করে পিঠে তৈরী করে সবাই প্রসাদ খায়। চাঁই ভাষায় মাড়ানো অর্থে 'থাসা' শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাই এই অনুষ্ঠানের নাম 'জঙ্গল থাসা'। ভাল শস্য বা ধন-ধান্যের কামনাতেই এই অনুষ্ঠান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

উল্কা উৎসব ঃ

উল্কা উৎসব চাঁই সম্প্রদয়ের একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও অংশ গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠান হয় কালীপূজোর দিন অমাবস্যার রাত্রে। পাঁচটা মাটির ঘট যাকে বলে 'চুক্ই', এতে থাকে পাঁচ ভাজা (ধানের খই, ভুট্টার খই, ভ্যাটের খই, ছোলা ভাজা আর মুরকি)। এগুলি দিয়ে ঘট ভর্তি করে তার উপর যে কোন বাতাসা জাতীয় মিষ্টান্ন দিয়ে গোঁসাই ঘরে (চাঁই সমাজের বাস্তু ভিটে বা পূজোর ঘর) বসুধারার কাছে রাখা হয়। মানকচুর

পাতায় কাজল পেতে সকলের চোখে পড়ান হয়। চুকই-এর পাঁচটি প্রদীপ জ্বালানো হয়। অমাবস্যা লেগে কালী থানে ওঠার পর চুক্ই-এর সমানের প্রদীপ থেকে পাটকাঠি জ্বালিয়ে কালীকে দেখিয়ে আসে ছেলে-মেয়েরা। তারপর পাটকাঠির আগুন নিয়ে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্রে, উদ্যানে আলোক প্রদর্শন করে। এই অনুষ্ঠানে কেবল বারো বছরের নীচের ছেলে মেয়েরাই অংশ গ্রহণ করে। তারা আগুন নিয়ে 'হুকারে! হুকিরে ! পোকা মার রে বলে' ছড়া কাটে। মা কালীর মাহাত্ম্য দিয়ে ফল, মূল ও শস্যাদিতে কীট পতঙ্গের অত্যাচার দমনের প্রার্থনাই এই উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এই সব ছেলে মেয়েরা আগুন দেখিয়ে গৃহে ফিরে এলে তাদেরকে বরণ করা হয়। একেও 'চুমান' অনুষ্ঠান বলে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের হিন্দু কৃষকদের মধ্যেও এই উৎসব পালন করতে দেখা যায়।

মাছ ধরা উৎসব ঃ

প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে চাঁই সম্প্রদায়ের পুরুষরা মাছ ধরা উৎসব পালন করে। এই উৎসব মালদহে এক সময় খুব জমজমাট ছিল, কারণ মালদহের বেশীরভাগ অঞ্চলই ছিল খাল, বিল, দহ, পুকুর, নদীতে পরিপূর্ণ। এদিন মাছ ধরার যন্ত্রপাতিকে মঙ্গল চর্চিত করে দলবদ্ধভাবে পুরুষরা নানা প্রকার মাছধরে। তারপর ধৃত মাছের নানা ব্যাঞ্জন দিয়ে পারিবারিক ভোজ সমাধা করে।

সত্যনারায়ণ পূজা অনুষ্ঠান ঃ

চাঁই সমাজে সত্যনারায়ণ পূজার ব্যাপক প্রচলন আছে। এদের বাস্তু দেবতার মধ্যে পাঁচ পীরকেই এরা বেশী প্রাধান্য দেয়। মুসলমান আমলে চাঁই সমাজের ধর্মান্তরীকরণ-ই এই পীর পূজার পেছনে সক্রিয়। সমগ্র বৈশাখ মাস চাঁই সম্প্রদায়ের পবিত্র মাস। এই সময় প্রায় প্রতি সম্পন্ন গৃহে সত্যনারায়ণ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া গৃহে কোন অনুষ্ঠান হলে সত্যনারায়ণের পূজা অবশ্য পালনীয়।

জিতাষ্টমী ব্রত ঃ

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে পালন কবা যায়। "যে নারী বা পুরুষ এই ব্রত পালন করেন, তাঁহার মনের সকল বাসনা অচিরে পূর্ণ হইয়া থাকে । হে-অন্তে ব্রতী দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন।" পুত্রের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনায় সন্তানেব মা অহোরাত্র নির্জলা উপবাস করে এই ব্রত পালন করেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মালদহের চাঁই সমাজে এই ব্রত পালন করেন। কারন "প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে জীমূত বাহনের পূজা করিলে সন্তান সন্ততি দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।"

সন্তানের মঙ্গল কামনায় সধবা নারীরা এই ব্রত করলেও কোথাও কোথাও স্বামী-স্ত্রী একত্রেও এই ব্রত পালন করে থাকেন। বাড়ির উঠোনে ছোট পুকুর কেপে তার মাঝখানে বেল গাছের ডাল ও কলাগাছের চারা পোঁতা হয়। সারাদিন উপবাসী থেকে সন্ধ্যাবেলায় জীমূত বাহনের পূজো করতে হয়। এই ব্রতের উপকরণ হল ঃ বাঁশপাতা, তিল, হরিতকী, মটর বা কলাইভেজা, শসা, বিবিধ ফুল ও ফল, আলোচাল, ধূপধূনা ইত্যাদির নৈবিদ্য। সন্ধ্যাবেলা ব্রত পালনের পর ব্রতীরা ব্রত কথা শোনে। এরপর ব্রতী প্রসাদ গ্রহণ করে ও সকলকে প্রসাদ বিতরন

করে। এই ব্রত আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করলে বন্ধ্যা নারীরও সন্তান হয় এমনটিই বিশ্বাস।

জিতাষ্টমীতে চাঁই সমাজে বেশ কয়েকটি উপভোগ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে বৌ-পাতানো এবং পুতুল কনে ভাসানো উল্লেখযোগ্য। এই অনুষ্ঠানের জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাপড় দিয়ে বাহারী সব কনে পুতুল তৈরী করে। তারপর চাল, গুড়, শসা, আখ, ফল, মূল দিয়ে ডালা সাজিয়ে তাতে নিজেদের কনে পুতুল নিয়ে নিকটবর্তী কোন জলাশয়ের কাছে যায় সেখানে ছেলেরা কলা গাছের বাগুড়ি দিয়ে তৈরী একটা ছোট নৌকা নিয়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা করে। নৌকাটিকেও ফুল, পাতা, রঙীন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়। এই নৌকোয় মেয়েরা তাদের পুতুল গুলিকে আলাদা আলাদা করে বসিয়ে দেয়। মেয়েরা সমাবেত ভাবে গান গায়। ছেলেরা পুতুল কনেদের নিয়ে বহিচ্ খেলায়। তারপর দিনের শেষে নৌকা সহ পুতুল কনে গুলিকে জলে ডুবিয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের পর মেয়েরা তাদের ডালায় খাবার গুলি সকলকে ভাগ করে খাওয়ায় এবং নিজেরাও খায়। মেয়েদের গীত গানটি এইরকম -

ক্যানিয়া গে গুড়িয়া গে -
ম্যাট্রিক ত্যাল ত্যাল যাইহ্যান গে,
ও খড়ি দেব্যাও, স্যাম্যাট দেব্যাও
চূড়া কুট কুট, খাইহ্যান গে।

অর্থ -

হে পুতুল কনে
তুমি মাটির নীচে নীচে যেও
(তোমাকে) উদু খল এবং তার দন্ড দিব
(তুমি) চিড়া কুটে কুটে খেও।
(তুমি) তোমার মায়ের জন্যে কাঁদিও
তোমার বাবার জন্যে কাঁদিও
(কিন্তু) আমার জন্যে কাঁদিও না।

এই পুতুল কনে ভাসানোর পেছনে অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়ে যাওয়া, বিশেষ দরিদ্র পিতা-মাতার মেয়েরা বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ি বাপের বাড়ি দুটির আশ্রয়ই অনিশ্চয় হয়ে ওঠে তাদের মনোবেদনাই এই অনুষ্ঠানের পেছনে কার্যকারী পেছনে কার্যকারী হয়ে থাকতে পারে। যদিও সাম্প্রতিক কালে এই উৎসবের তেমন প্রচলন নেই।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আচরিত অনুষ্ঠান ঃ

বাহা উৎসব ঃ

মালদহ জেলার গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা ইত্যাদি থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি জনজাতির বাস। এই সাঁওতালরা সরল, সাদাসিধা, সৌন্দর্যপ্রিয় জাতি। এই সম্প্রদায়ের কাছে 'উৎসব' জীবনেরই অন্য নাম। প্রতিটি উৎসবের পিছনে থাকে জীবনকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা। প্রাচীন রীতি নীতি জীবনকে ধরে রাখবার সচেতনতা আর নিজেদের মিলিয়ে দেবার ঐকান্তিকতা।

'বাহা' ঋতুরাজ বসন্তের উৎসব। বসন্তের আগমনে গাছের প্রতিটি শাখায় নতুন পাতার সমারোহ দেখা দেয়। সমস্ত প্রকৃতি সৃষ্টির আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সময় সাঁওতালরা 'বাহা' উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির দেবী 'জাহের এরা'কেপূজা করেন। সাঁওতালদের কাছে এটা অতি পবিত্র উৎসব।

ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথি থেকে 'বাহা' পরব আরম্ভ হয়। উৎসবের সাতদিন আগে গ্রামের মোড়ল 'নায়কে' (পুরোহিত) সকলকে ডেকে পূজোর দিন ধার্য করেন। এরপর জাহের থান তৈরী হয়। জাহের থানের কাছাকাছি অন্যান্য দেবতাদের জন্য খুঁটি ও খড়ের ছাউনি দিয়ে কুটিরের প্রতীক তৈরী করা হয়। এই ছাউনির কাজ কেবলমাত্র অবিবাহিত ছেলেরাই করে থাকে। উৎসবের দিন নায়কে স্নান সেরে নতুন কুলোতে ফুল-ফল ও পূজোর সামগ্রী জাহের থানে নিয়ে যান ও পূজোর কাজ শেষ করেন। এই পূজোয় দুটি মোরগ উৎসর্গ করা হয়। পূজোর আচার শেষে সকলে মিলে গান এবং নাচ করে। এই বাহা উৎসবে কেবল প্রাচীন গান গাওয়া হয়

"হেসাঃ মা চটেরে
জা গোসায় তুদে দয় রাগে কান,
বাড়ে মা লাওয়ের রে,
জা গোসাঁয় গুতরুৎ দয় সাঁহেদা।
দে চং আচুরেন
জা গোসায় তুদে দন রাগে কান,
দিসম চং বিহুরেন
জা গোসাঁয় গুতরুৎ দয় সাঁহেদা।"

অর্থাৎ —

অশ্বত্থের বৃক্ষ চূড়ায়
তুদে পাখি কেন গায়
বটবৃক্ষের নোওয়ানো ডালে
গুতরুৎ কেন শ্বাস নেয়
ধাতুর সে পরিবর্তন ঘটল
তাই তুদে পাখি গান গায়
প্রকৃতি বদল হল
তাই গুতরুৎ শ্বাস নেয়।

'বাহা' পরব না হওয়া পর্যন্ত সাঁওতাল ছেলে-মেয়েরা মহুয়া ফুল খায় না, শালের ফুল মাথায় দেয় না। বনের সম্পদ শাল গাছের উদ্দেশ্যেই তাদের এই বিশেষ উৎসব, কারণ তাদের প্রাচীন বিচার সভা বসেছিল এই শাল গাছের তলাতেই। শালগাছ তাদের কাছে সত্যের প্রতীকও বটে। তাই এই সত্য-সন্ধানী গাছকে তারা সারি-সারজম বলে সম্মান করে। এই শালগাছকেই ছোট ছোট করে কেটে তৈরী হয় পূজোর জায়গা বা জাহের থান। দুদিনের এই উৎসবে প্রথম দিন স্নান, দ্বিতীয় দিন অর্ঘ্য দান।

পূজোর ডালায় উপকরণের সঙ্গে থাকে নানা ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র। সেগুলিকে সিঁদুর চর্চিত

করা হয়। সন্ধ্যা বেলায় যুবকেরা শিকার থেকে ফিরে এসে পুরোহিতদের বাড়ীতে ঢাক বাজায় এবং সেই সঙ্গে শিঙ্গা। এই শব্দে গ্রামবাসীরা একে একে পুরোহিতের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। (প্রাচীনকালে বিশাল গহন অরণ্যে যে সব যুবক বিচ্ছিন্ন ও দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ত তাদের একত্রিত করার সঙ্গেতধ্বনি শিঙ্গার প্রতীকে আজও ব্যবহৃত হয়)। এরপর সমবেত গান, —

"অকন মায় চিয়ারা হো বির দিস্‌ম দ?
অকম মায় দহয় হো আতোরে পায়রি?
মারাঙ বুরুয় চিয়ারা হো বির দিস্‌ম দ,
জাহের এবায় দহয় হো আতোরে পায়রি।"

(বনভূমি কে খুঁজবে? গ্রামে কে বসতি স্থাপন করবে? মারাঙ বুরু বনভূমি খুঁজবেন / জাহের এরা গ্রামে বসতি স্থাপন করবেন)।

এরপর পুরোহিত তিনজন দেবতাকে স্মরণ করেন— জাহের এরা (জাহের ঠাকুরানী) ম'ড়ে কো (পঞ্চদেবতা) আর মারাঙ বুরু। নির্দিষ্ট আচার আচরণ পালন করে পূজো আরম্ভ হয়। প্রথমে মহুয়ার নির্মাল্য দান। পরে দেবতাদের রক্ত পান করতে দেওয়া হয়। শিকারের মৃত পশু পাখীর মাংস দিয়ে খিচুড়ী তৈরী হয় আর ছেলেরা সেই খিচুড়ী প্রসাদ খায়। বিকালে সবাই মিলে নাচ-গান করে আর মেয়েরা থালায় জল আর বাটিতে তেল নিয়ে রাস্তায় অথবা বাড়ীতে অপেক্ষা করে। তারা পুরোহিতের পা ধুইয়ে তেল মাখিয়ে দেয়, তখন পুরোহিত তাদের শালফুল দেন; এরপর উন্মুক্ত আকাশের নীচে মহুয়া মাতাল বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শালফুল সজ্জিত যুবক যুবতীদের সমবেত নাচ আর গানে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া। এইভাবে সমাপ্ত হয় রঙীন ঋতু উৎসব 'বাহা'।

এরক-সীম, হাঁড়িয়ার-সীম, জানথাড় উৎসব :

আষাঢ় মাসে ভাল ফসলের কামনায় সাঁওতালরা পালন করে এরক-সীম উৎসব। গ্রামের মাথায় জাহের থান-এ পুজা হয় এবং নায়কে সেখানে মারঙ বুরু, জাহের এরা, মাড়কো তুরাইকো, গোসাই এরা ও অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে একটি করে মুরগী উৎসর্গ করেন।

বীজ বপনের পর হাঁড়িয়ার সীম উৎসব। আর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বিস্তীর্ণ, সবুজ মাঠ যখন সোনালী সবুজ ধানে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেই ফসল কাটার আনন্দে 'জানথাড়' উৎসব। এই সমস্ত উৎসবগুলিতে নিয়ম-কানুন সামান্যই, শুধু দল বেঁধে মাদলের দ্রিমি দ্রিমি বাজনার সাথে নাচ আর উৎসবের আনন্দটাই আসল।

সরহায় / বাঁধনা :

খাদ্য সংগ্রহ হয়ে গেলে সাঁওতালরা তাদের প্রধান উৎসব 'সরহায়' পালনের আনন্দে মেতে ওঠে। 'সরহায়' উৎসব সাঁওতালদের জাতীয় উৎসব। উত্তরবঙ্গে এই উৎসব মাঘ মাসের পূর্ণিমাতে পাঁচ দিন যাবৎ অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিনকে ওম্, দ্বিতীয় দিন — দাকা, তৃতীয় দিন — ঘুনটাও, চতুর্থ দিন — জালে. পঞ্চম এবং শেষ দিনকে হাকো-কাটোকম্ বলা হয়ে থাকে।

এই উৎসবের আদি উৎস এইভাবে ঃ প্রাচীনকালে এই সাঁওতাল সম্প্রদায় চাষবাস বিদ্যা আয়ত্ব করে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে ভালই ফসল উৎপন্ন করত, চাষবাষের ফলে সাঁওতালদের জীবন পূর্বের জীবনের তুলনায় অনেক বেশী স্বচ্ছল, নিশ্চিন্ত এবং নিরাপদ হয়ে উঠল। কিন্তু ফসল উৎপন্নের প্রধান যে গরু,মোষ, তাদের প্রতি তাদের বিশেষ কোন দৃষ্টি ছিল না; অযত্ন এবং উপযুক্ত আহারের অভাবে এই সব জন্তুগুলি মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাই তারা একদিন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাদের দেবতা লিটাগডিত এর কাছে উপস্থিত হল। মানুষের এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অসহায় পশুগুলি দেবতাদের সাহায্য প্রার্থনা করল। দেবতা দুঃখিত হলেন, একটা নির্দিষ্ট দিনে তাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আসবেন এমন প্রতিশ্রুতিও দিলেন। কেমন করে এই খবর পৌঁছে গেল আদিবাসীদের কাছেও, মারাঙ্ বুরুর রোষ থেকে বাঁচবার জন্য তারা গোরু মহিষদের সেবা যত্নের ব্যবস্থা করল। উৎসবের উৎপত্তিতে এই কল্পকাহিনীই বাঙ্ময়।

এই উৎসব আনন্দের উৎসব। পরিবারের সকলের এক জায়গায় সামিল হয়ে খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান ও পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাতের উৎসব। এই উৎসব ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই প্রাণের উৎসব। এমনকি বাড়ীর গরু, মহিষ, বাছুর, বলদেরও উৎসব বলা যায়; তাই এই উৎসবের প্রাণ কেন্দ্রে রয়েছে গরু। পরিবারের বিবাহিতা মেয়েদের সকলকে এই উৎসবে আমন্ত্রণ করা হয়। সারাটা বছর এই দিনটির জন্য গোত্রান্তরিত মেয়েরা পিতৃগৃহে আসার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকে। এক মাস আগে থেকে ঘর-দোর, দেওয়াল ও পিণ্ডা নিকানো হয়। দেওয়াল নিকাতে নিকাতে এই অস্থিরতাই মেয়েদের গানে প্রকাশ পায়, —

"বাহারেদ সহরায় রেদ
নেওতাঞ মেসে মারাং দাদা
ইঞ দ দাদা একা বুহিন গে।
বীঞ খজা লুমাং শাড়ী বৌ
গেল মকা সাসাং গাবাও শাড়ীঞ বাঁদিয়া"

অর্থ ঃ —

"বাহা সহরায় পরবে আমায়
নেওতা কর দাদা
আমি দাদা একা বোনরে
চাইনা আমার সোনার চুড়ি
চাইনা আমি রেশম শাড়ি হলুদ মাখানো দশ হাত শাড়িই
আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

সকাল থোক ঘর দুয়ার গোবর মাটি দিয়ে পরিস্কার করে সাজিয়ে তুলে, দুপুরে গরু মহিষকে পুকুরে নিয়ে স্নান করায় (আচার নিয়ন্ত্রিত ধর্ম জীবনে প্রতীকী প্রবেশ)। তারপর বিকেলে গ্রামের এক নির্দিষ্ট জায়গায় গরু, মহিষ নিয়ে জড়ো হয়, যাকে বলে 'গট-টাণ্ডি'। সেখানকার নির্দিষ্ট একটি জায়গা গোবর দিয়ে পরিস্কার করে পূজোর উপযুক্ত করা হয়। পূজোর উপকরণ হিসাবে থাকে নতুন কুলোর মধ্যে ধূপ, সিঁদুর, কলা, বাতাসা, দূর্বা, আতপচাল আর মুরগীর ডিম। এছাড়া কয়েক মটকী পচই, বলির জন্য মুরগী আর কবুতরের বাচ্চা। পূজো শেষ হওয়ার পর

সকলে মিলে মুরগী আর কবুতরের বাচ্চা দিয়ে খিচুড়ী রান্না করে সবাই মিলে খায়। (আদিম যৌথ জীবনযাত্রার স্মৃতিতে উৎসবে ভোজ একটি অপরিহার্য। কারণ সমাজ ভাঙনের প্রতিষেধক হিসাবে এই যৌথ ভোজ এক সহমর্মী যাদু তৈরীতে সক্ষম ছিল। দেখা যায় আদিম জাতির ধর্মে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি সাধনার কোন কথা ছিল না, ব্যক্তি চৈতন্যমূলক সত্যোপলব্ধিরও কোন ইঙ্গিত নাই। সর্বজনীন মানসিক বৃত্তির বিকাশই তাঁদের ধর্মবোধের ভিত্তি)। এরই সঙ্গে চলে ছেলে মেয়েদের সমবেত গান। মাদলের বাজনা আর পচই খাওয়া। এরপর সবাই তাদের গরু-মোষ নিয়ে আসে পূজোস্থানের কাছে, এবং তাদের সেই নিকানো জায়গার কাছে নিয়ে গিয়ে তাড়া দেয়। যার গরু কুলোর ডিমটি ভাঙবে বা আতপচাল ছোঁবে, সেই গরুটির মাথায় তেল সিঁদুর মাখান হয়, সেই গরুটির মালিককে ভাগ্যবান বিবেচনা করা হয়, সে মানুষের কাঁধে চেপে বাড়ী ফেরে। এই হল সরহায় পরবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। এরপর উৎসবের উপযোগী করে বাড়ি-ঘর, গোয়াল-গোলা সব আলপনায় সজ্জিত করা হয়। (পণ্ডিতদের মতে 'আলপনা' নামক লোকাচার সম্পর্কিত এই লোককলা প্রথমে কৃষিজীবন সম্পর্কিত ছিল, প্রাক্ আর্য গোষ্ঠীর জনসমষ্টি শস্য রক্ষার্থে ভূত-প্রেত উপদেতার কু-দৃষ্টি এড়াতে বৃত্তাকার গণ্ডী এঁকে দিত শস্যক্ষেত্রে, পরে গোলায় ও বাড়ীর দুয়ারে, আলপনা বা আইলপনা এই শব্দটি ক্ষেতের 'আল' সম্পর্কিত এমনটিই মনে করা হয়)। উৎসবের শুরুতে অর্থাৎ 'উম' এর দিন গ্রামের 'জগমাঝি' নামের দুই ব্যক্তি মাদল নিয়ে প্রতি বাড়ী বাড়ী গিয়ে গোয়াল ঘরে দুয়ারে গরু-মহিষের বন্দনা গান গায়, —

"হিরে হিরে লাজাই
কুকুড়া মা ডাগি গেলা, পাতা মাফাটি গেলাই — মা ফাটি
ওঠা পুতা পসড়া কলাই
না বাবা জাগাস্ত, না বাবা নিন্দে,
নিন্দে তো লাগালে গোহাল
হাতে লিলে তানিয়া গড়ে, লিলে বাধয়া,
ঢালি গোলা আমকা বিয়া
পসড়া কলাই লাজাই।"

দ্বিতীয় দিন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে মিলন উৎসব 'দাকা', তৃতীয় দিন 'ঘুনটাও', উৎসবের আড়ম্বরপূর্ণ দিন। সবাই যে যার সাধ্যমত বাড়ি-ঘর সাজায়। ঘরের সামনে খুঁটিতে বাঁধা থাকে সুসজ্জিত গরু-মহিষ। তাদের গলায় তেলেভাজা, পিঠে, টাকা আর ফুলের মালা বেঁধে দেওয়া হয়। অন্য গ্রাম বা অন্য পাড়া থেকে মানুষ দলবদ্ধভাবে তীর, ধনুক নিয়ে টিন বাজিয়ে ঢোল অথবা ভাঙা কুলো পিটিয়ে গরু-মহিষের গলা থেকে সেই টাকা আর খাবার ছিনিয়ে নেয়। তারপর বিজয়ের আনন্দে মাদল বাজিয়ে নৃত্য চলে সারা রাত। চতুর্থ দিন 'জালে'। ঐ দিন নাচ-গান দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। পঞ্চম দিন হাকো কাটোকম্ প্রার্থনার দিন। আদিবাসীরা বিশ্বাস করে দেবতা 'লিটাগডিত' এই কদিন তাদের সঙ্গেই ছিলেন, — তিনি সব দেখেছেন, গরু-মহিষের প্রতি অযত্নকারীদের তিনি শাস্তিও দেবেন সময়মতো।

সাঁওতাল, মুণ্ডাদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'সরহায়' এর সাথে সাথেই প্রায় একই ধরনের যে অনুষ্ঠান মাহাতো, লোধা, ভূমিজ কোঁড়া ইত্যাদি স্থানীয় আদিবাসী যে অনুষ্ঠান পালন করে থাকে

তাকে বলা হয় 'বাঁধনা' উৎসব। দেওয়ালীর রাতেই 'বাঁধনা' বা গো-বন্দনা পরব আরম্ভ হয়।

কার্তিক অমাবস্যার দিন থেকে পরপর তিন দিন এই উৎসব চলে। প্রথম দিন 'জাগান' বা 'গাই জাগাও', দ্বিতীয় দিন 'চুমান'। গরুদের পূজো করার অনুষ্ঠান। তাদের পা ধুইয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের গায়ে ছাপ দিয়ে চর্চিত করা হয়। (প্রভু বিশ্বনাথকে ডাকা হয় যাঁর বাহন ষাঁড়)। কেউ কেউ লক্ষ্মী বা ভগবতীকে সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে জেনে নিয়ে তাদের নামে পূজো দেয়। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানের নাম 'নাচান' অর্থাৎ নাচ।

এই উৎসবের মূল কেন্দ্রে আছে গৃহপালিত পশু, বিশেষ করে গো জাতীয় পশু। বাদনা পরবের অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠানগুলি হল অমাবস্যার গোধূলি লগ্নে আলপনা এঁকে, ঘাস বিছিয়ে, প্রদীপ জ্বালিয়ে পরম সমাদরে গরু কাঁড়াকে ঘরে নিয়ে আসা, রাত্রে তাদের শিঙে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে দেওয়া, মাথায় সদ্য কাটা ধানের মোড় (মুকুট) পরিয়ে দেওয়া। এক কথায় সামগ্রিকভাবে তাদের পরিচর্যা করা। রাতভোর চলে মাদল বাজিয়ে গরু জাগানোর পালা। 'সাঁওতালীতে একে 'গাই জাগাও' বলা হয়। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে গরুর পিঠে ছাপ দেওয়া, গরয়া পূজা, গঠ পূজা, গোরু খুটা ইত্যাদি। এই অনুষ্ঠান আসলে শ্রমজীবী মানুষের শ্রমজীবনের শ্রেষ্ঠতম শরিকের স্তুতি রচনা, সকৃতজ্ঞ বন্দনা। সারা বছর যে পশুটি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে কালীপূজোর এই তিন দিন তার পূর্ণ বিশ্রাম। মানুষ তার সেবা করে তাকে প্রণাম করে গান শোনায় , —

জাগ মা ভগবতী জাগ মা লছমনি
জাগে ত অমাবইসা রাতিরে
জাগে কা আশিস দেবে মা গ ভগবতী
পাঁচ পুতা দশ ধেনু গাই।

এই উৎসবটিকে কেন্দ্র করে লোক গীতের এক বিরাট ভাণ্ডারও গড়ে উঠেছে। বাঁধনা গীতের দুটি আলাদা বিভাগ আছে। একটি আনুষ্ঠানিক অন্যটি নান্দনিক। 'গাই জাগানো' গানগুলিকেই আনুষ্ঠানিক বলে। সাধারণত এই গানগুলি গোরুর পশুজীবনের সাধারণ বন্দনা, গোরুর উৎপত্তির ইতিহাস, তার পূজার রীতিনীতি এবং প্রথা পদ্ধতি সম্পর্কিত আঞ্চলিক লোক বিশ্বাস এই সব গানের মর্মকথা। আর ডহরিয়া গানগুলিকে নান্দনিক বলা হয়। ডহরিয়া গানগুলি পথের গীত, উল্লাস তথা আমোদের গীত। এই গীতের ভাব চপল, সুর চটুল, লয় দ্রুত। এই গানের চলন্ত আসরে আসে মানুষের নিজস্ব প্রসঙ্গ, লোকায়ত মানুষের হৃদয় সংবাদ। বলা যায় এই গানগুলি একই সঙ্গে সমাজ দর্পণ এবং মৃত্তিকা সংলগ্ন মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা, চিত্র ও চরিত্রের নির্ভুল উচ্চারণ।

·শালার বাড়িয়ে নানা রংয়ের ফুল ভাই
শালার বহ্নি যাতেই মানে নাই।
দেন রে শালা বুঝাই মানাই পোঁঠাই দে
গেলে আর ছাড়ি দিব নাই।

শুধু আদিবাসীদের মধ্যেই নয়, মালদহের অন্যান্য অনগ্রসর অধিবাসীদের মধ্যেও এই গো-বন্দনা উৎসব বিভিন্ন ভাবে পালিত হয়।

মালদহের যাদব, গোয়ালা এমন কি অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের ভেতরেও গো-বন্দনা অনুষ্ঠান দেখা যায়।কার্তিকী অমাবস্যা বা কালীপূজোর আগের দিন প্রচলিত 'যম প্রদীপ' দেওয়ার রীতি। মাটি বা গোবর দিয়ে বিরাট আকৃতির একাধিক মুখযুক্ত প্রদীপ বানানো হয়। সেই প্রদীপ বাড়ীর সমানে, রাস্তায় জ্বেলে দেওয়া হয় সন্ধ্যাবেলা। একে 'যম-প্রদীপ'বলে। এরপর গোয়াল ঘরে গিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে গোরুর পা ধুইয়ে দিয়ে বাড়ীর গৃহিনী শাড়ির আঁচল দিয়ে তার পা মুছিয়ে দেন। ধূপ-ধুনো আর প্রদীপ জ্বালিয়ে পরের দিনের অনুষ্ঠানে আসার জন্য বিনীতভাবে গরু-বলদকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। গাই-জাগান এই অনুষ্ঠানের পর দ্বিতীয় দিন 'চুমান'। যেটি হয় অমাবস্যা ছাড়লে। গোয়ালের যে খুঁটিতে গরু বাঁধা থাকে সেখানে পান, সুপারি, কলা ইত্যাদির সাথে প্রধান উপকরণ থাকে লুচি, পায়েস। খুঁটি পূজোর পর গরুর শিং-এর তেল সিঁদুর মাখিয়ে গরুর শিং-এ একজন এক থোকা কলা ধরে থাকে তখন ধান, দূর্বা, ফুল, প্রদীপ দিয়ে পাঁচবার উলুধ্বনির সাথে গোরুকে বরণ করা হয়।

লোধা আদিবাসীরাও এই উৎসব 'বাঁধনা' নামেই পালন করে। যদিও আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তারা উৎসবে কেবল অংশগ্রহণ করে অন্যদের সঙ্গে, ব্যক্তিগত পূজোর চল নেই বললেই চলে।

সাকারাত উৎসব ঃ

সাঁওতাল সমাজে পৌষ কেন্দ্রিক আর একটি উৎসব 'সাকারাত উৎসব'। এই সময় প্রত্যেক বাড়িতে ফসল তোলার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মারাঙবুরুর নামে পূজো হয়। গৃহকর্তা দেবতার উদ্দেশ্যে হাঁড়িয়া নিবেদন করেন। এছাড়া পূজোর অন্যান্য উপকরণ হিসাবে থাকে পিঠা-চিড়া-মুড়ি ইত্যাদি।

মাগ-সিম পরব ঃ

মাঘ মাসের শেষের দিকে সাঁওতালরা 'মাগ-সিম পরব' করে। এই উৎসব কেবলমাত্র আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই অনুষ্ঠানের প্রধান গুরুত্ব হল — এই সময় সাঁওতাল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা তাঁদের সারা বছরের কাজের হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে পদত্যাগ করেন এবং নতুন পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন।

মাকড়-মে উৎসব ঃ

মহামারী, দুর্ভিক্ষ, বন্যা অথবা যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত দেবতার আরাধনা। এখানেই নাচ গানের মাধ্যমে দেবতাকে সন্তুষ্ট করা ছাড়াও পশু পাখি বলি ও অন্যান্য ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া পদ্ধতিতে পূজা আচার সম্পন্ন হয়। এই উৎসব সাধারণত বৈশাখ বা জৈষ্ঠ্য মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

শিকার উৎসব ঃ

উৎসববহুল সাঁওতাল সমাজের আলোচনায় শিকার উৎসবের কথা না বললেই নয়। এই উৎসব তাদের কৌম জীবনেরই অনুস্মৃতি। বলা যেতে পারে নিয়ানথারডাল মানুষ যখন

মাউসটোরিয়ান যুগে বাস করত তখন তাদের মধ্যে জীবনের কোন নিশ্চয়তা ছিলনা। এরপর প্রাগৈতিহাসিক এই মানুষেরাই একদিন মাটির উর্বরতা শক্তি আবিষ্কার করে ফেলে। জীবনের ক্ষেত্রে আসে খানিকটা নিশ্চয়তা, অনুসন্ধান পান ঈশ্বর নামক অপরূপ চেতনার। কিন্তু সৃষ্টিলগ্নের সূচনায় বিরূদ্ধ প্রকৃতির সাথে সংগ্রামের স্মৃতি তারা ভুলে যায় নি। তাকে স্মরণ করে শিকার, ক্রীড়া আর নৃত্যই এই উৎসবের প্রাণ। শিকারে যাবার আগে শিকারীরা তাদের স্ত্রীর হাতের নোয়া খুলে দিয়ে যায়। নির্দিষ্ট দিনে তারা উপস্থিত হয় গ্রামের চৌমাথায়, সঙ্গে থাকে বর্শা, তীর-ধনুক, বল্লম, কুড়াল ইত্যাদি। এরপর গ্রামের নায়কে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন নিজ শরীরের কয়েক ফোঁটা রক্ত। এই অনুষ্ঠানের নাম 'বুল-মায়াম'। এরপর জঙ্গলের সীমানায় নিয়ে গিয়ে 'দিহুরী' শালপাতাতে কিছু তেল মাখিয়ে তাদের এবং গ্রামের ভবিষ্যৎ গণনা করে বিপদমুক্তির সঙ্কেত দিলে তবেই শিকারীরা মাদলের তালে তালে শিঙ্গা বাজাতে বাজাতে জঙ্গলে প্রবেশ করে। সারাদিন শিকারের সন্ধানে বনে-জঙ্গলে ঘুরে ফিরে শিকার সংগ্রহ করে সন্ধ্যাবেলা তাদের পূর্ব নির্ধারিত জায়গা 'গিপিতিচ্- টাণ্ডি'তে ফিরে আসে। সেখানে গ্রামেব অন্যান্য লোকেরাও আসে। শিকার পাওয়ার আনন্দে শুরু হয় নাচ-গানের উৎসব। তারপর সবাই মিলে হৈ-চৈ করে গ্রামে প্রবেশ করে। এইভাবেই শেষ হয় শিকার পরবের।

মালদহে বসবাসকারী আর একটি আদিবাসী সম্প্রদায় 'ভূমিজ'-রা এই উৎসব পালন করে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে। এই শিকার উৎসবকে তারা বলে 'দেশ-শিকার' উৎসব। নিয়ম-কানুন সাঁওতালদের মতই খানিকটা তবে নিজস্বতাও এর মধ্যে বর্তমান, তবে বন-জঙ্গলের যথেষ্ট অভাব তথা সরকার দ্বারা যথেষ্ট পশু শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার এই উৎসবের আর তেমন গুরুত্ব নেই বললেই চলে।

মুণ্ডা আদিবাসীদের আচরিত অনুষ্ঠান ঃ

'মুণ্ডা' শব্দটি সংস্কৃত 'মুণ্ড' থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়, যার অর্থ মাথা বা প্রধান। 'মুণ্ডা' জাতির উৎস সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা আদিম অষ্ট্রাল শ্রেণীভুক্ত, যাদের বলা হত মুরা বা 'হেরোহন'। এদের আদি বসবাস উত্তর-পশ্চিম ভারত। সেখান থেকে আজমগড়, তারপর বিহারের পাহাড় ও বনজঙ্গলপূর্ণ ছোটনাগপুর। জীবিকার তাড়নায় এখান থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র, মালদহের বরিন্দ অঞ্চলে এরা প্রচুর সংখ্যায় বাস করে, অন্যত্রও এদের অস্তিত্ব দেখা যায়। অন্যান্য আদিবাসীদের মত মুণ্ডারাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসব পালন করে।

সারহুল পরব ঃ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বন্দনার উৎসব 'সারহুল'। ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ বসন্ত সমাগমে যখন শালগাছে ফুল ফোটে, বন-জঙ্গল ফুলের গন্ধে ভরে যায়, সেই সময় আদিবাসী মুণ্ডারা সারহুল পরব পালন করে।

পরবের দিন জঙ্গল থেকে শালফুল সংগ্রহ করা হয়। গ্রামের পাহান সে ফুল দেবতার পীঠস্থান 'সারনায়' নিবেদন করেন। দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশুবলি দেওয়া হয়। কয়েকদিন ধরে উৎসব চলে। ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ধামসা মাদল বাজিয়ে নাচ গান করে।

"বা চান্দু মুলুচলেনা সারজম বা বাজনা
সুড়া সাঙ্গেন বালে ওপাদ নাওয়া দারু রে,
সুড়া সাঙ্গেল সুরাজনা
সারজম বা বাজনা দিলে দাঙ্গোবা।"

বাংলায় এই রকম দাঁড়ায় —

ফুলের মাস এসেছে শালফুল ফুটেছে
গাছে নতুন কচিপাতা হয়েছে
কচি কচি পাতা হচ্ছে,
শালফুল মনে আনন্দ দিচ্ছে।

সারহুল পরবের সময় প্রত্যেক গ্রামবাসী নিজ নিজ পূর্ব-পুরুষের উদ্দেশ্যে শালফুল নিবেদন করে। উৎসবের কদিন তাদের চাষের কাজকর্ম একদম বন্ধ থাকে।

মাগে পরব ঃ

মাঘ মাসের প্রথম দিকে মুণ্ডারা মাগে পরব পালন করে। উৎসবের চারদিন আগে থেকে 'পাহান' এবং তাঁর স্ত্রী পূজোর আয়োজন করেন। গ্রামের অবিবাহিত ছেলেরা পরপর তিন দিন নাচ গান করতে করতে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। উৎসবের দিন পাহান (পুরোহিত) বুরুবোঙ্গা, ইকির বোজা, নাগেএরা, চণ্ডী বোঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবীর উদ্দেশ্যে পূজো দেন এবং তাঁদের কাছে মিনতি জানান যেন গ্রামবাসীরা নতুন বছরে সব কাজে সাফল্যলাভ করে। দেবদেবীরা যেন তাদের সব রকমের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। মুণ্ডারা এই উৎসবের দিনক্ষণ তেমনভাবেই স্থির করে যখন একদিকে বছরের সমাপ্তি অন্যদিকে আর একটা নতুন বছরের সূচনা হয়।

কারাম পরব ঃ

আগষ্ট-সেপ্টেম্বর বা ভাদ্র মাসে মুণ্ডারা কারাম পরব পালন করে। গ্রামের কল্যাণ ও উন্নতির কামনাই এই উৎসবের মূল সুর। উৎসবের আগের দিন কোনও এক অবিবাহিত ছেলে জঙ্গল থেকে 'করম' গাছের চারা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। চারাটি গ্রামের মাঝখানে পোঁতা হয়। আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুনের পর ছেলেমেয়েরা ইলি খেয়ে সারারাত সেই করম গাছকে ঘিরে নাচ-গান করে।

সরহায় পরব ঃ

অক্টোবর-নভেম্বর বা কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার দিন মুণ্ডারা 'সরহায়' পরব পালন করে। এটা তাদের জাতীয় বড় উৎসব। গৃহপালিত গবাদি পশুর কল্যাণের জন্য এই উৎসব চিহ্নিত হলেও এর সামাজিক গুরুত্ব হল মেয়ে বাপের বাড়িতে আসে। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, গল্পগুজব এবং সবাই এক সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করে।

কাদলেতা বা বতৌলিক পরব ঃ

জুন-জুলাই বা আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে মুণ্ডা আদিবাসীরা কাদলেতা বা বতৌলিব

পরব বা বীজ রোপন উৎসব পালন করে। চাষ-আবাদ যাতে ভাল হয় এই জন্য পাহান দেবতার থান জাহের সারণাতে এ উৎসবের আয়োজন করেন এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজো দেন। গ্রামের সকলেই পূজোর সময় উপস্থিত থেকে দেবতার আশীর্বাদ গ্রহণ করে।

ভূমিজ আদিবাসীদের আচরিত অনুষ্ঠান ঃ

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র (দার্জিলিং এবং মুর্শিদাবাদ ছাড়া) বিশেষ করে মালদহের অনেক জায়গাতেই এই ভূমিজদের দেখতে পাওয়া যায়। রিজলি সাহেবের মতে এরা মুণ্ডা আদিবাসীদেরই একটি প্রাচীন শাখা। যাযাবর গোষ্ঠীর মত ভ্রাম্যমান অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে বর্তমানে নিজস্ব জায়গায় স্থির হয়েছে। কিন্তু নিজস্ব আচার টোটেম বা ট্যাবুকে ধরে রাখতে পারেনি। তারা বর্তমানে যে সব রীতি-নীতি পালন করে সেগুলি অনেকটাই হিন্দু রীতি-নীতির দ্বারা প্রভাবিত।

সরহুল পরব ঃ

'সরহুল' ভূমিজদের সবচেয়ে বড় উৎসব। মে মাসের শেষে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে ভূমিজরা এই উৎসব পালন করে। উৎসবের সময় শালফুল দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। এই সময় দেবতা জাহিরবুরুর পূজো করা হয়। এবং মাঠের ফসল যাতে নষ্ট না হয় সেইজন্য দেবতার কাছে মিনতি জানান হয়।

করম পরব ঃ

ভাদ্র মাসের একাদশীতে পালন করে করম উৎসব। যদিও এই উৎসব সকলের, তবুও মেয়েরাই ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় এই উৎসব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

বাঁধনা উৎসব ঃ

কার্তিক মাসের অমাবস্যা, প্রতিপদ এবং দ্বিতীয়া এই তিনদিন পালন করে 'বাঁধনা' উৎসব। ভূমিজরা প্রধানত কৃষিজীবী, তাই গোরু, বলদই তাদের অন্যতম সম্পদ। এই গো-ধনের বন্দনাই বাঁদনা বা বাঁধনা উৎসব।

বুরু বা পাহাড় পূজো ঃ

মাঘ মাসের প্রথম দিকে বুরু বা পাহাড় পূজা। বিভিন্ন অজানা রোগের হাত থেকে দরিদ্র এই মানুষগুলো রেহাই পাবার উদ্দেশ্যেই পাহাড় পূজা করে।

টুসু পরব ঃ

পৌষ সংক্রান্তির দিন পালন করে টুসু-উৎসব। মেয়েরা দলে দলে টুসু সাজিয়ে নিয়ে গান গাইতে গাইতে নদী-পুকুর, জলাশয়ের কাছে যায়। এইখানে সমবেত নাচ ও গানের আসর বসে। টুসু আসলে কোন দেবী নন, তাদের ঘরের একজন আপনজন। তাদের পরিবারভুক্ত

মানবী মাত্র। টুসুর সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, পুরাণের সঙ্গে যোগ নেই, কোন তন্ত্র-মন্ত্র নেই। নিঃসন্দেহে টুসু অ-বৈদিক, অ-পৌরাণিক ও অ-ব্রাহ্মণ্য এক আন্তরিক উৎসব। 'টুসু' নামটির উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। 'পুষ্যা' নক্ষত্র যুক্ত মাস পৌষ, পুষ্যা নক্ষত্রের অপর নাম তষৎ তা থেকে তুষু বা টুসু। 'কোল' গোষ্ঠীর 'টুসা' শব্দ থেকেও টুসু শব্দটি আসতে পারে। উষা বা ওষা মিশরের টৈসুব বা টসব দেবতার লোকাচারের সঙ্গে টুসুর মিল পাওয়া সম্ভব। সাধারণ জনমতে প্রাচীন বাংলার অন্যতম তুষ-তুষালি ব্রত-ই দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ভাষাবর্গের কোল,মুণ্ডা, ওরাং, সাঁওতাল, ভূমিজ, ভুঁইয়া, কুর্মি, মাহাতো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের টুসু উৎসবে পরিণত হয়েছে।

গোটা পৌষ মাস ধরেই টুসু উৎসব চলে। টুসু উৎসবের মূল আকর্ষণ টুসু গান, এই গানগুলি নিরক্ষর আদিবাসী মেয়েরা রচনা করেন। প্রাত্যহিক সংসারের ব্যথাবেদনা, উপেক্ষা, বিবাদ-বিসম্বাদের জমে থাকা অভিমান অভিযোগগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেয়েদের কণ্ঠে গান হয়ে ফুটে ওঠে। এগুলিই টুসু উৎসবের গান। ভূমিজ মেয়েদের তৈরী এমনই একটি টুসু গান হল, —

হামার টুসু দক্ষিণ যাব্ হেন
সঙ্গে চাকর ছ'জনা,
ফিরবার বেলা দেখাঞ আনব
কালিমাটির কারখানা।

অন্যান্য লোক সঙ্গীতের মতই টুসু গানেও কাব্যিক মূল্য তেমন নেই, তবে এর মাদকতাময় সুর গানের অন্য সব অভাব মনে পড়তে দেয় না।

কোড়া আদিবাসীদের আচরিত অনুষ্ঠান ঃ

কোড়া আদিবাসীরা আদি অস্ট্রাল শ্রেণীর আদিবাসী এবং মুণ্ডাদেরই এক বিচ্ছিন্ন শাখা। সম্ভবত মাটি কাটার পেশা গ্রহণ করেই কোড়া-রা মুণ্ডা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বর্তমানে তাদের চাষী কিংবা ক্ষেত মজুর হিসাবেই দেখা যায়।

কোড়াদের আদি নিবাস সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও অনেকেই অনুমান করেন যে তারা ছোটনাগপুরের প্রাচীন অধিবাসী। জীবিকার প্রয়োজনে তারা মুঙ্গের, ভাগলপুর, হাজারীবাগ, ধলভূম, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করে পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদহেও জীবিকার সন্ধানে এসে উপস্থিত হয়। এক সময় এই কোড়া গোষ্ঠী নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যেমন, -- ধলো, মালো, শিখরিয়া, সোনারেখা, বাদামিয়া ইত্যাদি।

সওয়া লাখ কা পূজা ঃ

কোড়ারা বিশ্বাস করে যে প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তুর অন্তরালে এক বা একাধিক দেবী রয়েছেন, পূজা ইত্যাদির দ্বারা তাঁদের সন্তুষ্ট করতে পারলে অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে না। পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, নদী-নালা আকাশের তারা সব কিছুর পিছনেই আছে দেব-দেবীদের অদৃশ্য সক্রিয় হাত। তাই বছরের এক নির্দিষ্ট দিনে তারা এই সব দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করে। এই অনুষ্ঠানকেই কোড়ারা 'সওয়া লাখ' কা পূজা বলে।

গরাম পূজা :

গরাম ঠাকুরের পূজা দিয়েই কোড়াদের উৎসব অনুষ্ঠান শুরু হয়। গরাম ঠাকুরই তাদের গ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন এবং জাগ্রত দেবতা। কোড়াদের বিশ্বাস গরাম ঠাকুরকে খুশী রাখতে পারলেই গ্রামের মঙ্গল অন্যথায় অমঙ্গল, তাই ব্যক্তির তথা গ্রামের মঙ্গল কামনায় গরাম ঠাকুরকে তারা নানা উপাচারে তুষ্ট রাখে। এই গরাম দেবতার কোন মূর্তি নেই।

গ্রাম পঞ্চায়েত পূজোর দিন ধার্য করে গ্রামের সবাইকে সেটি জানিয়ে দেন এবং পূজোর চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। চাঁদার ব্যাপারে কেউ কোন আপত্তি করে না। পূজোর দিন গ্রামের প্রতিটি পরিবার উপস্থিত থাকে। এই পূজো সাধারণত দুপুরের দিকেই হয়, এবং পূজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুরোহিত উপবাসে থাকেন। গরাম ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করার জন্য পাঁঠা, ভেঁড়া, হাঁস, মুরগী, পায়রা ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। পূজা শেষে সবাই প্রসাদ ভক্ষণ করে গৃহে ফেরে।

অন্যান্য অনুষ্ঠান :

এছাড়া কোড়াদের মধ্যে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত সরহায় উৎসব, ভাদ্রমাসে করম উৎসব, হিন্দুদের মতো মনসা, শীতলা, কালী পুজোও তারা পালন করে।

লোধা আদিবাসীদের আচরিত অনুষ্ঠান :

নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল কোন উৎসব অনুষ্ঠান লোধাদের নেই বললেই চলে। লোধারা নানা দেব-দেবীর পূজো করে। দেবতার উপর অগাধ বিশ্বাসই লোধাদের বৈশিষ্ট্য। দেবতার পূজোর কাজ তারা নিজেরাই করে যদিও লোধা পূজারী আছেন যাকে 'দিহুরি' বলা হয়।

বড়াম পূজা :

লোধাদের সব চেয়ে বড় দেবতা বড়াম। তিনি সব রকম বিপদ থেকে লোধাদের রক্ষা করেন। বনে-জঙ্গলে ফল মূল, খাদ্য সংগ্রহ করতে যাবার আগে তারা বড়াম দেবতাকে স্মরণ করে। বড়াম দেবতা বাঘের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ান, হাতে একটা কুড়াল থাকে।

চণ্ডী পূজা :

চণ্ডী লোধাদের এক শক্তিশালী বনদেবী। চণ্ডী নানা নামে পরিচিত। জয়চণ্ডী, বড়াম চণ্ডী, ভৈরবী চণ্ডী ইত্যাদি। সাধারণত গাছতলায় তিনি অধিষ্ঠান করেন। বছরে তিন-চারবার এই দেবীর পূজা হয়। অন্যান্য উপাচারের মধ্যে অন্যতম হল মাটির ঘোড়া, যা বিভিন্ন সময়ে মানস পূরণের প্রতীক হিসাবে উৎসর্গ করা হয়।

চাঙ্ নাচ :

যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত লোধাদের নিজস্ব নাচগান হল 'চাঙ্ নাচ'। একমাত্র পুরুষেরাই এই নাচ গানে অংশ গ্রহণ করে। নাচের সময় যে বাদ্যযন্ত্র তারা ব্যবহার করে তার নাম হল 'চাঙ্গ' বা 'চাঙ্গল'। বাদ্য যন্ত্রটি কাঠের ফ্রেমে তৈরী এবং গোলাকৃতি ধরনের। এর

একদিক চামড়া দিয়ে ছাওয়া। হাতে এই বাদ্যযন্ত্র নিয়ে তারা বাজায় একই সঙ্গে চলে নাচ আর গান।

খাইছিরে বঁধু গাঁজার কলি
পথে যাতে যাতে ঢুলিয়ে পড়ি
ঢুলিয়ে পড়িছে শ্যামের গায়,
ঢুলিয়ে পড়িছে রাধার গায়,
তবুও রাধা ফিরে না চায়।

লোধাদের অন্যান্য পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে আছে সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে শীতলা পুজো। উৎসব অনুষ্ঠান বিশেষত বিবাহ অনুষ্ঠানের আগে বসুমাতা ও ধরম দেবতাকে তারা স্মরণ করে পুজো করে।

পাহারিয়া সম্প্রদায়ের আচরিত অনুষ্ঠান ঃ

গেরাম পুজো ঃ

পাহারিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম অনুষ্ঠান গেরাম পুজো। বছরের শুরুতে তারা এই পূজো করে থাকে। এই পুজোর পেছনে আছে অপদেবতাকে পরাজিত করার আকাঙ্ক্ষা। অসুখ-বিসুখ, রোগ-শোক, এমনকি যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে এই পূজো বিধি প্রচলিত। বৈশাখ মাসে গ্রামের বাইরে কোন পাকুড় গাছের নীচে মাটি দিয়ে একটি বেদি তৈরী করে, সেইখানেই পূজোর আয়োজন। ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা পূরণের জন্য অথবা কবুলতি করার জন্য যে কেউ পুজো দিতে পারে তবে এই পুজো সাধারণত 'দশওয়ালী'। উপকবণ হিসাবে থাকে দুধ, সিঁদুর, বাতাসা। এছাড়া বলির জন্য একটি দাগহীন সাদা পাঁঠা। এই পুজোর কোন মূর্তি নেই। আগে গাঁয়ের মোড়ল. পরে গ্রামের লোক পূজো দেয়। এই পূজোয় ঘণ্টা নিষিদ্ধ তবে ঢাক আর শঙ্খ বাজে। গেরাম পূজো পাহারিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম উৎসব।

জিতিয়া বা জিতাষ্টমী ঃ

ভাদ্রমাসে পালিত হয় জিতিয়া বা জিতাষ্টমী। এই অনুষ্ঠান নিজের নিজের বাড়িতেই করে। অনুষ্ঠানের দিন স্নান করে উপোস করে। সকালে পুজো করে চিড়া খায়। পূজোর উপকরণে ডালি প্রধান। এই ডালিতে নারিকেল, লেবু, কলা, পাঁচকলাই. মিষ্টিআলু, বাঁশের পাতা, জিয়লের পাতা, মানপাতা, ওলপাতা ইত্যাদি থাকে। অশুভ দেবতার দৃষ্টি এড়াতে মানপাতা থাকে ডালিতে। এই সমস্ত উপাদানসহ সাজানো অবস্থায় ডালি সারারাত থাকে। দ্বিতীয় দিন স্নান করে আলপনা দেয়, তারপর ধূপ-দীপ শঙ্খ বাজিয়ে পূজো শেষ হয়। অমাবস্যা পার হয়ে গেলে ডালা ভাঙ্গা হয় ও প্রসাদ নেওয়া হয়।

বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাহাড়িয়া সম্প্রদায় জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্ত্তিক, পৌষ. মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র মাসে কোন অনুষ্ঠান পালন করে না। কেবল অঘ্রাণ মাসে পালন করে নবান্ন অনুষ্ঠান।

বিশেষ কোন কোন কারণে পাহারিয়া সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা কালীপূজা করে থাকে। এক্ষেত্রে গ্রামের মোড়ল গ্রামস্থ সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে যে কোনও নির্দিষ্ট দিনে কালীপূজা করে। পূজার দিন অনেকেই উপবাস থাকে। পূজা শেষে প্রসাদ খায়।

কয়েকটি সাধারণ পাল-পার্বণ ঃ

দোলযাত্রা বা হোলী উৎসব ঃ

দোল বা হোলি উৎসব একই সাথে কৃষিধারা এবং উর্বরতা কেন্দ্রিক ধর্মধারার সমন্বিত বিবর্তন। সুতরাং যেকোন জনজাতির সাথেই দোল বা হোলি উৎসবের একটি আন্তরিক সম্পর্ক আছে।এই উৎসবের এতটাই ব্যাপকতা যে সারা ভারতে প্রচলিত তিনটি জাতীয় উৎসবের মধ্যে দোল অন্যতম একটি। অন্য দুটি হল দশেরা, এবং দেওয়ালী। কিন্তু দোল বা হোলি উৎসবের আবার অনন্যতা এখানে যে এই উৎসবে ধর্মানুসঙ্গটি প্রকৃতপক্ষে গৌণ হয়ে গেছে এর উৎসব মুখরতার কাছে। সেদিক থেকে দোল এই উৎসব হল একমাত্র সর্বভারতীয় উৎসব যে ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায়ের বিভেদ আবিরের রঙে রঙীন হয়ে আছে।

দোল উৎসবের সূচনায় যে গল্পটি রয়েছে তা হল এই তিথিতেই শিবের ধ্যানভঙ্গ করায় পঞ্চশর দেবতা মদন ভষ্মীভূত হয়েছিলেন। তাই এই উৎসবের আর একটি নাম 'মদনদহন' বা 'কামায়ণ'। এই গল্পের নেপথ্য পটভূমিকায় যে সমাজ ভাবনা রয়েছে তা হল বসন্ত ঋতুর প্রজনন প্রাচুর্যকে ব্যবহার করবার উপলক্ষে বসন্তোৎসব। কোনো কোনো পন্ডিত ভবিষ্য পুরানের মত অনুযায়ী ফাল্গুন মাসকে বছরের শেষ মাস হিসাবে গণনা করে নতুন বছরের সূচনা পর্ব অনুষ্ঠানও বলতে চান। এই উৎসব উপলক্ষে আগুন জ্বালিয়ে 'বুড়ির ঘর' বা 'নেড়ার ঘর' পোড়ানোর যে প্রথা রয়েছে, সেইটি অবলম্বন করে কেউ কেউ একে নববর্ষের সূত্রপাত বলেছেন।

আবার এই অগ্ন্যুসব বা চাঁচর উপলক্ষে জীবন্ত নেড়া (ভেড়া) পোড়ানোর প্রাচীন রেওয়াজকে কেউ কেউ ফসল উৎসবের দ্যোতক বলেছেন।

দোল উৎসবের আগে এই অগ্নিদাহনের একাধিক বিজ্ঞান এবং মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য আছে। ভেড়া অথবা তাজা গাছ পোড়ানো সম্ভবত শস্য দেবতার উদ্দেশ্যে বলি নিবেদনের আদিম প্রথার ধারাবাহী। ঐ আগুনে পূজার যে উপকরণগুলি পুড়ে যায় সেগুলিকে শস্যক্ষেত্রে ছড়ানো অথবা প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করার রেওয়াজ রয়েছে। ভষ্মীভূত ছাই কিছুটা ঘরে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে রাখলে সারা বছর অন্নাভাব হয় না এমন ও একটি সংস্কার রযেছে; ছাই তুলে মাঠে প্রান্তরে ছড়ানোতে জুম্ চাষের ঐতিহ্যকেই মনে পড়িয়ে দেয়। পাহাড়-জঙ্গলে আগুন দিয়ে চাষ উপযুক্ত জমি যোগাড় করে সেই ছাইয়ের গাদার সার জমা জমিতে গর্ত করে বীজ ছড়িয়ে চাষ করার প্রথা কোনো কোনো আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছুদিন আগেও প্রচলিত ছিল। বুড়ির ঘরের আগুনের শিখার ঢাল দেখে ভাল ফসল উৎপন্ন হওয়ার দিক নির্ণয় করা হতো। ঐ ছাই ঘরে রাখলে চাষীর মঙ্গল হবে। জমিতে ভাল ফসল ফলবে এইরকম একাধিক সংস্কারও এই উৎসবের পেছনে কার্যকর। "এ তথ্য এখন অনেকটা পরিস্কার যে, আদিতে হোলি ছিল কৃষি সমাজের পূজা; সুশস্য উৎপাদন কামনায় নরবলি ও যৌন লীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল

তাহার প্রধান অঙ্গ; তার পরের স্তরে কোন সময়ে নরবলির স্থান লইল পশুবলি এবং হোমযজ্ঞ ইহার অঙ্গীভূত হইল। প্রাক বৈদিক আদিম কৃষি সমাজের বলি ও নৃত্যগীতোৎসব বর্তমান হোলিতে রূপান্তরিত হইয়াছে''। (নীহাররঞ্জন রায়/বাঙালীর ইতিহাস)

কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কারের সঙ্গে উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মসংস্কারের অন্যতম দিকটিও বিদ্যমান। হোলি উপলক্ষে নিতান্ত রক্ষণশীল গ্রামীণ সমাজেও নারী পুরুষের মেলামেশার মধ্যে উদার মনোভাব দেখা যায়, তাতে একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে এর পেছনে প্রজননেব প্রাকৃতিক উদাব নিয়মই কাজ করছে।

এই প্রসঙ্গে হোলিতে ব্যবহৃত প্রধান দুটি বঙের কথা উল্লেখ করা যায়, যা হোল যথাক্রমে লাল ও সবুজ, লাল রক্ত এবং সবুজ বসন্ত সমাগমে নতুন পাতার প্রতীক। মনোবিজ্ঞানীরা এই দুটি রঙকে কামনার ব্যঞ্জনাবাহী এবং যৌবনের অনুভূতি সঞ্চারী বলে গণ্য করেন।

বসন্তোৎসবের একটি নাম 'হোলি'। এই নামকরণের পেছনে পুরাণ গল্পকাহিনী কাজ করছে বলে মনে হয়। হিবণ্যকশিপুর ভগ্নী হোলিকা প্রহ্লাদকে হত্যা করার জন্য তাঁকে কোলে নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেন। কিন্তু এই আগুনে প্রহ্লাদ নয় হোলিকা নিজেই পুড়ে মরেছিল। হোলি খেলার অঙ্গ স্বরূপ গালাগালি দেওয়ার যে রীতি রেওয়াজ প্রচলিত আছে তার পেছনে রয়েছে রাক্ষসী ঢুন্‌ঢিকার কাহিনী। গালাগালির অশুচিতায় তার প্রবেশ রোধ করার প্রচেষ্টা এটি।

বাংলাদেশে এসে হোলি উৎসবই দোল উৎসব বা দোল যাত্রায় রূপান্তরিত । বৈষ্ণবধর্মের ব্যপক প্রসারের ফলে রাধা ও কৃষ্ণের বসন্ত রাসলীলা দোল উৎসব হিসাবে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের কাছে জনপ্রিয়, রাধা কৃষ্ণের 'দোলায় গমন' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। দোল অর্থাৎ দোলা বা দোলনা, দোলায় বিশেষ খেলা এই স্মৃতিতেই 'দোল'। গবেষকরা কেউ কেউ দোলনাকে ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে বিষয়টিকে যুক্ত করতে চান। ঋতু দোলায়িত গতিতে আসা যাওয়া করছে প্রতি বছর। তাই বর্ষ শুরুর উৎসব ছিল দোল। শিবের গম্ভীর, গভীর তপস্যা যদি শীতের প্রতীক হয় তাহলে মদনের পুষ্পশর সন্ধান হল বসন্তের সূচনা। ''নতুন ঋতুর এই দোলাচল আবির্ভাব উপলক্ষে মানুষের আনন্দোৎসবই তাই 'দোল' বলে গণ্য। (পূজা পার্বণের উপকথা / পল্লব সেনগুপ্ত)।

বসন্তোৎসবে রঙীন পুষ্পরেণু ফগ্‌গু বা ফাগ একে অপরকে মাখান হয় বলে অনেকে একে ফাগুয়া উৎসব বলে থাকেন। নতুন রবিশ‌ে ‌ব প্রত্যাশার সঙ্গে যৌবন তারুণ্যের দোলা, নতুন বছরের আবাহন সব মিলিয়ে দোল উৎসব এক অন্য মাত্রায় মহিমান্বিত।

মালদহে এই দোল উৎসবের একটি লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য আছে। সমস্ত ভারতবর্ষে যে দিনটি দোল উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট মালদহে সেই দিনটি পরিচিত 'দেব দোল' হিসাবে। সে দিন দেবতার উদ্দেশ্যে আবীর রঙ নিবেদিত হয়। সাধারণ মানুষ দোল খেলে তারপর দিন। এর কারণ হিসাবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মালদহ আগমনের প্রভাবের কথা অনস্বীকার্য। ১৫১৫ খৃঃ জুন মাস অর্থাৎ ৯২১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে গৌড়ের শাসনকর্তা হোসেন শাহের আমলে শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল থেকে বৃন্দাবনে যাবার পথে মালদহের রামকেলি গ্রামের কেলিকদম্ব বৃক্ষের নীচে অবস্থান করেছিলেন। এই সময় মালদহে বহু মানুষ বৈষ্ণবধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। পুরাতন মালদহের অলিতে গলিতে একাধিক বৈষ্ণব আখড়া বা ঠাকুরবাড়ী তার প্রমাণ দেয়। নিমাই প্রেমে এই সব মানুষজনের কাছে চৈতন্যদেবের নিত্য নতুন অলৌকিক ক্ষমতার কথা তাদের কানে আসছিল।

তাদের মধ্যে অন্যতম হল এইরকম একটি ঘটনা — চৈতন্যদেব তখন নদীয়ায়। মুসলিম শাসনে হরিনাম সংকীর্তন করা একেবারে নিষিদ্ধ। এই ব্যাপারে যিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলন তিনি চাঁদ গাজী, নদীয়ার শাসনকর্তা, গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের গুরু। কাজীর সহায় ছিল হিন্দু অবিশ্বাসী তথা পাষণ্ডীর দল।

"যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাকার কৈল দ্বারে।।"

এই বিপদ থেকে নবদ্বীপকে মহাপ্রভু কেমন করে রক্ষা করেছিলেন। কেমন করেই বা হিন্দু বিদ্বেষী চাঁদ গাজীকে বৈষ্ণবমতের স্বপক্ষে এনেছিলেন সেই অলৌকিকতাকে বৈষ্ণব ধর্মবলম্বীরা আজও ভুলতে পারনে নি। কিন্তু যেদিন কাজীর আদেশে হরিনাম সংকীর্তনে আর বাধা রইল না সেই দিনটা ছিল মহাপ্রভুর জন্মরাত্রি ফাল্গুনী পূর্ণিমা। সেই দিন "হরিধ্বনি হৈল সকল নদীয়ায়"। এই দিনটি স্মরণে রাখতেই 'দেবদোল'। রাধা কৃষ্ণের দোল খেলা এবং চৈতন্যদেবের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেই একদিন পরে মালদহের জনসাধারণ দোল বা রঙ খেলে।

শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণব এই তিনটি ধর্মধারাই এই উৎসবের সূচনা লগ্ন থেকে মিলে মিশে আছে। এই উৎসব মালদহের কৃষিজীবী চাঁই সমাজের মূল উৎসব হলেও প্রায় প্রত্যেক জনজাতিরই এটি আন্তরিক অনুষ্ঠান। এই দোল কোনও কোনও অঞ্চলে বিশেষত বৈষ্ণব অধ্যুষিত অঞ্চলে এই উৎসব চলে একাধিক দিন ধরে।

পৌষ উৎসব / নবান্ন ঃ

নতুন শস্য ঘরে উঠলে আনন্দোৎসবের রেওয়াজ আছে সারা বিশ্বে। শস্যোৎপাদনপদ্ধতি আবিষ্কারের পর থেকেই এই শস্য উৎসবের ধারা প্রচলিত হয়েছে সারা দেশে এবং সমাজে। এই বিশ্বজনীন ঐতিহ্যেরই ধারাবাহী আমাদের পৌষ সংক্রান্তির বিভিন্ন উৎসব। এই পৌষ উৎসব যা বাংলা ভাষাভাষী সব সম্প্রদায়ের লোকই পালন করে অল্পবিস্তর নিয়মের হের-ফেরে। জীবনানন্দ এই রীতি রেওয়াজকেই নবান্ন নামে ধরে রেখেছেন তাঁর কাব্য কবিতায় —

"এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনও পেয়েছে;
নতুন চালের রসে রৌদ্রে কত কাক
এ পাড়ার বড় মেজো .... ও পাড়ার দুলে বোয়েদের
ডাক শাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত ...."।

নবান্ন উৎসব পালনের কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ বা তিথি নেই। ফসল গোলাজাত করার পর যে কোন দিনই তা করা যেতে পারে। যদিও ব্যক্তিগত আয়োজনের এই অনুষ্ঠানে বাড়ির মেয়েরা অগ্রাণ মাসের একটি শুভদিনকেই নির্বাচন করেন। 'নবান্ন' অনুষ্ঠানটি কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই।

পুরাতন মালদহের প্রায় সব গৃহস্থ পরিবারে নবান্ন আজও একটি অবশ্য পালনীয় উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। তিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলে। নির্ধারিত দিনের আগের দিন নখ কেটে স্নান করে সংযম পালন করতে হয়। সেদিনের আহার দই, খৈ আর ডাল ভিজানো। রাতে পাঁচ রকমের

সবজি দিয়ে তরকারী রান্না করে ভাত খাওয়া। দ্বিতীয় দিন সকালে স্নান করে লক্ষ্মী নারায়ণ পূজো হয়। এই উপলক্ষে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর মতই মূর্তি বিক্রয় হয় পুরাতন মালদার সর্বত্র। এই পূজোর বিশেষ উপকরণ হিসাবে শিকড় শুদ্ধ ধান গাছের চারা, কাঠা ভর্তি ধান, আলপনায় ধান গাছ, পেঁচা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, পদচিহ্ন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। দুপুরে দই আর চিড়ের আহার, রাতে লোকজন নিমন্ত্রণ করে একাধিক ব্যঞ্জন সহ আহার। তৃতীয় দিন 'বাসি নবান্ন'। আগের দিনের বাড়তি রান্নার সাথে লাউ এবং মাছ অবশ্যই খেতে হবে।

পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষজন যারা আজ এই জেলার সাথে অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন তাঁরা আবার এই নিয়মটি একটু অন্যভাবে পালন করেন। উৎসবেব দিন সকালে শীতের কুয়াশা ডাকা ভোরে সূর্য উঠবার আগে বাড়ির কাচি-কাঁচাদের কাজ হল কাকেদের নিমন্ত্রণ করা। বিপুল উৎসাহে তারা বড়ির আনাচে কানাচে, গাছ গাছালির তলায় কাকেদের নিমন্ত্রণ জানায় সুর করে ছড়া কেটে, —

ও কাওরা কো কো কো —
মোগো বাড়ি শুভ নবান্ গো
আইও বইও চালকলা খাইও।

এরপর বাড়ির মাতৃস্থানীয়ারা স্নান অন্তে পিটুলির গোলার আলপনায় বাড়ির আঙ্গিনা চর্চিত করেন। গোলাকৃতি সেই আলপনার মধ্যস্থলে থাকে ধান আব দূর্বা। তারপর চালের গুড়ো, খেজুর গুড়, নারকেল জলে নবান্ন মাখা হয়। সঙ্গে সব রকমের মরসুমি ফল আর পান। ছোট ছেলেরা একটি কলার খোলায় সেই নবান্ন মাখা একটি কলা দিয়ে রেখে আসত গাছতলায় অথবা বাড়ির আনাচে কানাচে। যতক্ষণ না কোনো দাঁড়কাক সেটি এসে খেয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে, চলে তারই অধীর প্রতীক্ষা। স্পষ্টতই নবান্নকে খাদ্য দেবতারূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। পূর্ব পুরুষের আত্মা কাকরূপে নবান্ন গ্রহণ করে গেলে বাকি খাদ্যটা তাঁদের প্রসাদরূপেই গণ্য হয়। প্রতিবেশী, আত্মীয় পরিজনের গৃহেও নবান্ন পাঠানোর রীতি প্রচলিত। এরপর সম্পন্ন পরিবারে বিভিন্ন প্রকারের ভাজাসহ অনেক পদ রান্না কবা হয়। নবান্ন উৎসবের মধ্য দিয়ে শস্যদেবীকে সন্তুষ্টির প্রয়াস এবং নতুন শস্য প্রাপ্তির আনন্দ অভিব্যক্ত। এছাড়া এই উৎসবের অর্ন্তনিহিত যে সুর 'আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হোক', — ব্যাপ্তিতে প্রাণীকুলও যে আমাদের নিকট আত্মীয় একথা আমরা ভুলে যাই না। নবান্ন উৎসবে সেই আত্মীয়তা কাকের মাধ্যমে। আমার গোলায় নতুন ধান উঠেছে, তাতে তোমারও অধিকার, আমার আঙ্গিনায় উৎসবের সূচনায় তুমিও প্রথম অতিথি এই আন্তরিক আবেগই এই উৎসবের মাধ্যমে প্রকাশিত।

নবান্নে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের (কোথাও কোথাও) অংশটুকু ছাড়া অনুষ্ঠানের বাকিটা সবই প্রায় মেয়েদের করণীয়। এই শ্রাদ্ধে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, কেবলই স্মরণ অনুষ্ঠান। সারা বছর ধরে শস্যকে কেন্দ্র করে যত রকমের উপলক্ষ্য বাঙ্গালী হিন্দুর সংসারে দেখা যায় তাদের মধ্যে নবান্নের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ নবান্নেই শস্য উৎসবের ফলায়িত সাকার রূপ দেখা যায়।

নবান্ন উৎসবের অনুষঙ্গ ধরে আর একটি অনুষ্ঠানও মালদহ জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। সেটি পৌষ পার্বণ। নতুন শস্য ঘরে উঠলে আনন্দোৎসবের এই রেওয়াজ বহু প্রাচীন, বিশ্বজনীন এবং

বলা যায় আবেদনেও দীর্ঘতম। তাই নবান্নের পরে পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষ পার্বণ। এই উৎসব আদিবাসীদের কোথাও 'আওনি-বাঁওনি', কোথাও বলে 'পৌষ আগলানো'। এই উৎসবের অন্যতম দিক হল বিভিন্ন ধরনের চালের তৈরী খাদ্য নির্মাণ। পিঠে-পুলি, পায়েস ইত্যাদি সুখাদ্য তৈরী এবং বিতরণও এই পৌষালি উৎসবের অঙ্গ।

করম উৎসব ঃ

করম উৎসব মালদহ জেলার নিজস্ব সংস্কৃতি না হলেও বিহার ও ছোট নাগপুর থেকে আগত শবর, কুরমী, নুনিয়া, বনিক, ডোম, নাগর, বিন্দ, কাহার, মাহাতো ইত্যাদি কৃষিজীবি এমনকি অন্যান্য বৃত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী এই পরব পালন করে। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের পার্শ্ব একাদশী হল পরবের দিন। কিন্তু পরবের প্রস্তুতি চলে পঞ্চমির দিন থেকে। সাধারণতঃ অ বিবাহিত মেয়েরা এই ব্রত পালন করে। পঞ্চমী তিথিতে তারা দল বেধে কোনো পুকুর, নদী বা খালের কাছে যায়। তাদের হাতে একটি করে বাঁশ বা বেতের তৈরী ডালা বা টুপা থাকে। সঙ্গে থাকে হলুদ বাটা, তিল, ভুট্টা, ছোলা, মুগ, কুসি কলাই বা মাস কলাই এবং অন্যান্য শস্য বীজ। তারপর টুপার মধ্যে সংগৃহিত বালিতে বীজগুলো পুড়িয়ে হলুদবাটার জলে দেয়। যার নাম 'জাওয়া' দেওয়া। সমবেত ভাবে গান করতে করতে এগুলি নিয়ে গ্রামের মোড়লের বাড়িতে রেখে দেয়। এই সময় তারা তিল-শিয়রী নামে এক দেবতাকে নাম জানায়। এই করম উৎসব অনেকের মতে শস্যোৎসব কিংবা বর্ষা উৎসব অথবা প্রকৃতি বরণ উৎসব। ভাদ্র মাসের একাদশীর আগের দিন স্থানীয় বন-জঙ্গল থেকে করম গাছ খুঁজে তাতে হলুদ সুতো বেঁধে বরণ করা হয়, পরদিন ঐ গাছ থেকেই দুটো ডাল কেটে নিয়ে আসা হয়। ব্রতীরা বিশ্বাস করে একটা ডাল ধরম অন্যটি করম। করম উৎসবে করম রাজা ও করম রানীর বিবাহ দেওয়া হয়। এই করম রাজা ও রানী যথাক্রমে সুর্য ও পৃথিবীর প্রতীক।

দ্বাদশীর দিন পরবের পারনের দিন। ঐদিন ধানের ক্ষেত থেকে ব্রতীরা ধান গাছ নিয়ে আসে। ঐ ধান গাছের তিনটি, পাঁচটি ও সাতটি ফলক থাকা চাই। বাড়িতে এনে ধান গাছগুলিকে পরিস্কার গোবর লেপা জায়গায় রাখে। তাতে দেওয়া হয় সিঁদুরের টিপ। তারপর কচুপাতায় পান্তাভাত খাওয়া। খাওয়ার পর ধানগাছ পোতার পালা। তারপর সমবেত ভাবে সকলে নাচগান করতে করতে করমের ডাল জলে ভাসিয়ে দেয়।

করম উৎসবটি প্রধানতঃ ভুমিজদের উৎসব। ধীরে ধীরে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষেরাও অনুষ্ঠানটিকে আপন করে নিয়েছেন। বর্তমানে ভুমিজ, কুর্মী, সাওতাল, বাউরি, ভুঁইয়া, হাড়ি, ঘাসি, মাহালি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা উৎসবটি নানাভাবে পালন করে থাকেন।

করম একটি বৃক্ষের নাম। গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে করম গাছ আসলে 'কেলী কদম্ব'। কদম গাছের মত দেখতে এবং বর্ষা কালে কদম ফুলের মতই ফুল ফোটে। ফুলের আকৃতি সাধারণ কদম ফুল থেকে কিছু ছোট। করম গাছকে পাহাড়ি কদম গাছ বলা হয়। স্বল্প সময়ে এই গাছ বেড়ে ওঠে। আসলে বটবৃক্ষ, অশথ্ব বৃক্ষ পুজার মতো প্রাচীন কদম গাছ পুজারই এটি একটি আঞ্চলিক রূপ।

ভাজো ব্রত ঃ

মালদহ অঞ্চলের মেয়েদের আরেকটি নিজস্ব ব্রত অনুষ্ঠান ভাজো ব্রত। যদিও উত্তর পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিন বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের কোন কোন অঞ্চলে ভাজো ব্রত প্রচলিত আছে। মালদহ জেলার পুন্ড্র, ক্ষত্রিয়, মালো প্রভৃতি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ব্রতের ব্যপক প্রচলন দেখা যায়।

ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে এই ব্রত শুরু হয়। ব্রত চলে পর পর আট দিন সন্ধ্যা বেলা। নবম দিবসের অনুষ্ঠান হল গন্ধ ছোঁয়া বা গায়ে হলুদ এবং দশম দিবসে অনুষ্ঠিত হয় ভুট্টা বরের সঙ্গে কলাই কন্যার বিবাহ। ভুট্টা কলাই এর বিবাহের রাত্রে মেয়েরা ছড়া বলে-

কাঁঠালের পাত চিকন চিকন, মাথা লম্বা টেড়ি।
বৈশাখ মাসে দেখতে যেমন জল ছুত্রের হাঁড়ি,
ভাইজ দিদিটে - ডুলিত্ আইলাম তাড়াতাড়ি ....

এর পর ভাজোর বিসর্জন পর্ব। কোন কোন অঞ্চলে বিসর্জনের দিন ফল বলি দেওয়া হয়। তখন ব্রতিনীরা গাইতে থাকে ঃ

কদিনইবা থাকলে ভাজো এবার কাঁদিয়ে যাও।
আবার আসিও ভাজো মুখের পানে চাও।।
নৌকা পাঠাব আমরা আসবে হাঁসি মুখে।
তোমাকে ছাড়িতে ভাজ দম আটকায় বুকে।।

ব্রতিনীদের ধারনা এই ব্রত পালন করলে কুমারী মনের কামনা পুরণ হয় এবং ধন সম্পত্তি ও বংশবৃদ্ধি হয়। তাই ব্রতীরা সেই বিশ্বাসের জোরেই সেই শস্যের মধ্যে বিবাহ দিয়ে তাদের ধ্যান ধারণাকে দৃঢ় বা বদ্ধমুল করতে চায়। এই ব্রত কৃষি দেবতার ব্রত, ভাজোর গোলা হল ধরিত্রীর প্রতীক। এর মধ্যে যে মাটিতে বীজ বপন করা হয় ও জল দিয়ে দানাগুলি থেকে অঙ্কুর বের হয় যা পরিণতিতে একটি গাছের জন্ম দেয়। তাই এই ব্রতে ভাজোর সাধভক্ষণও একটি অন্যতম অংশ। এই ব্রত তাই প্রজনন শক্তি বা উর্বরতাবাদের সঙ্গে যুক্ত।

গাড়শী ব্রত/ গার্শী সংক্রান্তি ঃ

মালদহ জেলার আর একটি প্রচলিত ব্রতের নাম গাঢ়শী ব্রত। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির আগের দিন গার্সী সংক্রান্তি করা হয়। এদিন রাত্রে তুলসী তলায় একটি মানের পাতার উল্টোদিকে ধান, চাল, ছোলা, মাষ, কলাই, মটর, মসুর, যব, গম, আদা, হলুদ, নিমপাতা, হলুদের ফুল, লেবু, নারকেল, সরষের তেল, কাজল, তালের আটি, আতশ ধানের খড়, গুড়, বেতের ডগা প্রভৃতি দ্রব্য রাখা হয়। একে বলা হয় গাঢ়শী জাগানো।

এই ব্রত গার্হস্থ বা গুরুব্রত। কলার খোলের নৌকায় লাল, হলুদ, সবুজ এই তিন রঙের তিনটি পিটুলির মূর্তি স্থাপন করা হয়। এই দেবতা হলেন যথাক্রমে লক্ষ্মী, কুবের ও নারায়ণ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন ভাবে আশ্বিন সংক্রান্তির দিন এই ব্রত পালন করে। সূর্য ওঠার আগের মূহুর্তে এই ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। কোন কোন জায়গায় এই ব্রতের আচার রূপে ছোট

ছেলেমেয়েরা প্যাকাটিতে আগুন ধরায়,আবার কোথাও কুলো উল্টো করে প্যাকাটি দিয়ে কুলো বাজায়। পরদিন খাওয়া হয়, সরষের তেল মুখে মাখা হয় এবং কাজল পড়া হয়। বেতের ডগা রান্না করে খাওয়া হয়। হলুদের ফুলের জল চোখে মুখে দেওয়া হয়। আতশ ধানের খড় ফলের গাছে বেঁধে দেওয়া হয়। এই ব্রতের প্রসাদ কেবল মেয়েরাই খায় কারণ লোকবিশ্বাস এই প্রসাদ ছেলেরা খেলে তারা অনুভূতিহীন হয়ে যায়। সকলের সুখ সমৃদ্ধি ও গৃহপালিত পশুর মঙ্গল কামনায় নারীরা এই ব্রত পালন করে।

ষাটব্রত ঃ

জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি থেকে ৩-রা আষাঢ় পর্যন্ত মালদহ জেলার কোন কোন সম্প্রদায় যাটব্রত পালন করে। সধবা ও কুমারীরাই সাধারণতঃ এই পূজা করে থাকে। জৈষ্ঠ্যমাসের শেষের চারদিন আগে এই ব্রতের জন্য পিঁড়ি সাজান হয়। কাঠের পিঁড়ির ওপর মাটি দিয়ে তার ওপর পঞ্চশস্য দানা রাখা হয়। তারপর জল ছেটানো হয়, শস্য দানা থেকে অঙ্কুর বের হলে সেগুলিকে একসাথে পিরামিডের আকারে বাঁধা হয় এবং এর মাথায় লাল জবা ফুল বেঁধে দেওয়া হয়। ঐ পিঁড়িতেই এবপর পূজা হয় লক্ষ্মী,বাসুদেব ও হর গৌরীর। যথাবিহিত পূজার্চনার পর ব্রতিনীরা ব্রত কথা শোনে। এই সময় তারা চালের গুঁড়ো পুতুল,হাঁড়ি, উনুন ইত্যাদি তৈরী করে, তারপর সেইগুলি দেবতাকে উৎসর্গ করে। সবশেষে ব্রতীরা তুলসীপাতা হাতে নিয়ে সেটি পিঁড়ির পাশে রেখে দিয়ে ব্রত পালন শেষ করে।

যাটব্রত কথার তিনটি কাহিনী আছে- ওক্নাই গৌরী ও ছত্রকাকই এর কথা, দায়োবায়ো দুই ভগ্নীর কথা এবং ঘটপাতালী ভাসার কথা।

এই ব্রতের পূজা উপকরণের মধ্যে নানা শস্য দানা ও নানা ফল দেওয়া হয়। পূজোর পদ্ধতি অনুধাবন করলেই বোঝা যায় ব্রতটি কৃষি ও সন্তানের সঙ্গে যুক্ত। যাট অর্থাৎ ষষ্ঠী তাই এই ব্রতের মধ্যে সন্তান লাভের কামনাও অভিব্যক্ত হয়। এই ব্রতের তিনটি কথা কাহিনীতেই সন্তান লাভ ও শস্য প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে । তাই এই ব্রতটি প্রজনন বা উর্বরতা তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত একথা সহজেই বলা যায়।

কুলো নামানো ব্রত ঃ

বৃষ্টির কামনায় নারীদের আচরিত এই ব্রতের নাম কুলো নামানো ব্রত। মালহের বামনগোলা, গাজোল, হবিবপুব ইত্যাদি রুক্ষ মাটির আদিবাসীরা যেমন চাঁই, রাজবংশী ও অন্যান্য উপজাতির নারীরা একটানা অনাবৃষ্টির আশঙ্কায় এই ব্রত পালন করে। বৈশাখ মাসের প্রচন্ড গরমে যখন পুকুর ও নদীর জল শুকিয়ে যায় তাদের অত্যাবশ্যকীয় বোরো ধান চাষের সময় তখন চাষের প্রয়োজনে বৃষ্টির জন্যে আকাঙ্খা অধীর হয়ে ওঠে। ব্রতিনীদের বিশ্বাস কুলো নামালে আকাশে মেঘ করে বৃষ্টি হবে তাতেই ফসল হবে। তাই গান গেয়ে মেয়েরা এই ব্রত পালন করে।

যে কোন গৃহস্থবাড়ির উঠোনের মাঝখানে একটি পিঁড়িতে চিত্রিত কুলো রাখা হয়। কুলোয় মাঝে জলভর্তি ঘট। ঘটের পাশে থাকে কিছু দূর্বা, ফুল, ধান এবং অন্যান্য শস্য বীজ। এই

কুলোটি মাথায় নিয়ে মেয়েরা সবাই মিলে গান গাইতে গাইতে নাচে। বাড়ির গৃহিনী এই সময় এক ঘটি জল এনে চারদিকে ছিটাতে থাকেন। এরপর এই একই প্রক্রিয়া চলে অন্যান্য বাড়িতেও। সেখানেও একই ভাবে এই অনুষ্ঠান চলে। তাদের গেয় গানটি মূলতঃ এই রকম ঃ —

হ্যাদে লো বুন মেঘরানী, হাত পা ধুইয়্যা ফ্যালাও পানি।।
ছোট ভুঁইতে চিনচিনানি। বড় ভুঁইতে হাঁটু পানি।
মেঘরানীর ঘরখানি পাথরের মাঝে।
হেই বৃষ্টি নামালো ঝাঁকে, ঝাঁকে।
ক্যালা মেঘ ধন্যা মেঘ বাড়ি আছনি,
গোলায় আছে বাজ ধান বুনতে পারনি।
হ্যাদের কালা মেঘ আস্য রে আস্য।

প্রাচীন কালের যাদুক্রিয়ার সূত্রেই এই ব্রত পালন করা হয় সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মুসলিম সমাজের নারীরাও বৃষ্টির আকাঙ্খায় এই ধরনের ব্রত পালন করে, তারা এই ব্রত পালনকে বলে 'কুলো-ঘট ব্রত'।

গোট গরব (সূর্য ব্রত) / ধুনুচি ঘোরা ঃ

মাঘ মাসের প্রথম রবিবারে মালদহ জেলায় অনুষ্ঠিত হয় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষের আর এক জনপ্রিয় পার্বণ সূর্যব্রত। কোথাও বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক তাকে বলেন গোট-পরব কেউ ধুনুচী ঘোরা।

সূর্যের এই ব্রত বাংলার নানা জায়গায় বিভিন্ন ভাবে উদ্‌যাপিত হয়। মাঘ মাসের এই বিশেষ দিনটিতে এই ব্রত পালনের তাৎপর্যটি হল এই যে, সেদিন থেকে সূর্যের উত্তর দিকে যাত্রা আরম্ভ হয়। সূর্যের সেই গতি উত্তরায়ণ নামে পরিচিত। সূর্য শক্তি ও আলোর উৎসের দেবতা। পথ পরিক্রমার এই বিশেষ ক্ষণটিতে তাই সূর্যের কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা করে নেওয়া। লোক-আচরিত ধর্মে এই সূর্য ধর্ম, ইতু, রাল-দুর্গা, মাঘ-মন্ডল, রেবন্ত ইত্যাদি নামে পূজিত হয়ে আসছেন। অখন্ড বাংলার প্রতি জাদুঘরে প্রায় বত্রিশ ধরনের সূর্যমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। মালদহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তেও বিভিন্ন আকারে অনুভবে এই মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, যার অনেকগুলিই মালদহ মিউজিয়ামে রক্ষিত রয়েছে।

সূর্যব্রতের মাহাত্ম্য প্রাচীন ইতিহাসকে কেন্দ্র করে প্রভাবিত হয়েছে। বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল সম্রাটেরা দীর্ঘদিন ধরে রাজত্ব করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের সেই গৌরব সেন রাজাদের আমলে এসে অস্তমিত হয়। কিন্তু লোক-কবিরা তাদের ছড়া-কাহিনী ও গরানের আঙ্গিকে ও বিভিন্ন অলৌকিকতা মধ্যে দিয়ে এই বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্যকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। ধর্মমঙ্গল সাহিত্য এবং সূর্যব্রত তাদেরই একটি। সূর্যব্রতের লোক কথাটিতেও তারই প্রভাব। — গৌড় নৃপতির সুন্দরী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ হয় গৌড়রাজেরই এক বৃদ্ধ সামন্ত রাজ কর্ণ সেনের সাথে। রঞ্জাবতী সূর্য দেবতার ভক্ত ছিলেন কিন্তু তার কোন পুত্র সন্তান না থাকার তাঁকে অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছিল। পুত্রের জন্য অনেক প্রার্থনা করে সফল না হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন বলে মনস্থ করেন। সূর্য দেবতা প্রসন্ন হয়ে রঞ্জাবতীকে আশীর্বাদ করলেন। এরপর রঞ্জাবতী

এক পুত্র সন্তান লাভ করলেন, নাম দিলেন লাউসেন। সাহসে, সৌন্দর্যে আর সূর্যের প্রতি ভক্তিতে লাউসেন বড় হয়ে উঠলেন। গৌড়েশ্বর এই বীরকে নিজ রাজ্যের সেনাপতি নির্বাচিত করলেন। লাউসেন কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করলেন। অনেক বিদ্রোহী রাজাকে পরাজিত করে গৌড়ের বশ্যতা স্বীকার করালেন। লাউসেন কামরূপরাজকে পরাজিত করে তাঁর কন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করলেন। এতে গৌড়ের মহামন্ত্রী মাহমুদ বা মাহুদ্যা তার ক্ষতি করার চেষ্টা করলে সূর্যদেবের অভিশাপে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হলেন। একদিন গৌড়ে অবিরাম বৃষ্টিপাত শুরু হল। এই বৃষ্টির ফলে সমস্ত গৌড়রাজ্য জলমগ্ন হল। লাউসেন তখন গৌড়বাসীর এই দুঃখে বৃষ্টিপাত বন্ধ করার জন্য গভীর তপস্যায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। ধর্মের কৃপায় বৃষ্টিপাত বন্ধ হল গৌড়ের সমৃদ্ধি ফিরে এল। পরবর্তীকালে লাউসেন গৌড়ের রাজা হলেন। — সূর্যব্রতের এই কাহিনী অনুসারে এই কাব্যের পটভূমি হচ্ছে পালযুগের গৌরবময় ইতিহাস, যখন ধর্মপালের পুত্র দেবপাল গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেবপাল (আনুমানিক ৮১০-৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) উৎকল ও কামরূপের রাজাদের পরাজিত করেন। গল্পের লাউসেন কামরূপরাজকে পরাজিত করে তাঁর কন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করেছিলেন। ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়- এর মতে দেবপালের কোন সামন্ত অথবা তাঁর খুড়তুতো ভাই জয়পাল কামরূপ ও কলিঙ্গ জয়ে গিয়েছিলেন। কালক্রমে সেই কাহিনীই লাউসেন নামের কোন চরিত্রের কল্পনায় আঁকা হয়েছে। তবে পালবংশের গোড়ার দিকে রাঢ়ের দুর্বিনীত সামন্তদের সঙ্গে গৌড়েশ্বর পালরাজাদের যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। সেইরকম কোন ইতিহাসের ক্ষীণসূত্র ও এই কাহিনীতে থাকতে পারে। কেউ কেউ আবার এই কাহিনীকে পালযুগ পরবর্তী সেনযুগেও আনতে চান। বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় রক্ষিত শ্যাম পন্ডিতের 'নিরঞ্জন মঞ্জিলে' কবি বল্লাল সেনের নাম উল্লেখ করে লাউসেনকে (লক্ষণ সেন?) ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন। এই কাব্যে লক্ষণ সেন নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

শুন মোর পূর্ব কথা বিশ্বাস আছিল যেথা
কহি তোরে করিয়া নিশ্চয়।
কণকসেন পিতামহ সেনভূমে আছিল গেহ
কর্ণসেনের আমি তোক।
বল্লাল সেনের গোষ্ঠী যার সৃষ্টি আনাসৃষ্টি
যার কীর্তি ঘোষে সর্বলোক।

হয়ত মূল ঘটনার প্রায় সাত-আট শত বৎসর পর ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী দানা বেঁধে উঠায় কবিরা ইতিহাস গত দিক থেকে কিঞ্চৎ গোলমাল করে ফেলেছেন। তবে গৌড়রাজ্য যে বার বার অতিবৃষ্টির দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল ইতিহাসগত ভাবে সে তথ্য সত্য।

সূর্য পূজার রীতি নিয়মের মধ্যে আছে কোনও নির্দিষ্ট স্থান বা বেদিতে কাঁচা মাটির তৈরী এক শায়িত মূর্তি (হবিবপুর, পাকুয়াহাট ইত্যাদি বরিন্দ অঞ্চলে যা আজও কোথাও কোথাও জমির আলকেই এই শায়িত পুরুষ মূর্তির রূপচিত্র দেওয়া হয়)। মাথার চারিদিকে আলোর রশ্মি। পায়ের কাছে আকাশী কলার গাছ। কাঁদি শুদ্ধ কলা গাছটিকে বিভিন্ন ফুল ও সিন্দুর দিয়ে সাজান হয়। দেওয়া হয় আলপনা। পূজার উপকরণ হিসাবে থাকে কলার ছড়ি-সুপারি, মিষ্টি, বাতাসা ও তিলের নাড়ু বা তিলুয়া। বিবাহিত মেয়েরাই সারাদিন উপবাস করে সন্ধ্যাবেলা এই পূজা করে।

পুরোহিত ছাড়া এই পূজোয় পুরুষদের প্রবেশাধিকার নেই। পূজা অন্তে ব্রতকথা চলাকালীন মেয়েরা শায়িত সূর্যদেবকে প্রদক্ষিণ করে মাথায় দুধ ও জল ঢালে। পায়ে এঁকে দেয় মেটে সিঁন্দুরের প্রলেপ। পূজা শেষ করে ভক্তের দল কলা গাছ থেকে একটি করে আকাশী কলা নিয়ে যায়, বিভিন্ন রোগের ঔষধ হিসাবে। সন্ধ্যাবেলা আপত চালের গুঁড়ো গুলে 'চিতুয়া' পিঠা তৈরী করে যা দুধ আর গুঁড়ে সিদ্ধ করে নিয়ে তাই দিয়ে উপোস ভঙ্গ করে। সূর্য-পূজোর আর একটি অংশ হল ধুনুচী - ঘোরা। ভক্তদের মধ্যে যারা মানত করেন তারা লালপেড়ে শাড়ি পরে পুকুর অথবা নদীর জলে স্নান করে পূজাস্থানে জড়ো হন। মাথায় থাকে মেটে সিঁন্দুরের দীর্ঘ প্রলেপ, দুহাতে জ্বলন্ত ধূনুচি। তারপর কাঁসর ঘন্টা আর ঢাকের আওয়াজের তালে তালে চলে নৃত্য। নৃত্য শেষ হয়ে গেলেও তারা বিশ্রাম নেবেন না, যতক্ষণ না সূর্য অস্ত যায়। সূর্য অস্ত গেলে তারপর ধূনুচি সহ আবার জলের ধারে গিয়ে ধূপচি বিসর্জন দিয়ে সূর্য বন্দনা করে, পূজা প্রাঙ্গণ থেকে আর্শীবাদী ফুল বেলপাতা দিয়ে ব্রতভঙ্গ হয়।

মালদহের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সূর্যব্রত আজও একটি জনপ্রিয় লোকাচার। কোতোয়ালি অঞ্চলে এই পূজার প্রধান অঙ্গ ধূপচী নিয়ে ভক্তের সূর্য প্রদক্ষিণ। কালিয়াচক থানার শুকপাড়ায় সূর্যব্রতের দিন পাঁঠা ও কবুতর মানত করা হয় কিন্তু বলি দেওয়া হয় না। রতুয়া থানার সিমলা গ্রামে সূর্য মূর্তির পাশে তিনটে কলা গাছ পোঁতা আবষ্যিক। মানিকচক থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে নারী-পুরুষ উভয়ে ধূপচি নিয়ে ঘোরে। কালিয়াচক ও ইংরেজবাজার থানার কিছু কিছু গ্রামে মূর্তির সামনে ব্রতধারিনীরা সন্তানের মঙ্গল কামনায় মাটির ঘোড়া উপহার দেন।

সূর্য পূজা যে বৌদ্ধ ধর্মাশ্রিত শূণ্য পূজারই পরিবর্তিত রূপান্তরিত আচার তা বোঝা যায় এই পূজার মূল মন্ত্রের মাধ্যমে, ''— সেই শূন্য মূর্তির ধ্যানই আমরা করি যার কোন আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই। তার হাত নাই, পা নাই, তার কোন দেহ নাই, কোন শব্দ নাই, রূপ নাই, কোন আকার নাই, তার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি যোগীদের ধ্যান দ্বারাই লভ্য। তিনি সর্বব্যাপ্ত, তিনি সমগ্র পৃথিবীর প্রভু, তিনি ভক্তদের মনের আকাঙ্খা পূর্ণ করেন এবং তিনি দেবতা ও মানুষকে বরদান করে থাকেন।''

(তথ্যসূত্র ঃ তুষার কান্তি ঝা / ললিত মোহন উচ্চ বিদ্যালয়, কেকা কুমার / গৌড় মহাবিদ্যালয়)

লক্ষ্মীপূজা ঃ

মালদহ জেলার আদিবাসী কৃষক সম্প্রদায় এবং জেলে সম্প্রদায়ের মানুষেরা কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন এবং অন্যান্য দিনেও লক্ষ্মীপূজা করে থাকেন। সাধারণতঃ প্রত্যেক বাঙ্গালীর কাছেই এই দেবী বিত্ত ও সম্পদের প্রতীক। কিন্তু বর্তমানের পরিচিত এই দেবী মূর্তির সঙ্গে পৌরানিক তথা বৈদিক লক্ষ্মীর খুব বেশি মিল পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগের লক্ষ্মী শস্য সম্পদের দেবী নন। আদিম মানুষ সমুদ্র থেকে মৃত্তিকার জন্মের কথা যা কল্পনা করে এসেছে তার থেকেই তৈরী হয়েছে সমুদ্র মন্থনের গল্প। ইন্দ্রের ঐরাবত দুর্বাশার দেওয়া মালা ছিঁড়ে ফেললে মুনির শাপে ইন্দ্র হলেন লক্ষ্মী পরিত্যক্ত; দেবী আশ্রয় নিলেন সমুদ্রতলে। ফলে সারা বিশ্বের সম্পদ গেল শুকায়ে। এরপর দেবতারা অসুরদের সঙ্গে সন্ধি করে বাসুকি নাগ এবং

মন্দার পর্বতের সাহায্য সমুদ্র মন্থন করে অমৃত ভান্ড সহ দেবীকে সমুদ্র থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। এরপর দেবতাদের দ্বারা প্রতারিত হন অসুরজাতি। এই প্রাচীন কাহিনিই সাঁওতাল পুরাবৃত্তে আজও জনপ্রিয় যে, কচ্ছপের পিঠে পৃথিবীর মাটি সমুদ্রেব তলা থেকে উঠে এসেছে। তাই প্রাচীন অবৈদিক লক্ষ্মীকে কল্পনা করা হয়েছে বসুন্ধরা রূপে। আবার সমুদ্র মন্থনের মিথে দিক্‌নাগ (হাতি) কর্তৃক দেবীবন্দনা করে কাহিনীতে দেবী পরিণত হয়েছেন হস্তীবাসনা গজলক্ষ্মীতে যা 'কমলে কামিনী' রূপে বাঙালী বণিক জাতির আরাধ্যা। বিবর্তনের পথে দেবী পরিণত ধন ও শস্যের প্রতীক রূপে। সমুদ্র মন্থনের সেই প্রতীক আজও বহন করেছে দেবীর কাছে কড়ির অস্তিত্ব। বাহনরূপে পেঁচার সংযোজন এই সময়েই। কারণ রাতজাগা এই পাখিই শস্যক্ষেত্রের এবং ধন সম্পত্তির উপযুক্ত প্রহরী বলে মনে করা হয়েছে। কোজাগরীও প্রকৃত পক্ষে শস্য রক্ষার রাত প্রহরা। তাই শস্য লাভের আশায় কৃষিজীবী যে কোন সম্প্রদায় এবং মৎসজীবী জেলে সম্প্রদায় অন্যান্য পাল পার্বনের সাথে এই লক্ষ্মী পূজা করে থাকেন নিষ্ঠা ভরে।

ইসলাম ধর্মালম্বীদের আচরিত অনুষ্ঠান ঃ

রামজান ও ঈদ ঃ

হিজরি মতে, রামজান নবম মাসের নাম। এই নামটিই কেবল কোরাণে উল্লিখিত আছে। এই একমাস ধরে উপবাস পালন করেন মুসলিমরা। উপবাস পালনের পরদিনই পালিত হয় ঈদ। হাদিসে উল্লেখ আছে, এই মাসে উপবাসকারীদের জন্য খুলে যায় ধর্মের দরজা, রুদ্ধ হয় নরকের দরজা। এই মাসটি মুসলিমদের কাছে মর্যাদাপূর্ণ তিনটি কারণে (ক) এই মাসেই কোরাণ নির্গত হয়েছিল, (খ) এই মাসেই মোহাম্মদ মেরাজে গিয়েছিলেন, (গ) এই মাসেই মহম্মদ প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন। ২৭ শে রমজানের রাতটি শব-এ-কদরের রাত। এই রাতের মহিমা কীর্ত্তন করে হাদিস বলে- এই রাতেই কোরাণ নির্গত হয়েছিল।

ইসলাম একটি সহজধর্ম এবং এর অনুষ্ঠানাদি সামান্য ও আড়ম্বরহীন। তথাপি বাংলার মুসলমানরা এই উৎসবগুলোকে বিরাট আনন্দ উৎসবে পরিণত করে। তাবাকাৎ-ই-নাসিরী থেকে জানা যায় যে, সুলতান গণ রমজান মাসে দৈনন্দিন ধর্মীয় আলোচনার ব্যবস্থা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে ধর্ম প্রচারক নিযুক্ত করেন। তারা ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহার নামাজ পড়ার জন্য ইমাম ও নিযুক্ত করেন। শহরের বাইরে বিরাট উন্মুক্ত জায়গায় অথবা গ্রামের নির্দিষ্ট স্থানে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হতো। এইসব জায়গাকে ঈদ্‌গাহ বলা হোত। (তাবাকাৎ-ই-নাসিরী, পৃঃ ৬১৯-২০)

বাহারিস্তান-ই-গায়েবীর লেখক মির্জা নাথনের বর্ণনা ও রমজান ও অন্যান্য উৎসবাদি সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করে। তিনি বলেন, "রামজান মাসের সূচনা থেকে এর শেষ দিন পর্যন্ত ছোটবড় সকলে প্রত্যহ নিজ নিজ বন্ধুর তাবুতে যেতেন, এটা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে, প্রত্যহ সকালে এক একজন বন্ধুর তাঁবুতে সময় কাটতো। সেই অনুসারে (পৃঃ - ১১০) - এই মাসে প্রতি রাত্রে অবস্থাপন্ন মুসলমানদের গৃহে সাক্ষাৎ করা খানাপিনার আয়োজন করা হতো।

ঈদ-উল-ফিতরের নতুন চাঁদ দর্শনে মুসলমানদের আনন্দ উৎসবের ইঙ্গিত ও মীর্জা নাথনের বর্ণনায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "দিনের শেষে যখন মোমবাতির আলোকে নতুন চাঁদ দেখা গেল তখন শিবিরে রাজকীয় বাজনা বেজে উঠল এবং আগ্নেয়াস্ত্র ক্রমাগত অগ্নি উদ্‌গীরন করে চলল।" (পৃঃ - ১১০)। বাংলাদেশে মোগল সৈন্যদের ছাউনি থেকে ঈদের আনন্দবার্তা ঘোষণা করা হতো। এ থেকেই প্রমাণ হয়, কিভাবে মুসলমানরা ঈদ উৎসবকে স্বাগত জানাতো এবং আনন্দ উৎসবে আমোদ প্রমোদ করতো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সুন্দর নতুন কাপড় পড়ে। গোলাম হোসেন ঈদ-উল-আজহাকে আনন্দ স্ফুর্তি ও সকল মানুষের জন্য নতুন পোশাক পরিচ্ছদ পরার একটি দিন বলে উল্লেখ করেছেন। মুসলমানরা সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে শোভাযাত্রা করে ঈদগায় যেত। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা উৎসবেব সময়ে মুক্ত হস্তে অর্থ ও উপহারাদি চলার পথে ছড়িয়ে যেতেন আর সাধারণ মুসলমানরা গরীবদের দান খয়রাত করতেন। নওবাহার-ই-মুর্সিদ কুলীখান গ্রন্থের লেখক আজাদ হোসেনী বিলগ্রামী লিখেছেন, যে, নবাব সুজাউদ্দিনের অধীনস্থ ঢাকার সুবাদার মুর্শিদকুলী খান ঈদের দিনে ঢাকার দূর্গ থেকে ঈদগার ময়দান পর্যন্ত একক্রোশ পথে প্রচুর পরিমান টাকাকড়ি ছড়িয়ে দিতেন (পৃ - ৮)। মুসলমানরা ঈদগায় বিরাট জমায়েতে ঈদের নামাজ পড়তেন ও আমোদ প্রমোদ চলতো এবং সর্বত্র অভিনন্দনের আনন্দে মুখরিত হতো। এই সমস্ত বড় উৎসবের দিনে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ ও একত্রে আনন্দ উৎসব করার জন্য তাঁরা বন্ধুবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের বাড়ি গমনাগমন করতেন।

কোরবানি তথা ঈদ-উল-আজহা ঃ

মুসলমানদের দ্বিতীয় বড় উৎসব কোরবানি। এই পার্বণে লুকিয়ে আছে প্রাচীন আরবের লোকবিশ্বাস। ঈদ-উল-আজহার পশুবলি এবং ইব্রাহিম ইসমাইলের পুরান কথা খুঁটিয়ে দেখলে জানা যায় প্রাচীন আরবের পশুবলি প্রথাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই উৎসব। (আরব ঈশ্বর/বাহারুদ্দিন (সমন্বয়-শারদ ১৯৯৩) এটি ত্যাগের অনুষ্ঠান। এই উৎসবের উৎপত্তি হয়েছিল পয়গম্বর ইব্রাহিম থেকে। আল্লাহর পথে হযরত ইব্রাহিম এর এই মহৎ দৃষ্টান্ত মুসলমান অনুসরণ করেন। এই উৎসবের দিনে মুসলমানগণ নতুন কাপড় পরিধান করে তকবীর ধ্বনি পুনরাবৃত্তি করতে করতে মিছিল সহকারে ঈদগায় যেতেন। বিরাট জমায়েতে নামাজ পড়তেন, ভ্রাতৃসুলভ অনুরাগে একে অন্যাকে অভিবাদন করতেন। অতঃপর তারা তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী গরু, ছাগল, মহিষ বা উট কোরবানি করতেন ও নিজেদের মধ্যে ভোজের ব্যবস্থা করতেন। কোরবানি করতে অসমর্থ গরীব লোকদের মধ্যে ভোজের ব্যবস্থা করতেন। এটা ছিল আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের এবং খানাপিনা ও একত্রে আনন্দ উৎসব করার বিশেষ পর্ব। ঈদ-উল-আজহার উল্লেখ প্রসঙ্গে মীর্জা নাথন বলেন, "উৎসবের দিনে বন্ধুজন, আত্মীয় স্বজন ও রাজকর্মচারীরা একে অন্যের নিকট যেতেন এবং ঈদ উপলক্ষে তাদের অভিনন্দন জানাতেন। সৈন্যাধ্যক্ষ সুজাত খান এই উৎসবের দিনটিতে বন্ধু বান্ধবের আপ্যায়নের নিমিত্ত একটি সামাজিক সম্মেলনীর আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে উপহার উপঢৌকন বিতরণ করা হতো।

শব-এ-বরাত ঃ

শাবান মাসের ১৫ তারিখ শব-এ-বরাত সামাজিক পর্ব হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর আচার অনুষ্ঠানে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন লোকবিশ্বাস। মিশর, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে নববর্ষ পালনের যে রেওয়াজ ছিল তার সাথে এই রাতের গাঢ় সম্পর্ক লক্ষ্য করেন আরবীয় তাত্ত্বিকেরা। কোরাণে এই রাতের কোনও উল্লেখ নেই, লোক বিশ্বাস, এই রাতেই ভাগ্য নির্ধারিত হয়। প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাস এই যে, শব ই-বরাত খুব গুরুত্বপূর্ণ রাত, এই রাতে আল্লাহ্ মানুষের জন্য রুজি বন্টন করেন। বিশ্বাস এই যে, প্রার্থনা, পবিত্র, কোরআন পাঠ ও পূণ্য কার্যের মাধ্যমে এই রাত্রি যাপনের জন্য মহানবী মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। কোন কোন পন্ডিত মনে করেন শব-ই-বরাত হিন্দুদের শিবরাত্রি উৎসবের অনুকরন। (কে.এম.আশরফ - Life and condition of the people of Hindusthan, p-205)। এর উৎস যাই হোক না কেন, মুসলমানরা এই পর্বটিকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব হিসাবে পালন করে থাকেন। এই দিন খাওয়া-দাওয়া আলোক সজ্জা ও আতশবাজীর আনন্দ উৎসব করারও একটি বিশেষ উপলক্ষ্যে পরিণত করেছেন।

মহরম ঃ

ইরানে শিয়া অভ্যুত্থানের আগে ইসলামে মহরমের কোন অস্তিত্ব ছিল না। হজরত মোহম্মদের দৌহিত্র শাহাদত কারবালার ময়দানে নিহত হয়েছিলেন। ৬৮০ হিজরীতে এজিদের হাতে এই দিনটিতে ইরাকের কুফায় নিহত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর হত্যাকে কেন্দ্র করে তাঁর সমাধিস্থল হয়ে ওঠে প্রধান তীর্থক্ষেত্র। আত্মবলির প্রতীক হিসাবেই শিয়ারা এই দিনটি পালন করেন। এই অনুষ্ঠানটি ধর্মীয় নয় লোকজ। ইরানীয় লোকবিশ্বাস থেকে জন্ম নিয়েছে মহরম, অনেকের ধারণা , মেসোপটেমিয়াদের পূজার আচার আচরণকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এই লোক বিশ্বাসজাত শিয়া কিংবদন্তী। (আরব ঈশ্বর/বাহারউদ্দিন/শারদ সমন্বয় ১৯৯৩) ভারতের মুসলমান বিশেষত্ত শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মোহরম পর্বকে কারবালায় হোসেন শাহাদতের বাৎসরিক স্মরনিকা হিসাবে পালন করত। ফাদার মনসেরাও আকবরের সময়কার মোহররম উদ্যাপনের একটি বর্ণনা রেখে গেছেন। তিনি লিখেছেন যে, "মোহররম সময় মুসলমানরা মাসের প্রথম নয়দিনে কেবল নিরামিশ খেয়ে রোজা রাখত এবং একটি উঁচু মঞ্চ থেকে জনসভায় হাসান হোসেনের দুঃখ কষ্টের করুণ কাহিনী বর্ণনা করত। এতে সমস্ত সভাগৃহ শোকে অভিভূত হয়ে পড়ত শেষের দিনে (দশম দিবসে) তারা কয়েকটি চিতার আয়োজন করত এবং এগুলো একটার পর একটা পুড়িয়ে চিতার আয়োজন করত এবং চিতাগ্নিতে ঝাঁপ দিতো এবং নিভে যাওয়া ভগ্নরাশি পায়ের পাতা দিয়ে ছড়িয়ে দিতো। তারা হাসান-হোসেন ধ্বনি দিয়ে ক্রন্দন করতো।

মনডেলসলো — সম্রাট শাহাজাহানের সময়কার 'মোহররম মিছিলের বর্ণনা দিচ্ছেন — ধনুক এবং তীর, পাগড়ী, তরবারী ও সিল্কের পোশাক দিয়ে আবৃত কৃত্রিম শবাধার শহরে বহন করে আনা হত এবং লোকেরা অশ্রুসিক্ত চোখে শোক প্রকাশ করে এগুলোর অনুসরণ করত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মিছিলে নৃত্য করত। অন্যান্য একে অন্যকে তরবারির আঘাত

করতো। কেউ কেউ নিজেদের শরীরে আঘাত করত, এতে তাদের শরীর ক্ষত হতো ও রক্তপাত হোত। এভাবে তারা একটি অত্যন্ত অদ্ভুত শোক মিছিল বের করত। রাতের বেলায় তারা সেই মহাপুরুষদের (হাসান ও হোসেনের) হত্যাকারীদের চিহ্নিত করে খড়কুটোর দ্বারা কয়েকটি মানুষের প্রতিমূর্তি তৈরী করত; এবং তাদের প্রতি বেশ কিছু তীর নিক্ষেপ করে আগুন দিয়ে ভষ্ম করে ফেলত।

সুন্নী মুসলমানগণ মহরম একটি নীরব শোকের পর্ব হিসাবে পালন করতো এবং সাধারণত শিয়াদের আবেগময় খেলা ও মিছিলে অংশগ্রহণ করত না। সুন্নিদের মধ্যে কেবলমাত্র সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা এসব ব্যাপারে অংশগ্রহণ করত। মুসলমানরা মহরমের প্রথম দিনটি নববর্ষের প্রথম দিন হিসাবেও পালন করত। বাহারিস্তান থেকে জানা যায় যে, মুসলমান উৎসব ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের দ্বারা মহরমের চাঁদকে স্বাগত জানাত।

মহরম তাজিয়া আমির তাইমুর প্রচলন করেন বলে মনে করা হয়। প্রকৃত পক্ষে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বুয়াহিদ আমীরগণ কর্তৃক মহরম উপলক্ষে বাগদাদে প্রথম শোকানুষ্ঠান হয়েছিল।

মিলাদ ঃ

বাঙ্গালী মুসলমানগণ রসুলের জন্মবার্ষিকী আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করতেন। নবাব মুর্শিদকুলী খান এই পর্বকে একটি বিরাট উৎসবে পরিণত করেছিলেন। রবিউল মাসের প্রথম বারদিন তিনি লোকেদের আপ্যায়িত করতেন। একটি বিশেষ মুর্হূতে মুসলমানদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে খুশীর সময় ঘোষণা করে তোপধ্বনি করা হতো। মিরাই-ই-সিকান্দরী অনুসারে, গুজরাটের সুলতান দ্বিতীয় মুজাফ্‌ফর (১৫১৫ - ২৫ খ্রীঃ) উলেমা, সেখ ও শেখদের ভোজে আপ্যায়ন করতেন, তার ভোর থেকে প্রায় বেলা দশটা পর্যন্ত হাদিস আলোচনা করতেন এবং অতঃপর তাঁদের ভোজে আপ্যায়িত করা হোত। সুলতান স্বয়ং তাঁর মন্ত্রীগণ ও আমীর-ওমরাহ উলেমা ও শেখদের সম্মানার্থে আবার সময় উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই বিদ্বান ও ধর্মপ্রাণ অতিথিদের এরূপ প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ ও বস্ত্রাদি উপহার দিতেন যে, তা দিয়ে তারা একটি বছর নিজেদের ভরণ-পোষণ চালাতে পারতেন।

এই সময় মুসলমানদের মধ্যে ভোজ ও শোফরানা আদায় এর একটি বিশেষ সুযোগ ছিল।

ফতেয়া দোহাজদম ঃ

লাঞ্ছিতের আসমানে তিনি যেন সোনালী ঈগল
ডানার আওয়াজে তাঁর কেঁপে ওঠে বন্দীর দুয়ার;
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় জাহেলের সামান্য শিকল
আদিগন্ত ভেদ করে চলে সেই আলোর জোয়ার।

— আলমাহমুদ।

মুসলমান ধর্মের প্রচারক মহামানব হজরত মোহাম্মদ (আঃ) এই পৃথিবীতে জন্মেছিলেন ৫৭১ খ্রীঃ ১০ই এপ্রিল। আরবি মাস রবিউল আউয়াল মাসের ৯ম তারিখ, দিন ও রাতের

সন্ধিক্ষণে সুবে সাদকের পূর্ণক্ষণে সোমবারে। হজরত মোহাম্মদের (আঃ) জন্মতারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিক এবং সীরাতকারকগণের মধ্যে যদিও মতভেদ রয়েছে। তথাপি তারা এ বিষয়ে একমত যে তিনি রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম পক্ষে সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তা ৮ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে কোন একদিন ছিল। হজরত মোহাম্মদের (আঃ) জন্মদিনটিকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা ফাতেয়া দোহাজ দহম বা বিশ্ব নবী দিবস হিসাবে পালন করেন। যদিও মুসলিম ধর্মের প্রচারক বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদ (আঃ) নিজে জীবিতকালে নিজের জন্মদিনটিকে বিশেষভাবে পালন করা থেকে তাঁর অনুগামীদের বিরত করেছিলেন। কারণ তিনি কোন বিশেষ দিন নয়, তাঁর সারা জীবনের চর্চাটিকেই সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য কল্যাণকর ও আদর্শ হিসাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

- **তথ্য সহায়তা**

১. লোককথার ঐতিহ্য — দিব্যজ্যোতি মজুমদার।
২. বাংলার লৌকিক দেবতা — গোপেন্দ্র কৃষ্ণ রায়।
৩. উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ও ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ — ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়।
৪. প্রসঙ্গ লোক পুরাণ - - ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী।
৫. লোক সমাজ ও সংস্কৃতি — প্রবোধ কুমার চক্রবর্তী।
৬. আদিবাসী সমাজ ও পাল পার্বণ — ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে।
৭. পূজা - পার্বণের উৎসকথা — পল্লব সেনগুপ্ত।
৮. লোকজীবন মনস্তত্ত্ব শিল্পসৃষ্টি — মানস রায়চৌধুরী।
৯ বাংলার লোকশ্রুতি — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য।
১০. মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোক সাহিত্য — ডঃ সুনীত কুমার মুখোপাধ্যায়।
১১. উত্তরবঙ্গের লোক নাটক ও জনজীবন — সুবোধ সেন।
১২. বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি — ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩. লোক সংস্কৃতি গম্ভীরা — ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ।
১৪. গম্ভীরা ঃ পুর্ণবিচার — ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ।
১৫. সংযোগের সন্ধানে লোক সংস্কৃতি — ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত।
১৬. লোক - সংস্কৃতি গবেষণা — বাংলার মুখোশ বিশেষ সংখ্যা
১৭. বৈতানিক --- উত্তরবঙ্গের লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি সংখ্যা।
১৮. গম্ভীরা — ডঃ পুষ্পজিৎ রায়।
১৯. পশ্চিমবঙ্গের লোক - সংস্কৃতি বিচিত্রা — শ্রীসনৎ কুমার মিত্র।
২০. পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সমাজের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি — ডঃ সুনীল চন্দ্র মণ্ডল।
২১. লোকশ্রুতি — বিভিন্ন সংখ্যা।
২২. লোক সাহিত্যের ইতিহাস — শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।
২৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৪. ঝড় — মুর্শিদাবাদ থেকে সম্পাদকমণ্ডলী দ্বারা প্রকাশিত।

ব্যক্তি ঋণ — শ্রীকমল বসাক (শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়); বাণী ঘোষ (গৌড় মহাবিদ্যালয়); ডঃ পুলক কুণ্ডু (গৌড় মহাবিদ্যালয়); চন্দন সোরেন (গৌড় মহাবিদ্যালয়); গুপীচাঁদ মুর্মু (গৌড় মহাবিদ্যালয়)।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিধিন্ন ধারাসমূহ

মানুষের ব্যক্তি পরিচয়ের পেছনে যেমন একাধিক কারণ বর্তমান, কোনও ভূখণ্ডের ছোট ছোট স্থান নামগুলিও একইরকমভাবে বিবিধ কারণের সমন্বিত রূপ। একটি ভূমিখণ্ডে যুগে যুগে যত জাতি, জনজাতি বাস করেছিল কালের নিয়মে তারা হারিয়ে গেলেও তাদের জীবনবৃত্তের সাক্ষর কোন একটা জায়গায় থেকেই যায়। কালে কালে স্থান নামের নামাবলির শরীরে অনেক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিবর্তন, রূপান্তর এবং বিকৃতিকরণ ঘটলেও ভাষা বিজ্ঞানের সূত্র ধরে সেই প্রপিতামহ পিতামহীর ঐতিহ্য অনুসন্ধানে একটি জাতিব সমগ্রতার রূপটিই প্রকাশিত হয়।

নামকরণের শর্ত হিসাবে কতকগুলি বিষয় কাজ করে ঃ যেমন —

১) জলধারা

২) উদ্ভিদধারা

৩) দেবধারা

৪) পুরধারা

৫) করধারা

৬) কাহিনী-কিংবদন্তীর ধাবা

৭) ব্যক্তি নাম ধারা

৮) লোকধাবা

৯) সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা

১০) জীবিকাধারা

জলধারা ঃ

স্থাননামের ক্ষেত্রে উদক বা জলবৃত্ত একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাকৃতিক উদক বৃত্তে স্থান নাম ভাগ করলে তিনটি স্তর পাওয়া যায়।

(ক) উদকবৃত্ত — পুরোপুরি জল-ই যেখানে স্থান নামের দিশা চিহ্ন। যেমন - কেন্দপুকুর।

(খ) জলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভূমিবৃত্ত। যেমন - আড়াইডাঙ্গা।

(গ) ভূমি ও জল দুটি শব্দই যেখানে মিলে থাকে এমন যুগ্মক শব্দবৃত্ত। যেমন - মালদহ।

গঙ্গা ঃ

পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গে ও গো মা
শ্যাম বিটপী ঘন তট বিপ্লাবিনী
ধূসর তরঙ্গ রঙ্গে।

সমগ্র ভারতের সংস্কৃতি যে নদীর জলধারা প্রাচীন যুগ থেকে বহন করে আসছে সেই নদী হল গঙ্গা। বলা যায় মালদহ বাসীর সুখ-দুঃখ, হাসি কান্নার সঙ্গে আজ একান্ত হয়ে আছে সেই গঙ্গানদী।

গঙ্গা = গম (গমন করা) + গন + কর্তৃ + আপ্; অথবা গো শব্দের দ্বিতীয়ার গাং (পৃথিবীকে), গাং — গম + ড, কর্তৃ + অপ্; যিনি ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে গমন করেছেন। অথবা গঙ্গা বা গাঙ থেকে গঙ্গা।

গঙ্গার চলার পথের ভৌগোলিক বিবরণ এইরকম; হিমালয় পর্বতের পাদমূলে গাড়ওয়াল দেশে এই নদীর উৎপত্তি এবং বঙ্গোপসাগরে এর পতন। মূল নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫৫০ মাইল। এর উৎপত্তির মূলে আছে হিমালয়ের গোমুখ নামের একটি তুষার গুহা। ৮ মাইল প্রবাহিত হয়ে নদীটি গঙ্গোত্রী নামক স্থানে উপনীত হয়েছে; তারপর কিছুদূর এসে জাহ্নবী এবং আরও কিছুদূর এসে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়ে গঙ্গা নাম ধারণ করেছে। মিলনের পূর্বে এর নাম ভাগীরথী। এই মিলন স্থানের নাম দেব প্রয়াগ। দেব প্রয়াগ থেকে উপরি উক্ত মিলিত ধারাটি গঙ্গা নাম নিয়ে হিমালয় ও শিবালিক পর্বতমালা ভেদ করে উত্তরপ্রদেশের হরিদ্বারে এসে সমতল ভূমিতে অবতারণ করে। তারপর বক্রগতিতে দেরাদুন, সাহারান পুর, মজফরনগর, বুলন্দ শহর হয়ে ফারাক্কা বাঁধে এসে রামগঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়। হরিদ্বার থেকে বাঙলাদেশের রাজমহল পর্যন্ত গঙ্গার এই মধ্য গতিতে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে যমুনা, গোমতী, টন্‌স, কর্মনাশা, সারদা, ঘর্ঘরা, গন্ডক, বুড়ীগন্ডক, কুশী, শোন, ফল্গু, পুনপুন ও আরও অনেক অখ্যাত নদ-নদী। এলাহাবাদে এই নদীর সঙ্গে মিলিত হয় যমুনা (এবং হিন্দুরা বলেন গুপ্তভাবে সরস্বতী), এই সংগম স্থলের নাম প্রয়াগ, পরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ দিয়ে আসার পথে গোমতী ও ঘর্ঘরা। বারানসী দিয়ে বিহার প্রদেশে এসে শোন নদী, পাটনা অতিক্রম করার পর গন্ডকী নদী এর সঙ্গে মিলিত হয়। পরে গঙ্গা আবার পূর্বাভিমুখী হয়ে কুশী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়, এবং রাজমহল অতিক্রম করে দক্ষিণাভিমুখী হয়ে প্রাচীন গৌড়ের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। গৌড়ের প্রায় ২০ মাইল নিয়ে নদীটি বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়। মূল নদী পদ্মা নাম নিয়ে দক্ষিণ পূর্বাভিমুখী হয়ে গোয়ালন্দে উপনীত হয়েছে।

মালদহ জেলায় এই নদী রাজমহলের কাছে এসে ২ মাইল নীচে একটি সংকীর্ণ নদী পরিত্যাগ করেছে যা মূলত তার নিজস্ব গতিপথেরই ধারা ছিল। এটি পূর্বাদিকের প্রবাহিনী ভাগীরথী নামে মোটামুটি কালিয়াচক এবং ইংরেজবাজার থানার সীমানা নির্ধারিত করেছে। পাগলা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে মহদীপুরের কাছে। এই পাগলা নদীও গঙ্গারই একটি শাখানদী ছিল। এই দুটি নদী একত্রে বর্তমান বাংলা দেশের কানসাটকে অতিক্রম করে নবাবগঞ্জের কাছে

মহানন্দায় পতিত হয়েছে। আবার ভাগীরথী নদীও মূল গঙ্গার প্রবাহপথ বলে সাদুল্লাপুরের ঘাট হিন্দুদের অন্তিম যাত্রার জন্য নির্দিষ্ট এবং বিভিন্ন তিথিতে পবিত্র স্নানের জন্য নির্দিষ্ট।

গঙ্গার উৎপত্তি, মর্ত্যলোকে আগমন, তাঁব বিশালতা, প্রাচীনত্ব এবং চলার পথের বিচিত্রতা কে কেন্দ্রে রেখে যে পৌরাণিক গল্পটি তৈরী হয়েছে সেটি এইরকম ঃ দেবর্ষি নারদের মনে একসময় এই বলে অহঙ্কার জন্মেছিল যে তিনি অতি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত গায়ক। কিন্তু দেবর্ষির ত্রুটিযুক্ত সেই সব গানে রাগরাগিনীর স্বকীয়তা নষ্ট হয়, এতে রাগরাগিনীরা রাগে দুঃখে নারদকে শিক্ষা দেবার জন্য তারা বিকলাঙ্গ নরনারীর আকারে পথের ধারে পড়ে থাকলেন। নারদ সেই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের এই বিকৃতির কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তারা বললেন নারদ নামের জনৈক সঙ্গীতজ্ঞের অশিক্ষা জনিত সঙ্গীত সাধনাই এর যথার্থ কারণ। নারদ একথা শুনে মনে দুঃখ পেলেন এবং তাদের পঙ্গুত্ব মোচনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন একমাত্র মহাদেব যদি সঙ্গীত পরিবেশন করেন তবে সেই শুদ্ধ সঙ্গীতের স্পর্শে সুস্থ জীবন লাভের সম্ভাবনা। নারদ এই কথা মহাদেবকে জানালে তিনি আবার বললেন যথার্থ সঙ্গীত রসিক যদি তার গান শ্রবণ করেন তবেই তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। অনেক সন্ধানে সঙ্গীত রসিক হিসাবে পাওয়া গেল ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে। মহাদেব সঙ্গীত আরম্ভ করলেন এবং রাগ রাগিনীরা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে আরম্ভ করলেন কিন্তু মহাদেব যে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন ব্রহ্মা তার মর্মাস্বাদ গ্রহন করতে সক্ষম হলেন না আর বিষ্ণু সবটা না বুঝলেও যতটা বুঝেছিলেন তাতেই তিনি দ্রবীভূত হয়ে গেলেন, এরপর ব্রহ্মা বিষ্ণুর সেই দ্রবীভূত অংশটুকু তাঁর স্বীয় কমন্ডলুতে গ্রহন করে নিলেন। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা নামে খ্যাত।

এই ঘটনার বহুকাল পরে কপিল মুনির শাপে সগরবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হলে ভগীরথ পূর্ব পুরুষদের উদ্ধার করার জন্য কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে তার কাছ থেকে গঙ্গাকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার কমন্ডলু থেকে পতন কালে দেবাদিদেব মহাদেব গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন। পরে ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হয়ে গঙ্গাকে বিন্দু সরোবরে ত্যাগ করেন। সেখান থেকে তিনি সপ্ত ধারায় প্রবাহিত হন। তারমধ্যে হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে তিন ধারা পূর্বদিকে এবং সীতা, সিন্ধু, কুচক্ষু নামে তিনধারা পশ্চিমদিকে গমন করে আর একটি ধারা ভগীরথের পশ্চাদ গামিনী হয়। পথে কবির ঐরাবত তাঁর পথ রোধ করলে তিনি তাঁকে স্রোতে ভাসিয়ে প্রায় মৃত অবস্থা করেন। হিমালয়ের গোমুখী গুহার পার্বত্য পথ পেরিয়ে গঙ্গা ভারতে প্রবেশ করেন। পথে জহ্নুমুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করে তাঁর যজ্ঞোপকরণ ভাসিয়ে নিয়ে গেলে মুনিবর গঙ্গার সমস্ত জল পান করে তাঁর গতিপথ রূদ্ধ করেন। আবার ভগীরথ ও দেবতাদের অনুরোধে জানু বিদীর্ণ করে (মতান্তরে কর্ণপথ) গঙ্গাকে মুক্তি দেন। সেই থেকে গঙ্গা জহ্নুমুনির কন্যা জাহ্নবী নামে খ্যাত হয়ে আছেন। তারপর অব্যাহত ভাবে ভগীরথ প্রদর্শিত পথে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে সগর সন্তানদের মুক্তি দেন।

গঙ্গার চলার পথে অন্যত্র অভিশপ্ত বসুগণের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁদের স্তব ও অনুনয় বিনয়ে তুষ্ট হয়ে গঙ্গা মানবীরূপ ধারণ করে শান্তনু রাজার পত্নী হয়ে তাঁকে এইরকম প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ করান যে তাঁর কার্যে কোনরকম বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না। এরপর গঙ্গাগর্ভে শান্তনু রাজার আটটি পুত্র জন্মে, পরপর সাতটি পুত্রকে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত করলে রাজা শান্তনু অস্থির

হয়ে অষ্টমপুত্রের বেলায় গঙ্গাকে বাধা দেন। এরপর গঙ্গা আর শান্তনুর স্ত্রী হিসাবে থাকলেন না, পুত্র দেবব্রতকে শান্তনুর হাতে সমর্পন করে অন্তর্হিত হলেন। কালে কালে সংযোজিত পৌরাণিক এই গল্পগুলিই গঙ্গার চলার পথের দিক নির্দেশিকা বলে মনে হয়।

গঙ্গার শস্য উৎপাদিকা শক্তি অতুলনীয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে কৃষিশক্তির সাহায্যের জন্য গঙ্গার দুটি সুবৃহৎ খাল খনন করা হয়েছে। প্রথম খালটি মেজর কট্‌লির ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প জ্ঞানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই খালটি ১৮৫৮ খ্রীঃ ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক উদ্বোধন হয়। দ্বিতীয় খালটি প্রথম খালটির বিস্তার স্বরূপ ১৮৭৮ সালে সংস্কার করা হয়। এরপর ১৯৭২ সালে ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরীর সময় আবার খালটির সংস্কার সাধন করা হয়। গঙ্গার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রতল থেকে ১০,৩০০ ফুট উঁচুতে। গঙ্গার চলার গতি এত পরিবর্তনশীল ও তীব্র এবং তীরস্থ ভূমির উপর এর ধ্বংস সাধিনী শক্তি এত প্রবল যে, এর উপকূলবর্তী অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করা সবসময় নিরাপদ নয়। গঙ্গা তীরবর্তী মালদহ জেলার ১৯৩১ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত ভূমিক্ষয়ের পরিমান ১৪,৩৩৫ হেক্টর। ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ২৫৬৬ হেক্টর জমি গঙ্গা গর্ভে বিলীন হয়েছে।

এত ব্যাপক ক্ষতি সত্বেও মালদহ জেলার অধিকাংশ মানুষের জীবন ও জীবিকা গঙ্গাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

টাঙ্গল নদী ঃ

হবিবপুর থানার জগজ্জীবন পুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, উদ্রঙ্গ মহাবিহারের পূর্বদিকে টাঙ্গল নদী প্রবাহিত। এই টাঙ্গল নদী আর বর্তমানে টাঙ্গণ নদী একই বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে টাঙ্গন নদী জগজ্জীবন পুরের পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। উৎখনন চলাকালীন প্রত্নস্থল তুলাভিটা থেকে ২ কি.মি. পূবে ৩০-৪০ মিটার চওড়া একটি শুকানো নদী খাত পাওয়া যায়। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে এখানে কোন জল থাকে না, মনে হয় শুকিয়ে যাওয়া এই নদীখাতই প্রাচীন টাঙ্গল নদী। এই শুকিয়ে যাওয়া নদীগর্ভকে স্থানীয় লোকেরা 'বারেন্ডী খাল' বলে থাকে।

মহানন্দা ঃ

গঙ্গার পর অপর যে নদীটির সঙ্গে জেলার সুখ-দুঃখ, জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতি জড়িয়ে রয়েছে সেটি হল মহানন্দা। নদীটি নন্দা বা অপরনন্দা নামেও স্বল্প পরিচিত।

মহানন্দা অর্থাৎ অতিশয় আনন্দযুক্তা বা মহান আনন্দ যাহাতে। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথি বোঝাতেও মহানন্দা শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এই নদীটির নামকরণের পেছনে কোনও নক্ষত্রের প্রভাব কাজ করে থাকতে পারে।

হিমালয়ের পাদদেশের কার্শিয়াং জেলার মহানদী রাম থেকে মহানন্দা নদী উৎপন্ন হয়ে বিহারের পূর্নিয়া জেলার মধ্য দিয়ে উত্তর দিনাজপুরে প্রবেশ করে নাগর নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মালদহ জেলায় প্রবেশ করেছে। এরপর চাঁচল থানার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে কালিন্দ্রী ও পূর্ব দিক থেকে টাঙ্গন পুনর্ভবার জলপ্রবাহ গ্রহন করে বর্তমান রাজশাহী, নবাবগঞ্জ মহকুমার মধ্য

দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পদ্মা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এ জেলায় মহানন্দার দৈর্ঘ্য ৫৫ মাইল।

পুরাতন মালদহের নিমা-সরাই এর কাছে মহানন্দা ও কালিন্দ্রীর সঙ্গমস্থলে একটি বাতিস্তম্ভ বা চেরাগদানি আছে। সুলতানি আমলে, এমনকি ইংরেজ আমলেও এই পথ এ দেশীয় এবং বিদেশীয় বণিকদের পণ্য পরিবহণের অন্যতম প্রধান জলপথ ছিল।

কালিন্দ্রী :

গঙ্গার একটি শাখানদী এই কালিন্দ্রী। মহানন্দার পশ্চিম অংশকে ভাগ করেছে এই কালিন্দ্রী। এই নদীর গতি পূর্বমুখী। নিমাসরাই এর কাছে এই নদী মহানন্দার সাথে মিশেছে। কালিন্দ্রী নদীর জল ভূতাত্ত্বিক কারণে গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর জলের তুলনায় পলিমাটি বিহীন ঝকঝকে। অনেক লোক সংস্কাব ও কিংবদন্তী এই কালিন্দ্রী নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

পুর্নভবা :

এটি তিস্তার একটি স্রোতোধারা। রেনেলের নকশায় দেখা যায় মহানন্দা ও পুর্নভবা একটি ধারায় লখনৌতির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গায় মিশেছে। বর্তমানে এই নদী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজশাহী জেলার রুকনপুর ঘাটের কাছে মহানন্দায় পড়েছে। পুর্নভবার জলেও পলির চাইতে বালির ভাগ বেশি এবং ভাঙনের পরিমাণও কম। চলার পথে এই নদী কোন কোন জায়গায় নদী পার্শ্ববর্তী বেশ কিছু খাদের সৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বামনগোলা থানার খুদাদহ মৌজার (জে এল নং ১৪২) এবং মহাদেবপুর মৌজার (জে এল নং ১৪৪) খাদ দুটি। দুটি খাদের মিলিত প্রবাহ আবার 'হাঁড়িয়া নদী' নামে স্থানীয় মানুযেব কাছে পরিচিত।

টাঙ্গন / তঙ্গন :

মহানন্দার একটি বিশিষ্ট উপনদী টাঙ্গন বা তঙ্গন। এটির মূল উৎস প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিচ্ছিন্ন। তবুও বলা যায় হিমালয়-ই এর মূল উৎপত্তিস্থল। বর্তমান গতিপথ জলপাইগুড়ি জেলা থেকে বেড়িয়ে বাংলাদেশের দিনাজপুর পানবারা, ঠাকুরগাঁও, পীরগঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের হেমতাবাদকে ছেদ করে বংশীহারী ও গঙ্গারামপুর থানার সীমা নির্ধারণ করে মালদহের গাজোল ও বামনগোলা থানা দুটির সংযোগ স্থলে এই নদী এই জেলায় প্রবেশ করেছে। একদিকে গাজোল, বামনগোলা অন্যদিকে হবিবপুর ও পুরাতন মালদা এই চারটি থানার সীমা নির্ধাবক এই নদী। এই নদীর একটি প্রশাখা 'মরাটাঙ্গন' গাজোল থানার উপর দিয়ে বামনগোলা থানার কাছে মূল টাঙ্গন নদের সঙ্গে মিশেছে। পুরাতন মালদহ থানায় এই নদীটির অপর একটি প্রাচীন পথ 'চূনাখালি খাল' নামে পরিচিত। এইভাবে আঁকাবাঁকা পথের গতিতে প্রায় ৩০ মাইল দৈর্ঘ্যের এই নদী আইহো মুচিয়ার কাছে মহানন্দা নদীর সাথে এসে মিলিত হয়েছে।

ভাগীরথী :

গঙ্গা নদী মালদহ জেলায় প্রবেশ করে 'ভূতনী দিয়ারা' নামে একটি 'ব-দ্বীপ' সৃষ্টি করেছে। সেখান থেকেই একটি ধারা পঞ্চানন্দপুর, শকুল্লাপুর ও গৌড় হয়ে মহদিপুরের পাশ দিয়ে চলে গেছে বাংলাদেশের দিকে। এই ধারাটিই ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধ। এই ভাগীরথী আর

দক্ষিণবঙ্গের ভাগীরথী আলাদা দুটি নদী। ঐতিহাসিক অনেকের অনুমান একাদশ-দ্বাদশ শতকে এই জলস্রোতকে গঙ্গার মূল ধারা থেকে খনন করে আনা হয়েছিল গৌড় নগরীতে জল সরবরাহের প্রয়োজনে।

ফুলহার :

এই নদীটি মহানন্দা নদীর একটি শাখা। এই শাখা নদীটি বিহারের পূর্নিয়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরের মিগ্রাহাট পর্যন্ত। তারপর থেকে এর নাম হয়েছে কালিন্দ্রী। এই নদীটি পশ্চিম দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ভূতনী দিয়ারার কাছে গঙ্গায় মিশেছে।

পাগলা :

পঞ্চানন্দপুরের কাছে ভাগীরথীর মূলধারা থেকে বেড়িয়ে এসে এই জেলার বাঙ্গীটোলা ও মোথাবাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাগলা নদী কালিয়াচকে এসেছে। এখানে গঙ্গার আর একটি শাখা ধারার সাথে পাগলা নদী মিলিত হয়েছে। গঙ্গাব এই দ্বিতীয় ধারাটিও পাগলা নামে পরিচিত। গঙ্গার মূল ধারা থেকে এই নদীটির উৎপত্তি ফারাক্কার কাছে চরবার পুর এলাকায়। দুই পাগলা নদী কালিয়াচকে মিলিত হয়ে মহদিপুরের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে।

ব্রাহ্মণী :

দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের কাছে পুর্নভবা নদী থেকে ব্রাহ্মণী নদীর উৎপত্তি। এরপব এই নদী ১৮ মাইল প্রবাহিত হয়ে বামনগোলার কাছে টাঙ্গন নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

বেহুলা :

এই নদীটিকে কালিন্দ্রীর মরা স্রোতধারা মনে করা হয। আসলে এটি মহানন্দারই একটি প্রশাখা বা খাল। এটি সাহাপুর অঞ্চল দিয়ে মাধাইপুর দিয়ে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীপুর হয়ে টাঙ্গনে মিশেছে। কেউ কেউ মনে করেন এই নদীরই পূর্ব নাম ছিল বারমাসিয়া-কারণ এর গতি উভয়মুখী। বর্ষাকলে মহানন্দা স্ফীত হলে তার গতি চলে উজানে এবং শীতকালে মহানন্দার জলরেখা শীর্ণ হলে তার গতি চলে ভাটিতে। মহানন্দা থেকে রাঙ্গামাটিয়া খাল হয়ে উত্তরে জলঙ্গী নাম নিয়ে একটি শীর্ণ খাল প্রবাহিত। এর মধ্য দিয়ে বেহুলা খাল বা ধরম কুন্ড প্রবাহিত।

জনশ্রুতি এই যে চাঁদ-বেনের পুত্রবধূ বেহুলা মৃতস্বামী লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে কালিন্দ্রী নদী হয়ে এই নদীতে এসেছিলেন। এখনও গাজোলের ময়না অঞ্চলে ২৮ শে আশ্বিন থেকে ৩রা কার্তিক পর্যন্ত বেহুলা মেলা বসে। উৎসবের অনুষঙ্গ হিসাবে সেখানকার সাধারন মানুষ পায়রা আর হাঁসের ডিম ব্যবহার করেন। জনশ্রুতি আরও এই যে, চাঁদ সদাগর নাকি এইখানে মনসার পূজা করেছিলেন। পরবর্তীকালে বারমাসিয়া নদী তাই বেহুলা নদী এই নামে পরিচিত হয়।

কালকোশ, কঙ্কর, কোশ এবং বারমাসিয়া :

বর্ষার মরশুমে টালের জলধারাকে বর্হিগমনে সাহায্য করার জন্য এই চারটি ছিল মহানন্দার

উপনদী বা জল নিষ্কাষক বিশেষ সহায়ক খাদ। বছরের অন্য সময়ে এই খাতগুলি সম্পূর্ণ শুস্কই থাকে।

বুড়িগঙ্গা ঃ

রতুয়ার কাছে কালিন্দ্রী ও প্রাচীন গঙ্গার খাদের সংযোগ অংশ বুড়ীগঙ্গা নামে পরিচিত। যদিও বর্ষার জল ছাড়া এর জলের কোন প্রবাহ নেই।

খাদ, দাঁড়া, খাল ঃ

মালদহ যেহেতু একাধিক নদী অধ্যুষিত জেলা সেইজন্য এই জেলার সর্বত্র একাধিক খাদ, দাঁড়া বা খালের অস্তিত্ব দেখা যায়। বর্ষা মরশুমের জল নদীবক্ষে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত হয়ে পড়লে তা নির্গমনের জন্য বিভিন্ন পথ খোঁজে, কাছাকাছি নীচ এলাকা থাকলে তা ভর্তি হয়ে গিয়ে খাদ তৈরী করে আবার কখনও ভূপৃষ্ঠের বালি বা অপেক্ষাকৃত নরম মাটি জলের গতিবেগে খাদ কেটে নিম্ন অঞ্চলে যাওয়ার প্রবণতাই দাঁড়া তৈরীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার মানুষের প্রয়োজনে যেমন জমিতে জলসেচ অথবা পণ্য পরিবহনের কাজের সুবিধার জন্য মানুষ খাল কেটে জলপথকে নানান কাজে ব্যবহার করে। এইভাবে এইরকম চাঁচল থানার সামসি দাঁড়া (আগে নাকি এটি সামসি নামের একটি নদী ছিল), টেঙ্গুইরা দাঁড়া কেউ কেউ এটিকে 'গঙ্গাহার' নদীও বলতে চান।

বিল / দহ ঃ

মালদহ জেলার নদীগুলি একাধিকবার গতিপথ পরিবর্তন করার ফলে এই জেলায় প্রচুর বিল বা দহের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এই বিলগুলি এই জেলার সম্পদ, বন্যাপ্রবণ এই এলাকার নদীগুলির ধারনক্ষমতা জলের অধিক হলে এই বিলগুলির মধ্যে দিয়েই অতিরিক্ত জল প্রবাহিত হয়। আবার বর্ষা মরশুম ছাড়া অন্য সময়ে এই বিলগুলিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। যেগুলি মৎসজীবী মানুষের অন্নসংস্থানের কারণও বটে। বিলের ধারের জমি উর্বর হওয়ায় এখানে বিভিন্ন ফসল যেমন ধান, আখ, ভুট্টা, মরশুমী সবজী ইত্যাদির ফলনও বেশ ভাল হয়। এছাড়া এইসব বিলের শীতকালীন পরিযাযী পাখিরা প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও যেমন বজায় রাখে, তেমনি বিলের প্রাকৃতিক শোভা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। উল্লেখ্য বিলগুলি হল - সিংহাবাদের নতুন বিল, মালদা থানার মাধাইপুরের বিল, মুচিয়ার কাছে পুতুল বিল, যাত্রাডাঙ্গার বড় বিল, গাজোলের আহোড়া বিল, মালঞ্চপল্লীর রামচন্নার বিল, ঝামদহ বিল, লক্ষ্মীপুর চাতরা বিল, কালিয়াচকের গোলাপজঞ্জ ঢাব, কালিয়াচক ফারাক্কার গঙ্গার চর, পঞ্চানন্দপুরের গঙ্গার চর, ভূতনী দিয়ারা চর, হবিবপুর থানার আতলা বিল, দাঁড়িডুবা বিল, বাকলা বিল, ভীখন বিল, সাতসিং বিল, দামোস বিল, মশাইচক বিল, চেবোল বিল ও হবিবপুর গাজোল অঞ্চলের জলকর বিথান, আড়াইডাঙ্গা অঞ্চলের শোলমারী, রুহিমারী বিল ইত্যাদি।

দিঘি / পুকুর ঃ

মালদহ জেলায় রয়েছে একাধিক দিঘি, পুষ্করিনী এবং পুকুর, টাল দিয়ারা অঞ্চলে যেমন

নদী, দাঁড়া, বিল, দহ রয়েছে প্রচুর পরিমানে, বরিন্দ অঞ্চল প্রসিদ্ধ দিঘি, পুকুর, পুষ্করিনীর জন্য। দিঘি এবং পুকুরের মধ্যে মূলগত যে পার্থক্য রয়েছে তা হল, দীঘি সাধারণত জনসাধারণের হিতার্থে রাজা জমিদার অথবা ধনি ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব জমি অথবা উৎসর্গীকৃত জমিতে জলাশয় খনন করে দেন। গভীর জলাশয় পানীয় জলের উপযুক্ত হত। সাধারণত একেই দীঘি বলা হয়। আর ব্যক্তিগত অর্থাৎ পরিবারগত প্রয়োজনে বাসস্থানের কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত অগভীর স্বল্প পরিসরে যে জলাশয় খনন করা হয় তাকে পুকুর বলা হয়। মালদহের বেশিরভাগ দিঘি বা পুকুর বরিন্দ অঞ্চলে দেখা যায়। কারণ এই অঞ্চলের জলস্তর অত্যন্ত নীচে থাকায় বর্ষার জলকেই ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হত। মালদহ জেলার দীঘিগুলি বেশির ভাগই পাল সেন আমলের খনিত কোন কোনটি তার চাইতেও প্রাচীন বলে কেউ কেউ মনে করেন। মালদহ জেলায় রয়েছে প্রায় ২৯ হাজার পুকুর। যার মধ্যে কুড়ি হাজার পুকুরই বরিন্দ অঞ্চলের। শুধু তাই নয় এর মধ্যে হাজার খানেক পুকুর অর্বাচীন হলেও প্রায় উনিশ হাজার পুকুরই ৪০০ থেকে দুই হাজার বছরের পুরানো। সেইজন্য ঐতিহাসিকদেব কেউ কেউ মালদহকে 'লেক ডিস্ট্রিক্ট অব বেঙ্গল' বলে থাকেন।

মালদহ অঞ্চলের কয়েকটি দিঘি :

ষাটগড় দিঘি/ ষাটাশগড়া দিঘি বা পাণ্ডুয়ার দিঘি :

আদিনা থেকে প্রায় এক মাইল আগে 'ষাটগড়' বা ষাটগম্বুজ নামে একটি ধ্বংসস্তূপ রয়েছে। এটা রাজার প্রাসাদ বলে লোক মুখে প্রচলিত। এইখানে রয়েছে বিশাল ষাটগড় দিঘি বা পাণ্ডুয়ার দিঘি। সম্ভবত এই দিঘি নির্মান করেন একজন পাণ্ডু রাজা। জনশ্রুতি আবার এইরকম যে দেশের এই অংশটা ছিল বিরাট রাজার শ্যালক কীচকের শাসনাধীন। তিনিও এই দীঘি খনন বা সংস্কার করে থাকতে পারেন। পরবর্তী কালে পাণ্ডুয়ার বেশিরভাগ অংশের চিরস্থায়ীর বন্দোবস্ত পান বর্ধমান জেলার চৌধুরিয়ার সৈয়দ আব্দুল কালাম। বর্ধমান শহরে তাদের অফিস। সেখানকার কাগজপত্র থেকে জানা যায় ১৫৭৪ খ্রীঃ আকবরের সেনাপতি খান জাহান আলি সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) থেকে জনৈক দাউদ কররানীর পরিবার বর্গকে বিতাড়িত করে। দাউদ কররানী পাণ্ডুয়ায় ফৌজদারের আশ্রয় লাভ করেন। এই দাউদ কররানী-ই পাণ্ডুয়ার এই দীঘি খনন করেন অথবা সংস্কার করেন। এই দীঘির দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে বেশি হওয়ার কারণে এটি হিন্দু রাজা নির্মিত হওয়ার সম্ভবনাই বেশি।

ধনুষ দিঘি :

আদিনা মসজিদ থেকে কিছুদূরে রয়েছে আরও একটি দিঘি যা ধনুষ দিঘি নামে পরিচিত। এই দিঘিটিও উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত, ৪৬৫ গজ লম্বা ও ১০৫ গজ প্রশস্ত। এই দিঘিটি এখন প্রায় অনেকখানিই বুজে গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব কোনে একসময় দুটি বুরুজ ছিল যা মিনার নামে কথিত।

আট বাঁক দিঘি / রাহাৎ বাঁক দিঘি :

আদিনা অঞ্চলেরই অন্য একটি দিঘির নাম আট বাঘ দিঘি। এই দিঘিটির অন্যান্য নামগুলি হল রাহাত -বাক্ দিঘি বা প্রাণ দির্ঘি। এই দিঘিটিও উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এটি লম্বায় ৫০০ গজ

চওড়ায় ১৭৫ গজ। এই দিঘির প্রতি প্রান্তের কাছে একটি করে মোট দুটি বুরুজ জলের মধ্যে ছিল। এই দিঘির লাগোয়া অন্য আরএকটি দিঘির নাম 'পুবাণ-দিঘি এছাড়া আরও একটি ছোট পুকুর আছে। আটবাঘ দিঘির বুরুজগুলো দিঘির তলদেশে ভূগর্ভস্থ পথ দ্বারা যুক্ত ছিল বলে কথিত।

শুকান দিঘি ঃ

পাণ্ডুয়া অঞ্চলের অন্য একটি বিখ্যাত দিঘির নাম শুকান দিঘি। এটিনাসির শাহ দিঘির প্রায় দ্বিগুন, লম্বায় ৬২৫ গজ আর প্রস্থে ২৭৫ গজ। এই দিঘির অনেক অংশই শুকিয়ে গেছে, অনুমান এর উত্তর দিকে যে উঁচু পাড় বা আল রয়েছে সেটি এই শুকান দিঘির উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃতির শুকনো অঞ্চল। এই দিঘিটি বুর্জপুর বা বরিজপুর নামক স্থানে অবস্থিত। বুর্জ শব্দটির অর্থ 'দুর্গ'। এর আশে পাশে কোন দূর্গের চিহ্ন না থাকলেও এই দিঘির পারিপার্শ্বিকতা থেকে মনে হয় পাল সেন বা অনুরূপ কোন সময়ে এখানে দূর্গ থাকলেও থাকতে পারে।

মেঘডুম্বর দিঘি ঃ

বামনগোলা থানার মদনাবতী তথা উত্তর কসবা মৌজায় রয়েছে এই অঞ্চলের বিখ্যাত পাল আমলের মেঘডুম্বর দিঘি। সম্ভবতঃ পাল সম্রাট মহীপাল এই দিঘিটি খনন করান। তাই এটিকে মহীপাল দিঘিও বলা হয়। এই দিঘিটিও সংস্কারের অভাবে বর্তমানে অনেকখানিই শুকিযে ছোট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও এখনও স্বচ্ছ সলিলা এই দিঘির সৌন্দর্য পর্যটকের আকর্ষণকে ধরে রাখে। দিঘির বাধানো ঘাটের সিঁড়ির প্রাচীনত্ব পাল আমলকেই মনে পড়ায়, দিঘির ধার ঘিরে সারি বদ্ধ গাছের সারি, এর সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করেছে। ঐতিহাসিক হরিদাস পালিত মহাশয়-তাঁর 'মালদহের পাল নগরাদি' প্রবন্ধে লিখেছেন যে ''ইহা বামনগোলা হইতে ছয় ক্রোশ পূর্বোত্তর ভাগে অবস্থিত; প্রায় তিন চাব হাজার বিঘা উন্নত ভূখন্ডোপরি পরিখা ও উন্নত প্রাচীর বেষ্টিত ভূখন্ড। অভ্যন্তরে চারি পাঁচ শত বিঘা পরিমিত 'উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সুন্দর দিঘি বর্তমান। ইহাব চারিটি পাড়ই ইষ্টক পাষাণ মন্ডিত ছিল এবং উহার উপর রাজপ্রাসাদ শোভিত ছিল।'' বর্তমানে এই দিঘিটির এক পাড়ে খ্রীষ্টান পাদরি বাংলা গদ্য ভাষার পুস্তক রচয়িতা উইলিয়াম কেরীর পুত্র উইলিয়াম ফ্রেলিক্স এর সমাধি বর্তমান, এবং উত্তর পাড়ে উইলিয়াম কেরীর নীলকুঠির ভগ্নাংশ, সেখানে এখনও পাঁচটি করে দুই সারি নীল ভেজানোর জন্য নির্মিত চৌবাচ্চা এবং বাংলা ভাষায় প্রথম ছাপাখানা তৈরীর জন্য ভিত প্রস্তরের চিহ্ন দেখা যায়।

রায়খান দিঘি / রাইখাঁ দিঘি ঃ

পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত মালদা কাটিহার রেলপথের কাছেই অপর একটি ইতিহাস বিশ্রুত দিঘির নাম রায়খান দিঘি। এই দিঘির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিদ শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী মহাশয়-এর দাবি এই অঞ্চল থেকে N.B.P পাওয়া গেছে। সেই হিসাবে এই অঞ্চলের দিঘিটি খ্রী পূর্ব যুগের জনপদ বলেই অনুমান করা যেতে পারে। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দিঘিটি লম্বায় প্রায় ১৩২০ গজ এবং চওড়ায় ৫২৫ গজ। এই দিঘিটির অপর নাম পালখান দিঘি। সুতরাং পাল রাজাদের খনিত এই দিঘি এই কথা ধরে নেওয়া যায়। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন গুপ্ত যুগে

এই অঞ্চলে একটি জনপদ ছিল। শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ খননকার্যে যে রকম ইট পাওয়া গেছে রায় খান দিঘির পাড়েও সে রকম ইট পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে কুষাণ যুগের কিছু পুরাবস্তুও। যেগুলি বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত রয়েছে। রায়খান দিঘির পাড়ে নানাবিধ পুরাবস্তু ছাড়াও উচ্চমানের কিছু লোকশিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

নাসীর শাহ্ দিঘি ঃ

পাণ্ডুয়ার অন্য একটি দিঘির নাম 'নাসির শাহ দিঘি'। এই দিঘিটি আদিনা মসজিদ থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এই দিঘিটির নাম এবং অন্যান্য দিঘিগুলির তুলনায় ভাল অবস্থায় থাকার কারণে মনে হয় দিঘিটি হোসেন শাহের পরবর্তীকালের খনিত দিঘি। অনুমান যে, নাসির উদ্দিন নসরত শাহ বা নাসির শাহ এই দিঘি খনন করেন। কিন্তু সুলতান নাসিরুদ্দিন যে পাডুয়ায় কখনো বাস করেছিলেন বলে রিয়াজ-উল-সালাতীনে কোন উল্লেখ নেই, সেইজন্য দিঘিটি ইলিয়াস শাহের বংশধর নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের আমলেও খনিত হতে পারে। উত্তর-দক্ষিণ চওড়া এই দিঘির জল এখনও স্বচ্ছ, পরিস্কার ও পানীয় উপযোগী। এই দিঘিটির আয়তন চওড়ায় ৩৬০ গজ লম্বায়২৫০ গজ।

কান্ডারণ এর দিঘি ঃ

অতীতে গঙ্গা থেকে একটি নদী কান্ডারণ এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। নদীর নাম ছিল গঙ্গাহার। এরই কাছে মালদহের চাঁচল থানার অন্যতম মহাবিদ্যালয় সামসী কলেজ। এই কলেজের সামনেই রয়েছে এই দিঘিটি। প্রায় শুকিয়ে আসা নাতিবৃহৎ এই দিঘিটি কয়েক বছর আগে পুনরায় খনন করা হয়েছে এবং সেখান থেকে বেশ কিছু পুরাবস্তু সংগৃহীত হয়েছে।

মিঠা তলাও দিঘি / মিঠা দিঘি ঃ

পাণ্ডুয়ার কুতুব শহরে (মৌজা কুতুব শহর - ৩২) কুতবুল আলমের পূর্বদিকের এই দিঘি আলাউল হকের সময়ে খনন করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। পুকুরের ঘাটের সিঁড়িগুলি পাণ্ডুয়ার অন্যান্য ভগ্নস্তুপ থেকে সংগ্রহ করে তৈরী করা হয়েছে। তার মধ্যে আদিনা মসজিদের বেদীর একটি অলংকৃত পাথরও আছে যা দিঘির পূর্বদিকের ঘাটে পাওয়া গেছে। নুর কুতবুল আলমের বিচিত্র অলৌকিক ক্ষমতার অনেক কাহিনী কিংবদন্তীর জন্মদাতা এই দিঘি।

ছোট সাগর দিঘি / চাঁদ সওদাগরের ভিটা ঃ

তাঁতীপাড়া মসজিদ পেরিয়ে নবাবগঞ্জের রাস্তা থেকে পূর্বে প্রায় আধ মাইল লম্বা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দিঘি রয়েছে। এটিকে ছোট সাগর দিঘি বলে। এই দিঘির উত্তর দিকে ধূসর ও কালো রঙের মসৃন পাথরের স্তম্ভ সম্বলিত একটি বৃহৎ অট্টালিকা দেখা যায়। স্থানীয় লোকে এই ধ্বংসাবশেষ টিকে চাঁদ সওদাগরের বাস্তু ভিটা বলে চিহ্নিত করে থাকে।

পিয়াসবারি দিঘি ঃ

গৌড়ের দর্শনীয় স্থানগুলি প্রবেশের রাস্তার বামদিকে আর একটি দিঘি দেখা যায় এটিকে

পিয়াসবারি দিঘি বলা হয়। এই দিঘিটিও মুসলমান আমলের আগেই খনিত হয়েছিল। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই দিঘিটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। স্মরণাতীত কাল থেকেই এই দিঘির জল বিষাক্ত বলে সাধারণে বিশ্বাস করে। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামীদের এখানে বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা ছিল এবং এই দিঘির জল খাইয়ে তাদের মেরে ফেলা হত। আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন বাদশা আকবর এই ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা তুলে দেন। যদিও পিয়াসদিঘির জল বিষাক্ত নয় সুপেয়। দিঘির পশ্চিম পাড়ে রয়েছে একটি পাকা ঘাট।

কুম্ভীর পীর দিঘি ঃ

গৌড়ের কদম রসুলের প্রায় এক মাইল উত্তর-পূর্বে একটি বৃহৎ দিঘি আছে। এই দিঘির জল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পানীয় যোগ্য। এই দিঘিতে অনেক কুমীর বাস করত, সাধারণের বিশ্বাস এই কুমীর গুলি পীর-এর অনুচর, একটি বৃহদাকার কুমীর স্বয়ং পীব সাহেব তাকে ছাগলের বা মুরগীর মাংসের 'পুড্ডা' উপহার হিসাবে দেওয়া হোত। তবে বর্তমানে এই বীতির আর তেমন প্রচলন নেই।

বড় সাগর দিঘি ঃ

ইংরেজবাজার শহর থেকে প্রায় ছ-মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই দিঘিটি অবস্থিত। দিঘির আকার আয়তন সাগরের বিস্তৃতির কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। এটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ ও অর্ধ মাইল প্রশস্ত (১৬০০ x ৮০০ গজ), প্রস্থে ৬০ গজ মাপের ছয়টি পাকা ঘাট। এই ছয়টি ঘাটের চারটি পূর্ব ও পশ্চিম পারে মুখোমুখি অবস্থায় ছিল, আর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের প্রত্যেকটিতে ছিল একটি করে ঘাট। যদিও বর্তমানে ঘাটগুলির অস্তিত্বই কেবল টের পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লক্ষ্মণ সেন এই দিঘির খননকার্য শুরু করেন বলে কথিত আছে।

রূপসাগর সনাতন সাগর ও অন্যান্য ঃ

মদন মোহন মন্দির থেকে দক্ষিণে বারদুয়ারীর পথে ২০০ গজের মধ্যেই রাস্তার বামদিকে রূপসাগব দীঘি। রাজকার্যে নিযুক্ত থাকাকালীন বৈষ্ণব প্রধান রূপ ও সনাতন যে বিশাল বিশাল দিঘি খনন করান তারই অন্যতম একটি রূপ সাগর। এই রূপ সাগরের পাড়ে ছিল রূপের আবাসস্থল পিদাবাড়ী। উত্তর-দক্ষিণে বৃহদায়তন এই দিঘিটি প্রায় ৮০০ ফুট লম্বা ও ৩০০ ফুট চওড়া। রূপসাগরের অদূরেই ছিল সনাতন দিঘি। যার পশ্চিম পাড়ে ছিল সনাতনের বাড়ী, যার নাম বড়বাড়ী। হোসেন শাহ-র প্রাসাদে কর্মচারী থাকার সময়-ই তাঁদেব মনে বৈরাগ্য দেখা দিলে তাদের মনের পারমার্থিক শান্তির প্রয়োজনে সুলতানের সম্মতিক্রমে গৌড়ে মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয় আর মন্দিরের আশপাশ খনিত হয়। শ্যামকুন্ড, রাধাকুন্ড নামের দুটি পুষ্করিনী, এছাড়া ললিতাকুন্ড, বিশাখাকুন্ড, সুরভীকুন্ড, রঙ্গদেবীকুন্ড, ইন্দুরেখা কুন্ড ইত্যাদি নামের আরও আটটি ছোট ছোট দিঘি খনন করা হয়।

রানী দিঘি ঃ

চাঁচোল থানার কলিগ্রাম মৌজায় (১৫১) বাসস্ট্যান্ড থেকে হাঁটাপথ দূরত্বে কলিগ্রাম

হাইস্কুলের অদূরেই রয়েছে বিখ্যাত রানী দিঘি। প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, বিহারের পূর্ণিয়া জেলার সাউরিয়ার রানী দ্রাক্ষায়নী ইন্দ্রানী ব্রত উৎযাপনের জন্য এই দিঘি খনন করান। সেই থেকে এই দিঘির নাম রানী দিঘি। তারপর চাঁচলের মহারাজা শরৎচন্দ্র এই দিঘিটির সংস্কার করান। বিরাট এই দিঘিটির জল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সুপেয়। এই দীঘির পাড়ে রয়েছে এক রত্ন বিশিষ্ট শিবমন্দির। রানীদিঘির কাছেই অন্য আর একটি পুকুর, যেটি কলিগ্রাম হাইস্কুলের সামনে রয়েছে।

পারা দিঘি / পারাঢালা দিঘি ঃ

পুরাতন মালদহ স্টেশন থেকে দেড় কি.মি. আগে (মৌজা - নবাবগঞ্জ জে এল নং - ৯৬) নবাবগঞ্জ অঞ্চলে ছিল এক সময়ের বর্ধিষ্ণু জনপদ। এই খানেই আছে বিখ্যাত পারাদিঘি। এই দিঘিকে কেন্দ্র করে বহু প্রচলিত জনশ্রুতিটি এই যে এক পারদ বিক্রেতা এক লক্ষ টাকা মূল্যের পারদ বিক্রয়ের জন্যে এই শহরে এলে তা বিক্রয় না হওয়ায় আফশোষ করতে থাকেন। স্থানীয় এই পুকুরে বস্ত্র পরিমার্জনে রত এক ধোপানী সেই কথা শুনে লক্ষটাকার বিনিময়ে সেই পারদ কিনে নিয়ে পুকুরে ঢেলে দিতে বলেন। গল্পটি পুরাতন মালদহ, সমৃদ্ধির উদাহরণ হলেও পারদের ন্যায় স্বচ্ছ দিঘির জল এই এই জনপ্রিয় কারণ হতে পারে। আবার কোনও এক সময়ে পুকুরের জলের শোধন প্রক্রিয়ায় পারদ ব্যবহৃত হয়েছিল বলেও এর নাম 'পারাঢালা দিঘি' হওয়াও অসম্ভব নয়।

পীর পুকুর ঃ

পাণ্ডুয়া সীমানার অদূরে পুরুষোত্তম পুরে যে পুকুরটির সন্ধান পাওয়া যায় সেটি প্রায় ৪১ বিঘা জমি নিয়ে খনিত। শোনা যায় পাণ্ডুয়া-বিজয়ী সুলতান সাফিউদ্দীন প্রজাদের জলকষ্ট নিবাবরের জন্য এই পুকুর খনন করিয়েছিলেন। পুকুরটির জল অত্যন্ত স্বচ্ছ। পীর পুকুরে জল শুকিয়ে গেলে স্থানীয় লোকজনরা লক্ষ্য করেন পুকুরটির চারিদিকে জলের গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত সিমেন্টের গাঁথনি এবং লম্বা লম্বা বৃহদাকার শালের খুঁটি। পীরপুকুর-এর জড়িয়ে আছে অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস। শোনা যায় পুকুরের মাঝখানে একটি গম্বুজযুক্ত মসজিদ আছে, তাতে বাস করতেন এক পীর সাহেব। সফিউদ্দীনের সময়ে একজোড়া কুমীর এই জলে ছাড়া হয়েছিল. তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল আলে খাঁ, কালে খাঁ। সন্তানহীনারা এইখানে মানত করে সন্তান লাভ করলে এই পুকুরের কুমীরের মুখে ছুড়ে দিত, কুমীর সেই নবজাতককে নিয়ে ডুব দিয়ে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যেত। পীরপুকুরের খ্যাতি ও মাহাত্ম্য একেবারেই নষ্ট হয়ে যায় জনৈক ইংরেজ শিকারীর দ্বারা এই পুকুরের কুমীর হত্যার পর। পুরুষ কুমীরটির মৃত্যুর পর সঙ্গিনী কুমীরটির আর কোন সন্ধান মেলেনি। কেউ কেউ বলেন, বন্যার সময় স্ত্রী কুমীরটি পুকুরের বাইরে চলে যায়। পীর কালে খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হত্যাকারী সাহেবও মারা যান। দুজনকে কাছাকাছি একই সাথে কবরস্থ করা হয়। ঐ অঞ্চলে পীর কালে খাঁর মাজার যা স্থানীয় লোকেরা সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে। আদিবাসী সাঁওতালরা অতীতে তার প্রিয় 'মাঘ-উৎসব' পালন করতো এই পুকুরের পাড়ে। তাদের বর্তমান 'জাগরণ' মেলা যেটা এখন বসে পাণ্ডুয়ার দিঘির ধারে সেই মেলাটিও হতো এই পুকুরেরই ধারে। তখন পুকুর থাকতো পরিযায়ী পাখির কলরবে ঝলমল।

তর্পন দিঘি / ভাতশাল দিঘি ঃ

ইংরেজবাজার শহর থেকে মানিকচকের পথে রাজমহল রোড দিয়ে ২ কি.মি. পথ এগোলে উভয় দিকে মাইল খানেক দীর্ঘ আল বেষ্টিত যে অঞ্চলটি চোখে পড়বে তাই প্রাচীন রাজা বল্লাল সেনের বাগানবাড়ি। আলটি উত্তর থেকে দক্ষিণদিকে অধিকতর দীর্ঘ। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দুর্গ প্রাকার দিয়ে এটি দুই অংশে বিভক্ত। পশ্চিম দিকে প্রশস্ত খাদ, পূর্বদিকের অর্ধাংশে বিশাল তম্‌না / টম্‌না বা তর্পন দিঘি। নামকরণ থেকেই অনুমান হয় রাজপ্রাসাদ তথা এলাকার জনসাধারণের ধর্মীয় কাজকর্মের জন্য এই দিঘির জল নির্দিষ্ট ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল মৃতদেহ ফেলবার জন্য নির্দিষ্ট ভাত্‌শাল দিঘি।

পাণ্ডুয়ার অন্যান্য পুষ্করিনী ঃ

পদ্মযুক্ত সরোবরকেই সাধারণত পুষ্করিনী বলা হয়। পাণ্ডুয়া অঞ্চলে একাধিক দীঘি ছাড়াও রয়েছে একাধিক পুষ্করিনী। এইগুলির নামকরণ এবং বুজে যাওয়া পুকুরগুলির সংস্কার কালে যথেষ্ট বালি পাওয়া যাচ্ছে, পাওয়া যাচ্ছে মূর্তি, পাত্রভাঙ্গা, তরবারি, প্রাসাদ চিহ্ন ইত্যাদি। এইরকম কয়েকটি পুষ্করিনীর নাম হল, — কঙ্কাপুকুর, গোবাঁধি পুকুর, হাটতলা দীঘি (মছলন্দ খাঁর দীঘি), হেদো পুকুর, বুনো হেদো পুকুর, যোজী হেদো পুকুর, বলাকা, সেজাম খাঁ, আরবৃন্দা, হাজাম গেড়ে, সেখ পুকুর, মুচি হেদো, কালু পুকুর, জানমিরে, তাল পুকুর, কাজী পুকুর, সুরের গাবা ইত্যাদি।

এছাড়া মালদহ জেলায় পূজাস্থান বা মন্দিরের কাছে হিন্দুরীতি অনুযায়ী এবং মসজিদের কাছে মুসলীম রীতি অনুযায়ী একটি করে পুকুর আছে। এ বিষয়ে মনস্কামনা মন্দির, সর্বমঙ্গলা পূজা স্থান, জহরা মায়ের মন্দির সংলগ্ন পুকুর, জেলা সমাহর্তার বাংলোর পুকুর, গাজোল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের পেছনে বিবির পুকুর ইত্যাদি অসংখ্য পুকুরের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে।

এছাড়া আছে অসংখ্য কুন্ড, এর সাথেও জড়িয়ে আছে প্রচুর কাহিনি কিংবদন্তী।

জলধারা বৃত্ত থেকে স্থাননামের সহযোগী যে শব্দগুলি তৈরী হয় তা নিম্নরূপ ঃ

ডাঙ্গা ঃ

তৃণ গুল্মহীন উঁচু শুকনো জমি। বাংলা অভিধানে শব্দটি দেশজ। শব্দ কোষকার হেমচন্দ্র শব্দটিকে 'দেশী' শব্দমালায় স্থান দিয়েছেন। অমরকোষে প্রায় সম অর্থে ভূমিবাচক শব্দ- 'খিল'। অপ্রতিহত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধ্বনিসাম্যে ডাঙ্গা শব্দটি মুন্ডারী 'ডাঙ্গার' শব্দজাত বলে মনে হয়। পঞ্চম শতকে কুমার গুপ্তের তাম্রশাসনে 'উচ্চভূমি ' অর্থেই ডাঙ্গা শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়। নদী তীরবর্ত্তী জেলা মালদহে উচ্চভূমির অভাব নেই। তাই একাধিক স্থাননাম ডাঙ্গা অন্ত্য নামে, যেমন — আড়াইডাঙ্গা, বালিয়াডাঙ্গা, ধর্মডাঙ্গা, সোলাডাঙ্গা, যাত্রাডাঙ্গা ফুলডাঙ্গা ইত্যাদি।

দহ ঃ

জলের ধারে ডাঙ্গায় মানুষ চিরকাল বসতি গড়েছে। নদী, দহ, কুন্ড, ঝোরা, মানুষকে দিয়েছে পানীয় জলের নিশ্চিত সন্ধান। মাছ, শামুক, গেড়ি, গুগলি আর কচ্ছপ ইত্যাদি খাদ্যের

সন্ধান, ডিঙ্গি-ডোঙ্গা-ছিপ-পানসিকে আশ্রয় করে মাঝি-মাল্লা, জেলে-ধীবর আর নৌকা তৈরীর মানুষেরা পেয়েছে জীবিকার সন্ধান। হিমালয় থেকে উদ্ভুত একাধিক নদী গঙ্গা, পদ্মা, মহানন্দা, তিস্তা আর তোর্সা; ছোটনাগপুরের পূর্বাভিমুখী অবতলভূমি দামোদর, অজয়, কাঁসাই, সুবর্ণরেখার জলধারা, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অকৃপণ দাক্ষিন্য, সাগর উদভুত চর-দ্বীপভূমি, নদীর ফেলে যাওয়া খাত বাংলায় ভূমিরূপ তৈরী করেছে। বাংলার স্থাননামে তাই উদক স্পর্শের ছড়াছড়ি। আমাদের এই জেলাও তার ব্যাতিক্রম নয়। গঙ্গা-পদ্মা, মহানন্দা-টাঙ্গন, কালিন্দ্রী, ফুলহারা, শ্রীমতি বেহুলা ইত্যাদি নদীর প্রবাহ স্থান এই জেলা, তাই 'দহ' অন্ত্য স্থান নাম এই জেলায় অসংখ্য। তাছাড়া দ্বীপ বা একই অর্থবহ দী, দা বা দীয়া শব্দান্তক স্থানও আছে একাধিক। 'দহ' যা প্রয়াশই 'দা'তে পরিণত, এই 'দা'-কে শব্দানুরূপে গ্রহণ ভাষাবিজ্ঞান সম্মত এবং যুক্তি যুক্ত। এছাড়া সাঁওতালি ভাষায় 'দা' শব্দের অর্থ জল যা দহ শব্দের অর্থের সঙ্গেও মানান সই।

বসতি বিস্তারের প্রাথমিক স্তরে বন্যজন্তু, বর্হি গোষ্ঠীর আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার প্রয়োজনে নদী, দহ, খাল-বিলের ধারে বসতি গড়ে উঠেছিল। আর্য-পূর্ব নাম করণে তো বটেই এমনকি আর্য প্রভাবযুক্ত নাম করণেও তাই উচ্চুভূমি ও জলাভূমির প্রাধান্য বেশী। যেমন ঃ— মালদহ, রসিলাদহ, মাদিয়া।

কান্দর / কাঁদর / কান্দি ঃ

ভূমিখন্ডের শাখা অর্থ বোঝাতে কান্দর, কাঁদর বা কান্দি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যার অন্যান্য অর্থ হল ফাঁকা মাঠ, অনাবাদী জমি, জনবিরল স্থান, উঁচু-নীচু ভূমিখন্ড, এটি একটি লোকজাত শব্দ। মালদহ জেলার হবিবপুর থানা এলাকায় একাধিক কান্দর নামযুক্ত মৌজা রয়েছে। যেমন — খোঁচা কান্দর, গাজিয়া কান্দর, সুখনী কান্দর ইত্যাদি।

জেলা/জুলি, জোড়া/জুড়ি ঃ

নালিকা বা ছোট নদী অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি অর্থ ভাষা উৎস সংস্কৃত থেকে প্রাপ্ত নয়, দ্রাবিড়ীয় ভাষা মন্ডলে জুল্লু 'জোরু - জলপ্রবাহ এই পথ ধরে এসেছে। যেমন ঃ — নয়ানজুলি।

বিভিন্ন যুগে জলকেন্দ্রিক বা জল থেকে উদ্ভুত জমির অনেক নাম পাওয়া যায়। যেমন তল, বাটক, উদ্দেশ, আলি ইত্যাদি। তল অর্থ পয়ঃ প্রণালী, বাটক অর্থ জলধারার পাশ্ববর্ত্তী পথ। বাংলাদেশে কথা সাহিত্যে, 'বাট' শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। (উল্লেখ ঃ) 'যখন' পড়বে বা মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে" — (রবীন্দ্রনাথ)। 'উদ্দেশ' অর্থে জলভূমির পার্শ্ববর্তী উচ্চভূমি অর্থাৎ বাঁধ, ঢিপি ইত্যাদি। 'আলি' অর্থে জমির 'আল', বরেন্দ্রভূমি তথা মালদহে 'বান্দাইল' শব্দটির বহুল প্রচলন আছে।

জোলা, জোলক, জেটিকা, খাট, খাটাও খনটিকা, খাড়ি ইত্যাদিকে জল কেন্দ্রিক বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন ধরণের জমিকে বোঝাত। এর মধ্যে 'জোলা' শব্দটির বহুল প্রয়োগ উত্তরবাংলা তথা মালদহে দেখা যায়। যার অর্থ সংকীর্ণ খাল, যার ভেতর দিয়ে বিল, পুকুর, গ্রামের জল চলাচল করে। খাট, খাটা, খাটিকা, খাড়ি ইত্যাদি শব্দের অর্থ খাল। খানিকা, স্রোতিক, গঙ্গানিকা শব্দগুলি মরা পুরাতন খালকে বোঝায়। উত্তরবাংলায় গঙ্গানিকার কথ্যরূপ গাঙ্গিয়া প্রচলিত।

হাজ্জিকা অর্থ নিম্ন জলাভূমি। হট্ট, হাটিকা জলের পার্শ্ববর্তী হাটবাজার। ঘট্ট. তর অর্থে খেয়াখাট।

চর ঃ

মালদহ জেলার প্রধান নদী গঙ্গা তার চলার পথে একাধিক বার পথ পরিবর্তন করার ফলে তার চলার পথে জেগে উঠেছে বিস্তীর্ণ বালুকা বেষ্টিত ভূমিখণ্ড বা চর। পলি মিশ্রিত এই মাটি পরে মানুষের হস্তক্ষেপে হয়ে উঠেছে বাসযোগ্য সবুজ ফসল সমৃদ্ধ জনপদ। মালদহ জেলায় ভূতনীর চর. বগচরা এইভাবেই গড়ে উঠা জনপদ।

উদ্ভিদধারা ঃ

ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের ঐতিহ্যে যে কয়টি প্রাচীন স্থাননামের উল্লেখ পাওয়া যায় তার পেছনে উদ্ভিদবৃত্তের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বেদ, উপনিষদের সময় থেকেই বৃক্ষ স্থানের 'দিশা-চিহ্ন' হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাংলা স্থান নামে শিমূল, শাল, বট, অশ্বথ বা পাকুড়. আম, জাম, পারুল, ফনীমনসা, আঁশ, শেওড়া, ভাঁট, ঘেঁটু ইত্যাদি উদ্ভিদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বৃক্ষকেন্দ্রিক নামকরণের পেছনে কাজ করছে সনাতন ভারতীয় চিন্তা-চেতনার অবহিত ধারা। যেমন বৈদিক সাহিত্যে শিমূল গাছকে ধরা হয়েছে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বড় গাছ বলে। কারণ বনের বড় বড় গাছের মধ্যে শিমূল গাছই সবচাইতে বেশি জন্মায় ও বাড়ে। এর পরই স্থাননাম তথা মানুষের জীবনে যে গাছের প্রভাব সবচাইতে বেশী তা হল ন্যাগ্রোধ বা বটগাছ। এই গাছের জীবনীশক্তি সবচাইতে বেশি। এই গাছ নীচের দিকেও বেড়ে ঝুরি নামিয়ে নিজেকে 'বৃত্ত' অর্থাৎ ঘিরে ফেলে তাই এর চলিত নাম বট। বেদের যজ্ঞ কাণ্ড যখন পুরোদমে তখন থেকেই বটগাছের প্রতিষ্ঠা রাজোচিত এবং জনহিতকর কাজ বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে। বটগাছ একাধিক গ্রামের দিশা-চিহ্ন। এই গাছের তলায় গড়ে উঠেছে মন্দির। মেয়েদের ষষ্ঠীপূজোতলা। বট দিয়ে গ্রাম নাম বঙ্গদেশে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দ থেকেই পাওয়া যায়।

বৈদিক আমলে যজ্ঞের কাজে ব্যবহৃত হত অশ্বথ। এই কাঠেই যজ্ঞের বাসনপত্র ব্যবহৃত হয়। গীতায় অশ্বথকে স্বয়ং বিষ্ণু বলা হয়েছে। পরবর্ত্তীকালেও অশ্বথর অদ্ভুত জীবনীশক্তি প্রমানিত হয়েছে। তাই অশ্বথকে বলা হয় tree of life। অর্থব সংহিতায় বলা হয়েছে একই সঙ্গে বেড়ে ওঠা বট-পাকুড় গাছের বিশেষ মূল্য আছে।

আম. জাম. কাঁঠাল বাংলার এই তিনটি নিজস্ব ফলের গাছ ঐতিহ্য বা জীবনীশক্তির গুনে তো বটেই এমনকি খাদ্যগুনেও মানুষের মনে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

এছাড়া লোকসংস্কৃতির কোলীয় বৃত্ত তথা আর্য়ুবেদিক চিকিৎসার কারণে ফনীমনসা. আঁশশেওড়া. অন্যান্য দেশজ উদ্ভিদগুলিও স্থান. কাল ভেদে নিজস্ব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আছে। উদ্ভিদ সংক্রান্ত স্থাননামের সহযোগী শব্দগুলি হল —

তলা ঃ

এই শব্দটি সংস্কৃত 'স্থলক' বা 'তলক' থেকে আগত। আবার হিন্দী শব্দ 'তলাও'

(তড়াগ) থেকে এসে থাকতে পারে। সিঙ্গাতলা, শিবতলা, বটতলা, শিমুলতলা ইত্যাদি।

তাল/তালা/ তালি ঃ

তাল মানে বৃক্ষবহুল ভূমি, যা বন নয়। কিছু স্থাননাম আছে যা তাল, তালা, তালি শব্দযুক্ত। যেমন ঃ — একতালা, জগদলা।

দেবধারা ঃ

অনার্য অথবা আর্য মানুষ যে সময় সীমারই হোক না কেন একটা দীর্ঘ সময় ছিল যখন দেবতার স্থান ছিল সবার উপরে। তাকে ঘিরেই মানুষের আশা-আকাঙ্খা, অভিমান, অভিযোগ নিবেদিত হোত। মানুষের বসতি তা গ্রামই হোক অথবা গৃহ মানুষ তার প্রিয় আরাধ্য দেবতার নামেই তাঁকে বিবেচিত করত। এখনও সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে অথবা পবিবেশগত যে কোন প্রয়োজনীয় কারণে স্থান নাম পরিবর্তিত হচ্ছে। মালদহে আবাধ্য দেবতার নামাঙ্কিত স্থাননামের কোনও অভাব নেই। যেমন কৃষ্ণপুর, শ্রীরামপুর, নারায়ণপুর ইত্যাদি। দেবধারা সংক্রান্ত স্থাননামের সহযোগী শব্দ হল —

বুড়া/বুড়ি ঃ

গ্রাম অঞ্চলে পূজিত কোন দেবী বা বৃদ্ধা গ্রাম দেবী। কখনও নির্দিষ্ট কখনও অনির্দিষ্ট অবযবে তিনি পূজিতা হন শিলাভূমিতে অথবা পলিভূমিতে। এছাড়া শেওড়া, খেজুর, বট, অশ্বত্থ গাছের তলায় ঘাসের ঝোপে, পুকুর পারে, নদীর চরে, পথের ধারে অমসৃন শিলাস্তূপে আরাধনা। তাঁর অবয়বে কোথাও গাঢ় হরিদ্রাভ কোন রঙের প্রলেপ, কখনও সিঁদুর লিপ্ত রক্তাভ, বনাঞ্চলে তার ছলন পোড়া মাটির হাতি, ঘোড়া আর সমতল ভূমিতে ছলনহীন নির্ভার পূজিত হন দেবী। সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা, মাঝি, বাগদি, ধাঙর, ডোম, হাঁড়ি, শাল, কেওটদের দেবী, বৃদ্ধ বৃদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাত। তাঁদের প্রাজ্ঞদর্শিতার উপর একান্ত শ্রদ্ধাবোধ এবং বিশ্বাস থেকেই একধরণের কল্পনা ও জনমতই সাধারণ মানুষের মনে বুড়া/বুড়ি দেবদেবীর জন্ম দিয়েছে। তাদের অধিষ্ঠান ভূমিও তাদের গ্রাম নামে সাক্ষরিত।

পুরধারা ঃ

পুর শব্দটির আভিধানিক অর্থ নগর, রাজ-আবাস, দেবগৃহ, স্কন্ধাবার। যাযাবর জনগোষ্ঠী যখন ধীরে ধীরে প্রশাসনিক সমাজ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে তারই পরিচয় বহন করছে এই পুরধারা বৃত্ত। অট্টালিকা বহুল নগর বসতি গড়ে তোলা অনার্য দ্রাবিড় গোষ্ঠীর দান। পাহাড় বা জলাশয়ে ঘেরা সেনানিবাস ছিল প্রাক্ আর্যগনের জলদুর্গ বা পুর। এই শব্দ প্রাথমিক স্তরে একই কোমের পাশাপাশি কয়েকটি বাড়ী নিয়ে গ্রাম সমুদায় গড়ে উঠত। আর এই গ্রামের অভ্যন্তরে প্রতিরক্ষা ব্যূহকে বলা হত 'পুর', এই শব্দ পরবর্ত্তীকালে রাজধানী দেবনগরী অর্থেও ব্যবহৃত হোত।

নগর সভ্যতা ভারতীয় অনার্য জনগোষ্ঠীর দান। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ বছর আগে প্রাচীন ভারতে নানা ধরণের নগর গড়ে উঠেছিল। সিন্ধুসভ্যতার নগর কেন্দ্রগুলি

এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। 'রাজধানী' তাদের মধ্যে অন্যতম। এছাড়া সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ছিল 'দুর্গনগরী', ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে প্রাকারবেষ্টিত "নগর", নদী বা সমুদ্র তীরের বাণিজ্য বন্দর 'পট্টন' এবং ছোট ছোট বাণিজ্যকেন্দ্র, যা দ্রোণমুল বা খেতা' নামে পরিচিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ বছর আগে এদেশে প্রথম নগর স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। নগর সভ্যতায় সেই ধারাই অদ্যাবধি বজায় আছে। কোনও একটি অঞ্চলে নগর গড়ে ওঠার পেছনে একাধিক কারণ কাজ করত। কিছু নগর গড়ে উঠত প্রশাসনকে কেন্দ্র করে। নদী বা সমুদ্র তীরবর্ত্তী বাণিজ্যকেন্দ্রেও নগর তৈরী হত। এক বা একাধিক পেশাকে কেন্দ্র করে অথবা ধর্মীয় তীর্থস্থানেও ধীরে ধীরে গড়ে উঠত নগর। বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকালে পুরনো দুর্গগুলির সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দুর্গ তৈরী হয়েছিল তার তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত নগর। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও শিখ প্রতিটি প্রধান ধর্মই নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য ছোট বড় উপাসনা করার জায়গা তৈরী করে নিয়েছিল, সেই সময় ধর্মীয় শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের কেন্দ্র যেমন ছিল, তেমনি আবার বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রও ছিল। সময়ের প্রভাবে নগরগুলির কোন কোনটি স্থায়িত্ব পেয়েছে কোনটি আবার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে নি।

বাংলাদেশে মুসলিম আমলে খুব দ্রুত রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে নগরায়ন খুব বেশী পরিমাণে হয় নি। এরপর ফরাসী ও পর্তুগীজরা আমাদের দেশে এসেছিল, কিন্তু তাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না, ফলে তাদের দ্বারা খুব বেশী নগরায়ন সম্ভব হয় নি। কিন্তু তারা যে কয়টি নগর পত্তন করেছিল, সেখানকার বৈশিষ্ট্য এখনও পর্যন্ত বজায় থেকে গিয়েছে। এরপর বেশিদিন থাকার সুবাদে ইংরেজরা এদেশের নগরায়নে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। মালদহ জেলার ইংরেজবাজার তার অন্যতম উদাহরণ। পুরভাযা বা নগরাযনের সঙ্গে ভূমিগত যে বিভাজনগুলি আসে তা নিম্নরূপ ঃ

নগর ঃ

প্রাচীনকালে নগর বলতে পাথর বা ইটের তৈরী গৃহ অথবা রাজা বা দেবতা অধিষ্ঠিত প্রাচীর ঘেরা গ্রামকে বোঝাত। পরে এই অর্থ সঙ্কুচিত হয়ে ইটে গাথা শিবালয় অথবা যেকোন দেবালয় বিশিষ্ট গ্রামকেই বোঝাত। আমাদের দেশে স্থাননামে'নগর' শব্দের চলন ছিলনা বললেই চলে, কারণ বাংলাদেশ ইট , পাথরের দেশ নয়, মাটি, কাঠ আর বাঁশের দেশ। তাই স্থাননামে 'নগর' শব্দ পাওয়া যায় না। এরপর ১৫-১৬ শতাব্দীতে ইসলাম শাসন পাকাপাকি ভাবে বাংলাদেশে কায়েম হবার পর 'নগর' শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে প্রথমে কোম্পানীর শাসন, পরে ব্রিটিশ শাসন, পাঁচশালা দশশালা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন জমিদার তালুকদারের সংখ্যা বেড়ে গেল। বেশীর ভাগ 'নগর' বাচক গ্রাম নামগুলিএই নতুন ভুস্বামীকুলের সৃষ্টি। রাজার পরিবর্তে জমিদার হলেন স্থায়ী ভূমি স্বত্বের অধিকারী। 'নগর' সম্বলিত স্থাননাম মালদহে প্রচুর রয়েছে। - বৈষ্ণবনগর, আলিনগর, জয়নগর, বক্সিনগর ইত্যাদি।

পুর ঃ

কন্নর ভাষায় পুর শব্দের অর্থ নদীগর্ভ, খাল, মালয়ালম ভাযায় অর্থ পাহাড়ী নদী। পুর

+ অন্দা (প্রত্যয়) = জলের কাছে লোকালয়। লোক কথায় পুরন্দরকে ইন্দ্র অর্থের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টিতে আগ্রহী। পুরুলিয়া-যড়ন, পুরুল্যা-নন্দী, পুর + উল-দ্রাবীড়িয ভাষাগুচ্ছ 'উল'-কদম-ভূমি, নদীর ধারের কাদা জমি।

হিন্দু আমলে কোন দেবদেবীর নামের অন্তে 'পুর'যুক্ত হয়ে স্থাননাম চিহ্নিত করা হত। যেমন - চন্ডীপুর, লক্ষ্মীপুর, কানাইপুর, গোবিন্দপুর, দেবীপুর, রামচন্দ্রপুর, নৃসিংহপুর প্রভৃতি। কিন্তু মুসলিমরা এদেশে অধিকারের পর তারাও ব্যক্তিনামের সাথে পুর শব্দ যুক্ত করে স্থান নাম গঠিত অথবা পরিবর্তিত করেছে। হায়দারপুর, কুতুবপুর, এনায়েতপুর ইত্যাদি।

গ্রাম ঃ

সংস্কৃত অর্থ সমূহ! কৃষক, পশুপালক, কুটির শিল্পীর সংহত বাসভূমি। আরবী-' মৌজা'; বাজত্ব সংগ্রহের একক সীমা নির্দিষ্ট। তদ্ভব শব্দ - গাঁও, গাঁ, গেরাম ইত্যাদি।

স্থায়ী বসত ভূমিতে গ্রাম পত্তন কৃষি অর্থনীতিরই দান। খাদ্য সংগ্রহক যাযাবরীয় জীবনে স্থায়ী ও যূথজীবন বিভক্ত গ্রাম গড়ার প্রয়োজন ছিল না। নব্য প্রস্তর যুগের শেষ দিকে মানুষ যখন ভূমি কর্ষণ করতে শিখেছে, শিখেছে বন্য বীজকে কৃষি শস্যে রূপান্তরিত করতে, নিশ্চিত খাদ্যশস্যের প্রয়োজনে মানুষ অনুভব করেছে স্থায়ী যূথবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তা। নদীর ধারে অথবা শস্য পূর্ণ মাঠের পাশে তখন একটু একটু করে গড়ে উঠেছে যূথবদ্ধ জীবনের প্রাচীনতম একক। কোলীয় জনগোষ্ঠির কাছে সেই বসতি 'আতু' ও 'হাতু'। দ্রাবীড় ভাষাভাষীদেব কাছে গ্রাম অর্থসমূদায় বা সমষ্ঠিগত। গ্রাম গড়ার প্রাথমিক স্তরে সমবৃত্তিজীবী একই গোষ্টির মানুষেরা বৃত্তি সহায়ক ভূমি নির্বাচন কবে ছোট ছোট বসতি কেন্দ্র গড়ে তুলত। মালদহ জেলায় এই গ্রাম অন্তস্থাননাম এখনও বহুল পরিমানে আছে। কলিগ্রাম, বামনগ্রাম, মোরগা, করমনিগা, মালিগাও মিরাগ্রাম ইত্যাদি।

পাড়া ঃ

গ্রামকে ঘিরে থাকত বিস্তৃত চারনক্ষেত্র, শস্যভূমি আর পতিত জমি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নতুন নতুন জনগোষ্ঠীর আবির্ভাবে পতিত জমিগুলি বাস্তুজমিতে রূপান্তরিত হতে লাগল। বৃহৎ গ্রামে এবং নতুন বসতিতে ভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং পৃথক পৃথক বৃত্তিজীবীরা আলাদা আলাদা বসতি গড়ে তুললেন। জনবসতির এই ক্ষুদ্র একক গুলিই পরিচিত হল পাড়া নামে। কোন জনগোষ্ঠীর কাছে পাড়া, টোলা, কলি, বাড় নামে পরিচিত। ওড়িয়া ভাষিদের সাহী > সাই এগুলির অর্থ — বৃহৎ গ্রামের অংশ বিশেষ। জাতি, ধর্ম, বৃত্তি, পদবী নানাভাগে বিভক্ত সমাজে পাড়াকে আশ্রয় করেই গোষ্ঠী ঐক্য গড়ে উঠত। মালদহের বাবুপাড়া, গোয়ালপাড়া, ঘোযপাড়া, রায়পাড়া ইত্যাদি।

পল্লী ঃ

এই শব্দটি পাড়া অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সমজাতিক, সমবৃত্তিজীবী মানুষেরা বৃহৎ গ্রামের বিশেষ বিশেষ অংশে নিজ নিজ বসতি গড়ে তুলতেন, এরফলে সুরক্ষা, সহমর্মিতা, গোষ্ঠী সুখ

ভোগ তাদের কাছে নিশ্চিত হোত। রাজা, ভূস্বামীরাও তাদের সেবকদের নিষ্কর ভূমি দান করে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য বসতি গড়ে দিতেন। আর্যভাষীদের কাছে বসতির এই এককটি পল্লী নামে চিহ্নিত। পল্লী > পাটক > পত্রক > পাড়া। দ্রবীড় বাসীদের কাছে 'হল্লী', কর্ণাটকে মারাথাল্লী। জেলার পল্লী অন্ত স্থাননাম - রামকৃষ্ণপল্লী, মালঞ্চপল্লী, কৃষ্ণপল্লী, সুভাষপল্লী, সর্বমঙ্গলাপল্লী।

বাড়ী :

সংস্কৃত মূল শব্দটা 'বাড়'। বাটিকা > বাটি > বাড়ি > বাড়িয়া > বেড়ে > বাড়ি (বেড়া দেওয়া অথবা প্রাচীর দেওয়া স্থান)। কোলীয় ভাষা উৎসে 'বাড়ি' শব্দের ব্যাপক ব্যবহাব দেখা যায়। সাঁওতাল 'বাড়' — উঁচু আল ঘেরা জমি, বাড়গে —বাস্তু সংলগ্ন ভূমি, গ্রাম সংলগ্ন বসতিহীন ভূমি, কৃষিভূমি। আবার 'বাড়ি'-র সাধারণ অর্থে বাস্তু সংলগ্ন কালাভূমি, তরি-তরকারী উৎপাদনের জমি। বাড়ী-পাড়া অর্থেও হয়।

কৃষি পশুপালন, গ্রামীণ কুটির শিল্প কিছু কিছু মানুষের হাতে উদ্বৃত্ত ধন এনে দিল, ফলে ব্যক্তিস্বার্থ ভাবনা সাম্যবাদী সমাজে ফাটল ধরালো। উদ্যোগী পুরুষেরা আদি বাসভূমির সংলগ্ন ভূমিতে স্বত্ব বিস্তার করতে লাগল। সামন্তশ্রেণীর কৃপাপুষ্ট হয়ে কেউ কেউ বৃহৎ ভূমিপতি বা জমিদার হয়ে উঠলেন। নবোদ্ভুত এই ধনিকশ্রেণীর ব্যক্তিগত ভোগভূমি আবাদ > আবাড়, ব্যক্তিনাম সমৃদ্ধ হয়ে তাই বাড়িতে রূপান্তরিত হল। খাত কেটে উঁচু আল দিয়ে ব্যক্তি স্বত্ত্ব সুনিশ্চিত অংশই চিহ্নিত হলো বাড়ি নামে। জেলা এবং জেলার বাহিরেও একাধিক বাড়ি-অন্ত স্থাননাম আছে। কোঠাবাড়ি, ফুলবাড়ি, দুর্গাবাড়ি, রথবাড়ি, বাগবাড়ী, মঙ্গলবাড়ী ইত্যাদি।

গঞ্জ :

বাজার অর্থে 'গঞ্জ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। রাজশক্তি তার নিজের প্রয়োজনে তার রাজধানী স্থানান্তরিত অথবা প্রসারিত করতে পারে। তবে রাজধানী স্থাপিত হওয়ার প্রধান শর্তটিই বোধহয় এই হয় যে, কোন নদীর তীরবর্ত্তী স্থান। রাজধানী গঠনের পর স্বাভাবিক নিয়মেই গড়ে ওঠে জনপদ এবং জনপদেব প্রয়োজনে উপযুক্ত বেচাকেনার স্থান। তাই সাধারণত 'বাজার' অর্থেই 'গঞ্জ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ক্রমান্বয়ে বাজার কেন্দ্রিক জনজীবন। বর্ধিষ্ণু গ্রাম বোঝাতেও 'গঞ্জ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন — রানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, কুমার গঞ্জ, সুলতানগঞ্জ ইত্যাদি।

হাট :

বড় বাজার অর্থে সংস্কৃত 'হট্ট' শব্দটি থেকে 'হাট' শব্দটি এসেছে। এই 'হাট' শব্দটি অঞ্চল ভেদে লোকমুখে হাট, হাটি, বা হাট্টা 'তে পরিবর্তিতে হয়েছে। যেমন - পাকুয়াহাট, মালিহাট, খৈহাটা, কোটালহাটি, নরহাট্টা, বাঁশহাঁটা, তুলসীহাটা ইত্যাদি।

কসবা :

আরবী শব্দ কস্‌বাহ থেকে কসবা শব্দটি এসেছে বলেই অনুমান। 'কসবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'সমৃদ্ধ গ্রাম' বা এমন বসতি যা গ্রাম থেকে বড় অথচ নগর থেকে ছোট। মালদহ জেলায় একাধিক কসবা অন্য নামযুক্ত মৌজা পাওয়া যায়। যার বেশীর ভাগই সুলতানী

আমলে বেড়ে ওঠা মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল। বামনগোলা থানার অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম কস্‌বা (৮০), পূর্ব কস্‌বা (২১৮), দক্ষিণ কস্‌বা (২৩৯) এইরকমই কয়েকটি মৌজা।

কেবলই সংখ্যাবাচকে কিছু নামও মালদহে পাওয়া যায়। যেমন একলাখি ইত্যাদি।

করধারা ঃ

রাজতন্ত্রের দুটো বিধি শাসনবিধি আর করবিধি। রাজা তার অধিকার রক্ষা করতে, শৃঙ্খলা বজার রাখতে শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো গড়ে তোলেন। কালের নিয়মে এক রাজবংশের পতনের পর নতুন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। পুরাতন শাসন কাঠামোর পরিবর্তে নতুন শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরনো প্রশাসনিক বিভাগ ও কর কাঠামো ইতিহাসের স্মৃতি হয়ে যায়, আর এই স্মৃতির অবশেষই ধরা থাকে স্থাননামের মধ্যে।

প্রাচীন এবং বর্তমান কালের ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে বর্তমান মালদহ জেলা গৌড় জনপদের অর্ন্তগত ছিল। এই গৌড়দেশে একসময় দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছেন আদিশূর এবং তারপর ভুসুর। এই বংশের রাজা বরেন্দ্র শূরের রাজত্বকালেই এই পুন্ড্রদেশের নাম বরেন্দ্র হয়। তারপর বিখ্যাত পাল এবং সেন রাজত্ব। আদিশূর এবং ভুসুর-এর রাজত্বকালীন দেশের কর ব্যবস্থার কোন স্থির চিত্র পাওয়া না গেলেও পাল এবং সেন বংশের করকাঠামো সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা দিয়েছেন ঐতিহাসিকরা।

বর্তমানকালে জমি সংক্রান্ত আইনগুলি কৃষক কল্যাণের যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে তার ভিত্তিভূমি রয়েছে ঋকবেদের যুগেই। আজকের প্রচলিত শ্লোগান 'লাঙ্গল যার জমি তার' — এর মূল উৎপত্তি বৈদিক সমাজ কাঠামোর মধ্যেই ছিল।

ঋকবেদের 'ক্ষেত্র' ও 'খিশ্যা' জমি সংক্রান্ত এই দুটি শব্দ পাওয়া যায়। 'ক্ষেত্র' হচ্ছে জমি আর 'খিশ্যা' হচ্ছে সীমানা। রাজা উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ 'রাজভাগ' হিসাবে গ্রহণ করতেন বিনিময়ে তিনি প্রজাদের নিরাপত্তা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা, রাস্তা, পুকুর খনন ইত্যাদির মাধ্যমে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতেন। প্রশাসন পরিচালনার জন্য পাঁচশত পরিবার অধ্যুষিত অঞ্চল 'গ্রাম' হিসাবে চিহ্নিত এবং কয়েকটি গ্রাম নিয়ে হত মহাগ্রাম।

পরবর্ত্তী রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে কৃষি বা ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। সে ব্যবস্থা মোটামুটি সুচিন্তিত ভাবে প্রথম আকার পেতে শুরু করে মৌর্য আমলে, চন্দ্রগুপ্তের পরামর্শদাতা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের লেখা 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ থেকে, অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় পাঁচশ অধিবাসীর গ্রামে অধিকাংশ ছিল কৃষিজীবী। আটশ গ্রামের মাঝখানে থাকত দুর্গ বা রাজধানী যাকে বলা হত 'স্থানীয়', চারশ গ্রামের মাঝখানে থাকত 'দ্রোণমুখ', দু'শ গ্রামের মাঝখানে থাকত 'খভতিক' এবং দশটি গ্রামের কেন্দ্রে 'সংগ্রহন'। গ্রামগুলির আবার নানারকম রকম চরিত্র ছিল। রাজস্ব মুক্ত গ্রামগুলিকে বলা হত 'পরিহারক'। সৈন্য সরবরাহ করত যে সব গ্রাম সেগুলি 'আয়ুধিক'। 'হিরন্য-এর অধীন গ্রামগুলি শস্য, গবাদি পশু, সোনা অথবা কুপ্য কাঁচামাল রাজস্ব হিসাবে সরবরাহ করত। 'ভিস্তি'-এর অধীন

গ্রামগুলি থেকে মজুর সরবরাহ হত এবং কর-প্রতিকার-এর অধীন গ্রামগুলি রাজস্বের পরিবর্তে দুধ, মাখন ইত্যাদি সরবরাহ করত।

সাধারণত জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণত সেই সময়ে কৃষকেরা যে জমি আবাদযোগ্য করে তুলত তাদের সাথে রাজত্বের বিনিময়ে সারা জীবনের জন্য তাদের জমির বন্দোবস্ত করা হতো, এমনকি রাজস্বের ব্যবস্থা বিনিময়ে রাজা তাদের পশু, বীজ এমনকি অর্থও ঋণ দিতেন। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় রাজা রাজস্ব মকুব ও করে দিতেন। জমি ও তার ব্যবহারের জন্য তের প্রকার বাজস্বের ব্যবস্থা ছিল। আর এই রাজস্ব যিনি আদায় করতেন তাঁকে বলা হত সমাহর্তা বা সংগ্রাহক। সংগৃহিত করগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) সীতা — রাজার নিজস্ব জমির উৎপাদন থেকে রাজস্ব।

২) ভাগ — রাজাকে দেওয়া উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ।

৩) কর — নগদ টাকায় রাজত্ব প্রদান।

৪) বিভিতা — গোচারণ ভূমি থেকে সংগৃহীত রাজস্ব।

৫) ভর্তনী — পূর্তকর।

৬) চেররজ্জু — চৌকিদারী কর।

৭) রজ্জু — জমি বন্দোবস্তের জন্য কর।

৮) বন — বন থেকে রাজস্ব।

৯) ব্রজ — গো-মহিষাদি প্রতিপালনে ব্যবহৃত জমির রাজস্ব।

১০) বলি — ধর্মীয় কর অর্থাৎ রাজাকে দেয় উপহার।

১১) খনি — খনি ও খনিজ পদার্থের জন্য রাজস্ব।

১২) তরা — ফেরি ঘাটের জন্য কর।

১৩) আত্তেয় — অপরাধের জন্য জরিমানা।

চন্দ্রগুপ্তের পরবর্তী সম্রাট অশোক রাজভাগ এক ষষ্ঠাংশ থেকে অষ্টমাংশ করে দেন। এছাড়া অন্যান্য কিছু করের প্রচলন দেখা যায় যেমন-

১) উদ্‌রঙ্গ — দখলী স্তত্ব বিশিষ্ট জমির কর।

২) উপরিক — দখলী স্বত্ব শূন্য জমির কর।

৩) ভাট — পতিত জমির কর।

৪) ধান্য — উৎপন্ন শস্যের কর।

ছিল ফুল, ফল ও খনিজ দ্রব্যের উপর কর। জমি সংক্রান্ত যে কোনও আইন ভঙ্গ কারীকেও জরিমানা দিতে হত।

গুপ্ত যুগে এর সাথে আরও কয়েকটি রাজস্ব আদায়ের কথা জানা যায় তা হল — খামারের উপর দেয় কর খাল, ভিক্ষা, মদের উপর কর প্রস্থালা এবং কাঁধে বহনকারী জিনিষের উপর কর স্কন্দ।

বাংলাদেশে জমি সংক্রান্ত আইন বা কর ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা পাওয়া যায় সেন-রাজাদের আমলে। তার আগে পঞ্চম শতক থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় সমাজই ভূমি-ব্যবস্থার নিয়ামক ছিল। মানুষ ঝোপ-জঙ্গল পরিস্কার করে চাষ আবাদ করত। কোনও সমস্যা হলে সমাজ-ই তার মীমাংসা করত। পরবর্তীকালে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে নির্বাচিত দল নেতাকে 'রাজা' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হোত, তিনিই হতেন ভূমি স্বত্বের অধিকারী। রাজাকে দেয় কর এই সময় চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল।

ভাগ্য :

প্রাচীন কালের মতই ধর্মপালের রাজত্বকালেও উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ ভাগ রাজস্ব হিসাবে রাজাকে দিতে হত। এই রাজস্ব যিনি সংগ্রহ করতেন তাঁকে বলা হত ষষ্ঠাধিকৃত।

ভোগ :

ফল, ফুল, কাঠ ইত্যাদি যে সব জিনিস রাজাকে তাঁর ব্যক্তিগত ভোগের জন্য দিতে হত, তাকে বলা হোত ভোগ।

কর :

মুদ্রায় দেয় রাজস্ব অর্থে কর। এই কর ছিল তিন প্রকার ১) রাজার প্রাপ্য শস্যের ভাগ ছাড়া নির্ধারিত কালে নিয়মিত ভাবে দেয় মুদ্রাকর; ২) আপৎকালে দেয় মুদ্রাকর; ৩) বণিক ও ব্যবসায়ীদের উপর দেয় কর।

হিরণ্য :

হিরণ্য অর্থে স্বর্ণ। রাজা শস্যের ভাগ গ্রহণ করতেন না, তার বদলে গ্রহন করতেন মুদ্রা। সেই মুদ্রাই হিরণ্য।

অষ্টম শতকের আগের বিভিন্ন লিপি থেকে জানা যায় জমি মূলতঃ তিন শ্রেনীতে বিভক্ত ছিল- বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিলক্ষেত্র। বসবাসের জন্য যে জমি তা বাস্তু। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে এই বাস্তুকেই ব্যভূ বলে চিহ্নিত করা হত। যে জমি কর্ষণযোগ্য সেই জমিকে 'ক্ষেত্রভূমি' বলা হত। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে এই 'ক্ষেত্রভূমিকেই নালভূ' বা 'নাভু' বলা হোত। আয় জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ফেলে রাখা পতিত জমিকে বলা হোত 'খিল'। পঞ্চম শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলায় জমি মাপার যে ব্যবস্থা ছিল তার সর্বোচ্চ মান 'কুল্য' বা 'কুল্যবাপ'; তারপর 'দ্রোনবাপ' এবং সর্বনিম্ন 'আঢ়বাপ'।

এছাড়া রাজা বিভিন্ন সময়ে ব্রাহ্মণ অথবা মন্দির বিশেষে দেবোত্তর জমি দান করতেন। সেগুলি হল —

অগ্রহার :

যে ব্রাহ্মণ পরান্নজীবী তাকে অথবা ধর্মীয় কোনও প্রতিষ্ঠানকে এক বা একাধিক গ্রাম দান করা হত। যার আয় থেকে তাদের জীবন ধারণ হত এবং অগ্রহার দান গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ সেই গ্রামের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন।

ব্রহ্মদেয় ঃ

রাজা বা ব্যক্তি কখনও কখনও কোন পূণ্য অর্জন করবার জন্যই নিষ্কর জমি ব্রাহ্মণকে দান করতেন। সেটি ব্রাহ্মণদেয় নামে পরিচিত হোত।

দেবদান ঃ

রাজা বা ব্যক্তি মঠ বা মন্দিরকে যে নিষ্কর জমি দান করতেন তাকে বলা হোত দেবদান। এই জমি থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব রাজকোষাগারে জমা থাকত।

ধর্মনিরপেক্ষ ঃ

এছাড়া রাজা রাজপুত্র বা তার আত্মীয় স্বজনেরা রাজকর্মচারীদের সেবা পাওয়ার শর্তেও জমিদান করতেন, এই ধরনের দান কে ধর্মনিরপেক্ষ বলা হোত।

প্রাচীনকালে জমি হস্তান্তরের এই প্রক্রিয়া এবং করকাঠামোর এই বিধির দিকে লক্ষ্য রেখেই ঐতিহাসিক রামশরন শর্মা মন্তব্য করছেনে — এই ভাবে শাসনের অধিকার ও রাজস্ব আদায়ের অধিকার হস্তান্তরিত করার ফলেই সামন্ত প্রথার জন্ম হয়েছে।

আবার ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকার এর মতে- এদেশে সামন্ত প্রথা কোন দিনও ছিল না, কারণ রাজা ইচ্ছা করলেই প্রদেয় জমি কেড়ে নিতে পারতেন, কারণ প্রদত্ত জমিতে তিনি প্রজাদের শাসনের অধিকার দেন নি, শুধু রাজস্ব ভোগের অধিকার দিতেন।

পাল এবং সেন আমলের পর বাঙলাদেশের প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কী, পাঠান, আফগান, মোগলদের হাতে। তুর্কী আমলের শাসনকর্তারা যুদ্ধ বিগ্রহে অধিক সময় অতিবাহিত করায় ভূমি ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করতে পারেন নি। এরপর পাঠান রাজত্বে মোটামুটি পূর্ব প্রচলিত গুপ্ত যুগের ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল। তবে রাজস্বের হার ক্রমাগত বাড়তে থাকে। আলাউদ্দিন খিলজীর সময়ে রাজস্বের পরিমান উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক হয় (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ)। 'খরাজ' অর্থাৎ ভূমি রাজস্ব হিন্দু জমির মালিকদের দিতে হত। মুসলিম যুগে দুপ্রকার রায়তের সরকারী স্বীকৃতি ছিল- 'খুদকস্ত এবং পাইকস্ত'। যারা নিজেদের জমি চাষ করত তারা 'খুদ্‌কস্ত' আর যারা অন্যত্র গ্রামের জমিচাষ আবাদ করত তাদের বলা হত পাইকস্ত'। তুঘলকরা খিলজিদের তুলনায় কৃষকদের প্রতি অনেক সহানুভূতি সম্পন্ন। তারা রাজস্বের হার উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ এবং ক্ষেত্র বিশেষে এক দশাংশ-এ কমিয়ে এনেছিলেন।

তুঘলকী রাজত্বের দুশ বছর পর শেরশাহ (১৫৪০-৪৫ খ্রীঃ) ভূমি রাজস্ব বিষয়ে বিধি সম্মত ব্যবস্থা বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেন। শেরশাহ-র পিতা হাসান খাঁ একজন বড় জায়গীরদার ছিলেন সেই কারণে শেরশাহ যৌবনেই রাজত্ব ও প্রশাসন সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পোষণ করতেন।

তিনি বাংলা এই প্রদেশটিকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে শাসন কর্তার পরিবর্তে প্রশাসন পরিচালনার জন্য প্রতি ভাগে একজন করে আইনজ্ঞ নিয়োগ করেন। এই আইনজ্ঞের অধীনে একজন আমীন, রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের জন্য একজন শিকদার। একজন কোষাধ্যক্ষ এবং সরকারী নথিপত্র ও রাজস্বের হিসাব নিকাশ হিন্দি ও ফার্সী ভাষায় রাখার জন্যে দুজন কেরানী থাকত।

শেরশাহ প্রবর্তিত ভূমি-রাজস্ব নীতির যুক্তিযুক্ততা অনেকদিন পর্যন্ত প্রশাসনিক অপরিহার্যতা বজায় রেখেছিল। তাঁর রাজস্ব ব্যবস্থার অন্যতম জাতির মধ্যে ছিল-প্রতিবার প্রধান শস্য কাটার সময় ভাল, মাঝারী ও নিকৃষ্ট জমি পৃথক পৃথক ভাবে জরিপ করে শস্যের পরিমান নির্ধারন করা এবং গড়পরতা উৎপাদনকে সেই অঞ্চলের জল হিসাবে এক-তৃতীয়াংশ শস্যের বাজার দর ঠিক করে তাই রাজস্ব হিসাবে সংগ্রহ করা। রাজস্ব আদায় করতে জোর জুলুম ও অত্যাচার নিষিদ্ধ করা হয়। এই বিষয়ে তাঁর আরও কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ হল ভূমি-রাজস্ব বা খাজনা জমা দিলে প্রাপ্তি স্বীকার করে রসিদ দেওয়া হত। প্রজা সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'পাট্টা' ও 'কবুলিয়ত' দেওয়া-নেওয়ার রীতি তিনি প্রবর্তন করেন। এই সময় থেকেই কৃষকরা জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে। জমি জরিপ এর কাজে শেরশাহ যে সব আরবি ফার্সী শব্দ একক হিসাবে ব্যবহার করতেন তার অনেকগুলি আজও এ দেশের জমির জরিপ, স্বত্ব লিপি আইনে ব্যবহার করা হয়।

শের শাহের এই রাজস্ব নীতির ভিত্তিকে অবলম্বন করেই আকবর তাঁর পরবর্তী রাজস্ব নীতি প্রবর্তন করেন। আকবর (১৫৫৬ - ১৬০৫ খ্রীঃ) তাঁর সাম্রাজ্যকে পনেরটি সুবা বা প্রদেশে ভাগ করেন। প্রদেশগুলিকে আবার সরকার বা সিকদার অর্থাৎ জেলা, পরগণা বা মহলে ভাগ করেন। এই সময় রাজস্ব সংগ্রহ করা হত দুটি স্তরে কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক। কেন্দ্র আদায় করত ব্যবসা-বাণিজ্য, টাঁকশাল, লবণ, আমদানী-রপ্তানি শুল্ক এবং ভূমি-রাজস্ব। আর ব্যবসা, পরিবহণ, সামাজিক জীবনের নানা বিষয়ের উপর আরোপিত কর আদায় করত প্রদেশ।

আকবরের আমলে রাজস্ব আদায়ের প্রধান তিনটি রীতি ছিল। — ১) গল্লাবক্স -- প্রতিটি উৎপন্ন শস্যের রাজাকে দেয় এক ভাগ। ২) জবতি -- উৎপন্ন শস্যের দেয় এক তৃতীয়াংশ, ৩) নসক্ -- চুক্তি বা আলোচনার মাধ্যমে রাজস্ব স্থির করা, এই ব্যবস্থা সমগ্র বাংলাতে প্রচলিত ছিল।

প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলাদেশের কিছু গ্রামকে একত্রিত করে একটি 'পরগণা' তৈরী করা হতো। এই পরগণার সম্রাট নিযুক্ত কর্মচারীর নাম চৌধুরী। পরগণার রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্র হিসাবে রাখার জন্য একজন 'কানুনগো' থাকত। বেতন পরিবর্তে তারা ভোগ করতেন নিষ্কর জমি, কিছুদিন পর এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়, যেমন— বিশেষ করে বাংলায় ভূমি রাজস্ব আদায় রাজকোষে জমা দেবার দায় দায়িত্ব কিছু লোকের উপর ন্যস্ত করা হয়, তাদের বলা হত জমিদার। এই জমিদাররা তাদের কাজের সুবিধার জন্য নিজস্ব এক প্রশাসন তৈরী করে নেন, যার সর্বনিম্নে মোড়ল বা মন্ডল এবং সবার উপরে জমিদার স্বয়ং। তারা কেন্দ্রীয় প্রশাসকের কাছে রাজস্ব প্রেরণের বিনিময়ে নিজের এলাকায় যথেচ্ছ স্বাধীনতা ভোগ করতেন, আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে এই জরিপ ব্যবস্থা 'আসলি-জমা-তুমা' নামে উল্লিখিত হয়েছে। আকবরী মুদ্রায় বাঙলাদেশ থেকে প্রেরিত রাজস্বের পরিমান ছিল এক কোটি ছয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার উনসত্তর টাকা। এছাড়া আদায়ীকৃত অর্থে জমিদার থেকে মন্ডলের লভ্যাংশের পরিমানও ছিল যথেষ্ট। এরপর বাঙলাদেশের সুবাদার হয়ে আসেন শাহাজানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা, ময়ূর সিংহাসন ও তাজমহল গড়তে রাজকোষে যে অভাব দেখা দিয়েছিল তা পূরণ করার জন্য সুজা আবার নতুন করে বাংলা সুবাকে চৌত্রিশটি সরকার ও তেরশ পঞ্চাশটি পরগণায় ভাগ করে নতুন করে জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণ করেন। যার ফলে উদ্ধৃত রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে

চৌদ্দ লক্ষ টাকা। ঔরঙ্গজেবের সময় নীতিগতভাবে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক রাজস্ব হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়। এই সময় বাংলার সুবাদার ছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। তিনি নিজেকে স্বাধীন নবাব বলে ঘোষনা করেন। তাঁর আমলে বাংলার কৃষকরা খানিকটা ভাল অবস্থায় ছিল। ১৭২২ খ্রীঃ মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলায় জমি জরিপের কাজ সম্পন্ন করেন। এই জরিপ ব্যবস্থা "জমা-ই-কামাল-তুমার" নামে পরিচিত। তিনি বাংলা সুবাকে তেরটি রাজস্ব চাক্‌লা ও এক হাজার ছয়শত ষাটটি পরগণায় ভাগ করেন। এখান থেকে আদায়ী কৃত রাজস্বের পরিমান দাঁড়ায় এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ অষ্টাশী হাজার একশত ছিয়াশী টাকা; যা শাহ সুজার নির্ধারিত রাজস্বের চেয়ে প্রায় বার লক্ষ টাকা বেশি। মুর্শিদকুলী খাঁর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ায় জমিদার ও জায়গীরদারদের অর্থ আত্মসাৎ-এর পথ বন্ধ হয়ে যায়, এবং বাংলায় অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়। কিন্তু বাংলার কৃষকেব কপালে এই সুখ দীর্ঘস্থায়ী হল না। মুর্শিদকুলী খাঁর উত্তরসুরী সিরাজ-উদ-দৌলার বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে ইংরেজরা তাঁর বিরূদ্ধাচারণ করে, যার পরিনতিতে ১৭৫৭-র ২৩ শে জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার পরাজয়। এক অসম যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজরা মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসায়। ১৭৬০ খ্রীঃ এর মধ্যে মীরজাফরের মাধ্যমে বাংলার রাজকোষ সম্পূর্ণ শূন্য করে মীরকাশিমকে সিংশাসনে বসায়। অল্পদিনের মধ্যেই মীরকাশিম কোম্পানীর কর্মচারীদের আগ্রাসী ক্ষুধা নিবৃত্তিতে ব্যর্থ হন। এরপর লর্ড ক্লাইব প্রবর্তিত বিখ্যাত সেই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা। মীরজাফরের মৃত্যুর পর ১৭৬৫ খ্রীঃ তাঁর পুত্র নাজাম-উদ-দৌলাকে ইংরেজরা এই শর্তসাপেক্ষে সিংহাসনে বসায় যে কোম্পানীর মনোনীত ব্যক্তিই নবাবের মন্ত্রী হিসাবে নিয়োজিত হবেন এবং তাদের সমর্থন ছাড়া মন্ত্রীকে পদচ্যুত করা যাবে না। এই ব্যবস্থায় প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদাধিকারী রইলেন নবাব স্বয়ং কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা চলে গেল উপ শাসক ইংরেজদের হাতে।

১৭৬৫ খ্রীঃ ১২ই আগষ্ট ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অনুকূলে লর্ড ক্লাইব দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা সুবার দেওয়ানী স্বত্ব সম্পর্কে যে ফারমান আদায় করেন তা হল —

"১১৭২ বাংলা বৎসরের ফসি-ই-রবি (বসন্তকালের ফসল কাটার মরশুম) হইতে অপর কোন ব্যক্তির অংশীদারী ব্যতিরেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী স্বত্ব স্ব-ইচ্ছায় দান ও আলতামঘা (কর্মের বিনিময়ে জায়গীর) স্বরূপ দেওয়ানীর বহিঃ শুল্ক রেহাই দিয়ে কোম্পানীকে মঞ্জুর করা হইল। নবাব নাজম-উদ-দৌলা বাহাদুর বাৎসরিক যে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন তাহার জন্য উক্ত কোম্পানী জামিন থাকিবেন এবং তাহা নিয়মিত রাজকোষে প্রেরণ করিবেন। যেহেতু উক্ত কোম্পানী বাংলা সুবার প্রতিরক্ষার জন্য একটি বৃহৎ সৈন্যবাহিনী প্রতিপালন করিতেছেন সেহেতু বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা প্রদানের পর উক্ত সুবার রাজস্বের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে নাজামতের ব্যয়ভার বাবদ তাহাও মঞ্জুর করা হইল।" আপাত নিরীহ এই চুক্তিপত্রটির প্রকৃত চিত্রটির স্বরূপ বোঝা গেল কিছুদিনের মধ্যেই। সে সময় বাংলা বিহার উড়িষ্যার বাৎসরিক রাজস্ব ছিল আনুমানিক চার কোটি টাকা, এর থেকে নবাব পাবেন ছাব্বিশ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ষোল ভাগের এক ভাগ। কিন্তু রাজস্ব সংগ্রহের যাবতীয় ব্যয়ভার, ঝামেলা সবটাই নবাবের অথচ অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রন থাকবে কোম্পানীর। এই কুখ্যাত দ্বৈত শাসন বাংলার কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেললো। ১৭৭০ খ্রীঃ (বাংলা ১১৭৬) বাংলায় এই দ্বৈত শাসনের

প্রভাব ডেকে আনল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে ইতিহাস বিখ্যাত।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর ১৭৭২ খ্রীঃ ইংরেজরা নায়েব দেওয়ানদের রাজস্ব আদায় পদ্ধতি বন্ধ করে দেয়। সেই জায়গায় নায়েব দেওয়ানদের দেখাশোনার জন্য যে সমস্ত ইংরেজদের নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের কালেকটার পদে বহাল করে রাজস্ব সংগ্রহের যাবতীয় দায় দায়িত্ব দেওয়া হল। ভূমি-রাজস্বের সঙ্গে যুক্ত এই নতুন পদটি আজও 'জেলা কালেকটার' নামে পরিচিত। এই কালেকটারদের অধীনে স্থানীয় রাজস্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ করে রাজস্ব সংগ্রহের যাবতীয় দায়িত্ব কালেক্টারদের দেওয়া হয়। পরে একটি 'সার্কিট কমিটি' গঠন করা হয়। এই কমিটি দেশের বিভিন্ন অংশে গিয়ে সকল জমিদারী স্থানীয় ভাবে নিলাম করে সর্বোচ্চ নীলাম ডাকিকে পাঁচ বছরের জন্য জমিদারী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পূর্বের জমিদারদের যে কোন দাবি অস্বীকার করা হোত। 'পাঁচশালা' বন্দোবস্ত ১৭৭২ থেকে ১৭৭৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বহাল থাকে। অনিশ্চিত এই জমিদারী ব্যবস্থার ফলে রাজস্ব সংগ্রাহের জন্য বাংলার কৃষকদের উপর অমানুষিক যে অত্যাচার শুরু হল তা বৃটিশ পার্লামেন্টকে বিচলিত করে তুলল। কোম্পানীর পরিচালক বর্গ সিদ্ধান্ত নেন জমিদারী নিলাম করা চলবে না। সুবিধাজনক শর্তে জমিদারদের সাথে বাৎসরিক বন্দোবস্ত করে রাজস্ব সংগ্রহ করতে হবে। এই ধারনার ভিত্তিতে এবং ইংরাজ শাসন শুরুর আগের কয়েক বছরের রাজস্ব আদায়ের খতিয়ান বিচার করে লর্ড কর্নওয়ালিশ স্থায়ীভাবে রাজস্ব স্থির করে প্রথম দশ বছরের মেয়াদে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া শুরু করেন। তার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে ১৭৮৯ খ্রীঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর 'বেঙ্গল ডেসিনিয়াল সেটেলমেন্ট রেগুলেশন' পাশ করা হয়। এই ব্যবস্থাই 'দশশালা বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত। দশশালা বন্দোবস্তের মাধ্যমে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমান দাড়াল ২,৬৮,০০,৯৮ টাকা, যা মীরজাফরের আমলে আদায়ী রাজস্বের তিনগুণ এবং ইংরেজদের দেওয়ানী লাভের প্রথম বছর রেজা খাঁর সংগৃহীত রাজস্বের প্রায় দ্বিগুণ।

'দশশালা বন্দোবস্তে'র এই সুফল প্রত্যক্ষ করে ১৭৯৩ খ্রীঃ ২২ শে মার্চ একটি ঘোষণা পত্রে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বলেন— 'অতি সম্প্রতি যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে বা যার কাজ চলছে তা চিরস্থায়ী করা হল। এরপর চলতি বছরের ১লা মে তাঁর নেতৃত্বে 'বেঙ্গল পার্লামেন্ট সেটেলমেন্ট রেগুলেশন' বা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' আইন পাশ হয়। এই আইনের মাধ্যমেই মুঘল আমলের রাজস্ব প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে এবং ভূমি রাজস্বের উপর ইংরেজরা সার্বিক নিয়ন্ত্রন করতে থাকে। কৃষক ও কৃষির পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ এই পদ্ধতি আসলে জমিদার ও ইংরেজদের কাছে 'স্বর্ণডিম্ব' প্রসবকারী হংসের মত লাভজনক একটি উপায় হয়ে দাঁড়াল, শুধু তাই নয় ইংরেজরা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মোটামুটি পাকাপাকি ভাবেই একটি বিশেষ সুবিধাভোগী বিত্তবান অনুগত সম্প্রদায়কে লাভ করে। এই অনুগত বাঙ্গালীদের সাহায্যেই বাংলার গ্রামগুলিকে অন্যান্য প্রদেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে নিঃস্ব করে ফেলা গেল। কারণ ১৭৯৫ থেকে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ এই পনেরো বছর ধরে ইংরেজরা বাঙলা দেশ থেকে আদায়ী রাজস্ব থেকেই মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সির ঘাটতি এবং ভারতে রাজ্য বিস্তারের বিপুল ব্যয় বহন করেছে।

এরপর ১৮৮৫ খ্রীঃ পাশ হল 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন'। এই আইনের দৌলতে সাধারণ প্রজা তথা কৃষকেরা কিছুটা সুবিধা পেল। বৃটিশ সরকার ১৯৩৮ খ্রীঃ তৈরী করল 'ল্যান্ড রেভিনিউ

কমিশন'। চেয়ারম্যান স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড। ১৯৮০ তে কমিশন রায় দিল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জমিদারী প্রথা সম্পূর্ণ অচল। মধ্যস্বত্ব লোপ করে জমি কর্ষনকারী প্রজাদের সরাসরি সরকারের অধীনে আনা উচিত এক দশ একরের উর্দ্ধে কারোর জমি থাকা উচিত নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৪৫-এ আবার গঠিত হল 'দি বেঙ্গল এ্যাডমিনিস্টেশন এনকোয়ারী কমিটি' যা ফ্লাউড কমিটির সিদ্ধান্তকে পুর্নবিবেচনা করবে। এই কমিটিও মত প্রকাশ করল জমিদারী ব্যবস্থা অচল এবং এ ব্যবস্থার ফলে জমি ও জলের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছেনা। ১৯৪৭ খ্রীঃ দেশ স্বাধীন হল। ১৯৫৩ খ্রীঃ একটি বিল, বিল সভায় দীর্ঘ আলোচনার শেষে গৃহীত হয় এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ক্রমে ৫ই মে আইনে রূপান্তরিত হয়, 'পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহন আইন' রূপে অদ্যবধি এই আইন কার্যকরী আছে। এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি ছিল — ১) রায়তদের তাদের জমি সম্পর্কে বাধ্যবাধকতার অধিকার ও নিয়মাবলী সম্পর্কে সচেতন করা। ২) জমি হস্তান্তর ও প্রজা সৃষ্টির উপর বাধা নিষেধ আরোপ যাতে অকৃষিজীবী মানুষের হাতে জমি না যায় এবং একজনের হাতের মুঠোয় স্তুপাকৃতি না হয়। ৩) কৃষি জগতে ভাগচাষ প্রথার উপর সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রন। ৪) বাস্তবসম্মত পদ্ধতিতে জমির খাজনা ধার্য। ৫) স্বত্ব লিপি সংশোধন ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষন এবং ৬) জমির স্বত্ব সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় পরিচালনা। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে এই আইন সংশোধিত হয়েছে।

১৯৭৯ খ্রীঃ থেকে পঞ্চায়েত সমিতির উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ভূমি সংস্কার এবং স্থায়ী সমিতি গুলির মাধ্যমে জমির উর্দ্ধসীমা নির্ধারণ করে উদ্বৃত জমিগুলি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টনের কাজ চলছে। এই কমিটির সদস্য হলেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের রাজস্ব অধিকারী এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা। বাংলা তথা মালদহের অর্থনৈতিক ওঠা পড়ার পেছনে পরিবর্তিত এই কর কাঠামো অনেকখানি দায়ভার বহন করছে।

রাজতন্ত্রের এই দুটি বিধি শাসনবিধি আর কর বিধিগুলি বিভিন্ন সময়সীমানা পার হয়ে এসে আজও বিভিন্ন স্থাননাম এবং প্রশাসন সংক্রান্ত নামের মধ্যে দিয়ে বেঁচে আছে। যেমন —

পরগণা ঃ

মুঘল আমলে সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালীন সময়ে টোডরমলের নেতৃত্বাধীনে এক ব্যাপক ভূমি সংস্কার শুরু হয়। গ্রাম স্তর থেকে এই রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তোলা হয়। প্রতিটি গ্রামের জমির সংজ্ঞা ও সীমানা সম্প্রদায়গত ভাবে চিহ্নিত করা ছিল। সুবে বাংলায় এই রকম কিছু গ্রামকে এক করে পরগণা সৃষ্টি করা হয়। এই পরগণা ব্যবস্থা স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন আগে পর্যন্তও বহাল ছিল। প্রতিটি পরগণার জন্য একজন করে সরকারী কর্মচারী থাকত, যাকে বলা হতো চৌধুরী। আর পরগণার রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্র ও হিসাব রাখার জন্য একজন 'কানুনগো' নিয়োগ করা হত। বেতনের পরিবর্তে এরা ভোগ করতেন নিষ্কর জায়গীর।

চক ঃ

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে মীরকাশিমের প্রশাসনিক চুক্তির ফলে বাঙলাদেশে নতুন উদ্ভুত জমিদারের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বেড়ে গেল। এদের

মধ্যে কেউ কেউ আবার তালুকদার বলেও পরিচিত হতেন। এরপর ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত পাঁচশালা দশশালা এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে এই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে লাগল। মালদহ জেলায় এই সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল একাধিক নদীর মোহনা স্থলে ভূখন্ডটির অবস্থান। ফলে প্রায়শই এককালীন অর্থ ও বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে অনাবাদী, উর্বর ভূমি অথবা নতুন উদ্ভুত নদীর চর নবপত্তনিকার এর কাছে জমিদার এর সেরেস্তা থেকে বিলি বন্দোবস্ত হতে লাগল। নদীর ধারে বাঁধ দিয়ে ঘিরে রাখা জমি 'চতুষ্কচক' এই জমি যিনি নির্দিষ্ট অর্থের ভিত্তিতে ইজারা নিলেন তার নতুন ভূমিকা হল চকদার মধ্যস্বত্বভোগী স্থিতিশীল রায়ত। এরা নিজেরা জমিচাষ করতেন না। ছোট ছোট অংশে জমি ভাগ করে চাষিদের মধ্যে চাষের জন্য ভাগ করে দিতেন। এই সব চাষিরা ছিলেন এলাকার অস্থিতিশীল প্রজা। চকদার ভূমিবন্টন করতো ভাগ, সাজা ও ঠিকা খাজনার বিনিময়ে। উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক 'ভাগ' নামে পরিচিত, শস্যে দেয় বার্ষিক নিদিষ্ট পরিমাণ শস্য 'সাজা' এবং শস্যে দেয় বার্ষিক নির্দিষ্ট চাষের অধিকার ঠিকা খাজনা। বড় বড় চকদার এইভাবে প্রজাস্বত্ব বিলি করতেন আর নিজের নামে 'চক' এর নামকরণ করতেন। ব্রাম্মণ, বণিক, ধনী, মুসলমানেরা ছিলেন এইসব চক বা পত্তনিকার নবোদ্ভুত অভিজাত শ্রেণী। মালদহ জেলা একাধিক নদীর ভূখন্ডে অবস্থিত হওয়ায় নতুন জেগে ওঠা চড়া বা জলাভূমের অভাব ছিল না। তাই মালদহ জেলায় আজও একাধিক থানা অথবা মৌজার নামকরণ এই 'চক' অন্ত্যনামে। যেমন - মীরচক, কালিয়াচক, মানিকচক, চক কাতলাপুকুর, মাসাইচক, হারুচক, সাদুলিচক ইত্যাদি।

জোত ঃ

স্থান নামের পূর্বে বা পরে 'জোত' এই শব্দটি শাসন এবং করবিধির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। জোত অর্থাৎ - একজোড়া বলদ নিয়ে যে জমি চাষ করা যায়; সাধারণত ২৩ বিঘার এই জমি হিসাব। এই জমি জোতদার চাকদা বা পাওনাদারের কাছ থেকে চুক্তি শর্তে নেওয়া হত মালদহ জেলার একাধিক থানায় এই জোত নামযুক্ত মৌজার সন্ধান পাওয়া যায় যেমন — জোত পরান, জোতআরাপুর, জোতধানাই ইত্যাদি।

কাহিনী কিংবদন্তীর ধারা ঃ

যে কোন জেলার অঞ্চলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কিছু লোকশ্রুতি, জনপ্রবাদ; যে প্রবাদগুলি সেই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, প্রাচীনত্ব, ঐতিহ্য অথবা সংস্কৃতিগুলি একটু অন্যভাবে প্রকাশ করে থাকে। এই জনশ্রুতিগুলিকে অনেক সময় ভিত্তিহীন বলে অস্বীকার করার প্রবণতা থাকলেও কোনও একটা জায়গায় যে সেই প্রচলিত ব্যাপারটির যে একটি অঙ্কুর রয়েছে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই কাহিনী কিংবদন্তীগুলি অবলম্বন করে কোন একটি জায়গা বিখ্যাত হয়ে ওঠে, প্রায়শই সেই পরিচিতির অন্তরালে থাকে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করা স্থান-কাল নিরপেক্ষ একটি ঘটনা নির্ভর গন্ধ। মালদহ জেলার স্থাননাম নির্ধারণে কাহিনী-কিংবদন্তী এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

পাণ্ডুয়া ঃ

মধ্যযুগে দীর্ঘকাল অবিভক্ত বাংলার রাজধানী ছিল গৌড় ও পাণ্ডুয়া। আবার মুসলীম শাসনের পূর্ব পর্যন্ত গৌড় একাধিকবার প্রতিষ্ঠার পর মুসলমান শাসন সম্প্রসারণ কাল থেকে প্রায় পৌনে চারশো বছর পাণ্ডুয়াই ছিল শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে। এই পাণ্ডুয়া নামকরণে আছে কিংবদন্তীর ছোঁয়া। পাণ্ডুয়ার প্রাচীন নাম পাণ্ডুনগর। শোনা যায় আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এখানে রাজত্ব করতেন বিরাট রাজা। তাঁকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন তার দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শ্যালক সেনাপতি কীচক। এখানেই পান্ডবেরা আসেন অজ্ঞাতবাসে, হস্তিনাপুর থেকে। এই গড় এলাকায় রয়েছে ধনুষ দীঘি। ধনুষ দীঘির কিছু দূরে রয়েছে পরিচিত সাতাশ ঘড়া দীঘি। কিন্তু লোক প্রবাদে এটি নাকি তৃতীয় পান্ডব অর্জুন দ্বারা খনিত দীঘি তাই নাম অর্জুন দীঘি। বুকানন হ্যামিলটনের মতে পাণ্ডুনগরের লোক প্রচলিত পান্ডবিয়া নাম থেকেই পাণ্ডুয়া কথাটি এসেছে। ঐতিহাসিক যুগের শুরুতে এই পাণ্ডুনগর-ই পরিবর্তিত হল পুন্ড্রবর্ধনে। মধ্যযুগে তাই পরিণত হল পাণ্ডুয়ায়।

রাজা বল্লাল সেন (বাগবাড়ি) ঃ

সেন বংশের পরাক্রমশালী রাজা বল্লাল সেন 'নিঃশঙ্ক শঙ্কর গৌড়েশ্বর' এই উপাধি নিয়ে অনেকদিন গৌড় রাজ্য শাসন করেছিলেন। বল্লাল সেনের মাতা ছিলেন পিতা বিজয় সেনের একাধিক মহিষীর মধ্যে জেষ্ঠ্যা মহিষী। সন্তানসম্ভবা অবস্থাতেই পিতা বিজয় সেন এই মহিষীকে নির্বাসিত করেন ব্রম্মাপুত্র নদের তীরে অরণ্য প্রান্তরে। ব্রম্মানদের তীরে জন্মে ব্রম্মাপুত্র নদের সন্তান; বল্লাল সেনের জন্ম রহস্যের সাথে এই কিংবদন্তীর অংশটি জড়িয়ে গিয়েছে।

বল্লাল সেন সম্পর্কে দ্বিতীয় কিংবদন্তীটি পদ্মিনী সংক্রান্ত। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ', 'বল্লাল-চরিত', 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস ও রজনীকান্ত চক্রবর্তীর 'গৌড়ের ইতিহাস' এই সবগুলি বইতেই বল্লাল সেন সম্পর্কিত এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ আছে। বল্লাল সেন যৌবনে ছিলেন সুদর্শন এবং যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী। শিকার করা তার অন্যতম রাজকীয় শখ ছিল। মধ্য যৌবনে একবার তিনি মৃগয়া করতে যান। সেখানে শিকার করতে করতে তিনি সঙ্গী-সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। 'ঢাকুর' গ্রন্থে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে এইভাবে —

একদিন রাজা গেল মৃগয়া করিতে।
ঝড়-বৃষ্টি দুর্যোগ হইল আচম্বিতে।।
ত্যাজিয়া বিপিন রাজা গেলা লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে।।
সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক ডোমকণ্যা প্রাতঃকালে আসি।।
বিবাহ করিব বলি লৈয়া আইল ঘরে।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে।।

কথিত আছে এই ডোমকণ্যা ছিলেন মদন হাড়ির কণ্যা। বিধবা এই রমনী বয়সে বল্লাল সেনের চাইতে অনেকটাই বড়। "পদ্মিনী হাঁড়ির কণ্যা" পরমা সুন্দরী, বল্লাল ইহাকে দেখিয়া মুগ্ধ

হন এবং পাণিগ্রহনের প্রস্তাব করেন। হাড়ির কণ্যাকে রাজপ্রাসাদে আনিয়া বল্লাল তাহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় হইয়া পড়েন। লক্ষ্মণ সেনের মাতা চালুক্য রাজবংশের কণ্যা রামদেবী, যিনি ছিলেন রাজার পট্ট মহিষী, স্বাভাবিক ভাবেই রাজার এরূপ আচরণ তাহার দুঃসহ হইয়া উঠিল। ঘটনাটি লইয়া পিতা-পুত্রে বিরোধ বাধে। বল্লাল পট্ট মহিষীর যাবতীয় সম্মান পদ্মিনীকে দিতে কৃতসংকল্প হন। পদ্মিনীর রান্না করা ভাত বৈদ্যজাতির মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রকেই খাইতে অনুরোধ করেন। খুব ভারী সোনার পিঁড়ি ও সোনার পান-ভোজনের আসবাব দিয়া তিনি বৈদ্যগণকে প্রলুব্ধ করেন। যাঁহারা প্রলুব্ধ হইয়া রাজ-ফাঁদে পা দিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও 'স্বর্ণ-পীঠী' উপাধির ব্যঙ্গ বহন করিয়া সমাজে অবজ্ঞাত হইয়া আছেন।''

এরপর পদ্মিনীকে কেন্দ্র করে রাজ্যে বেশ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাজগুরু ভীম ওঝা তাঁর পৈতৃক স্বগ্রাম কালিয়া ত্যাগ করে বর্তমান পাবনা জেলার ছাতক গ্রামে চলে যান। এরপর একে একে অনেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বণিকেরা এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা রাজদরবার এবং রাজ্য ত্যাগ করে চলে গেলেন। শুধু তাই নয় এই সময় গৃহত্যাগ করলেন যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনও। শোনা যায় এই সময় লক্ষ্মণ সেন পিতার বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করে প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহী হওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। বল্লাল সেন তাঁর পূর্ব রাজধানীতে নব পরিণীতা স্ত্রীকে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না। তাঁর রাজত্বের অন্য অংশ বরেন্দ্রের একাংশে গঙ্গার তীরে স্থাপন করলেন নতুন রাজধানী। অন্ত্যজ শ্রেণী অধ্যুষিত এই অঞ্চলে তিনি বাগদীদের দ্বারা একটি সুদক্ষ স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীও গড়ে তোলেন। ইংরেজবাজার থানার 'বাগবাড়ি' অঞ্চলে তৈরী হল সেই রাজপ্রাসাদ। কিংবদন্তী এই রাজা বল্লাল সেন তার রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে নব পরিণীতা স্ত্রীকে এখানে এনে রেখে তাঁর নিরাপত্তা সুনিশ্চিন্ত করেন।

মহেশমাটি :

পরিণত বয়সে পিতা বল্লাল সেনের ডোমকন্যা বিবাহ বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেন নি যুবরাজ পুত্র লক্ষ্মণ সেন। তিনি পিতার কাছ থেকে দূরে বিক্রমপুরে চলে যান। স্বামীর দীর্ঘ বিচ্ছেদে স্ত্রী তান্দ্রাদেবী অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। তান্দ্রাদেবী ভাল সংস্কৃত জানতেন। এই সময় তিনি বিরহ মনোভাব প্রকাশ করে অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেছিলেন। যার কোনও একটি বল্লাল সেনের নজরে পড়ে যায়; যে শ্লোকটির অর্থ ছিল — স্বামী বিয়োগ ব্যাথায় তিনি এতটাই কাতর যে অবিলম্বে স্বামী সাক্ষাৎ না ঘটলে তিনি আত্মঘাতিনী হবেন। বল্লাল সেন তখন বিক্রমপুর থেকে শীঘ্র লক্ষ্মণ সেনকে নিয়ে আসার ব্যাপারে মনস্থির করেন। এই সময় জলপথে দ্রুতগামী জাতি ছিল কৈবর্ত্তদের হালিক জাতীয় শাখা। এদের দলপতি ছিলেন মহেশ মাঝি। (শোনা যায় বল্লাল সেনের স্ত্রী পদ্মিনী হাঁড়ি বা ডোম জাতীয়া ছিলেন না, কৈবর্ত্ত তথা অন্ত্যজ জাতীয়দের সমাজে স্থান দেওয়ার জন্যই তিনি এইরূপ আচরণ করেন)। বল্লাল সেন এই মহেশ মাঝিকেই লক্ষ্মণ সেনকে আনতে পাঠান। এই মহেশ মাঝি লক্ষ্মণ সেনকে দ্রুতগামী জলপথে বিক্রমপুর থেকে গৌড়ে নিয়ে এসেছিলেন। কিংবদন্তী এরপর বল্লাল সেন মহেশমাঝিকে 'মহামাণ্ডলিক' উপাধি দেন এবং কৈবর্ত্ত জাতিকে জলাচরনীয় করেন। এখনও মালদহের অনেক মৌজার নাম মহেশপুর বা মহেশমাটি।

শবরী :

পুরাতন মালদার একটি মৌজার নাম শর্বরী বা সরবরি, সরবরি নামের উৎপত্তিতে যে কিংবদন্তীটি আছে তা এইরকম- মধ্যযুগে মুসলমান আমলের একটা সময় রাজা দনুজমর্দন দেব ক্ষমতা হস্তগত করেন। এই সময় সুফী সাধক পীর নুর-কুতুব-উল আলমের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অসাধারন। গৌড়েশ্বর গণেশের আদেশে নুর কুতুবের পুত্র শেখ আনোয়ারকে হত্যা করা হয় তারপর তাঁর মস্তক এনে এইখানে পুঁতে দেওয়া হয়। সেই থেকে এই মৌজাটি শিরগড়ি > শিরবরি > শরবারি > শর্বরী নামে পরিচিত হয়। (খুরশেদ জাঁহা নামা / মৌলবি এলাহিবক্স)।

লোটন মস্‌জিদ :

অমরনাথ ন্যায়রত্নের হাত ধরে কিশোরী নববধু অমৃতা এসেছিল ছোট্ট গ্রাম চাকলায়। গৌড় নগরের উপকণ্ঠে কোতুয়ালী দরজা থেকে পাঁচ ছয় মাইল আগে চাকলার অবস্থান। ততদিনে মারা গেছেন সুলতান বারবক শাহ, সিংহাসনে বসেছেন সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ। আর জামান খাঁ কোতোয়ালী দরজার নগর কোটালের দায়িত্বে। এই জামান খাঁ একদিন দেখে ফেলল সুন্দরী অমৃতাকে। ষড়যন্ত্র করে তাঁকে নিয়ে এল নিজের বাসগৃহে তিন বিবির পর চৌথী বিবিরূপে। কিন্তু সুলতানের কানে এই খবর পৌছুতে সময় লাগল না। তিনি অবিলম্বে কোতোয়ালের গর্দান নিলেন, আর চৌথী বিবিকে নিয়ে এলেন নিজের বাঈজী মহলে। নতুন নাম হল মীরা বাঈ। নজরানা দিলেন চাক্‌লা গ্রামের রাজস্ব স্বত্ত্ব। চাক্‌লা গ্রাম পরিবর্তিত হয়ে গেল মীরা তালুকে। অপূর্ব সুন্দরী এই রমনীকে সুলতান ডাকতেন নটু বা লোটন বলে। রূপ-যৌবন আর নৃত্য - গীতের সুরমুর্ছনায় এই বাঈজী সুলতানকে প্রায় বশ করে ফেলেছিলেন। উপার্জন করেছিলেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক বেশী টাকা। এই বাঈজী একদিন উপলব্ধি করলেন অর্থের অসারতা; তাঁর মনে জাগল অমর হওয়ার আকাঙ্খা। এই বাসনা থেকেই মস্‌জিদ তৈরীর অনুমতি তিনি সুলতানের কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। কোতুয়ালী দরজার উত্তরে বাদশাহী সড়কের পাশে পাথরের ভিত্তির উপর মীনা করা রঙীন ইঁট দিয়ে তৈরী হল অপূর্ব-সুন্দর লোটন মস্‌জিদ (১৪৭৫ খৃঃ) নির্মান শেষে সুলতান নিজে তাঁর অনুচর সহ মস্‌জিদে নামাজ পড়লেন। কিন্তু বাঈজীর তাতে মন ভরল না। নিজের নামের খোৎবা পাঠ শুনবার আনন্দ উপভোগ করতে লোটন বাঈজী পালকি চেপে দুপুর বেলা মসজিদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। দুজন ন্যাংড়া, নুলো ভিখিরির হাতে মোহর বখশিস্ দিয়ে মস্‌জিদে তাঁর নামে খোৎবা পাঠ করিয়ে নিলেন। সংবাদ গেল সুলতানের কানে। তখন তিনি আর মদিরাসক্ত নন; ইসলামে আস্থাশীল্ একজন সাচ্চা মুসলমান। দুজন হাব্‌সী খোজাকে নিযুক্ত করলেন সুলতান। তারাই রাতের অন্ধকারে নাচ ঘরের মেঝেতেই হত্যা করল বাঈজীকে। আর এই মৃতদেহ রাজ আদেশে পুঁতে ফেলা হল বাগানবাড়ি সংলগ্ন আমবাগানে। গল্প এইখানেই শেষ হল না, অমৃতার মৃত্যু সংবাদ গিয়ে পৌছল মীরা - তালুকে। হতভাগ্য স্বামী অমরনাথ স্ত্রীর শেষকৃত্যের মর্যাদা দেওয়ার জন্য পুত্র কাশীনাথকে নিয়ে উপস্থিত হলেন বাঈজীর বাগানবাড়িতে। আমবাগানের মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হল অমৃতার ছিন্নভিন্ন দেহ, ভাগীরথীর তীরে পুত্র কাশীনাথ দাহ করলেন সেই দেহ। তৃপ্ত হল অতৃপ্ত বিদেহী আত্মা। এরপর নাকি দূর থেকে সুলতান সামসুদ্দিন শাহকে তীর ছুঁড়ে মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন পুত্র কাশীনাথ। রাজনৈতিক

গুপ্ত হত্যা এই অভিধা নিয়েই শেষ হয়ে গেল আর এক সুলতান জমানার। বেঁচে রইল লোটন মস্‌জিদ, বেঁচে রইল মীরা - তালুক।

গৌড়েশ্বরীতলা ঃ

গৌড়ে রয়েছে মাতৃগয়া গৌড়েশ্বরীতলা। এই গৌড়েশ্বরী সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তীটি যথেষ্ট কৌতুহলকর। — হাবসী বিভীষিকার হানাহানি আর অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে গৌড়ের সুলতান হন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। তাঁর আমলে হিন্দুরা একাধিক রাজপদে আসীন ছিল। এই সময়ই একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ অগ্নিশ্বর স্বপ্ন দেখেন গৌড়েশ্বরী দেবী শিয়রে দাড়িয়ে বলছেন — "আমি তোর বসত ভিটার উত্তরে পুকুরের জলে নিমজ্জিত রয়েছি, আমাকে উদ্ধার কর। বর্তমান ধর্ম সহিষ্ণু সুলতান আমার মন্দির নির্মাণে রাজ অনুগ্রহ প্রদান করবেন"। স্বপ্ন সত্যি হল। উদ্ধার হলো গৌড়েশ্বরী দেবীর মূর্তি। এই মূর্তির পূজা পদ্ধতি একটু অভিনব। গৌড়ে জৈষ্ঠ্য সংক্রান্তির দিন রামকেলী মেলা চলাকালীন প্রচুর অবঙ্গবাসী মহিলা গর্ভধারিনী মাতার পিন্ড দানের জন্য এই স্থানে সমবেত হন। এখানে একটি গর্তের কাছে পিন্ডদান করে, কাপড়ে জড়ান গৌড়েশ্বরীর মূর্তিকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করে তারপর তুলসী মন্দিরের উপরে গিয়ে (ফিরোজ মিনার) স্বর্গতা জননীর উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালায়। এই অদ্ভুত আচরণের মূল কারণ হিসাবে এইরকম একটি কিংবদন্তী প্রচলিত, কয়েকশো বছর আগে কোনও এক হিন্দু শাসকের বিধর্মী পুত্রের পিতার অপঘাত মৃত্যুর পর তাঁর অশরীরী আত্মা নাকি পুত্রকে শয়নে স্বপ্নে ঘাড় মটকানোর ভয় দেখাত। পুত্রের দিবা - রাত্রির সুখ কেড়ে নিল এই অশরীরী আত্মা। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে বিধর্মী পুত্রের পিণ্ডদানের কোনও অধিকার নেই। কিন্তু হিন্দু পিতা-মাতার রক্ত ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে এই যুক্তিতে সবার অলক্ষ্যে সেই বিধর্মী পুত্র ছদ্মবেশে গৌড়েশ্বরী দেবীর মন্দিরে গিয়ে পূজা আর পিণ্ডদান করার পর থেকে পিতার বিদেহী আত্মা আর আসে নি।

এছাড়া প্রসবকালে মৃতা জননীর অশরীরী আত্মার সন্তানের কাছে ঘোরাফেরা করার এক রোমাঞ্চকর গল্প আজও আলমপুরে প্রচলিত আছে। শয়ন ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করেও মায়ের অশরীরী আত্মা ঘরের মধ্যে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে সন্তানের কাছে মুক্তির দাবী জানিয়েছে। অবশেষে কুলগুরু কেশব আচার্যের পরামর্শে গৃহকর্তা গৌড়েশ্বরীতলায় মৃতার নামে পিন্ডদান করার পর অতৃপ্ত আত্মা শান্তি পায়।

তারপর থেকে বিপদসঙ্কুল ও ব্যয়বহুল পথ পেরিয়ে গয়াধামে না গিয়ে বরেন্দ্র ভূমির অনগ্রসর অধিবাসীরা স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত রাজকুমারের অনুসরণে গৌড়েশ্বরীতলায় মাতৃ গয়াপীঠ জ্ঞানে পিণ্ডদান করে থাকেন।

পারা-ঢালা দীঘি ঃ

মালদহের গাজোলের কাছে রয়েছে বিখ্যাত পারা - ঢালা দিঘী। এই দীঘির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক ধোপানীর গল্প। মালদহ জেলার ধন-দৌলতের সুখ্যাতি শুনে মাসুম নামে এক সওদাগর (হোসেন শাহের আমলে) জাহাজভর্তি পারা নিয়ে আসেন। কিন্তু অনেক ঘুরেও সেই পারা বিক্রি হল না। একা একাই আক্ষেপ করছিলেন এই বলে যে, গল্প যা শুনে এসেছিলেন তা ভ্রান্ত এবং অতিরঞ্জিত, লোকের কথার উপর ভরসা করে এতটা পথ, এত টাকা পয়সা এবং

সময় নষ্ট করা তার উচিত হয় নি। পুকুরে কাপড় কাচছিল যে ধোপানী, নিজের জায়গার এই অপবাদ তার সহ্য হল না। সে সওদাগরকে ডেকে তার পারা পুকুরের জলে ঢেলে দিতে বলে, কাবণ জলটা নাকি ইদানিং বেশ নোংবা হয়েছে। সওদাগর তার অজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করতে গেলে ধোপানী তাকে নিবৃত্ত করে তাকে তার বাড়ীতে নিয়ে যায়, এবং একের পর এক প্রকোষ্ঠ উন্মুক্ত করতে থাকে যার প্রত্যেকটিতে সিকি, আধুলি থেকে শুরু করে রূপা, সোনার মোহর এবং ধন দৌলতে পরিপূর্ণ ছিল। এরপর সওদাগব সেই অর্থ দ্বারা প্রস্তুত করেন পুরাতন মালদহে জামি মসজিদ।

হাবসখানের ঘাট ঃ

এই প্রসঙ্গে হাবস খানের ঘাটের কথাও মনে পড়বে। শোনা যায় সুলতান রুকনুদ্দিন বাববক শাহ রাজপ্রসাদের প্রহরা কার্যে নিযুক্তির জন্য এবং রাজ্য বক্ষার্থে সেনাবাহিনীতে অনুগত সৈনিকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আবিসিনিয়া থেকে আট হাজার হাবসী ক্রীতদাস এনেছিলেন। তাদের একজন হাব্‌স খান সুলতান মামুদ শাহের (তখন বালক) রিজেন্ট পদে আসীন থেকে প্রকৃত শাসকের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। গৌড়বাসী তাই হাবসী পাড়ার ঘাটকে 'হাবস খানের ঘাট' নাম দিয়েছিলেন। এরই সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে হাবস্‌ খান কন্যা আঞ্জুমানারা আর হাবসী ওমরাহ সিদ্দি বদরের প্রেমকাহিনী। যে প্রেম কোন সুন্দর জীবনকে আহ্বান করে না, যে প্রেমের পশ্চাতে আছে অপহরণ, অত্যাচার, গুপ্তহত্যা আর আত্মহত্যার ইতিহাস। এই ঘাট তাই আজও ব্যর্থ প্রেমের অশ্রুসিক্ত করুণ কাহিনীর স্মৃতিচিহ্ন-ই বহন করছে।

সতীঘাট ঃ

'সতীঘাট' নামকরণের অতীত ইতিহাস-ও একই রকম অশ্রুসজল। সতীঘাটের চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে কত রমনী তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু অন্য একটি ঘটনা চিরস্থায়ী করে দিল এই নামের অন্তর্নিহিত ব্যাঞ্জনা। তাজ খাঁ করবানির মৃত্যুর পর সোলেমান করবানি গৌড় বাংলার মসনদে বসলেন। পুরাতন রাজধানী গৌড় তাঁর না - পসন্দ। তাই গৌড় দুর্গের কয়েক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে গঙ্গার প্রাচীন খাতের অপর পারে তাঁড়া / টাঁড়ায় রাজধানী স্থাপন করলেন। রাজধানী স্থাপনের প্রয়োজনে সেখানকার জনপদ, দেব-দেউল ধ্বংস করে গড়ে উঠল সুলতানের প্রাসাদ, 'আগা-মঞ্জিল'। আর সেখানকার উৎখাত হিন্দুরা তাঁড়ার উত্তর পূর্ব কোণে গড়ে তুলল নতুন বসত, নাম রাখল কৃষ্ণপুর। সুলতানের ছোট্ট পরিবারে বেগম জাকিয়া ছাড়া ছিল দুই পুত্র বায়োজিদ ও দায়ূদ এবং কন্যা দুলারী। প্রাসাদ শীর্ষ থেকে দেখা যেত 'সতীঘাটের জ্বলন্ত চিতা'। চিতার আগুন আর ধোয়া সুলতান কন্যা দুলারীর মনে এই বিশ্বাস এনে দিয়েছিল যে পতি প্রেমই হিন্দু রমনীকে সহমৃতা হওয়ার প্রেরণা জোগায়। দুলারী মায়ের কাছে আরও শুনেছিল তার পতিব্রতা হিন্দু ঠাকুরমার সতী হওয়ার কাহিনী। কালক্রমে এই দুলারী-ই প্রেমে পড়ল তাদেরই প্রাসাদের ফৌজদার কালাচাঁদ ভাদুড়ীর, দুরন্ত এই প্রেম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কালাচাঁদকে রূপান্তরিত করল দুর্দান্ত কালাপাহাড়ে। কিন্তু দুলারী ভালবেসেছিল সুদর্শন কালাচাঁদকে, বিধর্মী কালাপাহাড়কে নয়। তার অত্যাচার, অনাচার এবং ধর্মান্তরীকরণকে সে কখনই মেনে নিতে পারে নি। কালাপাহাড়ের এই পরিণতির জন্য নিজেকে দায়ী করে জীবনের প্রতি ঘৃণায় আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত

নিলেন দুলারী। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে দুলারী সাজল হিন্দু রমণীর সাজে বেনারসী আর শাঁখা - সিদুঁরে। তারপর আত্মবিসর্জন সতীঘাটের জলে। আজও নিঝুম রাতে চাঁদের আলোয় দেখা যায় শীর্ণকায়া ভাগীরথীর জলে এক ছায়াচ্ছন্ন নারীকে হেঁটে যেতে।

জালালুদ্দিন তাব্রিজী ঃ

কাহিনী কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে সেই সময়কার পীর, ফকির এবং দরবেশদের পুণ্য জীবনকথা নিয়েও এদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় পারস্য দেশের তব্রিজ শহর থেকে আগত হজরত মখদুম শাহ জালালুদ্দিনের। মখদুম শাহ ছিলেন শেখ আবু সৈয়দ তাবরিজীর শিষ্য। বাংলাদেশে ইসলাম বিপন্ন তাকে রক্ষা করতে হবে; গুরুর এই আদেশ শিরোধার্য করে তিনি পারস্য থেকে বাংলাদেশের সুদূর পথ পাড়ি দেন। এদিকে বাংলাদেশে শেখের আগমনের সংবাদ পেয়েছিলেন তৎকালীন সম্রাট লক্ষ্মণ সেন। তিনি তাঁকে বাংলাদেশের সীমান্তে আটকানোর অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু একদিন তিনি যখন গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করছিলেন তখন দেখেন পীর গঙ্গার জলের উপর দিয়ে হেঁটে আসছেন। এর পরেও তাঁকে হত্যা করার অনেক চেষ্টা করা হয় কিন্তু তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। আমীর খসরু লিখিত আফজাল - আল - ফাওয়াইদ গ্রন্থের একটি কাহিনীতে জানা যায় যে, শেখ জালালুদ্দিন যখন বাংলাদেশের লক্ষণাবতীতে অবস্থান করেন, সেই সময়ে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা একটি দৈত্যের উৎপাতে খুবই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। দৈত্যটা প্রতি রাত্রেই মানুষ খেত। শেখ জালালুদ্দিন দৈত্যটাকে ধরে ফেলেন এবং বন্দী করে রাখেন। শেখের এই আলৌকিক ক্ষমতা দেখে সম্রাট লক্ষ্মণ সেন সহ অন্যান্য হিন্দু অধিবাসীরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কীর কাছে লেখা একটি চিঠিতে মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী বর্ণনা দেন যে, জালালীয়া দরবেশগণ দেওতলায় সমাহিত আছেন, দেওতলা গাজোলের নিকটবর্ত্তী একটি জায়গা। বাংলা শব্দ দেওতলা 'ফারসি' 'দেবমহল' শব্দটির সমার্থক এবং উভয় শব্দের অর্থই দৈত্যস্থান। এরপর মহারাজা লক্ষ্মণ সেন ও মহারাণী বল্লভার ইচ্ছানুসারে 'হট্টগ্রাম' সহ আরও কয়েকটি গ্রাম শেখকে দান করা হয়। সেখানে তিনি কয়েকটি 'খানকাহ'ও নির্মাণ করেছিলেন, তৈরী করেছিলেন লঙ্গর খানা এবং চিকিৎসা কেন্দ্র। সেই থেকে একাধিক গ্রাম নাম যেমন — মকদুমপুর, জালালপুর, তবরিজাবাদ ইত্যাদি তাঁর নামের স্মৃতি চিহ্ন বহন করে আসছে।

ফিরোজ মিনার ঃ

বারদুয়ারীর পূর্বদিকের রাজপথ ধরে এগিয়ে গেলে গৌড়ের বিখ্যাত ফিরোজ মিনার চোখে পড়বে। উজ্জ্বলতায় আর মনোহারিত্বে চমৎকার এই মস্‌জিদটি সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহের জয়স্তম্ভ। এটি নির্মাণ করেছিলেন পিরু শাহ নামে এক স্থপতি । এই মিনারটি 'পীর আশার মন্দির' নামেও পরিচিত হয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় দর্শনার্থীদের কেউ কেউ অস্ফুট গোঙানীর আওয়াজ আজও শুনতে পায়। আর স্থানীয় মজুর কৃষকেরা বেলা শেষে গৃহে ফেরার সময় সাঁঝের আলো আধারিতে দেখতে পায় প্রদীপ জ্বালিয়ে এক অবগুন্ঠিতা ছায়া মূর্ত্তিকে মিনারের উত্তর দিকে বাগানের মাঝখানে একটা উঁচু ঢিবির দিকে এগিয়ে যেতে। কাহিনীটি এই রকম :- মালদহের মোরগাঁ - মাধাইপুরে এক সময় ভাল ভাল রাজমিস্ত্রির বাস ছিল, পিরু শাহ ছিলো এই

রাজমিস্ত্রীদের মধ্যে সেরা। তিনিই এই মিনারটি নির্মাণ করেন, নির্মাণকার্য শেষ হলে সুলতান ফিরোজ শাহ এটি দেখতে আসেন। সুলতানকে দেখে পিরু শাহ বলেন, 'আমি যদি এর চাইতে ভাল মাল মসলা পেতাম তা হলে এই মিনারটি আরও ভাল করে তৈরী করতে পারতাম''। এই কথা শুনে সুলতান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং প্রত্যুত্তরে বলেন যে, আমার রাজ ভান্ডারে অট্টালিকা নির্মাণের মাল-মসলার কোন অভাব নাই, তুমি একথা আমাকে আগে না জানিয়ে অপরাধ করেছ এবং আমার নির্দেশ অমান্য করেছ। সুলতান আদেশ দিলেন স্থপতিকে মিনারের উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিতে। সুলতানের আদেশ পালিত হল। পির শাহ মাটিতে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। সুলতান তাঁর খাস পাইক হিঙ্গাকে 'মোঁরগা যা' হুকুম দিয়ে হাতির পিঠে চেপে প্রাসাদে ফিরে গেলেন, পির শাহর কাছে এগিয়ে এলো সহকারী ইয়াকুব, জানতে চাইল তার শেষ ইচ্ছার কথা। শিল্পী জানাল - 'মিনারের পাশই যেন আমার দাফন কাফনের ব্যবস্থা হয়। আমার শিশুপুত্র হিলাল যেন আমার কবরে মাটি দেয়। আর সুলতানের অনুগ্রহে আমার বিবি জোলেখা যেন সাঁঝবেলায় তার কবরে ধূপবাতি জ্বালানোর অধিকার পায়'। জীবিত অবস্থায় সেই অনুমতি বোধ হয় জোলেখার ভাগ্যে জোটে নি। তাই আজও ......।

জিন্দাপীরের কাহিনী ঃ

চাঁচল থানার অন্যতম বর্ধিষ্ণু অঞ্চল কলিগ্রামে আছে জিন্দাপীরের সমাধি। কথিত আছে জিন্দাপীরের প্রকৃত নাম সূর্য খাঁ। ইনি অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর এই অলৌকিক ক্ষমতার গল্প দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। একবার এক ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হলে তিনি পীরের কাছে গিয়ে তাঁর পাদোদক প্রার্থনা করেন। পীর তা দিতে অস্বীকৃত হন। পরে ব্রাহ্মণ সেই পাদোদক অন্য ভক্ত মারফত যোগাড় করে পান করে তিনি রোগমুক্ত হন। এই খবর পীরের কাছে গিয়ে পৌঁছালে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। এরপর তিনি জীবন্ত সমাধি নেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন। সেই অনুযায়ী তিনি নিজের স্থান নির্বাচন করে ছয়মাসের উপযুক্ত খাদ্য ও জল সংগ্রহ করে নিয়ে সমাধিতে প্রবেশ করেন। আর ওঠেন নি। এই সমাধির উপরই বাংলার একেবারেই নিজস্ব ঢঙের আটচালা রীতিতে নির্মিত হল 'জিন্দাপীরের সমাধি'। এখনও কলিগ্রামের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দ্রষ্টব্য জিনিষ।

মালদহে অবস্থিত ছোট বড় একাধিক দীঘির নামের অন্তরালেও রয়েছে কাহিনী কিংবদন্তীর ছোঁয়া। এইভাবেই গ্রাম, মস্‌জিদ, পুকুর ও পীর - ফকির সাধু, দরবেশদের অতীত জীবন ও কাহিনীই নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দেশিত করেছে জেলার বিবিধ নামকরণ। মালদহের আরও অনেক মন্দির মসজিদ এবং স্থান নামের পেছনে সক্রিয় রয়েছে কৌতুহলোদ্দীপক কিংবন্তীর ছোঁয়া।

ব্যক্তিনাম ধারা ঃ

কাহিনী কিংবদন্তীর মত একক ব্যক্তিত্বের প্রভাবও কখনও কখনও আঞ্চলিক তথা দেশগত ভাবে ব্যপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। বাঙলাদেশ তথা মালদহ জেলার দীর্ঘ চারশত ব্যাপী ইসলাম শাসনাধীনে থাকার ফলে মালদহ জেলার বহু অঞ্চলের নামকরণ এবং সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে গেছে এইসব ব্যক্তিত্বের নিজস্ব প্রভাবে।

মুসলমান শাসন আমলে বাংলা ছিল সুফী অধ্যুষিত দেশ। মালদহ জেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। দীর্ঘ মুসলীম শাসন-সীমায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন এই সুফী সাধকেরা। তারা আর নিজের দেশে ফিরে যান নি। এই দেশ এই জেলাকে ভালবেসে এই খানেই চিরশান্তি লাভ করেছেন, ইসলামের বিস্তারে, মুসলমান শাসন সম্প্রসারণে, সংহতি - বিধানে, শিক্ষা - সংস্কৃতি ও সাধারণ মানুষের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি - উৎকর্ষ বিধানে সুফীদের কৃতিত্ব ছিল মুসলিম সেনাপতি বিজেতা ও শাসকের অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকর। তারা তাদের ধর্মীয় অনুরাগ, ধর্ম প্রচারের আগ্রহ, আদর্শ- স্থানীয় চরিত্র ও মানব হিতৈষণামূলক কার্যাবলীর দ্বারা জনমানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেন। ধর্মান্তরিত লোক ও শিষ্য সংগ্রহেব মাধ্যমে তারা মুসলমান সেনাপতিদের রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে নৈতিক বিজয় সম্পন্ন কবে অমুসলিম অধ্যুষিত দেশে মুসলমান শাসনকে শক্তি ও স্থায়িত্বের একটি উৎস প্রদান করেন। বাংলার আনাচে - কানাচে প্রতিষ্ঠিত সুফীদের 'খানকাহ্‌গুলো ছিল আধ্যাত্মিক, মানব - কল্যাণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যাবলীর একটি প্রধান কেন্দ্র।

হিন্দু থেকে মুসলীম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ফলে নবদীক্ষিত মুসলীমদের পক্ষে বংশ পরম্পরায় অর্জিত সংস্কাব পূর্ণমাত্রায় ত্যাগ করা সম্ভব হয় নি। পরবর্ত্তীকালে হিন্দু ও মুসলীম পরস্পর পরস্পরের পাশাপাশি বসতির ফলে স্থানীয় সামাজিক ও ব্যবহারিক কাবণে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠতে থাকে। হিন্দু ও মুসলীম উভয় তরফ থেকে সমন্বয়ের আগ্রহে সক্রিয় প্রচেষ্টায় সে সংস্কৃতি দৃঢ়তর হয়। ইসলাম ধর্মপ্রচারক পীর ও পীরানী প্রভাবান্বিত হিন্দু মুসলীমের সেই মিশ্র সংস্কৃতিকে পীর সংস্কৃতি বলা হয়েছে। বলা যায় অবিভক্ত ভারতের ব্রাহ্মণ্য - বৌদ্ধ - জৈন ইসলাম খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মাদশের সংমিশ্রণেই তৈরী হয়েছে আজকের ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন ধারা।

পীব শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধ বা প্রাচীন এবং ভাবার্থ আধ্যাত্মিক গুরু। শব্দটি ফারসী শব্দ। ফারসী পীর শব্দের মত বৌদ্ধগণ কর্তৃক ব্যবহৃত থের শব্দের অর্থ 'বৃদ্ধ'। সংস্কৃতি 'স্থবিব' শব্দেব অর্থও বৃদ্ধ। পীরগণ ছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারক। তাঁরা সুফী নামে অভিহিত। 'সুফী' শব্দটি আরবী 'তসাউওফ' বা সুফ শব্দ থেকে এসেছে। 'তসাউফ' শব্দের অর্থ পবিত্রতা। সুফ শব্দের অর্থ 'পশম'। সুফী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেউ বলেন, যারা সুফ নামে এক প্রকার রঙীন মোটা পশমী কাপড় পরিধান করতেন। কারো মতে — আহস - উল - সুফফা অর্থাৎ হজরত মহম্মদ এর সময় যারা মসজিদের মেঝেতে বসে সাধনা করতেন তাদেরকেই সুফী বলা হত। কারো মতে - সাফ-ই আউয়ায় অর্থাৎ যাঁরা সামনের সারিতে নামাজ আদায় করতেন তাঁদের থেকেই সুফী শব্দের উৎপত্তি।

সুফীবর সহল তস্তরী বলেন — 'তিনিই সুফী যিনি সকল মালিন্য থেকে মুক্ত'।

কালক্রমে ইসলামের মত ব্যবহারিক ধর্মেও এমন একটি মতবাদ গড়ে ওঠে যার প্রধান নীতি সংসার ত্যাগ না হলেও এই মতাবলম্বীরা সংসার বিবাগী ছিলেন। এই মতবাদকে বলা হয় 'তসাউওফ' এবং মতাবলম্বীদের বলা হয় 'সুফী'।

পীর, সুফী এই উপাধি ছাড়াও এই শ্রেণীর সাধকদের দরবেশ, ফকির, ওলি বা আউলিয়া

নামে অভিহিত' করা হয়। তবে এদের মধ্যে গুণগত সুক্ষ্ম পার্থক্য আছে। অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ছিল এঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এক বিশেষ সাধন মার্গে উত্তীর্ণ হলেই গুরু তাদের বিশেষ বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করে কর্মক্ষেত্রে প্রেরণ করতেন। শাহ, শেখ, গাজী এই সমস্ত বিশেষণ তারই কয়েকটি নমুনা। ফকির শব্দটি আরবী, সাধারণ অর্থ দরিদ্র, নিঃসন্তান। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে 'ফকির' শব্দের মাহাত্ম্য এই আভিধানিক অর্থ দিয়ে মাপা যায় না। বলা যায় ঈশ্বর - প্রেমের ব্যাকুল সাধক।

সাধারণভাবে আমরা অনুভব করি সংস্কার থেকে সংস্কৃতি শব্দটির উৎপত্তি। সংস্কারবশত: যিনি যে কাজ করেন, বা যা চিন্তা করেন, বা যে আচার - ব্যবহার করেন - তাই তার সংস্কৃতি। কিন্তু সংস্কৃতির পরিধি যে আরও কত বিস্তৃত বিধৃত সে সম্পর্কে গোপাল হালদার বলেন - সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান ও সমস্ত সৃষ্টি সম্পদ। (বাঙালীর সংস্কৃতির রূপরেখা) [illegible]বার সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে - ধর্ম আধ্যাত্মিক জগতের কিন্তু সংস্কৃতি পার্থিব জগতকে নিয়ে। মানবীয় আচার - পদ্ধতি, শিক্ষা, দীক্ষার মানসিক উন্নতি। পারিপার্শ্বিকতার [illegible] এই সবের সমন্বয়ে এক অপূর্ব মনোভাবই হচ্ছে সংস্কৃতি। একথা সত্য যে ধর্মের আদর্শ [illegible]র উপর প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু তাই বলে ধর্ম ও সংস্কৃতি এক বস্তু নয়।''

সংস্কৃতির যে ব্যাখ্যাই থাকুক না কেন বঙ্গে পীর দরবেশগণের আগমনের পর এই সংস্কৃতি ধীরে ধীরে হিন্দু ও মুসলীমদের মধ্যে মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করেছে। একেই বলা হয় হিন্দু মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতি বা পীর-সংস্কৃতি। মালদহ জেলার একাধিক স্থাননামে, পুকুর, দীঘির নামকরণে এই মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

কারো কারো বক্তব্য অনুসারে ইতিহাসের পাতায় মুসলীম ধর্মের আদি দিশারী হিসাবে এদেশে এসেছিলেন মহম্মদ বিন হাসান। তিনিই এ দেশে হিন্দু ও মুসলীমদের মধ্যেকার সুফী মবমিয়াবাদের আদি গুরু। (লালন শাহ.ও লালন গীতিকা : মহম্মদ আবু তালেব)

হজরত মখদুম শাহ জালালুদ্দিন তাবারিজী ঃ

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে জালালুদ্দিন ধর্ম প্রচার করার লক্ষ্য নিয়ে সুদূঢ় পারস্য থেকে বাংলাদেশে আসেন। ক্রমে তিনি গৌড়ভূমিতে 'শেখ' নামে অতুলনীয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও কঠোর তপশর্যার প্রভাবে তিনি একদিকে গৌড়ের অধিপতি অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মন জয় করে নেন। বাঙ্গালী রাজা লক্ষ্মণ সেন এবং পারস্যবাসী সাধক শেখ জালালুদ্দিনের মধ্যে সখ্য এবং সহমর্মিতার জ্বলন্ত নিদর্শন হল ২২ হাজারী ওয়াকফ এস্টেট। মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর এবং অধুনা বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে এই এস্টেটের সম্পত্তি বর্তমান। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন ও মহারাণী বল্লভার ইচ্ছানুসারে হট্টগ্রাম (পাড়ুয়া নগরীর পূর্বের নাম) এবং আরও বহুসংখ্যক গ্রাম ও ভূ-সম্পত্তি শেখকে নিঃশর্তে ও ধর্মার্থে দানপত্র করে দেন বলে 'শেখ শুভোদয়া গ্রন্থের ১৮শ পরিচ্ছেদে 'মহামদন দেশক্রয়' নামে অংশ বিশেষে উল্লেখ আছে।

জৌন পুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কীর কাছে লেখা একটি পত্রে মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী বর্ণনা দেন যে, 'জালালিয়া' দরবেশগণ দেওতলায় সমাহিত আছেন, 'দেওতলা'

উত্তরবঙ্গে পাভুয়ার কাছে একটি জায়গা। বাংলা শব্দ 'দেওতলা' ফরাসি 'দেবমহল'। দেওতলার একটি মসজিদে ৮৬৮ হিজরী, ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দের একটি উৎকীর্ণ লিপিতে স্থানটিকে 'কসবা তবারিজাবাদ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুলেমান করবানীর সময়ের একটি শিলালিপিতে পরিস্কারভাবে 'তবরিজাবাদ ওরফে দেওতলা' রূপে স্থানটির উল্লেখ আছে; অর্থাৎ তবরিজাবাদ দেওতলা নামে পরিচিত। রিয়াজ -উস সালাতিন অনুসারে আলাউদ্দিন আলী কর্তৃক ১৩৪২ খৃঃ শেখ তাবরিজীর সমাধি সৌধ নির্মিত হয়েছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকাহ (আস্তানা) এবং লঙ্গরখানাগুলো আধ্যাত্মিক, বুদ্ধি' বৃত্তি ও মানব সেবামূলক কার্যের কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল এগুলি বাঙ্গালী সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত করে তোলে। সেবামূলক কার্যেও তাঁর অবদান অসামান্য। মালদহ জেলার একাধিক স্থাননাম তাঁর নামাঙ্কিত। তবরিজাবাদ, জালালপুর — মখদুমপুর ইত্যাদি।

কালু ঘোষ ঃ

জালালুদ্দিন তাব্রিজীর কাছে কালু ঘোষ নামে পাভুয়াবাসী এক বৃদ্ধ গোপ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে তার রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং তিনি জালালুদ্দিনের আস্থাভাজন হয়ে উঠেন। প্রবাদ আছে যে কালু ঘোষ তাঁর অর্বতমানে ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনা এবং দানধ্যান স্বহস্তে পরিচালিত করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। এই কালু ঘোষ-ই পরবর্ত্তীকালে কালুপীর বা কালুগাজী নামে খ্যাতিমান হন। কালু পীর হিন্দু রাজত্বের অবসানকালে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়েছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। পাভুয়ার কুতুব শহরের গোল মসজিদের মধ্যে কালু পীরের মাযারকে স্থানীয় লোকেরা শ্রদ্ধা, ভক্তি করে থাকেন। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা ও ক্ষমতা বিষয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। ইংরেজ বাজার থেকে আট মাইল দূরত্বে জৈনধর্ম পীঠের কাছে একটি স্থানের নাম এই কালু পীরের নামে চিহ্নিত হয়ে আছে তা হল কালুয়াদিঘি বা কালুয়াদাগী।

শায়খ আখী সিরাজউদ্দীন ঃ

বাংলাদেশের প্রথমযুগের চিশতীয়া সুফীদের মধ্যে শেখ আখী সিরাজউদ্দীন উসমান ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তিনি এ দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব রেখে গেছেন। সূফী দরবেশদের জীবনী সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'আখবার - আল আখিয়ার' গ্রন্থে সঠিকভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, শেখ আখী সিরাজ তাঁর আধ্যাত্মিক, শিক্ষক শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার কাছ থেকে খিলাফৎ' ও খিরকাহ' লাভ করার পর স্বদেশে (ওয়াতানে আসলি) যাত্রা করেন। তিনি নিঃসন্দেহে লক্ষণাবতী আগমন করেন এবং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাংলা তাঁর মাতৃভূমি ছিল। নিজামুদ্দিন তাঁকে 'আয়নায়ে হিন্দ' বা হিন্দুস্থানের দর্পন' উপাধি দিয়ে প্রতিনিধিত্বের নিদর্শন সহ এখানে প্রেরণ করেন। মালদহের আপামর মানুযের কাছে ইনি 'পীরান-ই-পীর' অপভ্রংশে পীরানা পীর বা পীরদের পীর নামে শ্রদ্ধা ভাজন ও আশা আকাঙ্খা পূরণের সহায়ক হন। এই নামকরণের পিছনে নিছক অতিরঞ্জন না তাত্ত্বিক কোন যুক্তি আছে তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকে গেছে। ফার্সী অভিধানে 'পীরান' শব্দের অর্থ হল - সাধুপুরুষের সমাধি সংরক্ষণের জন্য ভূমিকর হস্তান্তর করণ'।

সাদুল্লাপুর যেতে বড় সাগর দিঘির উত্তর- পশ্চিম কোনে এই ভারত বিশ্রুত পীরের সমাধি এবং পারিপার্শ্ব প্রায় তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঈদের দিন মুসলমান আবাল বৃদ্ধ - বণিতার এবং ভক্তবৃন্দের মহাসমাগম ঘটে থাকে। বর্তমানে ঈদের পরদিন এখানে বিরাট মেলা বসে।

শেখ আলাউদ্দিন আলাউল হক ঃ

শেখ আলাউল হক ছিলেন আখী সিরাজউদ্দিনের সবচেয়ে খ্যাতনামা শিষ্য ও খলিফা। তিনি লক্ষ্মণাবতীর একটি সংস্কৃতিবান ও প্রতিপত্তিশালী সমৃদ্ধ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। 'মায়ায়িফ' আল ওলায়েত' নামক গ্রন্থের মতে, তার পরিবার বিখ্যাত কোরেশ বংশীয় সেনাপতি খালিদ - বিন - ওলিদের বংশধর। আখবার - আল - আখিয়ার থেকে জানা যায় যে, তাঁর পিতা সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৫৭ - ৯২ খৃঃ) কোষাধাক্ষ্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং শেখ আলাউল হকের আত্মীয় স্বজনরাও ছিলেন বাদশাহের উজীর ও আমীর ওমরাহ। আজম খান নামে তার এক পুত্র ছিলেন পান্ডুয়া রাজ দরবারের উজীর। সুতরাং শেখ আলাউল হক, ছিলেন উচ্চ অভিজাত শ্রেণীভুক্ত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অগাধ পান্ডিত্য। আখবার আল - আখিয়ার তাঁকে ঐ সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ আলেম, জ্ঞানী ও ধনী ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ঐ যুগের আলেমরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে সাহস পেত না। এমনকি আখী সিরাজও প্রথমে শেখ আলাউলের সম্মুখীন হতে দ্বিধা বোধ করেছিলেন। বিখ্যাত তাপস শেখ নিজামুদ্দিন, আউলিয়া যখন তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে আলাউল হক তাঁর শিষ্যত্ববরণ করবেন, কেবল তখনই তিনি তাঁর পীরের খলিফারূপে বাংলায় আসতে সম্মত হয়েছিলেন।

আখী সিরাজের মৃত্যুর পর আলাউল হক তার মহান শিক্ষকের ধর্মীয় ব্রত অনুসরণ করে চলেন এবং নানাভাবে ইসলামের উন্নতি সাধন করেন। তিনি পান্ডুয়াতে একটি খানকাহ্ ও একটি লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন; এগুলি ভক্ত, জ্ঞানী, ঈশ্বর অন্বেষণকারী ও আশ্রয়হীন অনাথদের আশ্রমে পরিণত হয়েছিল। তিনি এগুলির ব্যয় নির্বাহের জন্য মুক্তহস্তে দান করেন। বাস্তবিকই শেখ আলাউল হক তাঁর আদর্শ জীবন ও মানব সেবামূলক কার্যাবলীর দ্বারা মানুষের মনে এতবেশী প্রভাববিস্তার করেছিলেন যে, সুলতান সিকান্দার শাহ পর্যন্ত তার প্রতিপত্তিতে শংকিত হয়ে পড়েন, এবং তাঁকে সোনার গাঁও স্থানে নির্বাসিত করেন। সম্ভবত ১৩৯২ খৃঃ সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর তিনি পান্ডুয়ায় ফিরে আসেন। এরপর ১৩৯৮ খৃঃ পান্ডুয়াতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নূর কুতুব - উল - আলম, জাহাঙ্গীর সিমনানী, নাসিরুদ্দিন মানিকপুরী, শেখ হোসেন জুঙ্কার পোষ প্রভৃতি তাঁর খ্যাতনামা শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। আলাউল হকের সুযোগ্য শিষ্যরা তাঁদের মহান শিক্ষকের নামে চিশতীয়া তরীকার মধ্যে 'আলাই' নামে একটি সুফী সম্প্রদায় গড়ে তোলেন।

হযরত-নুর-কুতুব-আলম ঃ

হযরত-নুর-কুতুব-উল-আলম ছিলেন বিখ্যাত সুফী দরবেশ শেখ আলাউল হকের সুযোগ্য পুত্র ও সার্থক আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। পিতার মত তিনিও ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও বিদ্যাবত্তায়

সুপন্ডিত ছিলেন। আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে মুসলিম রাষ্ট্র রক্ষার জন্য নুর-কুতুব-আলম মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি স্থাপনের জরুরী প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি সকল সম্ভাব্য উপায়ে মুসলমানদের ভিতরকার বিভেদ দূর করে পুনরায় তাদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং ইসলাম ও মুসলমান শাসকদের প্রতি সাধারণ মানুষকে অনুগত করে তুলতে চেষ্টা করেন। সেইসময় বেশ কিছুদিনের জন্য রাষ্ট্রে রাজা কংস ও তার হিন্দু সহকারীদের কর্তৃত্ব বজায় ছিল। এইসময় মুসলমানদের উপর তাদের অত্যাচারের দরুন হযরত নুর কুতুব আলম বাধ্য হয়ে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ শার্কীর সাহায্যের আবেদন করে তার কাছে পত্র লেখেন। বাংলার সীমান্তে ইব্রাহিম শাহ শার্কীর আগমনে ভীত হয়ে রাজা কংস বিপদ এড়াবার জন্য বিনীতভাবে হযরত নুর কুতুব আলমের মধ্যস্থতা প্রার্থনা করেন। তিনি তাব পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য অর্পন করেন। সেই অনুযায়ী যদু ইসলামে দীক্ষিত হন এবং জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ উপাধি ধারণপূর্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর পীর সুলতান ইব্রাহিম শাহকে তাঁর অভিযান পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। এর ফলে চরম সংকটের মুখ থেকে মুসলিম রাজ্য ও সমাজ এবং বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা পায়।

হযরত নুর কুতুব আলমের মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে মতদ্বৈধতা আছে। মিরাত আল আসরার অনুসারে তিনি ৮১৮ হিজরী ১৪১৫ খৃঃ মৃত্যুবরণ করেন। তাজাকিরাত আল - আফতাব এর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে 'খাজিনাত - আল আসফিয়ার লেখক উল্লেখ করেন যে শেখ ৮৫১ হিজরী ১৪৪৭ খৃঃ ইহধাম ত্যাগ করেন। সুলতান প্রথম মাহমুদ শাহের সমকালীন একটি লিপি থেকে জানা যায় তিনি ৮৩৫ হিজরী ১৪৫৯ খৃঃ মৃত্যুবরণ করেন। স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

পান্ডুয়ায় পিতার সমাধির কাছে নুর-কুতুব সমাধিস্থ হন। শেখ আলাউল এবং কুতুব আলমের মাজার 'ছোট দরগাহ' নামে পরিচিত। 'ছোট - দরগাহ' সংলগ্ন ভূ-সম্পত্তিকে 'শশ-হাজারী' ষ্টেট বলা হয়, যেহেতু এতে ছ'হাজার টাকা আয় হোত। কুতুব আলমের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের প্রতি তাঁর মহান সেবার জন্য তিনি বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় সুফী দরবেশ হিসাবে পরিগণিত হন। তার দরগাহ রাজা বাদশাহ ও সকল শ্রেণীর লোকের তীর্থস্থান। এই সিদ্ধপুরুষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য প্রতিবছর হোসেন শাহ পদব্রজে 'একডালা' থেকে পান্ডুয়ায় আসতেন। তিনি নুর কুতুবের প্রতিটি লঙ্গরখানা রক্ষণাক্ষেণের জন্য ৪৭ খানা গ্রাম দান করেছিলেন। মালদহের সবচাইতে বেশী স্থাননাম এই সুফী দরবেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। যেমন - নুরপুর, নুরপুরঘাট, আলমপুর, কুতুবপুর, কুতুব শহর ইত্যাদি।

সেখ আনোয়ার ও রফিউদ্দিন নামে কুতুবের দুই পুত্র ছিল।

শেখ রাজা বিয়াবানী :

শেখ রাজা বিয়াবানী নামে আর একজন পীর সাধকের নাম পাওয়া যায়, ধার্মিক সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এই পীর দরবেশকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক 'একডালা দুর্গে' যখন অবরুদ্ধ হন, সে সময়ে পান্ডুয়ায় শেখ রাজা বিয়াবানী মৃত্যুবরণ করেন। দরবেশের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সুলতান

অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ফকিরের ছদ্মবেশে একডালা দুর্গের বাইরে আসেন, নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি প্রিয় শেখের জানাজায় (অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া) অংশগ্রহণ করেন।

শেখ রাজা বিয়াবানী পান্ডুয়ার কাছে এবং আদিনার চার মাইল আগে বোলবাড়ীতে অবস্থান করতেন। তিনি শাস্ত্র ও অধ্যাত্ম বিদ্যায় অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ফার্সীতে 'বিয়াবন' শব্দের অর্থ নির্জন অরণ্য। তিনি লোকালয়ের বাইরে জঙ্গলময় স্থানে বাস করতেন বলে বিয়াবানী তাঁর উপাধি ছিল। প্রচলিত গল্প এইরকম যে : কাজী বাহাস ও নুর কুতুব আলম এক সময়ে ধর্ম সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করার জন্য বিয়াবানীর কাছে যাচ্ছিলেন। তাঁদের আসার কথা জানতে পেরে কাজী বল্মীক দ্বারা নিজেকে ঢেকে ফেলেন। বোলবাড়ীর পূর্ব নাম কি ছিল তা জানা না গেলেও বোলবাড়ী নামটি বিয়াবানীর সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। কথিত আছে -- কোনও এক সময়ে বিয়াবানী কুতুব আলমের সাথে দেখা করতে যাওয়ার পথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার সময় - মাটির অভ্যন্তর থেকে 'আমি কুতুব আলম এইখানে ' — এই শব্দ বা বোল শুনতে পান। আবার একইরূপ কাজ করতে গিয়ে আর সেই শব্দ শুনতে পান নি। তখন তিনিই সেই স্থানের নাম রাখেন বোলবাড়ী। পারস্য ভাষায় 'বোল' শব্দের অর্থ প্রস্তাব।

ঘোড়াপীড়ঃ

রাজমহল গামী সড়কে 'ঘোড়াপীর নামে অঞ্চলটি বর্তমানে যথেষ্ট জনবসতি পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখানে ঘোড়াপীর নামে দুটি সমাধি পাশাপাশি অবস্থিত। এই সমাধি দুটি জাগ্রত পীরের সম্মানে আজও পূজিত হন ধূপ-ধূনো আর মাটির ঘোড়ার লোকাচারে। এই অদ্ভুত নামকরণ নিয়ে গবেষকদের বিতর্কের অবসান আজও হয়নি।

লৌকিক দেবস্থানে অথবা পীরের সমাধিস্থলে হাতি, ঘোড়া, বাঘ ইত্যাদি উপচারের নৃবিজ্ঞানীদের কতকগুলি ব্যাখা আঁছে। আমরা শুধু ঘোড়ার কথাই বলব। লৌকিক বার্ষিক উৎসবে, ব্যক্তি - বিশেষের মানত থাকলে দেবস্থানে পোড়ামাটির ঘোড়া নিবেদনকে বলা হয় 'ছলন'। আভিধানিক অর্থ ছলনায় আনয়ন। প্রায়োগিক অর্থ - পশুমূর্তি নিবেদনের যাদুক্রিয়ায় দৈবশক্তিকে আনয়ন। উদ্দেশ্য — বিঘ্ন বিনাশ, শত্রু-নিধন, ব্যক্তি-জীবনে, পরিবারে-সমাজে শুভশক্তির আবাহন, রোগ-নিরাময়, শস্যবৃদ্ধি, সন্তানলাভ প্রভৃতি ঐহিক কামনা। নব্য প্রস্তর যুগের শেষ স্তরে, যখন দেবতার মূর্তি গড়া হয়নি অথচ অতীন্দ্রিয় লোকের অলৌকিক শক্তির আভাস মানুষের মনে ফুটে উঠছে সেই সময় থেকেই পশুমূর্তির প্রতীকে এল 'ছলন' নিবেদন। বলা যেতে পারে দেব মূর্তি বা দেব শিল্প গড়ে ওঠার এটি ছিল প্রাক্ - ঐতিহ্য। ঘোড়া রূপ ছলনের এই প্রসারন ক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত একটু আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। সাঁওতাল, কোলীয়দের 'জাহের -থানে', সারণা - শালুই থানে ঘোড়া নিবেদন করা হয়।

ধর্মঠাকুরের পূজার অন্যতম উপকরণে আছে ছলন ঘোড়া, দক্ষিণ ভারতে লৌকিক দেবতার থানে পোড়ামাটির ঘোড়া নিবেদিত হয়।

মধ্যভারতের কিছু কিছু আদিবাসীদের মধ্যে ঘোড়ার পূজা প্রচলিত আছে। উড়িষ্যার 'কেওট' দের উপাস্য ঘোড়া - মুহ বাঁশুলী'। তপশিলী ডোম, বাগদী, কেওটরা ঘোড়াকে তাদের কুলপুরুষ বলে মনে করে।

সর্বত্র পীর স্থানে পোড়ামাটির ঘোড়া - মুক্তি কামনায় নিবেদিত হয়।

এইসব থেকে মনে হয় আর্য, গ্রীক, আরবী, তুর্কীদের আগমনের আগেই এদেশে ঘোড়ার শক্তির সঙ্গে মানুষ পরিচিত ছিল। পশ্চিম ও মধ্য থেকে আগত যোদ্ধা জাতিরা যুদ্ধে ঘোড়ার ব্যাপক ব্যবহার করে এদেশে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার ত্বরান্বিত করেছিল। দ্রতগামী অশ্ব সভ্যতার কাছে মন্থর গজ সভ্যতার পরাজয়ের পর এই যে দ্রুতগতির যুগ শুরু হল, তাকেই স্মরণ করে রাখা হল 'ঘোড়া' প্রতীকের মাধ্যমে।

মালদহ জেলায় রাজমহলগামী সড়কের পাশে ছাড়াও শহরের কেন্দ্রস্থলে বর্তমান সার্কিট হাউস এবং জেলা শাসকের বাসভবনের বিপরীতে একইরকমভাবে পরিচিত ঘোড়া - পীর ও জহান - পীরের সমাধি আছে। এলাকার সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে ঘোড়াপীর কোন সাধারণ মাজার বা সমাধি নয়। এটি পীরের সমাধি। কিংবদন্তী আছে যে, বক্তিয়ার খিলজী বাংলাদেশ আক্রমণের সময়ে মাত্র ১৮ জন ঘোড়সওয়ার সঙ্গে নিয়ে আসেন। তাঁদেরই কেউ কেউ সুফী - সাধকদের ঈশ্বর ভাবনার দ্বারা আপ্লুত হন। এই দুটি মাথার - এর একটি তুর্কী সৈনিক অন্যজন শ্রীহট্টে সমাধিস্থ হজরত শাহ জালালের ৩৬০ জন শিষ্যের অন্যতম একজন। 'ঘোড়া সওয়ারী পীর' থেকে 'ঘোড়াপীর' এই রূপ নামকরণ হতে পারে।

মীর সুলতান আলি, মীর কুরবান আলী ঃ

মালদহ শহরের মীরচক ইমামবাড়ার উত্তরে 'কালাপাথর' মাজার রয়েছে। এই মাজারটিও শহরের স্থানীয় মানুষের অত্যন্ত প্রিয়। চাদর জড়ানো, চেরাগ জ্বালানো ও সিন্নি দেওয়ার রেওয়াজ এখানকার একটি জনপ্রিয় লোকাচার। এখানকার সমাধিগুলি হল মীর সুলতান আলী ও তাঁর মীর কুরবান আলীর। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের নামেই স্থানটি নামাঙ্কিত 'মীরচক' নামে।

কলিগ্রামের জিন্দাপীর ঃ

মালদহ পশ্চিম দিনাজপুর ও পার্শ্ববর্তী বিহারের জনমানসকে যে সন্ত তার চরিত্রের অলৌকিতার গুণে আকৃষ্ট করে রেখেছেন তিনি জিন্দাপীর ওরফে সুরয্ খান বলে জানা যায়। তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ আজও বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে হিন্দু মুসলীম গ্রামবাসী স্মরণ করে থাকেন। জনশ্রুতি এই যে : তিনি পূর্ব পরিকল্পনা মতো মাটিতে গর্ত করে ছয় মাসের খোরাক নিয়ে স্বেচ্ছায় সমাধির মধ্যে প্রবেশ করেন। আর উঠেন নি।

পরবর্ত্তীকালে এই পীরের সমাধির উপর এক মসজিদ নির্মিত হয়। মস্জিদ নির্মিতির গঠনশৈলীতে হিন্দু ও মুসলীম স্থাপত্যের নমুনা স্পষ্ট। এটি গ্রামীন আটচালা ঢঙে নির্মিত ভবন।

দানশাহ্ ফকির ঃ

দানশাহের বসত ভিটা ও সাধনস্থল (চিল্লখানা) হাভেলী নামে পরিচিত। রতুয়া থানার বাহারাল মোড় থেকে পশ্চিমে দান শাহের বসতির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে। সমাধিভূমিটি ঢিবির মত উঁচু। প্রথমে তার কবর ছিল মাইল খানেক পশ্চিমে ফকির তাকিয়ায়, কালিন্দী নদীর গ্রাস থেকে বাঁচাতে দ্বিতীয়বার তার দেহ সমাহিত করা হয় কলুটোলায়। দানশাহ ও তাঁর ভাই

আশিক হোসেন এসেছিলেন পশ্চিম ভারত থেকে। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন অনেক অমুসলীম অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে।

বাংলা বিহার - উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উ দৌল্লার জীবনের চরম বিপর্যয়ের সাথে এই দানশাহ ফকিরের নাম জড়িয়ে গেছে। পলাশীর যুদ্ধের পর পরাজিত এই নবাবকে এই ফকির আশ্রয় দেন আবার পরে তিনিই নাকি নিষ্ঠুরভাবে নবাবকে তুলে দেন ঘাতকের হাতে। কিন্তু সম্প্রতি এই তথ্য সত্য নয় বলে প্রমানিত হয়েছে।

গাজী পীর ঃ

চাঁচল থানার অন্তর্গত বলরামপুর মৌজায় গাজী পীর নামে এক মহাত্মার দরগা এখন মহরম পর্ব উদ্‌যাপনের কেন্দ্র হয়ে দাড়িয়েছে। এর সঙ্গে বসে একটি বিরাট মেলা। লোকের মুখে গাজী পীরের মেলা'। গাজীর সম্পূর্ণ নাম সম্ভবত: শাহ ইসমাইল গাজী। তিনি আরবভূমি মক্কা থেকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে এসেছিলেন। এই গাজী পীর সম্বন্ধেও একাধিক লোক কথা কিংবদন্তী প্রচলিত।

কুম্ভীর পীর ঃ

গৌড়ের কদম রসুল থেকে মাইল খানেক উত্তর-পূর্বে এক বিশাল,পুকুরে ভাসমান কুম্ভীরকে পীর রূপে বিশ্বাস করা এবং তাকে সিন্নি দিয়ে কৃপা অর্জন করা মালদহের এক প্রচলিত জনরীতি। এখানে পুকুর সংলগ্ন একটি কারুকার্যময় সমাধিগৃহ আছে। পীরের আসল নাম বা পরিচয় জানা যায় না। তবে আজ সেই কুমীর নেই, তাকে মাংস ভেট দেওয়ার প্রথাও নেই। সেই পুকুরে পীরকে স্মরণ করে সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

পীর শাহ আবদুল্লা ঃ

সাদুল্লাপুর অর্থাৎ ভাগীরথী তীরবর্ত্তী পীর শাহ আবদুল্লার নামাঙ্কিত স্থানের অপর পারে 'রথবাড়ী' গ্রাম জঙ্গলী টোটা নামে যে সাধনক্ষেত্র ছিল তা কালক্রমে হিন্দু (বৈষ্ণব) মুসলমান ভক্ত মানসের মিশ্র ধারনায় ভর করে বিচিত্র রূপ নিয়েছে। এখানে বৈশাখ মাসে যে মেলা হয় তাতে হিন্দু - মুসলমান উভয় ভক্তেরই আগমন ঘটে থাকে।

পীরশাহ ইব্রাহিম চাহচেতন লওলঙ্গর ঃ

সুদুর লঙ্কা দ্বীপ থেকে এসেছিলেন এই পীরশাহ ইব্রাহিম। তাঁর সমাধি আছে পুরাতন মালদহ এলাকার বাচামারি গ্রামে। গৌড়ের কদমরসুল ভবন থেকে কিছু দুরে একটি কবরকে পীর শাহিলা শাহের কবর বলে চিহ্নিত করে থাকেন স্থানীয় মানুষেরা।

শাহ নিয়ামতুল্যা ঃ

ইংরেজবাজার কোতোয়ালী গ্রামে শাহ নিয়ামতুল্যর সমাধি ক্ষেত্র দেখতে পাওয়া যায়। যদিও সেই সমাধি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। শাহ নিয়ামতুল্যা একজন প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন। তিনি কবে কোথা থেকে অথবা কার আমলে এখানে এসেছিলেন এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।

তবে তোরণ-দ্বারের ফলকলিপি থেকে জানা যায় খন্‌জাহান নামে কোনও এক ভক্ত ১৫৬৩ খ্রীঃ নিয়ামতুল্যার জন্য এই তোরণদ্বার নির্মাণ করে দেন। এই সাধক গৌড়ের কাছেই বাস করতেন। তাঁর বংশধরেরা এখনও এই সব অঞ্চলে বসবাস করে। ১৬৬৯ খ্রীঃ তাঁর দেহান্তর ঘটে। সুদৃশ্য তার সমাধি মন্দিরের চারপাশে বৃহৎ সরোবর, মসজিদ, সাধক নিয়মতুল্যার প্রাধান্য, প্রতিপত্তি তথা জনপ্রিয়তার কথাই স্মরণ করায়। ভক্ত কর্তৃক এই সমাধি তথা স্মৃতি রক্ষার জন্য বার্ষিক ৬০০০ টাকা রাজস্ব সম্পন্ন ভূমি উৎসর্গ করা হয়েছিল।

মহানন্দার পূর্ব পারে সাহাপুরে রয়েছে মানিক পীরেব দরগা।

দুধ পীর ও তেনাপীর নামেও মালদহের দুটি স্থানে পীরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এই সাধকদ্বয়ের সমাধি চিহ্ন বহন করছে ওল্ড মালদহের গাজোল গামী বড় সড়কের উনিশ মাইল। শুদ্ধাচারী ইসলামের মধ্যে এই উভয় পীরকে ফেলা না গেলেও হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কার এই পীরদ্বয়কে কেন্দ্র করেই শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে।

সুফীদের মতে, কোর আনের দুটি ব্যাখা আছে, একটি বাহ্যিক অপরটি গুপ্ত বা গূঢ়জ্ঞান। মারিফাত নামে কোর আনের গূঢ় বা গুপ্তজ্ঞানকেই তারা অধিক মুল্য দিয়ে থাকেন। 'সুফী'রা প্রেমের মূলতত্ত্বের উপর তাদের মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য অন্যান্য পথ অপেক্ষা প্রেমের পথকেই তারা অধিকতর ভালবাসেন। তারা প্রেমকেই ধর্মের সারবত্তা (নির্যাস), সৃষ্টির কারণ ও এর বিস্তৃতির মূল হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রেমই প্রিয়তম আল্লাহর সঙ্গে মিলনের একমাত্র নির্ভুল উপায়। মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী বলেন,

আমরা সবে থাকি বসি ভবনে সেই মধুক্ষণ
তুমি আর আমি
দুই দেহে দুই রূপে, কিন্তু সদা একমন
তুমি আর আমি।

স্ত্রী বাচকে ব্যক্তি বিশেষের নামে স্থান নাম দেওয়ার রীতি আমাদের জেলায় খুব বেশি নেই। তবু এখানে আছে রামাবতী, মদ্‌নাবতী ও লক্ষণাবতীর নাম। বোধ হয় এই ধারা শুরু করেছিলেন ধর্মপালের মা 'দেদ্দ দেবী'। এই দেদ্দ কথাটি এসেছে প্রাকৃত দয়ার্দ্রা থেকে। তারপর থেকে স্ত্রীবাচকে কিছু স্থাননাম আমরা পাই।

লোক সংস্কৃতি ধারা ঃ

লোক সংস্কৃতি শব্দটির মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে সমাজের সংহতি, প্রথানুগতা, গোষ্ঠীনির্ভরতা, আর সমষ্টি চেতনার ধারনা। লোক সংস্কৃতির ইংরাজী প্রতিশব্দ হল Folk lore বা Folk Culture এই Folk Culture- এর এ পর্যন্ত পাওয়া বাংলা প্রতিশব্দ গুলি হল লোকচর্যা, লোকশ্রুতি, লোকবৃত্ত, লোকবিজ্ঞান, লোকায়ন, লোকবিদ্যা, লোকবার্তা, লোককৃতি, লোকযান প্রভৃতি, এই শব্দ গুলির মধ্যে লোকসংস্কৃতি এবং আচার্য সুনীতিকুমারের 'লোকযান' শব্দ দুটির মধ্যেই এক শাশ্বত গ্রামীণ সমাজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নৃতত্ত্ববিদ হাব্‌সকোভিটস্ এই Folk Culture এর কথা প্রসঙ্গে তাঁর 'Man and his works' গ্রন্থে বলেছেন — A Culture is a way of life of a people অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন প্রণালী সমাজ আসলে একটি জনসংগঠন। প্রত্যেক জনসংগঠন গোষ্ঠীর একটি বিশেষ জীবন যাপন রীতি যা তারা অনুসরণ করে বংশ পরম্পরায় তাই তাদের সংস্কৃতি। এককথায় সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এই সংস্কৃতিই সমস্ত জীবজগতের মধ্যে মানুষকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করেছে। কারণ সাধারণ জীবজগতের মধ্যে দেখা যায় low of mutual struggle প্রতিযোগিতার জৈব নিয়ম low of mutual aid- সহযোগিতার জৈব নিয়ম। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এ ছাড়াও আছে Low of human exchange - মানবিকতা বা মনন বিনিময়। এরই নাম সংস্কৃতি। অন্যভাবে বলা যায় - সমাজ হচ্ছে একটি ব্যক্তি আর সংস্কৃতি হচ্ছে Body of learned behaviour বা শিক্ষার্জিত আচরনের সমষ্টি। সমাজীকরন একপ্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে ব্যক্তিদের সঙ্গে মানিয়ে নেয় এরই নাম শিক্ষণ প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ব্যক্তি গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। নানাভাবে এই প্রক্রিয়া চলে - অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তি বিদ্যাগত, ধর্মীয় আচার আচরণগত, শিল্পকলা বিদ্যাগত এবং ভাষা ও সাহিত্যগত আত্মসাৎকরন। এই সবগুলিই হল সংস্কৃতি গড়ে ওঠার মৌলিক উপাদান যা জীবনাচরনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি রচনা করে।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সাংস্কৃতিকী' গ্রন্থে বলেছিলেন Culture শব্দের মূলে আছে লাতিনের Culture বা 'কুলতুরা' শব্দ; এই শব্দ লাতিনের 'Col' কোল শব্দ থেকে এসেছে। 'Col' অর্থে 'কৃষ্ণ' চাষ করা আবার যত্ন করাও হয়। ' Culture' এর প্রতিশব্দ রূপে 'উৎকর্ষ' অথবা উৎকর্ষসাধনা' ও হয়। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ' Culture' এর অর্থে অনুশীলন শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক ভাবে 'কৃষ্টি' শব্দটি গ্রহণ করে থাকলেও 'সংস্কৃতি' শব্দটিকেই সমর্থন করেছেন।

প্রাচীন কালে বহুগোষ্ঠীর মিশ্রণে এক সংযত, সংহত কৃষিভিত্তিক জনতা এক স্বতন্ত্র সমাজজীবন গড়ে তুলেছিলো। সেই সমাজকে যদি আমরা লোক সমাজ বলে থাকি তাহলে সেই সমাজের লোকশ্রুতি মূলক জীবনাচরনের উৎসমূলে আছে ঐ লোকসংস্কৃতি বা লোক জীবনাচরনের বিরাট বিচিত্র পটভূমি বা নেপথ্য ভূমি। এমনই একটি লোকায়ত কৃষিজীবী সমাজের বর্ষা বোধন উৎসব হল 'গাজন' - যার ভিত্তিভূমিতে রয়েছে আদি জীবনাসৃত হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব। এই অনুষ্ঠানটি বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে শিবের গাজন, আদ্যের গাজন, নীলের গাজন, ধর্মের গাজন ইত্যাদি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। জন্ম দিয়েছে একাধিক লোক সংস্কৃতি ধারার।

আসলে লোকায়ত মানুষগুলির মৌল আকাঙ্খার পরিপূর্ণতার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে নানা উৎসব অনুষ্ঠান, আচার, রীতিনীতি ইত্যাদির। আবার এর মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হচ্ছে একাধিক লোক সাহিত্য ধারার। পরবর্তী যুগে যেগুলি আবার নৃত্যে, নাট্যে, আলপনায়, কারুশিল্পে ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে প্রচলিত হয়েছে লোক সংস্কৃতির ফসল হিসাবে।

এই লোক সংস্কৃতিকে আবার আমরা দুভাগে ভাগ করে দেখতে পারি। একটি Material Flokelore বা বস্তু আশ্রয়ী লোক সংস্কৃতি অন্যটি Non Material Folklore অর্থাৎ সাহিত্য শিক্ষাশ্রয়ী লোকসংস্কৃতি যার মধ্যে আছে লোক সাহিত্যের অনন্ত ভান্ডার।

বস্তু আশ্রয়ী লোক সংস্কৃতি প্রধানত চারুশিল্পের বাইরে স্থাবর বস্তুকে কেন্দ্র করে বা উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে বেড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে আছে ঘড়বাড়ী তৈরী, খই, ঢেঁকি তৈরী কিংবা গ্রাম্য যানবাহন, বিভিন্ন ঝুড়ি, চুপড়ী, মাটির দ্রব্য, কাঁথা, মাদুর তৈয়ারী ইত্যাদি বিবিধ বিষয়।

সাহিত্য শিক্ষাশ্রয়ী লোক সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে লোকশ্রুতি নির্ভর সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা যেমন, লোকগীতি, ছড়া, ধাঁধাঁ বা প্রবাদ প্রবচন, রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথা, গীতিকা বা মিথ ইত্যাদি।

কেউ কেউ আবার লোক সংস্কৃতিকে উপরিউক্ত দুটি বিভাজন ছাড়াও আরও একটি বিভাজনের কথা বলে থাকেন, — যার মধ্যে আছে লোক নিরুক্তি, গ্রাম ও স্থানের নাম, পশুপাখী বৃক্ষ লতাদের লোকায়ত নাম ও তার ইতিবৃত্ত, মন্ত্রতন্ত্র প্রচলিত আশীর্বাদ তিরস্কার ইত্যাদি। এছাড়া আছে আচার-আচরণ, বিশ্বাস ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি, যার মধ্যে পাড়ে বিবিধ ধরনের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার বিশ্বাস, মেলা, পূজা, উৎসব, পালপার্বন, লোক চিকিৎসা ইত্যাদি।

লোক সংস্কৃতি বস্তু আশ্রয়ী অথবা সাহিত্য আশ্রয়ী যাই হোক না কেন এগুলি আবার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কোনও একটি জেলা বা অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, বসবাসকারী জনগণ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের উপর।

গম্ভীরার মুখোশ ঃ

প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন গম্ভীরা উৎসবের সঙ্গে যুক্ত এই মুখোশের বয়সও সুপ্রাচীন। বলা যায় বাঙলার প্রাচীনতম মুখোশ হল মালদহ জেলার গম্ভীরার মুখোশ।

গম্ভীরার মুখোশ নৃত্যের প্রধান চরিত্র কালী, নারসিংহ, চামুন্ডা, উগ্রচন্ডা, বাশুলী, ঝাঁটা কালী। গৃধিনী বিশাল ও মহিষ মর্দিনী নাচ এর সঙ্গে পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। গম্ভীরার মুখোশগুলির রূপায়বে অতি প্রাকৃত বিশ্বাস বা যাদু লক্ষণীয়। বাংলায় অন্যত্র যে সব লোকনৃত্যে মুখোশ ব্যবহৃত হয় তা আনন্দের জন্য কিন্তু গম্ভীরার মুখোশ নৃত্য পুরোপুরি অতিপ্রাকৃত উপাদানের সমন্বয়ে নির্মিত হয়। আবার একথাও বলা যায় যে মালদহ অঞ্চলের এই মুখোশ নৃত্যে কোন কাহিনীর স্থান নেই। তার উল্লেখযোগ্য কারণ হল গম্ভীরায় ধর্মীয় আচারই একমাত্র লক্ষ্য। আদিম প্রভাবে শক্তিবাদের ব্যাপারটিই এই মুখোশগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তার কারণ পাল রাজাদের আমলে গৌড়ে তন্ত্রের স্পর্শে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম রূপান্তরিত হতে থাকে, তারপর সেন রাজাদের সময়ে বৌদ্ধ ও শক্তিতন্ত্র একাকার হয়ে যায়। তারই কল্পিত রূপ গম্ভীরার মুখোশ।

গম্ভীরার দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে ছোট তামাশা ও বড় তামাশার রাত্রিতে নাচ-গানে ও এই মুখোশ নৃত্য পরিবেশিত হয়।

প্রাচীনকালে এই মুখোশ তৈরী হতো নিম, বেল, ডুমুর ও পিটুলি কাঠ দিয়ে। এখন বর্তমানে এই মুখোশ খরচসাপেক্ষ ও ব্যবহারের পক্ষে কষ্টকর হওয়ায় হালকা কাঠের অথবা কাগজের মন্ড দিয়েও কেউ কেউ মুখোশ তৈরী করে নিচ্ছেন। ঐতিহ্যবাহী কাঠের মুখোশ পড়ে

নাচ এখনও আইহো, পুরাতন মালদা, মহাদেবপুর, মুচিয়া, হবিবপুর, জগদলা, বামনগোলা, ইংরেজবাজার, আড়াপুর, গণিপুর, কোতয়ালী, জালালপুর, মহদীপুর, ফুলবাড়িয়া ইত্যাদি স্থানে দেখা যায়। আর এই প্রাচীন মুখোশ নির্মাতাদের মধ্যে আছেন আইহো গ্রামের শম্ভু দাস, ইংরেজবাজারের রাধাপদ সূত্রধব ইত্যাদিরা।

গম্ভীরা গান — জনপ্রিয় লোকনাট্য ও লোকগানে হিসাবে গম্ভীরার প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি আজ আর কেবল মালদহ জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই।। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অন্যান্য জনপ্রিয় লোকআঙ্গিক গুলির মধ্যেও গম্ভীরা গান অন্যতম স্থানাধিকারী। এর কারণ গম্ভীরা গানের ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক মানবিক অন্তরধর্ম।

গম্ভীরা গানের কাঠামোটি অনেকটা গ্রাম যাত্রার মত। ময়মনসিংহ গীতিকা, মনসার ভাসান গান ইত্যাদি গম্ভীরার দোসব; একে অন্যকে খানিকটা প্রভাবিতও করেছে বলে মনে হয়। গম্ভীরার এই লোক আঙ্গিকে নৃত্য, গীত, বাদ্যের সমন্বয়ে পরিচালিত গানে কর্মক্লান্ত, ধর্মভীরু মানুষ পান করেছে ধর্মীয় রসসুধা, মননশীল মানুষ অতি সুকৌশলে এই ধর্ম ভাবনার মিশেলেই অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতির। মায়ের ঘুম-পাড়ানী গানের মত শিক্ষার এই স্বাভবিক শোষন শক্তিতে ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়ে উঠেছে প্রত্যান্তিক মানুষ। মন্দির অঙ্গনের আনুষ্ঠানিক রীতি নীতির ঘেরাটোপ ছেড়ে গম্ভীরা যখন আম জনতার দরবারে এল সংস্কৃতির দায়বদ্ধতা মেনে তখনই তার প্রকৃত স্বরূপটি বোঝা গেল। নোয়াম্, চমস্কি, প্রপ, ড্যাভিস, স্ট্রস প্রমুখ পন্ডিতেরা বলেন আজকে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অ্যাবস্ট্যাক্ট ম্যাজিক, রিয়ালিটি অথবা থার্ডথিয়েটাবের মত অত্যাধুনিক শব্দগুলির বীজ বপন করা আছে আমাদের এইসব লোকসংস্কৃতির আঙ্গিকে। ধর্মকথা ছেড়ে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির নানাবিধ সমস্যা নিয়ে গম্ভীরা তার পরিবেশকে করে ফেলল সঞ্চরণশীল তখন আজকের আলোচিত থার্ড থিয়েটারের অবয়ব খানিকটা ধরা পড়ল এই লোক আঙ্গিকে। থার্ড থিয়েটার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মূল তিনটি উপাদান লেবেল, লাইট এবং লোকেশনের দূরত্ব এবং সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আসতে হয় মানুষের আরও কাছাকাছি দরজার এবং মনেরও, তথাকথিত অশিষ্ট মানুষের ভাবনায় শিল্পিত গম্ভীরা কি এই শর্তগুলিই যথাযথভাবে পালন করে আসছে না!

পালধর্মী গম্ভীরা গানের মোটামুটি চারটি পর্ব— ১.বন্দনা, ২.চার-ইয়ারী, ৩.টপ্পা-ঠুংরি, ৪.সালতামামি

গম্ভীরা গানের শুরুতে বন্দনা অংশে থাকে শিব-বন্দনা, ব্যতিক্রমে কোথাও কার্ত্তিক বন্দনা। এরপর চার ব্যক্তি আসরে প্রবেশ করে পারস্পরিক সমস্যাদি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করতে থাকেন। আলোচনা তুমুল বিতর্কে পরিনত হলে শেষ পর্যন্ত দেবাদিদেব মহাদেবকে আহ্বান জানানো হয়। উচ্চারিত ব্যবহারিক নাম হল 'নানা','শিবহে, নানাহে' এই ডাকে জটাজুট ছাই মেখে শিব শাসকদলের প্রতিনিধি হয়ে আসরে উপস্থিত হন। চলে সরকারের দরবারে দারিদ্র পীড়িত সাধারণ মানুষের ফরিয়াদ। গম্ভীরা গানে শিবকে উপস্থিত করে তার উদ্দেশ্যে গানের প্রচলন খুব বেশীদিনের নয়। এই প্রসঙ্গে গবেষক ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ একটি সুন্দর পরিপ্রেক্ষিতের কথা বলেন। গম্ভীরা গানের গায়ক বিশ্বনাথ পন্ডিতের মতে 'প্রায় আট-নয় দশক আগেই এর প্রচলন'। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

একবার মালদহে আসবার কথা ছিল, স্থানীয় বিখ্যাত গম্ভীরা গান রচয়িতা ও গায়ক মোহাম্মদ সূফী মাস্টার আশুতোষ অর্থাৎ মহাদেবের সামনে গম্ভীরা গাইবেন ঠিক করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একজন পাত্রকে শিব সাজিয়ে আসরে উপস্থিত করেন। কিন্তু অনিবার্য কারণ বশতঃ স্যার আশুতোষ নিজে না এসে তার প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে দেন। মহম্মদ সূফী এই প্রতিনিধিকে সামনে রেখেই তার জনপ্রিয় পদগুলি রচনা করেছিলেন,-

হে দ্যাখ,হো দ্যাখ কার ডাকতে
কেডা আইল ভাইরে-
ইনি কি স্যার আশুতোষ? হাইকোর্টের জজ
গায়ে মাথায় কেন ছাইরে?

এই চিত্র জনপ্রিয় হওয়ায় গম্ভীরা গানের সঙ্গে বিষয়টি একীভূত হয়ে গেছে । অনন্য সাধারণ এই আঙ্গিকটির জন্য গম্ভীরার দর্শক শ্রোতাগণ সূফী মাষ্টারের উদ্ভাবন শক্তির কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। শিব বন্দনার পর নানা বিষয় বস্তু নিয়ে গান বাঁধা হয়। প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা এই সময় সীমায় গানের বিষয় বস্তু থাকে, হাল আমলের সামাজিক রাজনৈতিক দেশীয় এমনকি আর্ন্তদেশীয় রাজনীতিও বাদ যায় না।

পরবর্তী পর্যায়ে চার-ইয়ারী। চার ইয়ার বা বন্ধুর বৈঠকী ঢঙে চলে সংলাপ ও গান, চার-ইয়ারী নিজেদের মধ্যে দুঃখের কারণ অনুসন্ধানের পর্ব। সমাজের চতুরদিকে সমস্যা গুলির স্বরূপ তুলে ধরাই এই অংশের মূল প্রতিপাদ্য। রূপকথা গল্পের রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র আর সওদাগরপুত্রের আলোচনার প্রাচীন আঙ্গিকটির কথা আমরা এই ক্ষেত্রে স্মরণ করতে পারি।

ডুয়েট বা টপ্পা-ঠুংরি অংশ নৃত্যগীতাদির মাধ্যমে দর্শকদের মনোরঞ্জনের কাজটি করে। সালতামামি বা রিপোর্ট সারা বছরের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ থাকে এই পর্বে। এই পর্যায়ে সাধারণতঃ দুটি চরিত্র থাকে। গম্ভীরা গান শেষ হয়। একটি সর্বজন গ্রাহ্য সমাধানের মধ্য দিয়ে। ধর্মীয় ধ্যান ধারণা থেকে জাত হয়ে এই লোক আঙ্গিকটি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে সর্ব ভারতীয় চরিত্র হয়ে লোকসংস্মৃতির বিশিষ্ট মর্যদায় অভিসিক্ত হয়ে রয়েছে।

আলকাপ ঃ

গম্ভীরা ছাড়া মালদহের অন্য একটি লোকনাট্য শাখা হল আলকাপ। এটি মালদহ ছাড়া মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম দিনাজপুর এবং বিহারের কিছু কিছু এলাকাতেও প্রচলিত। আলকাপের শ্রেষ্ঠ শিল্পী তথা স্রষ্টা হিসাবে বোকা কানার নাম করতে হয়। বোকা কানার জন্ম হয় স্বাধীনতা পূর্ব অবিভক্ত মালদা জেলার শিবগঞ্জ থানা রমোনা কয়সা গ্রামে।

'আলকাপ' শব্দের অর্থ কারো মতে রঙ্গধর্মী নক্‌শা, আবার কারো মতে রঙ্গ রসিকতা বা হাল্কা হাসিঠাট্টা প্রয়োজন। তবে পরবর্তীকালে বিভিন্ন গবেষকরা 'আলকাপ' শব্দের অর্থ করেছেন ব্যঙ্গ - বিদ্রুপাত্মক নাট্য প্রহসন. 'কাপ' শব্দটি সংস্কৃত 'কাপট্য' শব্দের অপভ্রংশ, 'কাপট্য' অর্থ নক্‌শা বা প্রহসন, আলকাপ গানের ওস্তাদ গাযক ঝাঁকসুর মতে 'কাপ' হল ব্যঙ্গরসাত্মক নাটিক আর 'আল' হল হুল, মৌমাছির হুল। আর সংশ্লিষ্ট এলাকায় 'আল' শব্দটি বিদ্ধ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। গরু - মোষকে তাড়ানোর জন্য পাইকার অথবা গোয়ালাদের হাতে যে লাঠি থাকে

তার ডগায় ছুঁচের মতো একটি ধারাল বস্তু থাকে তাকে বলা 'আল'। 'আল' বোঝাতে স্থানীয় মানুষেরা বোঝেন কাঁটা বিদ্ধ উপকরণ যার খোঁচা বা আঘাতে প্রাণী সজাগ হয়ে ওঠে, সাহিত্যের পরিভাষায় যা ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ। সুতরাং 'আলকাপ' হল ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক নাট্য প্রসহন।

আলকাপ গানেব অনুষ্ঠেয় সময় কার্ত্তিক মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট উৎসব বা দিনের প্রয়োজন হয় না। এই গানের কোন লিখিত রূপও থাকে না। ঘটনা ও চরিত্র ওস্তাদ বা মাস্টার মুখে মুখে বলেন তার থেকে শিল্পীরা নিজেরাই সংলাপ তৈরী করে নেন।

বোকা কানার সময়ে আলকাপ গানের আঙ্গিক রূপটি ছিল এই রকম - আসরবন্দনা, দ্বৈতগীতি বা ডুয়েট এবং কাপ। আর ঝাকসু যখন থেকে আলকাপ গান গাইতে শুরু করেন তখন তিনি এই লোক নাট্য শাখাটিকে যাত্রাপালার আদলে গড়ে নেন। তখন তার নামের পরিবর্তন হয়ে যায় বলা হয় 'আলকাপ পঞ্চরস'। বর্তমানে আলকাপের আঙ্গিক হল পাঁচটি - (ক) আসর বন্দনা, (খ) ছোকরাদের খেমটা নাচ ও বৈঠাকি গান, (গ) ছড়া গান, (ঘ) কাপ এবং (ঙ) পালাভিনয়।

আলকাপ গানের আসরের বৈশিষ্ট্যটি এইরকম। একটি বৃত্ত রচনা করে মুখোমুখি বসেন খলিফা; বৃত্তরেখায় দলের অভিনেতাগণ, বৃত্তমধ্যে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাজিয়েরা। এইসব কিছুর সামনে অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। চারদিকে যাত্রার আসরের মত বসে দর্শকরা, বাদ্যযন্ত্র হিসাবে থাকে হারমোনিয়াম, তবলা ডুগি। দলের মুখ্য গায়ক খলিফা এবং মুখ্য অভিনেতা লাব্বার। সহ অভিনেতা হিসাবে থাকে কয়েকজন ছোকরা, তারা মেয়ে সেজে নৃত্যগীত করে। যদিও মেয়েরাও এখন এই নাচে অংশগ্রহন করে থাকে। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রীদের মধ্যে হারমোনিয়াম ও তবলচি ছাড়া সকলেই প্রয়োজনে অভিনয়ে অংশগ্রহন করে। খলিফা অবশ্যই আলকাপ গানের প্রাণ তবুও প্রধান অভিনেতা লাব্বার এর অভিনয় - এর গুণে দলের নামডাক বৃদ্ধি পায়। লাব্বার শব্দটি সম্ভবত লোফার শব্দ থেকে এসে থাকবে।

খোলা মাঠে বা ফাঁকা জায়গায় আলকাপের আসর বসে। খলিফা বন্দনা গান শুরু করেন, বন্দনার পর বৈঠক গান। তারপর ভোলার বন্দনা শেষ করে মুখ্য পালাগান আলকাপ। লাব্বার উঠে ছোকড়াদের সঙ্গে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক পাতিয়ে নানা রসালাপ করে। বাক্য, বাচনভঙ্গী, কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গী, চোখমুখের বিচিত্র প্রয়োগে শ্রোতাদের আনন্দ দেয় লাম্বার। আলকাপের এই অংশটিকে বলে ''চাঁচোর''। পারিবারিক কাহিনীর আদলে নিজেদের তৈরী করা সংলাপ ও গীতের মধ্যে নানা সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার জট পাকিয়ে যায়। গম্ভীরার ঢঙেই তখন মোড়লকে ডাকা হয মীমাংসার জন্য। খলিফা সমস্যার সমাধান করেন, লাব্বারের অংশ শেষ হয়। এরপর খলিফার কেরামতি। ছড়ার পর ছড়া তৈরী করে দেবদেবীর স্তুতি, সামাজিক কেচ্ছা, রাজনৈতিক ব্যাপার স্যাপার সব কিছু নিয়েই। একাধিক দল থাকলে কবিগানের মত চাপান উতোরও চলে। শেষে আলকাপের মূল আকর্ষণ পালাগান। এখানেও বিষয় নির্ভর করে শ্রোতার চাহিদার উপর, কারণ পরিচিত কোন ঘটনা পালায় থাকলে আসর জমে বেশি। এই পালাগানের বিশেষত্ব এই যে কিছু গান তৈরী করা থাকলেও লিখিত কোন সংলাপ থাকে না। আলকাপ দলের নাম ডাক নির্ভর করে খলিফাদের উপর। মালদহ জেলার কয়েকজন বিখ্যাত খলিফা হলেন রঘু খলিফা, কালিমুদ্দিন, হাফি খলিফা, সফার্দি খলিফা, দুকলু খলিফা, মহীলাল

খলিফা, সোহরাব খলিফা, সুজার্দি খলিফা, মটর বাবু (যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী), রাইচাঁদ মন্ডল, নজর মহাম্মদ, সুবেদার খলিফা, ক্ষুরমোহন পান্ডে ইত্যাদি।

ডোমনী গান ঃ

মালদহ জেলার দিয়ারা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট লোক আঙ্গিক 'ডোমনী গান'। দিয়ারা অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট কথ্য রীতি 'খোট্রা' ভাষাতে এই গান রচিত ও পরিবেশিত হয়। ভাষাগত দূর্বোধ্যতার কারণে দিয়ারা অঞ্চলের বাইরে 'ডোমনী গানের' বিশেষ প্রসার ঘটেনি।

গম্ভীরা ও আলকাপের মতো ডোমনী গানও একটি বিশেষ ধরনের লোক নাটক। নৃত্য-গীতি বাদ্য সংলাপ পরিপূর্ণ এই লোক নাট্য শাখাটির প্রধান আবেদন এর অসাম্প্রদায়িক আবেদন।

কৃষি কেন্দ্রিক সমাজের উর্বরতা সূচক যাদুবিশ্বাসের সঙ্গে ডোমনী গানের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। খরিফ ফসল ঘরে তোলার পর কৃষক ডোমনী আনন্দে মেতে ওঠে, এটাই দিয়ারা অঞ্চলের নববর্ষের উৎসব 'শিরুয়া - পরব'। এই শিরুযা পরবের মেলায় 'ডোমনী গান' অপরিহার্য অনুষ্ঠান। বছরের প্রথম দিন 'ডোমনী গানের দল' অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গায় এবং চাঁদা তোলে। এই অনুষ্ঠান কখনও গৃহস্থদের বাড়ির বাইরে খোলা আকাশের নীচে হয় অথবা রাতের বেলা মাঠ, মেলা ইত্যাদি স্থানেও হয়।

শিরুয়া পরবের উৎপত্তি সম্ভবত শবরোৎসব থেকে হয়েছে। ডোমনী গানে আদি সর্বাত্মক বিষয়ের যে খোলামেলা প্রকাশভঙ্গিমা দেখা যায় তার সঙ্গে কালিকা পুরানে বর্ণিত শবরোৎসবের মিল দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গাপূজোর দশমীতিথিতে এই অনুষ্ঠানে শববরা নগ্নদেহে কাদা মেখে উদ্দাম নৃত্য করত; সেই সঙ্গে ঢাক ও যৌন লীলার নানারকম গান গাওয়া হত। শরৎ কালের সেই শবরোৎসবই আজকের বসন্ত ঋতুতে অনুষ্ঠিত 'শিরুয়া পরব'। কারণ আগে বর্ষারম্ভ হতো শরৎকালেই। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদেই এই শবর তথা 'ডোম্বী'দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ডোমেরা তাঁত-বুনত, চাঙ্গারি, চুপড়ি বানাত, নদীর ঘাটে পাটনীর কাজও করত। এই ডোম নারীদের চরিত্রের অনুসরণে ডোমনী চরিত্র বা ডোমনী গানের উৎপত্তি।

আবার ডোমনী গানে প্রচলিত এলাকার লোকশিল্পীরা একথাও বিশ্বাস করেন যে ডোমনীর ছদ্মবেশে বেহুলা তার শ্বশুর, শাশুড়ির মনোভাব জানতে এসেছিলেন। এখান থেকেই ডোমনী গানের উৎপত্তি। দিয়ারা অঞ্চলের কোথাও কোথাও ভদ্রমাসে মাগধীতে লেখা 'বেহুলা - কথা' নামের এক মনসা পুঁথির পাঠ চলে। বর্তমানে ডোমনী গানের বিষয়বস্তুতে সামাজিক, গ্রাম্য কুৎসা বা বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়েও মাঝে মাঝে পালা গান রচিত হয।

খোলা আকাশের নীচে একটি সামিয়ানা টাঙিয়ে বৃত্তাকারে বসে বাদক ও অভিনেতারা. এদের ঘিবে শ্রোতার দল, বাদ্যযন্ত্র হিসাবে আদিতে ছিল ঢোলক ও জুড়ি, এখন তাঁর সঙ্গে হারমোনিয়াম ও বাঁশিও ব্যবহৃত হয়।

কয়েকটি পর্যাযে ভাগ করে 'ডোমনী গান' গাওয়া হয়। যেমন — (ক) আসর বন্দনা, (খ) লাচারী বা নাকারী ডুয়েট, (গ) পালা গান।

আসর বন্দনা — পালাগানের শুরুতে আসর বন্দনা। মূল গায়েন ও ছোকরারা গান করেন ও দোহাররা ধুয়া ধরেন, বন্দনা গানের বিষয়বস্তুতে গম্ভীরা ও আলকাপের মতোই থাকে দেবী বন্দনা। কালী, দুর্গা, শিব, উপরে সূর্য, নীচে মা তা বসুন্ধরার সঙ্গে দর্শক মন্ডলীর চরণ বন্দনাও করা হয়।

লাচারি বা নাচারি — বন্দনার পর ছোকরাদের নৃত্য গীতসহযোগে লাচারি বা নাচারি পরিবেশিত হয়। এই অংশে ডোমনীকে সম্বোধন করে বিভিন্ন ধরনের গান বাঁধা হয়। গম্ভীরা গানে শিবের মতই এখানে ডোমনীও প্রতীকী হয়ে ওঠে। মাঝ মাঝে ডোমনীকে লাব্বার বা বিদূষকের ভূমিকাতেও দেখা যায়। উপস্থাপিত বিষয়গুলির মধ্যে থাকে স্বামী-স্ত্রী, বৌদি - দেবর, মা ও সন্তান, সুদখোর মহাজন, বিপন্ন কৃষক রমনীর কথা। নৃত্য-গীত ও সংলাপের মাধ্যমেই এই গানগুলো রচিত হয়।

পালা গান — লাচাড়ি বা ডুয়েটের পর পালার অভিনয় পালার কাহিনীগুলোও সামাজিক অন্যায় অবিচার, শোষণ, বঞ্চনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়। এগুলোর দ্বারা সমাজ প্রচলিত অন্যায গুলির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আঘাত হানা হয়। কয়েকটি বিখ্যাত ডোমনী পালা হল ঃ শিরুযা মেলার গান, শ্বশুরের দান নিযে পালা, ভাসুর - ভাই বৌ ইত্যাদি।

মালদহের দিয়াবা অঞ্চলের শিরুয়া মেলার ডোমনী গান অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি লোক নাটক শাখা। এই গানের জনপ্রিযতার অন্যতম কারণই হল এর অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। একদিকে কালীমাতার বন্দনা যেমন করা হয তেমনি আবার পীর পয়গম্বরদের বন্দনাও কবা হয়, গ্রাম্য জীবনের সরলতা ও সততা বন্দনাব কথায় ও সুরে ফুটে ওঠে। ডোমনী গান অশিক্ষিত গ্রামীন সমাজে লোকশিক্ষার ভূমিকাও নিয়ে থাকে।

বোলবাহি গান ঃ

মালদহের বরিন্দ অঞ্চলে প্রচলিত আছে বোলবাহি গান। এটি একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য। এই লোকনাট্যটি অঞ্চল ভেদে বোলাই, বোলবাই, বোলবাহি, বোলভাই, বোলাহি ইত্যাদি নানা নামে প্রচলিত আছে। গাজোল থানার কয়েকটি গ্রামে আবার এই পালাগান তাম্‌সা বা তামাশা নামে পরিচিত। কোথাও কোথাও আবার একে কুচ্ছা, কির্চা, কির্ছা বা কেচ্ছা জাতীয় গান বলা হয়।

'বোলবাহি বা বোলভাই' শব্দেব অর্থ খোট্টা ভাষায় আহ্বান বা স্বাগত। শিবেব আহ্বান মূলক আচার অনুষ্ঠানধর্মী একটি পর্যায় হল বোলবাহি। বোলবাহি শব্দের অন্য অর্থ যা অভিধানে রয়েছে তা হল - 'গম্ভীরা পর্বের তৃতীয় দিবসে গেয গীত'। 'আদ্যের গম্ভীরা প্রণেতা হবিদাস পালিত মহাশয় গম্ভীবাব তৃতীয দিবসের 'বড়ো তামাসার বিবরণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন - "এই দিবসে দুই তিন ব্যক্তিব সম্মিলনে যে গীতাদি হয তাহাকে বোলাই বা বোলবাহি বলে, ইহার সুরও স্বতন্ত্র"। বোলবাহি গান বরিন্দ অঞ্চলের কোচ, পলিয়া সম্প্রদায়েব মধ্যে প্রচলিত ছিল। বোলবাহি গানের ভাষা তাই ববিন্দ অঞ্চলেব লোক ভাষা কাঁঠালিয়া লোকভাষাব অন্তর্ভুক্ত।

বোলবাহি গানের মূল পরিবেশিত বিষয় হল শিবের বন্দনা জ্ঞাপক গান। পরবর্তিতে অন্যান্য লোক নাটক পালার মত বিগত বছরের ঘটনাবলীর বিবরণই বোলবাহি গানের বিশেষত্ব হয়ে দাড়াল। নীতি বিগর্হিত, নিন্দামূলক, গোপনে সংঘটিত অনৈতিক বা অসামাজিক কার্যকলাপের

প্রকৃত তথ্য এই বোলবাহি গানের মাধ্যমেই জানা যেত। বোলবাহি গানের প্রধান তথা জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে আছেন গাজোল থানার মরতোল গ্রামের গেদেল সরকার, বসুধা গ্রামের দুলাল মন্ডল, চাঁচল-খরবা থানার বর্তলিয়া নিবাসী ভীমচন্দ্র সাদ, বামনগোলা থানার বসবা গ্রামের গোপাল মন্ডল।

বোলবাহি গানের পালা পরিবেশিত হয় দশ বারো জন শিল্পী নিয়ে। এই নাট্য প্রয়োগে বাদ্যযন্ত্র থাকে ঢোলক, জুড়ি, খোল, বাঁশি ও হারমোনিয়ম। এই আসরটিও অর্ধবৃত্তাকার, আসর ঘিরে বসেন দর্শকেরা। শিববন্দনা ও আসর বন্দনা করে পালা অভিনয় করে মূল অভিনেতা এবং প্রয়োজনমত ছোকরার দল। সমাজ বিষয়ক পালা পরিবেশনের সাথে সাথে পরিবেশিত হয় নর-নারীর অনৈতিক ও অবৈধ সম্পর্কভিত্তিক আদিরসত্মাক বিষয়বস্তু।

ভাজোই গানের পালা বা মেয়েদের গম্ভীরা ঃ

মালদহ জেলার ইংরেজবাজার থানার মহদিপুর গ্রামে এবং পুরাতন মালদহের মুচিয়া, মহাদেবপুর গ্রাম এবং মহদিপুর গ্রামে ভাদ্র মাসে মেয়েদের ব্রতানুষ্ঠান 'ভাজোই উৎসব' হয়। এই উৎসব উপলক্ষে মেয়েরা কিছু কিছু বিষয় অবলম্বনে পালাগান অভিনয় করে। এই পালাকে 'মেয়েদের গম্ভীরা' বা 'ভাজোই গানের পালা' বলে।

গৃহস্থ বাড়ির অন্তঃপুরে অনুষ্ঠিত এই পালায় পুরুষদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ভাজোই গানের পালা মেয়েরাই রচনা করত। কখনও কখনও কোন বিষয় জানার জন্য পুরুষদের সাহায্য নেওয়া হত। সামাজিক বিষয়বস্তু ই হল পালার প্রতিপাদ্য বিষয়। এর সাথে রঙ্গ-ব্যঙ্গ, আনন্দ-বিনোদন যোগ করে পালাগুলিকে আকর্ষনীয় করে তোলা হত। পোশাক বলতে সাধারন পোষাক ব্যবহৃত হয়। গ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেয়েরাই এতে অংশগ্রহন করে। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় ঢোলক ও জুরি। বর্তমানে এই লোক শাখাটির তেমন জনপ্রিয়তা দেখা যায় না। এই গানের সরল সাধাসিধে উপস্থাপনা মেয়েদের সৃষ্টিশীলতার দিকটিকে তুলে ধরত। যেমন —

চুড়িওয়ালা — আমি কাঁচের চুড়ি ফেরি করি
বেড়াই লোকের বাড়ি বাড়ি
তোরা চুরি লিবিগে।

গৃহস্থ বধু — এসো এসো চুড়িআলা
এসো আমার বাড়ি
যদি থাকে মনের মতো
চুড়ি নিতে পারি।

ছাঁই - ছুঁই পালা ঃ

মালদহের কালিয়াচক, মানিকচক ও ইংরেজবাজার থানার কয়েকটি গ্রামে 'ছাই-ছুঁই' নামে এক ধরনের গান প্রচলিত ছিল। এখন আর এই লোকপালার তেমন প্রচলন নেই।

এই গানে কোন নাট্যধর্ম ছিল না। এই গানের সঙ্গে ডোমনী বা আলকাপ গানের কিছুটা অন্তর মিল আছে। কেউ কেউ 'ছাই-ছুঁই' গানকে আলকাপের আদিরূপ বলে থাকেন। তবে

তুলনামূলক আলোচনায় আলকাপ নয় বরঞ্চ ডোমনী গানের সঙ্গেই এর বেশি মিল পাওয়া যায়।

'ছাই-ছুঁই' ছিল আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একটি গ্রামে যতগুলি গম্ভীরার দল থাকত। তাদের প্রত্যেকেরই থাকত 'ছাই-ছুঁই' দল। তারা ছোকরার দল সঙ্গে নিয়ে নগর - কীর্তনের মত ঘুরে বেড়াত, এবং গান করত। এই দল প্রয়োজনমত ছোট ছোট কিছু পালা গানও পরিবেশন করত। তার মধ্যে ননদ ভাউজির পালা, লাবাভুমির পালা ইত্যাদি বিখ্যাত।

বিহার সীমান্ত ঘেষা মালদার বিন্দ, নাগর, চাঁইমন্ডল ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের মুখের কথ্য 'খোট্টা' ভাষায় প্রাত্যহিক জীবনের ছোট খাট সামাজিক সমস্যার খন্ডিত রূপটিকে নিয়ে এক গম্ভীরা মন্ডপ থেকে অন্য মন্ডপে ঘুরে ঘুরে গান ও অভিনয় করত। অন্ত্যজ শ্রেণীদের এই লোক আঙ্গিকটিই 'ছাই-ছুঁই নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। বর্তমানে যার প্রচলন নেই বললেই চলে।

লোক কাহিনী লোক কথা ঃ

মালদহ জেলার লোক নাট্য গম্ভীরা শুধু মালদহে নয়, বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষের অন্যান্য লোক নাট্যগুলির মধ্যে অন্যতম। শুধু লোক নাটকগুলিও নয় মালদহ জেলার অন্তর বৈশিষ্ট্য ধরা আছে লোক আঙ্গিকের অন্যান্য শাখার মধ্যেও। তেমনিই একটি লোক আঙ্গিক হল এই লোক কাহিনী বা লোক কথা।

মালদহের লোক কহিনী ও লোক কথার সংখ্যা নেহাত কম নয়। এগুলির যেমন সংখ্যা অজস্র তেমনি এগুলির জনপ্রিয়তাও অসম্ভব। এই লোক কথাগুলিব ভাষার বাহন ছন্দোবদ্ধ পদ্যের বদলে সবল গদ্যে হওয়ায় সমগ্র লোক সমাজে অর্থাৎ জেলাব সর্বত্র অতি সহজেই প্রসার লাভ করেছে।

অন্যান্য লোক কাহিনীগুলির মত মালদহের লোক কাহিনীগুলিরও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, কাহিনীগুলির মধ্যে একটা বিরাট অংশ অধিকার করে আছে পশুপাখি ও গাছপালার কথা। গোরু, ছাগল, ঘোড়া, বাঘ, বেড়াল, ময়ূর, ঘুঘু, হাঁস, মুর্গী, আমগাছ, তালগাছ, শালগাছ এমনকি তৃণ পর্যন্ত বাদ যায়নি। কথা-ও কাহিনীতে পশুপাখি, উদ্ভিদের আধিক্য প্রমাণ করে এক সময়ের জলে - জঙ্গলে ঘেরা এই অঞ্চলের মানুষের জীবন গভীরভাবে যুক্ত ছিল এদের সঙ্গে। ময়ূর, মুর্গীর পা বদল, বিড়ালের আত্মগোপন, ঘুঘুর বধু হত্যা, আমগাছের জন্ম কাহিনী, স্বর্ণ লতিকার স্বর্ণপ্রভা লাভ, মুথা ঘাসের দ্রুত বৃদ্ধি, দূর্বা ঘাসের অমরত্ব লাভ, তালগাছের বেঁকে যাওয়া এদের - ই কয়েকটি। জেলার ভাষা তত্ত্বের আলোচনায় জাতি তত্ত্বের অনুসন্ধানে, নৃতত্ত্বের তথ্য নির্ণয়ে এই লোক কাহিনীগুলির ভূমিকা অপরিহার্য।

লোক - কিংবদন্তী ঃ

একটি জেলার সার্বিক পরিচিতির জন্য লোক - কাহিনীর মত লোক প্রচলিত কিংবদন্তী গুলির ভূমিকাও অপরিহার্য। বাংলার পরিবর্তিত প্রাচীন ইতিহাসের অনেক গানই লুকিয়ে আছে এই কিংবদন্তীগুলির মধ্যে। ইতিহাসের দেশ মালদহের গৌড় আর পান্ডুয়া এই দুই জায়গায় ভগ্ন মন্ডপ, স্তম্ভ, প্রাচীন সরোবর, গড়, নদী প্রভৃতি সরোবর, পাটলাচন্ডী, বড়ো সাগর দিঘি,

কালাপাহাড়ের গড়, রূপ-সনাতনের অলৌকিক জীবন - কাহিনী, গৌড়ে সুবর্ণবর্ষন, হুসেন শা, গনেশ, যদু প্রভৃতিদের কেন্দ্র করে যে কিংবদন্তীগুলি প্রচলিত জেলার ইতিহাস রচনায় তার বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

লোক - নিরুক্তি ঃ

ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘন ঘন পট পরিবর্তনের কারণে মালদহ জেলার লোক বসতি কিছু অস্থির। এছাড়া গাঙ্গেয় অববাহিকায় এই অঞ্চলের অবস্থিত কারনেও বারে বারে মানুষ প্রবেশ করেছে এই জেলায়। ফলে লোক - নিরুক্তির অন্তর বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে এইসব সহায় সম্বলহীন মানুষের দুঃখ - বেদনার দীর্ঘশ্বাস। শেরশাবাদিয়া, নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশী, দেশি পোলিয়া, খেরিয়া, পাহাড়িয়া ইত্যাদি উপজাতিদের সমাজ, দর্শন, পেশা, সংস্কৃতি ও চরিত্রকে জানতে হলে এইসব লোক নিরুক্তিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এইরকম কয়েকটি প্রবাদ বা লোক - নিরুক্তি হল —

১) দেশী মুরগী বিলাতি বোল।
শুননে মে লাগতা ফাট্টা ঢোল।
২) চাষোকা দো ভাত, বুদ্ধি র‍্যাখো হাত।
৩) দিনকে মোসাল্লি, রাতকে ভুট্টা চোর।
৪) ভোজকে আগে, র‍্যানকে পিছে।
৫) পুতো মিঠা, ভ্যাজরো মিঠা কিড়িয়া কেক্যার খাঁউ।

(এম.ডি. ইউনুস আলীর সংগ্রহ থেকে)

ছড়া, ধাঁধা, শোলক ঃ

ছড়া, ধাঁধা, শোলক ইত্যাদি লোক সাহিত্যের আর একটি দিক। এগুলি আকৃতিতে, অবয়বে ছোট হলেও এরই মধ্যে পাওয়া যাবে মালদহের ভূ-প্রকৃতি, ঋতুর বৈশিষ্ট্য আর সমাজ আচরনের গতি প্রকৃতিকে। যেমন —

১) তাল কাটরে খেজুর কাট
কাটরে বন শিয়া
হাতির উপর ঘুঘু নাচে
রাজার কান ধরে কষিয়া।
২) আমকালে ডোম রাজা।
৩) শিং মোটা ল্যাজ ছোটা
সেই গরু কিনরে ব্যাটা
৪) যা না করে আল্লা
তা করে এক বিঘা পোল্লা।

(ডঃ ফনী পালের সংগ্রহ থেকে)

ব্রতকথা ঃ

সাধারণত নারীসমাজের আচরিত এই ব্রত কথাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এগুলি কোনও বিশেষ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে মুখে মুখে অথবা মাহাত্ম্য কীর্তনের মাধ্যমে দূর দূরান্তে প্রচলিত হয়। এবং ধীরে ধীরে একটা সময় অঞ্চল ভেদে তা চরিত্রও একটু ভিন্ন প্রকৃতির হয়। সাহিত্যগুণে এই লোক শাখাটি তেমন উৎকৃষ্ট না হলেও এই ব্রত কথাগুলির মধ্যে নারী জাতির স্বাভাবিক প্রবণতা, কৃষি, রোগমুক্তি এবং আরও অন্যান্য খুঁটি নাটি বিষয়গুলি ধরা পড়ে। ব্রত কথাগুলির সঙ্গে যে অনুষ্ঠানগুলি জড়িয়ে আছে সমাজ জীবনে তার মুল্যও কম নয়, সর্বোপবি সংসারের সকল সদস্যদের মঙ্গল কামনাই এই ব্রতগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য। মালদহ জেলায় প্রচলিত ব্রত কথাগুলি হল ডোরা - বান্দা, খাঁটো - ব্রত, সাঁনঝা ব্রত, রথাই পাথাই ব্রত ইত্যাদি।

লোক গীতি বা লোক সঙ্গীত ঃ

লোক গীতি বা লোক সঙ্গীত লোক সংস্কৃতির এই ধারাটিও মালদহ জেলায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এদের মধ্যে রয়েছে —

১. বুলেশ্বরী।

২. ঝামেলাশ্বরী।

৩. চাঁচলিয়া গীত।

৪. তোতাকাহিনী।

৫. গুনাই বিবির গান।

৬. নাটুয়া।

৭. ঝুমুরিয়া।

৮. পাউরিয়া।

৯. সোনারায়ের গান ইত্যাদি

এই জাতীয় লোক গীতিগুলির নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নেই। এগুলি প্রধানত রচনাকারের মানসিকতা, সমাজ, স্থানীয় ঘটনা অথবা কোন ঐতিহাসিক বীরত্বের ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত হয়ে থাকে। ফলে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বৃহৎ ব্যাপারটি যেমন থাকে তেমনি নীলচাষ, আমের মড়ক, রেশমের দুর্দিন এমনকি ব্যক্তিগত ব্যাপার ও এই সঙ্গীতে অন্তর্গত হয়ে যায়।

এরমধ্যে সেনারায়ের গান মালদহের লোক সঙ্গীত শাখার একটি উজ্জ্বল দিক। এই গান মঙ্গল কাব্যকারে লিখিত বাঘের দেবতার দীর্ঘ প্রশস্তি মূলক গান। সমাজে বাঘের অত্যাচার, বিভিন্নরকম বাঘের বর্ণনা ব্যাঘ্র দেবতার প্রশস্তি এবং তার অভয় লাভই এই কাব্যের মূল বক্তব্য। সমগ্র পৌষ মাস জুড়ে বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে মাগন সংগ্রহের মাধ্যমে অর্থ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে তা দিয়ে পৌষ সংক্রান্তিতে সোনারায়ের মূর্তি গড়ে পূজা হয়। একসময় সোনারায়ের পূজা যে জনপ্রিয় ছিল মালদহের কাগাচিড়া গ্রামের সোনারায়ের মন্দির ও মালদা মিউজিয়ামে রাখা সোনারায়ের প্রস্তর মূর্তিই তা প্রমাণ করে।

নব জাতকের জন্মকে কেন্দ্র করে পাঁউড়িয়া গান মালদহ লোক সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। বিশেষ করে জেলার দক্ষিণ - পশ্চিম অঞ্চলে এ গানের বহুল প্রচলন দেখা যায়। পাঁউড়িয়ারা জাতিতে মুসলমান হলেও এরা রামায়ণ ও অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অবলম্বনে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে গান পরিবেশন করে থাকেন। পাঁউরিয়া সম্প্রদায়ের অধিকাংশের নামই হিন্দু কেবল উপাধি পাঁউরিয়া। এরা হলুদ কাপড় পড়ে, মাথায় বিরাট পাগড়ি ও বিশেষ রীতি নিয়মে তৈরী মাটির ঢোলক নিয়ে বাদ্য সহকারে নাচ গান করে। এদের পরিবেশিত সঙ্গীত ই 'পাঁউড়িয়া গীত' নামে পরিচিত।

সঙ্গীত বানী ঃ

বিভিন্ন রকম কাজের উৎসাহ ব্যাঞ্জক গানগুলি এই লোক সাহিত্য শাখার অর্ন্তভুক্ত।

১. কর্মসঙ্গীত - ক) নিড়ানির গীত, খ) ঢেঁকি ও যাতার গীত, গ) বন্ধুয়ালি।

২. ধর্মীয় সঙ্গীত - ক) কাওয়ালি, খ) সাঁইয়ের গান, গ) সত্যপীরের গান, ঘ) মাদার পীরের গান, ঙ) আকিকার গান।

২. মহরম কেন্দ্রিক - ক) জারি, খ) জঙ, গ) মার্সিয়া, ঘ) ঝারনি।

৪. বাইচের গান -

৫. বিবাহের গীত,

৬. প্রেম সঙ্গীত,

৭. হাস্যরসাত্মক গীত

৮. বিদ্রুপাত্মক সঙ্গীত

৯. সহেলা

১০. গাজীর গীত

১১. জাগ

১২. মারফতী মুর্শিদ্যা বা মুর্শির্দী।

১৩. লৌলা

১৪ যাদু বিদ্যাগত

১৫. হাপু

১৬. পামাড়িয়া

১৭. ভাট গীত

১৮. গোর্ঘ - ইত্যাদি।

(তথ্য সহায়তা — ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ)

এই জেলার হিন্দু-মুসলমানের অসাম্প্রদায়িক রূপটি এইসব সঙ্গীত ধারায় বহমান। মুসলমান সমাজের নিজস্ব গান যেমন মার্সিয়া, ঝারনী, আকিকার গান প্রভৃতিতে হাদিস, কোরাণ ও কিতাবের কিছু কিছু অংশ লোক শিক্ষার আকারে সমাজে প্রচলিত রয়েছে তেমনি এই সব গানে হিন্দু প্রভাবও যথেষ্ট।

কাহিনী মূলক গীতিকা বা গীত মঙ্গল :

ক) আলাউধলা, খ) ঘুগঘুল, গ) বিজয়মল, ঘ) সতী - মহিনী, ঙ) আশুরায় ও বাঁশুরায়, চ) ভোলা ও ধন্মু বেপারী, ছ) কন্যা - সুরঙ্গা, জ) মাধব ও মালঞ্চী, ঝ) কাশীবাবার গীত, ঞ) কাজল সুন্দরী, ট) যোড়লা - লরিক।

লোক - কাহিনী :

ক) রাজপুত্র মোরগ, খ) বিধবা ও তার পুত্র, গ) জোলা ও মোড়ল, ঘ) বোকা রাখাল, ঙ) সাতরানী ও ছয় রানী, চ) রাজার ছেলে চোর, ছ) চাঁন ও সূরজ, দুই ভাই, জ) গাই - কম্বল ভাগাভাগি, ঝ) পাকা - গণৎকার ইত্যাদি।

মেলা :

সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার জন্য মানুষের যেমন ভাববিনিময়ের প্রয়োজন হয় তেমনি প্রয়োজন হয় মেলা-মেশার। উপলক্ষ্য হল কোন অনুষ্ঠান, মেলা অথবা উৎসব ইত্যাদি।

'মেলা' শব্দের আভিধানিক অর্থগুলি এইরকম— অনেক প্রশস্ত, সমাজ, সভা, তীর্থ ইত্যাদি জায়গায় বহু লোকের সমাগম, কোন পূজা বা মহোৎসব ইত্যাদি উপলক্ষ্যে এক স্থানে বহু লোকের সমাগম, তাকে কেন্দ্র করে বসা হাট বা বাজার। বহু লোক এক জায়গায় মিলিত হয় বলে এর নাম 'মেলা'। অমর কোষে বলা হচ্ছে 'মেলাকে সঙ্গ সঙ্গ মৌ' এককথায় মিলন। মানব সমাজে 'মেলক' স্থির করে নারী ও পুরুষের বিবাহ দেওয়া হয়। এই 'মেলক' অর্থে মিলন বা সমূহ। তাই 'মেলক' শব্দটির ঐক্য কারক বা মিলন কারক। (মেল = মিল + ঘঞ্) ঐক্য, মিলন, জনতা উৎসব স্থানে লোকারণ্য তাই মেলা বা মেলক (মেল + কণ) সঙ্গ, সহবাস (মিল + নক) অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিলিত হয়। বঙ্গীয় শব্দ কোষেরও মেলা অর্থে সমাজ, সভা, দলকে বোঝানো হয়েছে।

একত্র সমাবেশে মত ও পথের ভাব বিনিময়ই মেলার বৈশিষ্ট্য। উদ্দেশ্য এবং উপলক্ষ্য পৃথক হলেও উপাদান একটাই তা হল জনতা। এই জনতা অসংহত বিচ্ছিন্ন নয়। বরঞ্চ এক দীর্ঘ সময় ধরে বহুজনের ভাবনা চিন্তা সম্মিলিত হয় এই মেলায়। একত্রিত মন একটি আবেগের মধ্যে দিয়ে চালিত হয়। সমগ্র জনতার ইচ্ছাশক্তি যেন কেবল বহুজনের কল্যাণ কামনার ভিতর দিয়েই পরিচালিত হয়। এই খানেই মেলাগুলির সবচাইতে বড় সার্থকতা

মেলা ও উৎসবের সার্থকতার সাধারণতঃ তিনটি দিক আছে। এর মধ্যে প্রথমেই যার কথা বলা যায় তা হল মেলাকে কেন্দ্র করে উৎসবের আচরনীয় এবং অনুষ্ঠেয় রীতি নীতি।

দ্বিতীয়ত, মেলা এবং উৎসবের পঠনীয়, শ্রবনীয় ও গেয় সম্পদ থাকে বলা হয় লোক সাহিত্য। লোক সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকগুলি মেলা উপলক্ষ্যে গীত, পঠিত এবং প্রচারিত নয়। মেলাকে কেন্দ্র করেই এই লোক আঙ্গিক গুলি গীত, পঠিত এবং প্রচারিতও হয়। এই ভাবেই বেঁচে থাকে লোক সাহিত্যের শাখাগুলি।

তৃতীয়ত, উৎসব ও মেলার যা কিছু দর্শনীয় এবং প্রদর্শনীয় সামগ্রী তা হল মেলা ও উৎসবের শিল্প সংস্কৃতির দিক। আবার শুধু শিল্প সংস্কৃতিক বা দিকটিই নয় জড়িত আছে সাধাবণ

মানুষের অর্থনৈতিক দিকটিও। মানুষের নিত্য ব্যবহার্য ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক সামগ্রী ও পণ্যসম্ভার মেলা ও উৎসবে বিক্রয়ের জন্য আনা হয়। গ্রামের সাধারণ জনসাধারণ মেলায় এসে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র সংগ্রহ করে। গ্রামের কুটির শিল্প, হস্ত শিল্পগুলিও এইভাবে বেঁচে থাকে। এটি হল মেলার একটি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক।

মেলার শ্রেণীগত বিভাজনটি এইরকম :

ক) মানব মানবীর স্মৃতি বিজারিত মেলা ও উৎসব।

খ) বাংলার গাজন গম্ভীরা এবং ধর্ম ঠাকুরের পূজা ও উৎসব কেন্দ্রিক।

গ) বাংলার আঞ্চলিক লোক উৎসব ও ব্রতানুষ্ঠান।

ঘ) বাংলার ব্রত উৎসব ও ব্রতানুষ্ঠান কেন্দ্রিক।

লোক সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা হল এই মেলা। সাধারণ মানুষের প্রাণের আনন্দের বর্হিরাঙ্গিক রূপ এই মেলা। মেলাকে কেন্দ্র করেই একটি অঞ্চলের মানুষের দেখা সাক্ষাৎ হয়, ভাবের আদান প্রদান হয়, সুখ দুঃখের কথা হয়। তাদের হাতে তৈরী জিনিসের বেচা কেনা হয়, সব মিলিয়ে লোক সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মেলার ভূমিকা অনেকখানি গাঙ্গেয় অববাহিকায় মালদহ জেলার প্রতি প্রত্যন্তে ইতিহাসের সাক্ষর, বৈচিত্র্যের অনুলেপন, সেইজন্য এই জেলায় মেলার সংখ্যাও অগণ্য।

ইংরেজবাজার থানায় অনুষ্ঠিত মেলাগুলি হল —

রামকেলী মেলা — মালদহ জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সুবিখ্যাত মেলাটির নাম রামকেলির মেলা। ইংরেজবাার থানার অন্তর্গত রামকেলি গ্রাম হুসেন শাহের আমলে একটি হিন্দু ব্রাহ্মণ পল্লী হিসাবে চিহ্নিত ছিল। এই হুসেন শাহের আমলেই মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব গৌড় রাজ্যের মন্ত্রী পরিষদের অন্যতম সদস্য সাকর মল্লিক শ্রী সনাতন তাঁর ছোট ভাই দবীর খাস শ্রীরূপকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। শ্রী চৈতন্যদেবের এই রামকেলি আগমন ও সেখানে অবস্থান উপলক্ষে প্রায় দুইশত বৎসর ধরে রামকেলিতে বৈষ্ণব মহাসম্মেলন ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এই মেলার প্রবর্তন করেন নিত্যানন্দ বংশজ গোস্বামী অটল বিহারী দেবানন্দ প্রভু পাদ। দূর - দূরান্ত থেকে এই মেলায় আসেন বৈষ্ণব ভক্তরা। এই মেলা জৈষ্ঠ্য সংক্রান্তির এক দিন আগে থেকে শুরু হয়ে প্রায় সপ্তাহ খানেক পর্যন্ত চলে। ভক্তরা এখানে এসে শ্রী সনাতন গোস্বামী সেবিত মদনমোহন বিগ্রহের শ্রী জিব গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত মদন মোহন মন্দির, কেলিকদম্ব তমালতলা (যেখানে চৈতন্যদেব অবস্থান করেছিলেন), রাধাকুন্ড, শ্যামকুন্ড, ললিতা - বিশাখাকুন্ড, বৈষ্ণবাচার্যরূপসাগর, সনাতন সাগর ইত্যাদি পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন দর্শন করেন। এই মেলার বৈশিষ্ট্য হল এর প্রাচীন বৈশিষ্ট্য তথা বৈষ্ণবিয় বৈশিষ্ট্যগুলি আজও বর্তমান।

আখি সিরাজুদ্দীনের সমাধি স্থলের মেলা — ইংরেজবাজার থানার বড় সাগর দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে এবং নওদাবাজারের দক্ষিণে কমলাবাড়ীর (বর্তমানে যা ঝনঝনিয়া নামে পরিচিত) সাধক পীরানা-পীর শেখ অখী সিরাজুদ্দীন উসমান এর সমাধিভবন অবস্থিত। দিল্লীর বিখ্যাত সুফী সাধক পীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার খিলাফৎ ধারী শিষ্য নুর কুতুব উল আলমের এর পিতা

পীর শেখ আলাওল অখী সিরাজুদ্দিনের দীক্ষাগুরু ছিলেন। প্রতি বৎসর ইদ্-উদ-ফিতরের পূণ্য দিনে এই পীরের উরস (বার্ষিক তিরোধান দিবস) উপলক্ষ্যে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য পান্ডুয়ার বড় দরগা (বাইশ হাজারী) থেকে তাঁর ছোট গুরু ভাই সৈয়দ জালালুদ্দীন বুখারী মক্দুম জহানিয়া জহান গস্তের ঝান্ডা এবং পান্ডুয়ার ছোট দরগা থেকে তাঁর শিষ্য পুত্র হজরত নূর-কুতুব-আলমের পাঞ্জা এই সমাধিভবনে নিয়ে আসা হয়। ইদ্-উদ-ফিতর এবং ইদ্-উল্-আজহা বা বক্র-ঈদ এর পূণ্য দিনে এখানে বিরাট ধর্মীয় সমাবেশ বা মেলা হয়। এই অঞ্চলটি এক সময় 'মুহম্মদাবাদ' নামে পরিচিত ছিল। এই সমাধি ভবনটির রক্ষণাবেক্ষনে তৎকালীন প্রায় সব মুসলমান সুলতানরাই যত্নবান ছিলেন। ইলয়িাস শাহী বংশের গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ভবনটি নির্মাণ করান, পরবর্ত্তীকালে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ ও পুত্র নসরৎ শাহ এই সমাধিভবনের প্রবেশদ্বার গুলি নির্মাণ করান। এই মেলায় দূর দূরান্ত থেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা যেমন আসেন তেমনি অন্য সম্প্রদায়ের মানুষেরাও আসেন। সর্বধর্ম সমন্বয়কারী এক অসাম্প্রদায়িক চরিত্র এই মেলার বৈশিষ্ট্য।

ইংরেজবাজার থেকে দশ মাইল দক্ষিণে জঙ্গল টোটা অঞ্চলে বসে তুলসী বিহার মেলা। এটি অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখের শেষ দিনে। মূলত বৈষ্ণবদের যেমন এটি কিংবদন্তী অনুসারে কৃষ্ণ এখানে উপাস্য দেবতা মাত্র নন তিনি প্রেমিক। তাই পুরুষরা নারী বেশে নিজেদের গোপিনী ভেবে কৃষ্ণ ভজনা করে। বছরে একবার সকলে কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। 'ঠাকুরজ্ঞী' নামে একটি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী এই প্রথা ও মেলার প্রবর্তক।

এছাড়া, কোতয়ালী গ্রামের বৈদ্যপাড়ার সেন বংশের প্রাচীন ঐতিহ্য মন্ডিত জগদ্ধাত্রী পূজাকে কেন্দ্র করে নবমীর দিন মেলা বসে। মাঘ মাসের প্রথম রবিবারে শিবতলায় অনুষ্ঠিত হয় সূর্য্যব্রত। এই সূর্যপূজাকে কেন্দ্র করে ধুনুচি নৃত্য উৎসব ও মেলা বসে।

টিপাজানি গ্রামে প্রাচীন জোড়কালী মাতার বেদীতে কার্তিকী অমাবস্যায় বিরাট সমারোহে কালীপূজা হয় ও মেলা বসে। অমৃতি গ্রামে সুবৃহৎ শিব মন্দির প্রাঙ্গনে শ্রী শ্রী মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে শিব চতুর্দশীর ব্রত পালন ও সাতদিন ধরে বিরাট মেলা। শঙ্খজাত দ্রব্যাদি এই মেলায় প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়।

নঘরিয়ার ফুলবাড়িয়া গ্রামে কোজাগরী পূর্ণিমায় কালিন্দ্রী নদীর লক্ষ্মী ঘাট এ বাইচের মেলা প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন। নৌ শক্তিতে একসময় মালদহ জেলার মানুষের যে দক্ষতা সুবিদিত ছিল তারই স্মৃতি চিহ্ন বহন করে এই 'বাইচ মেলা'। এক সময় কালিন্দ্রী নদীতে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হত বাইচ প্রতিযোগিতাকে উপলক্ষ্য করে। আজ আর তেমন সাড়ম্বরে এই প্রতিযোগিতা হয় না কিন্তু প্রতি উৎসবে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মিল্কী গ্রামে মহরম এবং ইদ্-উল-ফিতর এর দিন সমাবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠান হয় ও বিরাট মেলা বসে। কালিয়াচক থানার একাধিক অঞ্চলেও বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। জালালপুরে ৮ দিন ধরে চলে রথযাত্রার মেলা। সাদীপুর - গোঁসাই হাটের দশনামী গিরি সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির ঘিরে মহাশিব রাত্রিকে উপলক্ষ্য করে মেলা বসে। খাসকোল গ্রামে কালিপূজার দিন গঙ্গার ধারে শ্মশানের পাগলী কালির পূজা উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে।

কালিয়াচক থানায় অনুষ্ঠিত মেলা গুলি হল —

চরি-অনন্তপুরে ৪ দিন ধরে চলে শারদীয়া দুর্গা পূজোর মেলা।

সুজাপুর গ্রামে ঈদ্-উল-ফিতরের দিন প্রার্থনা সমাবেশ হয় ও মেলা বসে।

যদুপুর গ্রামেও ঈদ-উল-ফিতরের প্রার্থনা সমাবেশ হয় ও মেলা বসে।

বালুগ্রামে কালী পূজা হয় ও মেলা বসে।

কালিয়াচক বালিয়াডাঙ্গায় প্রাচীন শিবমন্দির ও শান্তিপীঠে শাবদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা হয়।

মানিকচক থানায় অনুষ্ঠিত মেলা গুলি হল —

মানিকচক থানার নুরপুর গ্রামে বৈশাখী অমাবস্যায় কালী পূজা হয় ও মেলা বসে।

মানিকচকের বিখ্যাত মেলা হয় বড় গঙ্গার স্নান ঘাটে মাঘী পূর্ণিমার দিন। এই মেলার স্বতন্ত্র তীর্থ মহিমা রয়েছে।

রতুয়া থানায় অনুষ্ঠিত মেলা গুলি হল —

রতুয়া থানার একবর্ণা গ্রামে শারদীয়া দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে।

মহানন্দা টোলা বা কাটাহা - দিয়াড়া গ্রামে বাসন্তী পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে।

জ্ঞানী টোলা গ্রামে মাঘী পূর্নিমায় কুশী গঙ্গা স্নান ও মেলা বসে।

লস্করপুর গ্রামে দৈবযোগে প্রাপ্ত প্রাচীন শিলাময় বিগ্রহে কার্তিকী কালী পূজা উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। এই পূজা ও মেলা আঞ্চলিক তীর্থ মহিমায় ধন্য।

হরিশ্চন্দ্র পুর থানায় অনুষ্ঠিত মেলা গুলি হল —

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অর্জুনাই গ্রামে ফালগুন মাসের প্রথম রবিবার থেকে তিন দিন ধরে চলে মহারাজ পূজার উৎসব ও মেলা।

গোহিলা গ্রামে মাঘ মাসের প্রথম দিন গঙ্গা পূজো, গোহিল চন্ডীর উৎসব উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে।

শ্রী চন্দ্রপুর গ্রামে মাঘ মাসের শ্রী পঞ্চমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় সরস্বতী পূজা ও মেলা। আঞ্চলিক তীর্থ মহিমায় এই পূজোও বিখ্যাত যা দূর দুরান্তের ভক্তজনকে আকর্ষণ করে আনে।

চাঁচোল থানায় অনুষ্ঠিত মেলা গুলি হল —

চাঁচোল থানার ক্ষেমপুর গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনদিন ধরে চলে গম্ভীরা পূজা, উৎসব ও মেলা।

বলরামপুর গ্রামে মহানন্দা নদীর তীরে সুন্দর মনসা মন্দির প্রাঙ্গনে বিজয়া দশমী থেকে লক্ষ্মী পূজা পর্যন্ত চলে মনসা পূজা ও সেই উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা।

মহানন্দা পুর গ্রামের শারদীয় দুর্গোৎসব ও মেলা আঞ্চলিক তীর্থ মহিমায় বিখ্যাত।

গাজোল থানায় অনুষ্ঠিত মেলা গুলি হল —

মালদহের গাজোল থানার অন্তর্গত পাণ্ডুয়াতে অনুষ্ঠিত হয় বিরাট ঐতিহাসিক পাণ্ডুয়াব মেলা। পাণ্ডুয়ার বড় দরগাহতে লক্ষণ সেনের সময়ে আগত পূর্বাঞ্চলের প্রথম পীর শেখ জালালুদ্দীন মখদুম শাহ তাব্রেজীর বার্ষিক 'উরস' ও 'ফতেহা' উৎসব উপলক্ষ্যে পাণ্ডুয়ার মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ছোট দরগাহ্তে গনেশের পুত্র যদু বা জালালুদ্দীনের দীক্ষাগুরু হজরত শেখ আহমদ নুর - কুতবুল - আলম ও তাঁর পিতা শেখ আলাওল হক সাহেবের সমাধিতে সবেবরাত এর দিন উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই দুটি উৎসব ও মেলাই ঐতিহ্যমন্ডিত। ধর্মপ্রাণ ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষ অনেক দূর থেকে এই মেলায় যোগ দেওয়ার জন্য আসেন। কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুযেরাই নন সব ধর্মের মানুষই এই মেলায় এসে উভয় দরগাহ্তে মানত করেন ও আশীর্বাদ নেন।

গাজোল থানার অপর একটি বিখ্যাত মেলা হল ঐতিহাসিক কংস ব্রতের মেলা। রাজা দনুজমর্দনদেব যিনি রাজা গনেশ বা কংস রায় নামেই ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর প্রবর্তিত 'কংস ব্রত' বা কাঁ-স-ব উৎসবেব স্মৃতি বিজরিত মেলা। গাজোল থানার দেওতলার ১½ কি.মি. উত্তবদিকে ধাওয়াইল নামেব এই গ্রামটিতে মাঘী পূর্নিমার দিন এই উৎসবকে কেন্দ্র করে এই কয়েকটি দিন যেন গ্রামটি লোকসংস্কৃতির কেন্দ্র হযে ওঠে। মেলাটি প্রায় পনের দিন স্থায়ী হয।

মালদহ জেলায় এটিই বোধ হয় দীর্ঘস্থাযী মেলা। রাজা গনেশ প্রবর্তিত এই 'কংস ব্রত' মালদহ থানার যাত্রডাঙ্গা এবং দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডী থানার করঞ্জা গ্রামেও অনুষ্ঠিত হয। তবে ধাওয়াইল এর মেলাটিই বৃহৎ।

গাজোল থানাব আলাল গ্রামে প্রাচীন গঙ্গা মহানন্দা সংগমের স্মৃতিতে পৌষ সংক্রান্তিব দিন মহানন্দা নদীতে স্নান ও সেই উপলক্ষ্যে মেলা বসে।

বামনগোলা থানায় অনুষ্ঠিত মেলা গুলি হল —

বামনগোলা থানার বিখ্যাত মেলা হল বাঁশড়হা গ্রামের গ্রামাধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী / বাশুলী / বাশুড়ানী চামুন্ডা দেবীব পূজা। চৈত্র সংক্রান্তির দিন এই পূজা হয়, সেই সঙ্গে গম্ভীরা পূজা ও চড়ক উৎসবেব মেলা। চড়ক - কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকম আচার - অনুষ্ঠান এই মেলাব অন্যতম আকর্যন।

ফরিদপুব গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে শিব ও কালী পূজা ও গম্ভীরা উৎসব এবং পরদিন ১লা বৈশাখে গম্ভীরা মেলা সিমলা গ্রামে শারদীয় দুর্গাপূজো উপলক্ষ্যে তিনদিনের মেলা শিববাটা গ্রামে ব্রাহ্মণী নদীর তীরে পাল যুগে প্রতিষ্ঠিত ভীমেশ্বর শিবের মন্দিরে শ্রী শ্রী মহাশিবরাত্রির ব্রত অনুষ্ঠান ও মেলা। এটি ও একটি ঐতিহ্যমন্ডিত মেলা। আঞ্চলিক মহিমান্বিত এই মেলায দূব দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন।

চৈত্র মাসে বামনগোলায চলে পোয়াল মেলা। তিনদিন ধরে চলে। এটি মুসলমান সম্প্রদায়ের মেলা।

হবিবপুর থানায় অনুষ্ঠিত মেলা গুলি হল —

এই থানার হবিবপুর গ্রামে সাঁওতালদের নেতৃস্থানীয় জিতু হেমব্রম বা জিতু বাবা এবং দিনাজপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামী উকিল কাশীশ্বর চক্রবর্তীর প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত 'সত্যম্-শিবম্' সম্প্রদায়ের লোকেরা চৈত্র পূর্নিমা থেকে সাতদিন ব্যাপী রাত্রিবেলায় শিব পূজার আয়োজন করে, এই পূজোকে কেন্দ্র করে বিরাট চৈত্র-পূর্ণিমার মেলা বসে।

সজনা দিঘিতে ফাল্গুন সংক্রান্তির দিনে সাঁওতাল সমাজের প্রথাসিদ্ধ বাৎসরিক 'ছাজ-পরব'। এই পরবকে কেন্দ্র করে রাত্রিবেলা বসে বিরাট মেলা। সাঁওতাল সমাজের কাছে এই মেলার গুরুত্ব অপরিসীম।

বুলবুলচন্ডী গ্রামের গ্রামাধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রাচীন শিলাময় মাতৃকা বিগ্রহের চন্ডীদেবীর মন্দির এবং শারদীয় দুর্গোৎসবের নবমী দশমী এই দুটি দিনে বসে বিরাট মেলা। দশমীর দিনের মেলায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিরাট সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন।

বার্ণপুর গ্রামে ঝাপড়ী কালী মাতার জাগ্রত মন্দিরকে ঘিরে রামনবমীর দিন ও বৈশাখ মাসের বার্ষিক পূজা উপলক্ষ্য করে বিরাট মেলা বসে।

আইহো গ্রামের প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী দুর্গা দেবীর থান, প্রাচীন শিব-মন্দির, ওঁ-কার বিগ্রহের মন্দির ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে মহানন্দা ও টাঙ্গন নদীর সংযমস্থলে অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুষ্ঠিত হয় তিনদিনের শারদীয় দুর্গোৎসবের মেলা।

মালদহ থানায় অনুষ্ঠিত মেলা গুলি হল —

মালদহ থানার মোকাতিপুর গ্রামে প্রাচীন গঙ্গা খাতের অংশ 'ধর্মপুন্ড' এ অঘ্রানের মূলো ষষ্ঠাতে ষষ্ঠী পূজোর মেলা। সেই সঙ্গে সারারাত ধরে চলে জুয়াড়ি মেলা।

তিলভোগ-সর্দারপুর গ্রামে রাম বাবা আশ্রমে সাঁওতালী সমাজের বাসন্তী পূজা ও বিজয়া দশমীর মেলা।

সাহাপুর গ্রামে শ্রী শ্রী মৎ স্বামী প্রণবানন্দ জী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সংঘের বার্ষিক বাসন্তী পূজা ও মেলা।

(তথ্য সহায়তা — বৃদ্ধদেব কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর গঙ্গাহৃদি গৌড়ভূমি : তীর্থভূমি মালদহ)

বস্তু-আশ্রয়ী লোকসংস্কৃতি ঃ

বস্তু-আশ্রয়ী লোক সংস্কৃতির ধারা অনুসরণ করলেও দেখা যাবে মালদহ জেলায় তাঁর অবদান কম নয়। কুটীর শিল্পের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এইসব জিনিসের মধ্যে থাকে মানুষের ঐতিহ্য প্রীতি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কামনা। মালদহ জেলার বস্তু আশ্রয়ী লোক সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য অবদান দেখা যায় গম্ভীরা উৎসবের মুখোশ তৈরীর ক্ষেত্রে।

নৌকা নির্মাণ — খুব বেশিদিনের কথা নয় মালদহ জেলার মহানন্দা, কালিন্দ্রী নদীর একাধিক ঘাটে (যেমন, ইংরেজবাজারের গুজর ঘাট, পুরাতন মালদহের নবাবগঞ্জের এবং কালিন্দ্রী নদীর তীরের লক্ষ্মীঘাটে) অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল বাইচ খেলা অর্থাৎ নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা।

কারণ এই জেলা একাধিক নদী অধ্যুষিত হওয়ার কারণে বড় বড় নৌকা তৈরী হতো, বজরার নৌকা, যাতে বিশ বাইশটা দাড় থাকত, এই দাঁড় বেঁধে মাঝিরা নৌকা চালাতে চালাতে বজরার গান গাইত। 'ঢাকাই-নৌকা' - সাধারণত বজরার নৌকার চাইতেও বড়ো। যে নৌকায় করে জলপথে ব্যবসায়ীরা ঢাকা, ময়মনসিং, পাবনা প্রভৃতি জায়গায় আম কিনে নিয়ে যেত। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের নৌকা তো ছিলই। মালদহ জেলায় শুধু কাঠের নৌকাই নয় কাঠের আসবাব ও বিখ্যাত ছিল। জেলার বিভিন্ন মেলায় তাই প্রচুর পরিমাণে কাঠের আসবাব বিক্রি হতো।

মালদহের নবাবগঞ্জের হাট বিখ্যাত ছিল গুড় বিক্রির জন্য। সেইজন্য নবাবগঞ্জের হাটকে 'গুড়েব হাট' ও বলা হোত। ৪০ থেকে ৫০ কেজি ওজনের চাকী আখের গুড় তৈরী হতো নরহাট্টা ও তার আশ পাশের অঞ্চলে। এছাড়াও বিক্রি হতো রাব গুড়। ছোয়া গুড় (তামাক খাওয়ার জন্য), দানা গুড় এবং খাঁড় সারি চিনি।

নবাবগঞ্জের হাটে গুড় ছাড়াও লাঙ্গল বিক্রির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই নবাবগঞ্জেই তৈরী হতো লাঙ্গলের ফাল, কুডুল এবং ধুরি লাঙ্গলের ফাল। এই ফালগুলি নানারকমের হতো। যেমন, (১) বাংলা ফাল, (২) গুচিয়া ফাল, (৩) নাগরাট গুচিয়া, (৪) সাঁওতালী, (৫) ডাকাই বাংলা ফাল খরালী চাষের জন্য ব্যবহৃত হতো।

সাধারণতঃ শুকনো জমিতেই বাংলা ফালের ব্যবহার হতো বেশি। বালিয়ারি মাটিতে ব্যবহৃত হতো গুচিয়া ফাল, নাগর সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে গুচিযা ফাল ব্যবহৃত করার প্রবণতা ছিল বেশি। এ ছাড়াও নাগর সম্প্রদায়ের লোকেরা খুব ভারী ওজনের একরকম ফাল ব্যবহার করত, এর নাম নাগর গুচিয়া। দিনাজপুরের আদিবাসীরা পছন্দ করত সাঁওতাল ফাল। ডাকাই ফালও দিনাজপুরের চাষীরা ব্যবহার করত।

মালদহ জেলার শাদুল্লাপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ ছিল একসময় শিল্প গঞ্জ হিসাবে। এখানকার তৈরী কাঁসার ঘটি, কলসি, ও হাঁড়ি ছিল বিখ্যাত, তাছাড়া রূপোর জিনিষ তৈরীতেও এই গ্রামেব খ্যাতি ছিল।

কোম্পানীর আমল পর্যন্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের স্ত্রীলোকেরা সূত্র নির্মান কার্যে নিযুক্ত থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। সুজনী ও কাঁথা প্রস্তুত করে এই অর্থ তারা লাভ করত। মালদহী বস্ত্র বয়নের জনাই ছিল প্রায় আট হাজার তাঁতি, যার সাড়ে সাতশত তাঁতি ছিল পুরাতন মালদহের মোকাতিপুর গ্রামে। মালদহের বাহিরে এই কাপড়ের ভীষন চাহিদা ছিল।

মালদহ জেলায় তৈরী হওয়া মিষ্টিও ছিল বিখ্যাত। ক্ষীর মাখানো চম্‌চম্ (কানসাট), কড়া পাকের চম্‌চম্, রাজভোগ, পান্তুয়া, কমলাভোগ, মোহনভোগ, কলাই ডালের বড় বুঁদিয়া আর মোটা পাকের বিরাট অমৃতি, ঘিওর, কচুরি, নিমকী, টাঁড়ার খাজা, খিরসা আর সবার সেরা হাতি পাইয়া লুচি। - এইরকম একাধিক কুটির শিল্পে মালদহের লোককলা সমৃদ্ধ।

সাহিত্য সংস্কৃতির ধারা ঃ

কোন দেশ তথা জাতির সার্বিক পরিচয় পেতে হলে সেই দেশের লিখিত সাহিত্যের উপর নির্ভর করতেই হবে। কোন একটি জাতির উত্থানের পেছনে সক্রিয় থাকে যে মানসিক

উৎকর্ষতা, সাহিত্যে তারই প্রতিফলন ঘটে। আমাদের গৌড়ভূমিও যে তাঁর ব্যতিক্রম নয় অতীত থেকে বর্তমানের লিখিত সাহিত্য আলোচনা করলেই তা বোঝা যাবে।

গুপ্তযুগ থেকে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বৃহত্তর বাংলায় দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ সাহিত্য চর্চা, অনুশীলন ও রচনা অব্যাহত ছিল। তার পরবর্তী আরও চারশত বছরের ইসলাম শাসনে আরবী ফার্সী, তুর্কী, উর্দু শব্দের ব্যবহারে প্রচলিত সাহিত্য এবং তৎপরবর্তী ইংরেজ, ফরাসী, পোর্তুগীজ ভাষা প্রভাবিত বাংলা সাহিত্য সবকিছুই বাঙালীর সাহিত্যে গ্রহন বর্জন ক্ষমতায় বিবর্তিত সংস্কৃতির ছাপ রেখে গেছে।

একথা ঠিক যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রাণরহস্যের যবনিকা উম্মোচন করতে হলে আদি পর্বের সংস্কৃত সাহিত্যঅনুশীলনেরও পরিচয় নিতে হবে। কারণ বাঙ্গালীর চিত্তলোকে উত্তরভারতের প্রভাবটুকু সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমেই পড়েছিল একথা বলা যায়। আবার বাংলায় আর্যীকরনের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সঙ্গে সংস্কৃতি করণেরও একটা চেষ্টা চলেছিল। তাই স্মৃতিসংহি তা, বেদপুরাণ, তন্ত্রমন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রাদি যেমন সংস্কৃতেঅনুশীলিত হত, তেমনি আবার বাংলাদেশের নিজস্ব সাহিত্য, কাব্য ও রচিত হয়ে চলেছিল নিজের মত করে।

প্রাচীন যুগ ঃ

একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের স্মার্ত পন্ডিতগণ যেমন তাদের নানাবিধ সৃষ্টিশীলতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন অন্যদিকে তেমনি প্রাচ্যখন্ডের প্রাচীন জাতিরা বিভিন্ন লৌকিক আচার অনুষ্ঠান ও লৌকিক সাহিত্যের মাধ্যমে ভাষাগত নানা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিজস্ব ও স্বাতন্ত্র বজায় রেখে চলছিল। নাথ সাহিত্য, ধর্মঠাকুরের বার ব্রত পূজা উপাসনা, শিবের গাজন, গম্ভীরা গান, বৌদ্ধ-সহজিয়া ও বৈষ্ণব সহজিয়ারা নানা গুরুমুখী আচার আচরণের মধ্যেই তার ক্ষীণতম ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়।

অনুমান করা যায় যে, মৌর্যযুগেই বাংলাদেশে আর্যভাষা ও সাহিত্যের প্রসার আরম্ভ হয়। উত্তরবঙ্গের মহাপ্রস্থানের কাছে ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত যে লিপি পাওয়া গিয়েছে সেটিকেই বাংলাদেশের প্রাচীনতম সাহিত্যচর্চার লিখিত রূপ বলে গ্রহন করা যায়। এই লিপিটিতে 'সংবংগীয়' এবং পুড্রনগরের উল্লেখ আছে। সুতরাং একথা অনুমান করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে মৌর্যযুগের আর্যভাষা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে পাণিনি তার 'অষ্ট্যাধ্যায়ী'তে প্রাচ্য - খন্ডের ভাষা রীতি ও তার উচ্চারণ পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। তাই ধারে নেওয়া যায় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই প্রাচ্য অঞ্চলে অর্থাৎ অঙ্গ - বঙ্গ - গৌড়ে একটা বিশিষ্ট ভাষারীতি গড়ে উঠেছিল। এই বিশিষ্ট ভাষারীতিই 'গৌড়ীয় রীতি' নামে পরিচিত হয়েছিল। বলা যায় এই গৌড়ী রীতির মধ্যে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও একটা সময়ে ভারতের প্রায় সর্বত্রই কবিগণ এই রীতি অনুশীলন করতেন।

সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ প্রাচীন যে চারটি সাহিত্য রীতির উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল - গৌড়ী, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী এবং লাটী। তাঁর মতে গৌড়ী রীতি ওজঃপ্রকাশক, গাঢ়বদ্ধ আড়ম্বর পূর্ণ এবং সমাসবহুল। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতে গৌড়ী রীতি বৈদর্ভী

অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অনুজ হলেও খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর মধ্যে এই দুই রীতিই প্রাধান্য অর্জন করে। কিন্তু জেকারি সাহেবের মতে গৌড়ী রীতিই প্রাচীনতর। 'গৌড়ীয় রীতি' প্রভাবিত যে কয়টি বই সেইযুগে লেখা হয়েছিল তার মধ্যে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত', গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী' এবং 'সদুক্তিকর্নামৃত'- এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়া বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপি নারায়ন পালের তাম্রশাসন এই দুটিও গৌড়ীয় রীতির অক্ষর ডম্বরে লিখিত।

এই প্রসঙ্গে এই যুগের অন্যতম কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখযোগ্য। পুন্ড্রবর্ধন তথা উত্তরবঙ্গের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী পালবংশের সম্রাট রাম পাল ও তাঁর পুত্র মদনপাল দেবের রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ে 'রামচরিত' শ্লেষকাব্য রচনা করেন। এটি একটি দ্ব্যর্থবোধক কাব্য, অর্থাৎ এই কাব্যের প্রতি শ্লোকেই দুইটি করে অর্থ নিহিত আছে; একদিকে অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র আর অন্যদিকে পাল সাম্রাজ্যের শেষ কুলতিলক রামপালের কাহিনী। এই গ্রন্থের ৩৫শ শ্লোক পর্যন্ত যে সংস্কৃত টীকা পাওয়া যায় তার সাহায্যে এই কাব্য বর্ণিত। এতে পৌরাণিক কাহিনী অংশ আর ঐতিহাসিক অংশের যোগাযোগ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। এই সাধারণ গ্রন্থটির অবশিষ্টাংশের আরও অর্থ প্রকাশ করে আলোক পাত করেছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং শ্রী যুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক।

সেন রাজাদের আমলে ছিলেন হলায়ুধ মিশ্র ও জীমূতবাহন সেন, হলায়ুধ দ্বাদশ শতাব্দীর স্মার্ত পন্ডিত। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণ সমাজের জন্য তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, সেগুলি হল — ব্রাহ্মণ সর্বস্ব, মীমাংসা সর্বস্ব, বৈষ্ণব সর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব ও পন্ডিত সর্বস্ব। তাঁর অন্য দুই ভাই ঈশান ও পশুপতিও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রামান্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জীমূতবাহন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ - ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। তাঁর তিনখানা গ্রন্থ যথাক্রমে, — কালবিবেক, ব্যবহার মাতৃকা, ও দায়ভাগ, বৃহস্পতি মিশ্র পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে, — 'সুকেশ' নামে কুমার সম্ভবের টীকা, 'রঘুবংশ বিবেক' নামে রঘুবংশের টীকা, নির্ণয় বৃহস্পতি নামে 'শিশুপালবধের টীকা' পদচন্দ্রিকা' অমরকোষের টীকা আর 'বোধবতী' মেঘদূতের টীকা।

লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় ছিলেন 'কবি পঞ্চরত্ন'। যেমন — উমাপতিধর, শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন আচার্য ও জয়দেব। এদের মধ্যে কবি ধোয়ী লক্ষ্মণ সেনকে নায়ক কল্পনা করে লিখেছেন 'পবন-দূত'। সেখশুভোদয়া' নামক মিশ্র সংস্কৃতে লেখা মধ্যযুগীয় একটি গ্রন্থ থেকে জানা যায় কবি ধোয়ী নাকি জাতিতে তন্তুবায় এবং প্রথম জীবনে নিতান্তই মূর্খ, অশিক্ষিত ছিলেন।

মধ্যযুগ ঃ

সত্তর দশকের প্রথমদিকে বাণগড়ের শিববাটী অঞ্চল থেকে পাওয়া এক বিরাট প্রস্তর লেখ থেকে মধ্যযুগীয় এক কবির আমরা সন্ধান পাই। তিনি হলেন কবি শ্রীকণ্ঠ। প্রস্তর লেখটি তিনি অনুমানিক ১০২০-৪৩ খ্রীঃ মধ্যে রচনা করেন 'লেখাটির ৩৩টি শ্লোকের মধ্যে তিনি অনুষ্টুপ ছন্দে ৫টি, শার্দূল বিক্রীড়িত ছন্দে ২২ টি আর্যায় ১টি, বসন্ততিলকে ২টি, হরিনীতে ২টি এবং বংশস্থলবিল, মালিনীও মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১টি করে শ্লোক রচনা করেছেন। বর্তমান মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ওয়াড়িতে ১৫৪৫ খ্রীঃ জনৈক শ্রীমহেন্দ্র নামক এক ব্যক্তির দ্বারা

নির্মিত শিখর মন্দিরের উৎসর্গ পত্রে আরও দুজন কবির নাম পাওয়া যায়, যারা এই উৎসর্গ পত্রের শ্লোকগুলি রচনা করেছিলেন। তারা হল, কবি শ্রী গোবিন্দ মিশ্র ও শ্রী শতাবধান। বাংলাদেশে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে মধ্যযুগ পরিকল্পিত হলেও চতুর্দশ শতাব্দীর আগে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সূচনা হয়নি। তারপর বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের বিস্তার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চলে। সুতরাং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পাঠান ও মুঘল এই দুই রাষ্ট্রশক্তিব শাসনকালে বিকশিত হয়ে উঠতে দেখা যায়, দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন লক্ষণ সেনের সভাকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের নতুন নতুন পরীক্ষা চলছিল, ঠিক সেই সময়ে তাতার-তুর্কী-খোরাসানী, মরু-পর্বতবাসী বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী বাংলাদেশের খানিকটা অধিকার করে নেয়। তারপর ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রায় দুই শত বৎসর বঙ্গ সংস্কৃতির তামসযুগ, এই সময়কার কোন মৌলিক সাহিত্য কীর্তির সঙ্গে তাই বাঙ্গালীর তেমন পরিচয় নাই। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল ১৪৯৩ খ্রীঃ হোসেন শাহ বাংলার সুলতান পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর। হোসেন শাহের সিংহাসন লাভের আট বছর আগে অর্থাৎ ১৪৮৫ খ্রীঃ চৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্ম গ্রহন করেন। চৈতন্য আবির্ভাব ও হোসেনশাহী শাসনাধীন বাংলা - এর ফলে তামসিক মধ্যযুগে নবজীবনের আলোকরেখা দেখা দিল। চৈতন্য প্রভাবিত বাংলা সাহিত্য যদিও মধ্যযুগীয় সংস্কারের দ্বারাই লালিত তবুও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্য আবির্ভাবকে একটি ঐতিহাসিক ক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। চতুর্দশ শতক থেকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী যুগকে মধ্যযুগের প্রথম পর্ব, মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্বে চৈতন্যদেবের ৪৮ বৎসর বয়স থেকে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক পর্যন্ত বিস্তৃত এই কালকে চৈতন্য যুগ তথা দ্বিতীয় স্তর এবং মধ্যযুগের তৃতীয় স্তর সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাংলায় মুসলমান রাজত্বের প্রাক মুগল আমল ছিল সাহিত্যের গঠনযুগ। এই সময় রাষ্ট্রভাষা আরবি, ফারসী, উর্দু তাদের বিপুল সম্ভাবনা ও ঐতিহ্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নবজীবনের সঞ্চাব করছিল। শুধু তাই নয়, মুসলমান রাজত্বের সাংস্কৃতিক প্রবাহগুলোর মধ্যে বাঙ্গালীর চিন্তা-চেতনায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছিলো মরমী চিন্তাধারার প্রভাব। বলা হয় উত্তরাঞ্চলে মিশ্র মরমিবাদ একটি প্রভাবশালী শক্তিরূপে দেখা দিয়েছিল তখন মুনিবাদ বা হিন্দু ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব মুসলমান সুফিদের মধ্যে প্রবেশ করে। আবার ইসলাম ধর্মের পরার্থপরতা ও ঐকান্তিক ঈশ্বর প্রীতির সমন্বয়ে বাংলা সাহিত্যে অতীন্দ্রিয় আদর্শ ও মরমিয়াবাদের ধারা প্রচলিত হয়। সম্রাট আকবর এই উদার মরমী মতবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দারাশিকোহ্ - ও এই মিশ্র অতীন্দ্রিয়বাদের পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'মাজমা - অল - বাহরাইন' গ্রন্থে সুফিবাদ এবং মুনিবাদের যৌথ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ষোড়শ শতক থেকে এই মিশ্র সুফি মতবাদ একটি প্রভাবশালী শক্তি ছিল। এই মিশ্র মতবাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল ফকিরীবাদ, কর্তভজা, বাউল, সত্যপীর ইত্যাদি ধারণাগুলি। এইসব মরমি ভাবধারা বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে প্রচুর উপাদান সরবরাহ করেছিল। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের উপর ছিল বাউল, ভাটিয়ালি, মুর্শিদা ও কীর্তন সঙ্গীতের প্রভাব।

মালদহ জেলা থেকে আবিস্কৃত 'সেখশুভোদয়া' গ্রন্থটি নানা কারনে উল্লেখযোগ্য। এই

বিচিত্র গ্রন্থটি ১৩৩৪ সালে ডঃ সুকুমার সেন মহাশযের সম্পাদনায় কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে মালদহের জিলা ম্যাজিস্টেট ও প্রাচীন ইতিহাসে অভিজ্ঞ উমেশচন্দ্র বটব্যাল মালদহ জেলার শহরস্থিত বাইশ হাজারী মসজিদ থেকে প্রাচীন কাগজে লিখিত এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেন। মালদহ জেলার পন্ডিত ব্যক্তি হরিদাস পালিত মহাশয় এই পুঁথির খবর প্রথম বটব্যাল মহাশয়কে দিয়েছিলেন। পুঁথিটি মুসলমান মাতোয়ালীর হেফাজতে ছিল, সময় বিশেষে অর্থাৎ উৎসব অনুষ্ঠানে সেই পুঁথিটি বিশেষ ব্যক্তি দ্বারা পঠিত হতো পরম ভক্তিভরে। এই পুঁথিটিতে লেখকেব কোন নাম পাওয়া যায় নি। কিন্তু বর্ণনাকার হিসাবে নাম আছে লক্ষণ সেন সভাকবি হলায়ুধ মিশ্রের। এই গ্রন্থে জালালুদ্দিন তাব্রিজি নামের অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন এক শেখের কাহিনী বর্ণিত আছে; যিনি লক্ষণ সেনের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং লক্ষণ সেন তাঁর অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হযে তাকে নানাভাবে সম্মানিত করেন। লক্ষণ সেনের সভায় শেখের শুভোদয় এবং শেখের গৌরব ব্যাখ্যাই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থের বিষয় এবং ভাষা কোনটিই পরিণত নয়। ডঃ সুকুমার সেনের অনুমান এই গ্রন্থ ষোড়শ শতাব্দীর কোনও এক সময়েই রচিত হয়েছিল। তার আরও অনুমান ষোড়শ শতাব্দীতে টোডরমল যখন বাংলাদেশে জমি জরিপের কাজে এসেছিলেন, তখন পান্ডুয়া মসজিদের কর্তৃপক্ষ নিজেদের জমিজমা ও মসজিদের সম্পত্তির দখলী স্বত্ত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচনা করে টোডরমলের কাছে দাখিল করেছিলেন। তবে ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক কেমন ছিল তা জানার জন্য এই পুঁথির অনেক উপাদান অপরিহার্য।

ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের গোস্বামী প্রভুরা সমস্ত কাব্য-নাটক ও ধর্ম-দর্শনের বই লিখেছিলেন তার মধ্যে পুরাতন মালদহ জেলার মোরগ্রাম নিবাসী রূপ, সনাতন ও তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যযুগে রাজধানী গৌড়ের অদূরেই মালদহের রামকেলি গ্রামকে কেন্দ্র করে রূপ - সনাতনের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সুদৃঢ় বিদ্বৎসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রূপ গোস্বামী হুসেন শাহের অর্থ সচিব ছিলেন। রূপ আর সনাতন কে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করাই নাকি শ্রী চৈতন্যদেবের গৌড় আগমনের একমাত্র কারণ, এমন কথা বলেছেন শ্রী চৈতন্য স্বয়ং -

গৌড়-নিকট আসিতে নাহি প্রয়োজন।
তোহা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন।।
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে।।

এরপর সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহন করে এই ধর্মের প্রচার এবং বৈষ্ণবীয় স্মৃতি ও ভাগবত ব্যাখ্যা সংক্রান্ত একাধিক পুস্তক রচনা করেন। তাঁর রচিত 'বৃহৎ ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, বৈষ্ণব তোষনী,' প্রভৃতি গ্রন্থে ভাগবতের ভক্তিরসতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই গ্রন্থগুলির সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, এক বিশাল পান্ডিত্য ও মনীষার অধিকারী ছিলেন সনাতন গোস্বামী।

সনাতনের অনুজ রূপ গোস্বামী পান্ডিত্যে ও প্রতিভায় অগ্রজকেও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তিনি নাটক, ভানিকা, কাব্য, চম্পূকাব্য, রসশাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্যের

প্রায় প্রতি বিভাগেই অসাধারণ নৈপুন্য দেখিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল, —

নাটক — বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব, দানকেলি কৌমুদী, নাটক চন্দ্রিকা (নাট্যশাস্ত্র)।

কাব্য — হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, পদ্যাবলী (সঙ্কলন)।

ভক্তি ও রসশাস্ত্র — ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমনি (রূপ সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র অনুপমের পুত্র)

জীব গোস্বামী এই দুই জেষ্ঠ্য তাতের কাছ থেকে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও রসতত্ত্বে স্নাতক হয়েছিলেন। জীব গোস্বামীর রচিত সাহিত্যের পরিমান ও বিষয় বৈচিত্র্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যে খুব একটা দেখা যায় না। সনাতন ভাগবত ব্যাখ্যায় বৈষ্ণব ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, রূপ গোস্বামী কাব্য ও রসতত্ত্ব নির্মানে অধিক আগ্রহী ছিলেন। আর জীব গোস্বামী নিয়োজিত ছিলেন বৈষ্ণব দর্শনের কার্যব্যূহ নির্মাণে। এছাড়া তিনি কাব্য - কবিতাও রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে, —

কাব্যকবিতা — গোপালচম্পূ, সঙ্কল্প কল্পদ্রুম, মাধবমহোৎসব, গোপাল বিরুদাবলী প্রভৃতি।

রসশাস্ত্র — রসামৃতশেষ, দুর্গমসঙ্গমনি, লোচন-রোচনী প্রভৃতি।

ব্যকরণ গ্রন্থ — হরিণামামৃত ব্যাকরণ, সূত্রমালিকা ইত্যাদি।

বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক সন্দর্ভ — তত্ত্ব সন্দর্ভ, ভগবৎ সন্দর্ভ, পরমাত্ম সন্দর্ভ, শ্রী কৃষ্ণ সন্দর্ভ, ভক্তি সন্দর্ভ ও প্রীতি সন্দর্ভ। শ্রী জীব গোস্বামী স্মরণীয় হয়ে আছেন বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক এই ষট্ সন্দর্ভগুলির জন্য। তাঁর বিপুল পরিশ্রম অসাধাবণ মনীষা, তত্ত্ব নিষ্ঠ জ্ঞান এবং বৈষ্ণবীয় দর্শন এই সন্দর্ভগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। বলা যায় এই সন্দর্ভগুলির দর্শনের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল।

তন্ত্র বিভূতি ঃ

মনসা মঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে মালদহ জেলার যে দুইজন কবির নাম পাওয়া যায় তারা হলেন তন্ত্র বিভূতি এবং জগজ্জীবন ঘোষাল।

ডঃ আশুতোষ দাস মহাশয় উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণ কালে প্রথম তন্ত্র বিভূতির পুঁথির সন্ধান পান। মালদহ জেলা থেকেই তন্ত্র বিভূতির ভণিতাযুক্ত দুইখানি পুঁথি সংগ্রহ করেন। পুঁথি দুটিব রচনাকাল বাংলা ১২৪৪ সাল। পরে আরও একখানি গ্রন্থ মালদহ জেলা থেকে পাওয়া যায়, যেটি সংগ্রহ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গোকুলানন্দ মিশ্র। তন্ত্র বিভূতি তাঁর কাব্যের সর্বত্র যে ভূমিকা দিয়েছেন তা হল —

মন দিয়া শুন সভে মনসার গীত,
তন্ত্রবিভূতি গায় মনসা রচিত।

তন্ত্র কথাটিকে তাঁতী অর্থে ধরে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন "মনে হয় কবি জাতিতে তাঁতী ছিলেন, তাই ভণিতায় নিজেকে তন্ত্র বিভূতি বলিয়াছেন।" এই অনুমান অমূলক নাও হতে পারে, কারণ কবির পুঁথি যেখান থেকে পাওয়া গিয়েছে সেই কালিয়াচক থানার চর্তুপার্শ্বে এখনও বহু তাঁতীর বাস। কবি তন্ত্র মতাবলম্বী ছিলেন বলে নিজেকে 'তন্ত্র' বা 'তান্ত্রিক'

বলতে চেয়েছেন এমনটাও হতে পারে। কারণ এই কাব্যে নানা পুরাণ গ্রন্থের এমন নিপুণ বিবরণ আছে যে, কবিকে উচ্চতর সমাজের বলেই মনে হয়।

৩০৪ পৃষ্ঠায় পুঁথিটি শেষ হয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯টি করে পংক্তি আছে। তুলোট কাগজ একটু জীর্ণ হয়ে পড়লেও সেহাই কালিতে লেখা পুঁথির অধিকাংশ অক্ষর খুব উজ্জ্বল এবং পুরো পুঁথিটির পাঠ অবিকৃত। কাব্যে বর্ণিত চরিত্রগুলির উৎকর্ষতা, ভাষা বিন্যাসের মুন্সীয়ানা এবং আদি রসাত্মক বর্ণনাভঙ্গীতে সংযম প্রমাণ করে তন্ত্র বিভূতির রচনাশক্তি সংহত এবং ঋজুগতি সম্পন্ন। তাছাড়া শালীনতাবোধ, লোক চরিত্র জ্ঞান ও বাস্তব চিত্রাঙ্কনে তন্ত্রবিভূতির কোন কোন অংশ মনসা মঙ্গলের অনেক কবিকেই ম্লান করে দেবে। তন্ত্র বিভূতির কাব্য এখনও মালদহের কালিয়াচক এবং হরিশ্চন্দ্রপুরের কোন কোন গ্রামে প্রচলিত হয়।

লক্ষ্মীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হলে চাঁদ সদাগর সনকাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন —

ভাল ছিল মিল পুত্র বালা লখিন্দর,
নিধনিয়ার ঘরে চোরের নাহি ডর।

সাধারণ ভাষার সাথে এইরকম সহজ দার্শনিকতাবোধই কবি তন্ত্র বিভূতির কাব্যের বিশেষত্ব। উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যে যে নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয় তার প্রথম সূচনা করেন কবি তন্ত্র বিভূতি।

জগজ্জীবন ঘোষাল ঃ

তন্ত্র বিভূতির পরবর্ত্তী কবি জগজ্জীবন ঘোষাল। তিনি তন্ত্র বিভূতির অনেক আগে থেকেই মালদহ তথা উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি হিসাবে পবিচিত ছিলেন। মালদহ পার্শ্ববর্তী দিনাজপুরের কুচিয়া মোড়া গ্রামে কবি জগজ্জীবন ঘোযাল জন্মগ্রহণ করেন। কবি দেবী মনসার স্বপ্নাদেশে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। যদিও কবির রচনাকাল সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কবি উল্লেখ্য এই কারণে যে তার কাব্যের রচনাশৈলি, ভাযাবিন্যাস এবং বিষয়বস্তু বর্ণনাতে তিনি পূর্বোক্ত কবি তন্ত্র বিভূক্তির কাব্যকলা অনেকাংশেই গ্রহণ করেছেন।

কবি মনোরথ ঃ

বরেন্দ্রভূমের অন্যতম কবি মনোরথ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। অনুমান পাল রাজত্বের শেষ দিকে কৈবর্ত নায়ক দিব্যের বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ের তিনি কবি। কামরূপ অধিপতি বৈদ্যদেব তার রাজ্যের চতুর্থ বিজয় উৎসবে কবি শ্রীধরকে ভূমিদান করে এক তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করেছিলেন। সেই তাম্রশাসনে মহাবাজ বৈদ্য দেবের যে প্রশস্তি গীত উৎকীর্ণ হয়েছিল 'তাহা রাজগুরু মুবারির পুত্র পদ্মাগভোপন্ন মনোরথ কর্তৃক বিরচিত।' বারাণসীধামের গঙ্গা বরুনা সংযোগস্থলের কাছে কমৌলি গ্রামে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ভূমি খননের ফলে মাটির তলায় এই তাম্রশাসনটি পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসনটি আবিস্কৃত হওয়ার পরই কবি মনোরথের সম্পর্কে জানা যায়। যদিও মনোরথের কবি প্রতিভার অন্য কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তবুও এই একটি মাত্র প্রশস্তি থেকেই মনোরথের রচনা কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। পাল বংশের অন্যতম রাজা কুমার পাল কামরূপের বিদ্রোহ দমনে তার প্রিয়তম মন্ত্রীবিদ্যাদেবকে নিযুক্ত করেছিলেন। বৈদ্যদেব 'অনুত্তর বঙ্গের'

জলযুদ্ধে জয়লাভ করে কামরূপের বিদ্রোহী নরপালের বিনাশ করেন এবং কামরূপের সিংহাসনে বসে 'মহারাজা ধিরাজ' উপাধি গ্রহন করেন। কামরূপের এই নরপতির প্রশস্তি রচনা করতে গিয়ে এই কবি সেই যুগের বাঙ্গালীর বাহুবলের ও শাসন প্রণালী সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রদান করেছেন। কবি মনোরথ এই একটি প্রশস্তি রচনা করলেও তার মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সহকারে এই প্রশস্তিটিকে একটি কাব্যের মর্যাদা দান করেছেন। বরেন্দ্রভূমের গৌড়ীয় কবিদের মধ্যেই তাই মনোরথের নাম উল্লেখযোগ্য।

গৌড়কবি চতুর্ভুজ ঃ

মধ্যযুগে অল্প কয়েকজন কবিদের মধ্যে সংস্কৃত কবি চতুর্ভুজের নাম উল্লেখযোগ্য। চতুর্ভুজ বিখিত গ্রন্থটির নাম 'হরিচরিত কাব্যম'। আর তার বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণলীলা। এই কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে কবি নিজেই একটি পুষ্পিকায় বলেছেন— "তৎকাল গৌড়ের ইতিহাস বিখ্যাত সুলতানগণের সিংহাসনে তাঁহাদের হাবসী ক্রীতদাসগণ উপবিষ্ট।" এই নির্দেশ অনুসারে ১৪১৫ শকাব্দ (১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) 'হবিচরিত কাব্যের' সমাপ্তিকাল বলে অনুমান করা যায়। কারণ এই বইটি রচনার পর বৎসরই আলাউদ্দিন হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করেন। কবি আরও লিখে গিয়েছেন- তিনি বাস করিতেন — ভাগীরথী পরিসরে - 'বহু শিষ্টজুষ্টে' শ্রী রামকেলিনগরে।" বর্তমান ইংবেজবাজর থানার অন্তর্গত এই মৌজায় বিদ্যাচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যেও এই স্থানটির পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি চতুর্ভুজ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের ধনীবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কাশ্যপ গোত্র ভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাই তিনি হর্ষচরিত কাব্যে পাঁচশত বছর আগে (হোসেন শাহ ও তার পূর্ববর্তী আমলে) বারেন্দ্র ব্রহ্মণ সমাজরে কাশ্যপগোত্র কিরকম রীতি নিয়ম প্রচলিত ছিল 'হরিচরিত' কাব্য থেকে তারও প্রমাণ খানিকটা মিলবে।

মানিক দত্ত ঃ

মধ্যযুগীয় কবি সাহিত্যিকদের ধারায় মালদহ জেলার অন্য আর একজন যে কবির নাম পাই, তিনি হলেন মানিক দত্ত। মানিক দত্ত চন্ডীমঙ্গলের আদিকবি বলে পরিচিত। তাঁর রচিত দুইখানি পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় রক্ষিত রয়েছে। কবি মানিক দত্ত যে মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর ও পূর্ববর্তী কবি ছিলেন তা জানা যায় মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল থেকে। এই কাব্যে তিনি কবি মানিক দত্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছেন ঃ

মানিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়।।

মালদহের জাতীয় শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে মালদহ জেলা থেকেই মানিকদত্তের চন্ডীমঙ্গলের দুইখানি পুঁথি আবিস্কৃত হয়েছিল। তারপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় মানিক দত্তের পুঁথিটির উপর মালদহের পন্ডিত ব্যক্তিগণ যেমন, রজনীকান্ত চক্রবর্তী মানিদত্তের মঙ্গলচন্ডী (১৩১১ সাল), হরিদাস পালিত 'গৌড়ীয় মঙ্গলচন্ডীর গীত্ 'বৌদ্ধ ভাব' (১৩১৭ সাল), এবং তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের 'মানিক দত্ত ও মুকুন্দরাম' (১৩৪৫ সাল) প্রবন্ধগুলি থেকে

মানিক দত্তের জীবনীও তাঁর রচনা সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা লাভ করা যায়।

সম্ভবতঃ কবি মানিক দত্ত মালদহের 'ফুলবাড়ী' গ্রামে জন্মগ্রহন করেছিলেন। প্রবাদ এইরকম যে তিনি কানে কালা ও খোড়া ছিলেন। দেবীর বরেই তিনি স্বাভাবিক দেহ লাভ করেন ও স্বপ্নাদেশে দেবীর কাব্যগাথা রচনা করেন। এখনও মালদহের উৎসব অনুষ্ঠানে এই গ্রন্থ গীত এবং পঠিত হয়ে থাকে। ধনপতি সদাগর বানিজ্যে বেড়িয়ে আসার পথে যে সমস্ত গ্রাম নদ নদী, মঠ-মন্দির ইত্যাদি দেখেছেন এবং তার বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মালদহের চিত্র - ই পরিস্ফুট হয়। এই বর্ণনার মধ্যে আছে ঝাড়গ্রাম, বড় গাছা, আগলা, কাঞ্চন নগর, সন্ন্যাসী পাটন, ছ্যাতারভাতার বিল (ভাতিয়ার বিল), কেন্দুয়ার নালা, গৌড়েশ্বরীর মন্দির, দ্বারবাসিনীর ভগ্নস্তুপ ইত্যাদি। এর অধিকাংশই মালদহের ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত, এছাড়া পুঁথির বর্ণিত ভাষাতেও মালদহের প্রচলিত বাক্‌রীতির প্রভাব দেখা যায়। সেইজন্য রজনীকান্ত চক্রবর্তী এবং হরিদাস পালিত মহাশয় কবিকে এই জেলার অধিবাসী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, তাঁদের মতে কবির কাব্যে ধর্ম মঙ্গলের নিরঞ্জন আদ্যা সংক্রান্ত বৌদ্ধভাব মূলক সৃষ্টি তত্ত্বের প্রভাব পড়েছে। কবির এই কাব্যে দেবী চন্ডীর সৃষ্টি রহস্য এবং ভাড়ুদত্তের চরিত্রটি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

দেবী চন্ডীর বর্ণনা — ডাহিনে বামে চাহিয়া দেবী কি না দেখিল।
হাথের কঙ্কন দেবী টানিএগ খসাইল।।
চক্র ধরিয়া দেবী দিল একটান।
চক্র হৈতে আনল বাহির হৈল দশখান।।
সেহিত আনলের তাপে শঙ্কর ঘামিল।
শিবের ললাটে ঘাম ভূমেতে পড়িল।।

ভাড়ুদত্ত — কার বাড়িতে ঝাটিঝুটি কার বাড়িতে তর।
ভাড়ু দত্তের বাড়ি হৈল নদীয়া সাগর।।
ক্রোধে জ্বলিল তবে ভাড়ুয়া নাবড়।
ব্যর্থ সেবা করিল মুঞিও ভোলা মহেশ্বর।।

জরতীবেশিনী চন্ডীর হেয়ালী — আমারে বোল ডান বুড়িরে আমারে বোল ডান।
কার খাইনু ভাতার পুত কার করিনু হান।।
ডান নইরে ডান নই হই এ মুখ দোষী।
দ্বারে বসি খাইনু মুঞিও চৌদ্দ ঘর পড়শী।।

আধুনিক যুগ ঃ

এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাক্ লগ্ন থেকেই আধুনিক যুগের সূচনারম্ভ। তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলা সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশের কাল। এই সাহিত্য ধারায় মালদহ জেলার অবদানও কিছু কম নয়।

উইলিয়াম কেরী ঃ

১৭৬১ সালের ১৭ই আগষ্ট ইংলণ্ডের নরদাম্পটন শায়ারের অর্ন্তগত পলার্স পিউরি গ্রামে উইলিয়াম কেরীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা তাঁতের কাজ করে অন্নসংস্থান করতেন, পরে কাজ করতেন প্রাথমিক স্কুলে। শিক্ষক পিতার সান্নিধ্যে কেরী বাল্যকাল থেকেই শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হন কিন্তু দারিদ্রের কারণে বিদ্যা অর্জনে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। তবুও বাল্যকাল থেকেই নানাধরণের গ্রন্থ যেমন, ভ্রমণ কাহিনী, ভূগোল, দেশ আবিষ্কারের কাহিনী তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। উদ্ভিদ বিদ্যায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। পরবর্তীকালেও এই উদ্ভিদ বিদ্যা তাঁর বিভিন্ন ধরণের গবেষণার কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তিনি একাধিক ভাষাবিদ্যাও আয়ত্ব করেছিলেন, তার মধ্যে ইতালীয়, ফরাসী, ডাচ ভাষার সঙ্গে এদেশীয় সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষাও ছিল। ১৭৯৩ সালের ১১ই নভেম্বর স্ত্রীপুত্র এবং টমাস সহ মিশনারী ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় এলেন উইলিয়াম কেরী। এরপর ব্যাণ্ডেলের কাছাকাছি প্রচারকার্য চালাতে তারা বাধাপ্রাপ্ত হলেন স্থানীয় হিন্দুপ্রধান গ্রামের মানুষজনদের কাছ থেকে। এছাড়া স্থানীয় শিক্ষিত হিন্দু ও সম্পন্ন মুসলমানরা এই প্রচারকার্য প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারলেন না। এর ফলে কেরী ও টমাস প্রচারকার্যের জন্য অন্যরকমের চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় জর্জ উডনী নামে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী কেরী ও টমাসের কথা জানতে পারেন। উডনি ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মালদহস্থিত রেশম কুঠির কর্মাশিয়াল রেসিডেন্ট। উডনীর সঙ্গে দেখা করে কেরী মালদহের হবিবপুর থানার অন্তর্গত মদনাবতীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত নীলকুঠির ম্যানেজার রূপে নিযুক্ত হলেন। এই পদে কেরী পাঁচ বছর ছিলেন (১৭৯৪-১৭৯৯)। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই জুন নদী পথে কেরী সপরিবার মদনাবতীতে এসে পৌঁছন। সঙ্গে ছিলেন মুন্সী রামরাম বসু। বাংলা ভাষার সেই শৈশবের দিনগুলিতে কেরী রামরাম বসুকে সঙ্গে নিয়ে বাংলা গদ্য গড়ে তোলার কাজে হাত দিলেন। প্রথমেই নিজের প্রয়োজনে একটি বাংলা শব্দকোষ ও ব্যাকরণ তৈরী করে নিলেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কেরী বাইবেলের 'The book of Genesis' -এর সম্পূর্ণ (Old teslancnt) এবং Exodus এর তেইশ অধ্যায় পর্যন্ত বাংলায় অনুবাদ করেন। এরপর বাংলা ভাষায় অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্য তিনি 'Gospal of John' এর অনুবাদও করেন এবং সংস্কৃত মহাভারতেরও কিছু কিছু বাংলায় অনুবাদ করেন।

মদনাবতীতে আসার পরই তিনি স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং ১৭৯৪ খ্রীঃ সেখানে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হোত। এছাড়াও তাদের খাদ্য ও পোশাক দেওয়া হোত।

মদনাবতীতে থাকাকালীন কেরী বাংলাভাষায় যে বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন সেটি মুদ্রণের জন্য ৪০ পাউণ্ড দাম দিয়ে কাঠের তৈরী একটি মুদ্রণ যন্ত্র ক্রয় করেছিলেন। মদনাবতীতে এনে একটি ঘরে স্থাপন করে পঞ্চানন কর্মকার নামক এক ব্যক্তিকে হরফ সরবরাহের জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু নানা কারণে সেই মুদ্রণযন্ত্রটি শ্রীরামপুরে নিয়ে যেতে হয়। এরপর উইলিয়াম কেরী তার বৃহত্তর জীবন শুরু করেন শ্রীরামপুর ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা শিক্ষার প্রধান রূপে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে উইলিয়াম কেরীর নাম আজ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে

গেছে তাঁর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল মালদহ জেলার এই মদনাবতীতেই। এরপর ১৮৩৪ খ্রীঃ ৯ই জুন বিরাট প্রতিভার অধিকারী তথা মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টায় অক্লান্ত এই মানুষটির জীবনাবসান হয়।

হেনরী ক্রেটন ঃ

১৭৬৭ খ্রীঃ স্কটল্যাণ্ডে হেনরী ক্রেটন জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক পড়াশুনা স্কটল্যাণ্ডেই করে তিনি নিতান্ত কিশোর বয়সেই ভারতবর্ষে চলে আসেন। জন্মসূত্রে মালদহবাসী না হয়েও হেনরী ক্রেটন যৌবনকাল থেকে শুরু করে আমৃত্যু এই জেলাতেই কাটিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয় এই জেলার উন্নতির জন্য শিক্ষার বিস্তারের জন্য এমনকি পুবাতাত্ত্বিক গবেষণার কাজের জন্য এই জেলায় ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে থাকবে।

মালদহ জেলায় তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় গৌড়ের কাছে গুয়ামালতী নামক স্থানের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ বণিকগণ কর্তৃক পরিচালিত রেশম শিল্প কারখানার সহকারী কর্মাশিয়াল রেসিডেন্ট হিসাবে। এরপর ১৭৮৬ খ্রীঃ সেখানে একটি নীলকুঠি স্থাপিত হলে সেই নীলকুঠি তত্ত্বাবধানের ভারও তার উপর ন্যস্ত হয়।

হেনরী ক্রেটন খুব ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। ছবি আঁকার এই শখ মেটাতে তিনি মাঝে মাঝেই গৌড়ের লুপ্তপ্রায় ধ্বংসাবশেষগুলির সামনে দাঁড়াতেন রং-তুলি এবং ক্যানভাস হাতে। ছবি আঁকার এই শখ থেকেই তাঁর মনে জেগে উঠেছিল অতীত গৌড়ের ইতিহাস জানার আকাঙ্খা। অনেক অনুসন্ধিৎসায় লেখা হল সেই বই যার নাম The Ruins of Gour. যদিও বইটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় এবং বইটি সহজ প্রাপ্যও নয়। কিন্তু অবহেলায় পড়ে থাকা ভগ্ন প্রস্তর লিপি, কারুকার্য খচিত স্তম্ভ এবং প্রস্তরমূর্তিগুলির সংগ্রহ করার ও তাব সংরক্ষণ করা সেই কাজ তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ভরে করেছেন এবং সম্ভবত প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ এবং পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনার তিনিই এ জেলার পথিকৃৎ।

শুধু তাই নয় ১৮০২ সালে মালদহ জেলার গুয়ামালতীতে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, যেটি প্রথম বাংলা বিদ্যালয় বলেই দাবী করা হয়।

কর্মক্ষেত্রে একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী, ব্যবহারে অমায়িক এবং সমাজ সেবায় নিরন্তর এই নিরহঙ্কারী মানুষটি ১৮০৭ খ্রীঃ মাত্র ৪০ বছর বয়সে মারা যান।

কুমুদ নাথ লাহিড়ী ঃ

১২৮৬ বঙ্গাব্দের ২১ শে মাঘ বুধবার বাংলাদেশের বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত কৌড়কদী গ্রামে কুমুদ নাথ লাহিড়ী জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম দ্বারকানাথ লাহিড়ী মাতা জননী দেবী। মালদহের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ১৯১০ সালে রেঙ্গুন থেকে মালদহে এসে জাতীয় শিক্ষা সমিতিতে যোগ দেওয়ার সূত্রে।

ফরিদপুর জেলা স্কুলের হেডমাস্টার মহাশয়ের বিদায় উপলক্ষ্যে তের বছর বয়সে কবিতা লেখার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত। এরপর অজস্র কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। যেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল সাহিত্য, নব্যভারত, সাধনা, বিশ্বশক্তি, গৃহস্থ, উপাসনা, বঙ্গদর্শন,

গম্ভীরা, আর্থিক উন্নতি ইত্যাদি পত্রিকায়। মালদহের কলিগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'গম্ভীরা' পত্রিকাটির সম্পাদনায় তিনি অনেক সাহায্য করেছেন দীর্ঘকাল। এছাড়া 'গৃহস্থ' পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার ছিল তাঁর উপর।

তাঁর রচিত পূর্ণাঙ্গ প্রকাশিত গ্রন্থ পাঁচটি 'বিল্বদল' ও 'বীথি' তাঁর কবিতার সংকলন। 'পাপ ও পূণ্য' বৌদ্ধ অবদান শতকের কাহিনী অনুসারী রচনা। 'সাগরের ডাক' গ্রন্থটি অধ্যাপক অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাষায় 'বাঙলার মিষ্টিক ড্রামার' এক সুন্দর নিদর্শন। 'সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ' নামক গ্রন্থটি পাশচাত্য ও বাঙলা সাহিত্যের এক সুনিপুন সমালোচনা গ্রন্থ। এছাড়া রক্তজবা, পল্লীপূজা, পল্লব ও অপূর্ব মিলন নামে সংকলিত পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ায় কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয় নি। 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কপালকুন্ডলা উপন্যাসের উপদেশ' ও 'মনোরমা' নামের প্রবন্ধ দুটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা সৃষ্টি। তাঁর শেষ সমালোচনা প্রবন্ধ 'শেষ প্রশ্নের বৈঠক' ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের 'বিচিত্রা'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

কুমুদনাথ লাহিড়ীর বেশির ভাগ রচনাই মালদহে থাকাকালীন রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং মালদহের সঙ্গে তাঁর বন্ধন চিরকালের, ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১৭ই আষাঢ় কুমুদনাথ লাহিড়ী কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রাধেশ চন্দ্র শেঠ ঃ

১৮৬৪ খ্রী পুরাতন মালদহে রাধেশ চন্দ্র শেঠ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পিতার নাম হরিশচন্দ্র শেঠ। মালদহ জেলার সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগসূত্র ছিল। এখানকার আদালতে ওকালতি করার সময় থেকেই তিনি সাহিত্য সেবার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

তিনি মালদহ থেকে 'গৌড় বার্তা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার পর 'কৃষ্ণকালী প্রেস' নামে একটি মুদ্রাণালয় স্থাপন করে 'গৌড়দূত' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব প্রত্নতাত্ত্বিক রচনাগুলির জন্য। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইতিহাসের উপর লেখা একটি মননশীল প্রবন্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সেই সূত্রে তাঁর সাথে ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্র এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ সমাজ পতির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়, তাঁদেরই প্রেরণায় তিনি লুপ্তপ্রায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন গুলি পুনরূদ্ধারের কাজে মনোনিবেশ করেন। এই ব্যাপারে বহু প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন ও সেগুলির বিধিবদ্ধ আলোচনা করেন। একই সাথে এই উভয় কাজ করার ফলে তিনি বিশ্বাস করতেন - "মালদহের সৌধ কীর্তি সম্পদ যেমন অতুলনীয়, প্রাচীন সাহিত্য সম্পদ গৌরব তদপেক্ষা বড় অল্প নহে।

জীবৎ কালে তাঁর লেখা পাঁচটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি হল- ১) ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, ২) মালদহ রত্ন মাল্য, ৩) মালদহের শিল্প ইতিহাসের উপাদান, ৪) গীতা কৌমুদী এবং ৫) একটি সম্পাদিত গ্রন্থ নাম সেক শুভোদয়া। এছাড়াও 'মালদহের ভূগোল' নামের একটি বই তিনি রচনা শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি।

জীবনের শেষ দিকে তাঁর কৃতিত্বের তালিকায় অছে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২৫ শে পৌষ ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকারকে মালদহে এনে সাহিত্য সম্মেলন করা। এবং উত্তরবঙ্গের

সাহিত্য সম্মেলন মালদহে অনুষ্ঠিত করা। এরপর অত্যাধিক পবিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে যায়। চিকিৎসার জন্য সপরিবারে তিনি কোলকাতায় যান। ১৯১১ খ্রীঃ মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তিনি কোলকাতাতেই মারা যান।

হারাধন দাস বৈষ্ণব ঠাকুর ঃ

হারাধন দাস বৈষ্ণব ঠাকুর বর্তমান বাঙলাদেশের কানসাটে জন্মগ্রহন করেন। তার পর জীবিকা সূত্রে মালদহে এসেছিলেন। তাঁর 'পরমার্থ - সঙ্গীত' ও 'নগর সঙ্কীর্তন' নামক কাব্য সঙ্কলনে গতানুগতিক ধর্ম বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে। কবির লেখা 'রামকেলি মাহাত্ম্য' ইতিহাস কিংবদন্তী ও কল্পনার মিশ্রিত রূপায়ন। বৈষ্ণব ঠাকুর একটি 'দেল কেতাব' ও রচনা করেন। এটি একটি দরবেশ সম্প্রদায়ের সাধন গ্রন্থ। এই হাতে লেখা পুঁথিটি মালদহের দরবেশ সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্ত ঃ

১৮৭৬ খ্রীঃ ২১ শে জুলাই জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্ত মালদহে জন্মগ্রহন করেন। মালদহ জেলা স্কুলে প্রাথমিক পাঠ সেরে তিনি বহরমপুর কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। মালদহ জেলা স্কুলের শিক্ষক হিসাবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। শিক্ষকতা করার সময় আচার্য বিনয় কুমার সরকারকে তিনি ছাত্র হিসাবে পেয়েছিলেন। প্রায় দুই বৎসর কাল এই স্কুলে শিক্ষকতা করার পর এই পেশা ত্যাগ করে অবিভক্ত মালদা জেলার চাঁপাই নবাবগঞ্জে ওকালতি করেন, দীর্ঘ ৩৫ বৎসর এই জীবিকার সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন। পেশারত অবস্থায় তিনি একদিন পক্ষাঘাত গ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং তারপর ১৯৩৭ খ্রীঃ ১৫ই জুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্ত মহাশয়ের নাম স্মরনীয় হয়ে থাকবে 'বাংলা ভাষার প্রথম কথা সংগ্রাহক হিসাবে'। এ বিষয়ে ডঃ মলয় বসু তাঁর 'বাংলা রূপকথার প্রথম সংগ্রাহক 'জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্ত কিছু মালদহ সংবাদ' প্রবন্ধে বলেছেন যে, 'জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্ত বাংলা রূপকথার এক বিস্মৃত সংগ্রাহক। সম্প্রতি তিনি আবার লোকচক্ষুর সামনে এসেছেন। বাংলা রূপকথার পাঠক মাত্রই জানেন যে লোক সমাজে যে রূপকথাগুলি শ্রুতি নির্ভর হয়েই বেঁচেছিল সেগুলিকে ইংরেজী অনুবাদ ও বাংলা ভাষায় প্রথম সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন যথাক্রমে রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, — এই ক্ষেত্রে লালবিহারীর অগ্রপথিকত্ব নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনকে নিয়ে আছে। দক্ষিনারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রূপকথা সংকলন গ্রন্থ দুটি (ঠাকুবমার ঝুলি ও ঠাকুরদাদার ঝুলি) অসম্ভব জনপ্রিয় ও বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশংসা ধন্য ছিল। কিন্তু বাংলা রূপকথার প্রথম সংগ্রাহকের সম্মানটি কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রশশীরই প্রাপ্য। জ্ঞনেন্দ্র শশী গুপ্তের 'উপকথা' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের কোন কপি পাওয়া যায় নি। দ্বিতীয় সংস্করনের একটি দুর্লভ কপি পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ কাল বাংলা ১৩১৬ সাল। প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবত ১৩১৪ / ১৫ সালে। ১৩১৪ সাল দক্ষিনারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রূপকথা সংগ্রহ গ্রন্থ

'ঠাকুরমার ঝুলিরও প্রকাশ কাল'। মনে হয় জ্ঞানেন্দ্র শশীর 'উপকথা' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ 'ঠাকুরমার ঝুলির পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু দ্রুত বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল, তবু আমরা জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্তকেই বাংলা রূপকথার প্রথম সংগ্রহক বলে চিহ্নিত করতে চাই।''

যে রূপকথা গ্রন্থের জন্য জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্তের পরিচিতি সমধিক সেটি কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের পৌরানিক নাটক - নাম 'ভীষ্ম'। এরপর তার তৃতীয় গ্রন্থ 'আত্রেয়ী' নামের একটি স্বল্প উপন্যাস। এরপর আরও কয়েকটি উপন্যাস যথাক্রমে — মুনসেফ কাহিনী, মৃগাঙ্ক মৌলি, কাবেরী ও রমলা।

১৩১২ বঙ্গাব্দে কোলকাতা থেকে জ্ঞানেন্দ্র শশীর 'উপকথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই বইটির জন্যই তার খ্যাতি। তবুও বাংলা রূপকথার প্রথম সংগ্রাহক সম্মান জ্ঞানেন্দ্র শশী পাননি। এ ব্যাপারে ডঃ মলয় বসুর মন্তব্য হল — 'গ্রন্থটি লিখতে গিয়ে যে সব সূত্র থেকে গল্পগুলি যেমন ভাবে সংগ্রহ করতে পেরেছেন বা যাঁদের কাছ থেকে যে যে গল্পগুল যেমনটি শুনেছেন সেই গল্পগুলি কোন রকম বিকৃত না করে তাঁর গ্রন্থে ঠিক তেমন ভাবেই পরিবেশন করেছেন।' এ সম্পর্কে জ্ঞানেন্দ্র শশীর মতটিও অনুরূপ — ''আমাদের দেশে সচরাচর যে ভাষায় কথাবার্তা চলে, বর্তমান পুস্তকে সেই ভাষা অবলম্বন করিয়াছি। যথাসাধ্য গ্রাম্য কথার ব্যবহার করি নাই। ...... গল্পগুলি যেমন শুনিয়াছি সেইরকমই ব্যবহার করিয়াছি।''

কেবলমাত্র এই একটি গ্রন্থের জন্যই জ্ঞান্দ্রেশশী গুপ্তের নাম মালদহের গ্রন্থকারদের মধ্যে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ঃ

১৮৯০ খ্রীঃ মালদহ জেলার রতুয়া থানার চাঁদপুর (মির্জাদ পুর) গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গোরাচাঁদ চৌধুরী। রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী তাঁর জীবিত কালে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সৃষ্টি শীলতার সাক্ষর রাখতে না পারলেও একজন যথার্থ শিক্ষানুরাগী মানুয হিসাবে মালদহের মানুষ তাঁকে মনে রাখবে।

১৯০৬ খ্রীঃ প্রথম তিনি মহামনীষী আচার্য বিনয় কুমারের সংস্পর্শে আসেন। সেই সময় মালদহ জেলার শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েন। তাঁরই উদ্যেগে রাজেন্দ্র নারায়ণ মালদহ জেলার বিভিন্ন স্থানে 'ঘুরে ঘুরে' জাতীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন এবং তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচার কার্য চালাতে থাকেন। মালদহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত জাতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হিসাবে ব্যবহারের জন্য তিনি 'মালদহের ভৌগোলিক বিবরণ' নামে একটি বই লেখেন। পরে এই বইটিকেই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নাম দেন 'ভূগোল শিক্ষা প্রণালী'। এছাড়া তাঁর অন্য একটি বই এর নাম বস্তু পরিচয় ও ইন্দ্রিয় পরীক্ষা।

১৯৫৭ খ্রীঃ ১৫ই অক্টোবর তাঁর নিজ গ্রামের বাসভবনে ৬৮ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিধুশেখর শাস্ত্রী ঃ

১৮৭৫ খ্রীঃ মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতার নাম ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য। ছেলেবেলার তিনি নিজের গ্রাম হরিশ্চন্দ্রপুর এবং কলিগ্রামে শিক্ষালাভ করেন। পরে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কাশী যান এবং সেখান থেকেই 'শাস্ত্রী' উপাধি অর্জন করেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের পান্ডিত্যের খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত ছিল যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বিশ্বভারতীর সংস্কৃত বিভাগটি দেখাশোনার জন্য আমন্ত্রন জানান। তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ তথা আশুতোষ অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন।

বিধুশেখর শাস্ত্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পান্ডিত্যের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। সম্মান দেয় শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী দেশিকোত্তম উপাধি দিয়ে। সবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট সম্মানে ভূষিত করে।

বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্কৃত বিশেষ করে বৌদ্ধশাস্ত্র, পালি, প্রাকৃত ও তিব্বতী ভাষায় অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত আঠারটি গ্রন্থের তালিকা পাওয়া যায়। যেমন —

১. পালি প্রবেশ ব্যাকরণ
২. ভোট প্রকাশ
৩. অসঙ্গ প্রণীত যোগাচার ভূমিশাস্ত্র (১ম খন্ড)
৪. তিব্বতী সহ বোধিচর্যাবতার তথা নাগানন্দ নাটক
৫. গৌড়পদীয় আগমন শাস্ত্র
৬. অশোক নির্দিষ্ট বৌদ্ধ পাঠাবলী
৭. নাগার্জুন কৃত মহাযান বিংশক
৮. উপনিষদ (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ শালা)
৯. বিবাহ মঙ্গল
১০. মিলিন্দ পঞ্‌হো (দুইখন্ড)
১১. তিব্বতী পাঠসহ বোধিচর্যাবতার তথা নাগানন্দ নাটক।
১২. তুচ্চির সহযোগে মধ্যান্ত বিভাগ ভাষ্য টীকা।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পুঁথি বিভাগের এবং তিব্বতী ও চীনা শাস্ত্র বিভাগের সমৃদ্ধির জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এখান থেকেই তিনি অবসর গ্রহন করেন। কলকাতার গড়িয়াহাটায় নিজের বাড়িতে তিনি অবসর পরবর্ত্তী জীবন কাটান। সেখানেই এই জ্ঞান তপস্বীর মৃত্যু হয় ১৯৫৯ সালে।

কালীপদ লাহিড়ী ঃ

১৩১১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (ইং ১৯০৪ খ্রীঃ) মালদহে কালীপদ লাহিড়ী জন্ম গ্রহন করেন। পিতা ধর্মনারায়ণ লাহিড়ী এবং মাতা জলদ বরনী দেবী।

গ্রামে পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মালদহ শহরে অক্রুরমনি উচ্চ বিদ্যালয়ে

পড়াশুনা করেন। ১৯২৩ খ্রীঃ ম্যাট্রিক পাশ করে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হন। এরপর মালদহ কালেক্টরেটে কেরানী চাকুরী গ্রহণ, হেড এ্যাসিসটেন্টের পদে উন্নতি হয়, এই ভাবে দীর্ঘ ৩২ বছর চাকুরী করে ১৯৬১ খ্রীঃ অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৬১ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'গৌড় ও পাণ্ডুয়া' যেটি পূর্ব প্রকাশিত অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সুগ্রথিত সংকলন। যেগুলি বিভিন্ন সময়ে 'মালদহের গ্রাম্য ভাষা', 'মালদহের পরিচয়', 'গৌড় ইতিহাসের এক অধ্যায়', 'পূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতিতে মালদহের অবদান', ইত্যাদি প্রবন্ধ বসুমতি, ভারতবর্ষ, আনন্দ বাজার, যুগান্তর, সংহতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'গৌড় ও পাণ্ডুয়া' নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছাড়াও গৌড়ের পটভূমিকায় লেখা একটি গল্প সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, নাম দেন 'নীচ তলার কাব্য'। ১৯৮২ তে গৌড় দর্পন, নামে আর একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, 'গৌড় দূত' নামের সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন মালদহের একাল সেকাল নামে তথ্যনিষ্ঠ লেখা।

১৯৯১ খ্রীঃ ২৭ শে সেপ্টেম্বর কোলকাতায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। মালদহের সাহিত্য জগতে, বিশেষ করে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতার কথা মালদহের মানুষ দীর্ঘদিন মনে রাখবে।

বিনয় কুমার সরকার ঃ

১৮৮৭ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর মালদহ জেলায় জন্মগ্রহন করেন বিনয় কুমার সরকার। তাঁব পিতার নাম শ্রী সুধন্য কুমার সরকার মাতা মনোমোহিনী দেবী। তাঁরা মালদহ জেলার পুড়াটুলিতে বসবাস করতেন।

১৯০১ খ্রীঃ ১৩ বছর বয়সে বিনয় সরকার মালদহ জেলা স্কুল থেকে প্রাথমিক ভাবে তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০৫ সালে ইংরেজী ও ইতিহাস বিষয়ের সাম্মানিক স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করে ঈশান - বৃত্তি লাভ করেন। ফলে সেই সময়কার শাসক সরকার ইংরেজ তাঁকে ইংলন্ডে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য রাষ্ট্রীয় বৃত্তি প্রদান করে এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দিতে চায়। যদিও প্রথাগত শিক্ষার আলোচনা ও তাই দিয়ে আচার্য বিনয় কুমার সরকারের কৃতিত্বের কোনও বিচারই হয় না। বলা যায় উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের মধ্যে থেকে উঠে আসা এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব মহামনীষী আচার্য বিনয় কুমার সরকার। তাঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ডঃ প্রদ্যোৎ কুমার ঘোষ বলেন — আচার্য সরকারের সৃষ্টি সম্ভারের বৈচিত্র্য ও গভীরতা আলোচকের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিধিতে আবদ্ধ হওয়া সঙ্গত নয়, সম্ভবও নয়। সংখ্যায় তা অসংখ্য। কেবল গ্রন্থই প্রকাশ প্রায় একশ, বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ প্রায় হাজার। ...... প্রথম পর্বের রচনা পান্ডিত্য পূর্ণ, নীতি শাস্ত্রযুগ ও স্বদেশ ভাবনামূলক ...। প্রকৃত বিজ্ঞান, চারুকলা, সাহিত্য, লোকসংস্থা, ধর্ম, অর্থনীতি, আইন এবং রাজনীতিক সংগঠন, পৃথিবীর অসংখ্য দেশে তাঁর ভ্রমন ও বক্তৃতায় শুধুমাত্র অম্বেষা জ্ঞান বিতরণ ও ব্যক্তি চরিত্রের পান্ডিত্যই প্রকাশিত নয়, বিভিন্ন দেশের শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, সামাজিক সেবা প্রভৃতি সম্পর্কে রচনা, সামাজিক ভূগোল এবং প্রতিষ্ঠানগত সমাজবিদ্যার অর্থনীতি সম্পর্কে

আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্পায়ন, বৈদেশিক বানিজ্য, ভূমি সম্পর্কে আইন, ব্যাংকিং শ্রমিক এবং সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁর সুগভীর অনুধ্যানের প্রতিফলন তাঁর রচনাবলী।'' — এইরকম একজন বহু বিদ্যা বিশারদ, বহু ভাষা পারঙ্গম, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অভ্যস্ত এই বিরাট পন্ডিতের অক্লান্ত জ্ঞানচর্চার পেছনে যে শক্তি দিবারাত্রি কাজ করেছে এবং শক্তি যুগিয়েছে তা হল তাঁর স্বদেশ প্রেম তথা দেশাত্মবোধ যার শুরু শৈশবের জন্মভূমি মালদায়। ১৮৯৬ - ১৯০০ সালের কথা। বাড়ীর কাছের একটি জামগাছতালায় ফি বছর অনুষ্ঠিত হতো গম্ভীরা গান, সেখানেই হাজির হতো তথাকথিত 'ছোট-জাতের দল'। শৈশবের দেখা এই গম্ভীরা গানই তাঁর পরবর্ত্তী কর্মময় জীবনে দিয়েছে উন্মাদনা এবং নবীন প্রাণের স্পর্শ। তাঁর নিজের কথায় — ''জামতল্লার গম্ভীরাতে যে সব লোকজন দেখেছি সেই সব লোক জনের সঙ্গে তুলনা করেই অন্যান্য লোকজনকে চিনেছি। গম্ভীরার লোকজনের জুড়িদারই পেয়েছি দুনিয়ার নানা পল্লী শহরে। যে সব রক্ত - মাংসের মানুষ জাপানে, চীনে, মিশরে আর ইয়োরোপ আমেরিকায় ছুয়েছি তারা সবাই মনে হয়েছে পুড়াটুলীর বারোয়ারীতলার লোক জনেরই মালদহতুতো ভাই। ... একালে গণতন্ত্র বকি। সেই গণতন্ত্রই জীবনে প্রথম দেখেছি জামতল্লীর গম্ভীরার শাসন কায়দায় আজকাল সমাজতন্ত্র ও কপ্চাই। সেই সমাজ তন্ত্রের সম্বল জীবনে প্রবেশ করেছিল - চুনিয়া, নুনিয়া, পাঝরা, কাঁসারি ইত্যাদি জাতীয় ভাইদের সঙ্গে নাচানাচি আর লাফালাফির আবেষ্টনে।'' (বিনয় সরকারের বৈঠক, ১ম খন্ড)। আঞ্চলিক এই সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেবার সুযোগ খুজছিলেন। ১৯০৮-১৯১০ খ্রীঃ মধ্যে বিনয় সরকার ইউরোপীয় লোক সাহিত্য লোক পাঠ্য, লোক নৃত্য ইত্যাদির চর্চা করলেন নিরলস ভাবে। এইভাবে লোক সংস্কৃতির তুলনামূলক ইতিহাস রচনা করবার জন্য যখন নিজেকে প্রস্তুত করেছেন সেইসময় তিনি 'ফোলক' দর্শনের ঋষি জার্মান মনীষী জার্ডারের লেখার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। জার্ডার যেমন করে লোক সাহিত্যে লোক শিল্পে, লোকাচারে, লোক সঙ্গীতে জার্মান জাতির আত্মিক চেতনার ও জনসাধারনের চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রকাশ দেখতে পেতেন, আচার্য বিনয় সরকারও 'আদ্যের গম্ভীরার' মধ্যে জন্মভূমির প্রকৃত স্বরূপটি দেখতে পেতেন। এই বিশ্বাস থেকেই রচিত হল তথ্য-সমৃদ্ধ মুল্যবান গ্রন্থ ''The Folk element in Hindu Culture'' তিনি নিজেই এই গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এই গ্রন্থ 'আদ্যের গম্ভীরার প্রতিষ্ঠিত রচনা।'' শুধু তাই নয় তিনি আরও বলেছেন — ''১৯১৭ সালে Eolk Element বইটা বেরুলো। তখন আমি অমেরিকার হাভার্ডে, তারপর ইয়োরামেরিকার নানা দেশের বড় বড় লাইব্রেরিতে এই বইয়ের এক একটা কপি দেখেছি। যখনই দেখেছি, বুকটা চেঁড়ে উঠেছে, ... মনে হয়েছে এই আমার পুড়াটুলীর দিগ্‌বিজয়। কল্পনা করেছি - নুনিয়া ভাইদের দিগ্বিজয়' (বিনয় সরকারের বৈঠক ১ম খন্ড)।

বিনয় সরকার তাঁর রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচন, বিষয় বিন্যাস ও বিশ্লেষণী শক্তিতে নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর সৃষ্ট রচনাবলী সমূহ নিম্নরূপ।

1. বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা, কলকাতা ১৯০৭।
2 শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা, কলকাতা ১৯১০।
3 প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা, কলকাতা ১৯১০।

4. ভাষা শিক্ষা, কলকাতা ১৯১০।
5. Economics, Calcutta 1910.
6. Political Science. Calcutta 1911.
7 Constitutions, Calcutta 1911.
8. Lessons on Sanskrit, Calcutta 1911.
9. Lessons on English, Calcutta 1911.
10. Ancient Europe, Calcutta 1912
11. Mediavel Europe, Calcutta 1912.
12. History at English leature, Calcutta 1912.
13 The science of history and the hope of mandind, London, 1912.
14. শিক্ষা সোপান, কোলকাতা ১৯১২।
15. ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, কলকতা ১৯১২।
16. শিক্ষা সমালোচনা, কলকাতা ১৯১২।
17. সাধনা, কলকাতা ১৯১২।
18. Sukraniti, Allahabad, 1912
19 Introduction to the science of Education, London 1913.
20 বিশ্বশক্তি, কলকাতা ১৯১৪।
21. নিগ্রো জাতির কমলধীব, কলকাতা ১৯১৪।
22 The Positive Back ground of Hindu Sociology, Allahabad 1914.
23 রবীন্দ্র সাহিত্যে ভারতের বানী, কলকাতা ১৯১৪।
24 কবরের দেশে দিন পনেরো, কলকাতা ১৯১৪।
25. বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র, কলকাতা ১৯১৪।
26 ইংরেজের জন্মভূমি, কলকাতা ১৯১৪।
27 Chinese Religion through Hindu Eyes, Sanshai 1916
28 Love in Hindu literature. Tokyo 1916.
29. The Falk element in Hindu culture, London 1917.
30. Hindu Achievements in Exact Science, London 1918
31. The Bless of a moment. U.S.A. 1918.
32 Hindu Art, Its Humanism
33. The Psoitine Back hround of Hindu Soceology, Allahabad 1922.
34 চীনের সভ্যতার অ, আ, ক, খ, কলকাতা ১৯২২।
35. The palitical Institutions and theofics of Hindus leipzig 1922.
36. The Futurism of young Asia, Berlin 1922.
37 Die Lebensan chaung Des Inders (German), Leipzig 1923.

38 The Aestheties of houng India, Calcutta 1923

39 ইয়াংকি স্থান, কলকাতা ১৯২৩।

40 Economic Development, Studis in applied Economics and wored Economy, Madras 1926

41 The Politics of Boundaries and Tendences in International relations, Calcutta 1926

42 পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র (এঙ্গেলেসের জার্মান ভাষায় রচনার অনুবাদ), কলকাতা ১৯২৬

43 Hindu Politics in Italian, Calcutta 1926

44 দুনিয়ার আবহাওয়া, কলিকাতা ১৯২৬।

45 হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, কলকাতা ১৯২৬।

46 নবীন এশিয়ার জন্মদাতা, কলকাতা ১৯২৬।

47 The Positive Background of Hindu sociology Vol - II, Allahabad 1927

48 Greetings to young India P + I, Calcutta 1927

49 ধনদৌলতের জন্মান্তর, (লাফার্গের ফরাসী গ্রন্থের অনুবাদ), কলকাতা ১৯২৮।

50 বর্তমান যুগের চীন সাম্রাজ্য, কলকাতা ১৯২৮।

51 The Political Philosophies Since 1904, Madras 1928

52 Post graduate university of Calcutta 1929

53 Comparative Pedagogies in pelation to public Finance and National Wealth, Calcutta 1929

54 এ কালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র, কলকাতা ১৯২৮।

55 সুইজারল্যান্ড কলকাতা ১৯৩০।

56 Aspects Economiquis EtPolitiques De la Civilisation Hindu (French) Paris 1930

57 Three papers in Intalian in Annalidi Economia and Commercio (Italian) Rome 1931

58 Quozienti De Natalita De Mortalita E Di Anmento Natural Nell India Attanale Nel Quandro Della Demografia Comparata, Rome 1937

59 Sixteea papers in German in the Deutsche Randsehan Berlin 1930 Wirtsehaftliehe Nachrichten (Viena 1930)

60 নয়া বাংলার গোড়া পত্তন, কলকাতা ১৯৩২।

61 স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি (ফ্রেডারিশ লিস্টের অনুবাদ) কলকাতা ১০৩২।

62 Economic Development, Studies in Applicd Economie and world Economy 1932

63 প্যারিসে দশ মাস, কলকাতা ১৯৩২।

64 ইটালিতে বার কয়েক, কলিকাতা ১৯৩২।

65 Compara tive Birth, Death and Growth Tates, Calcutta 1932

66. Indian currency and Peserve Bank problims, Culcutta 1933.

67 বাড়তির পথে বাঙ্গালী, কলকাতা ১৯৩৪

68. Imperial preferehec Vis a Vis world Economy, Calcutta, 1934.

69. একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র, কলকাতা ১৯৩৫।

70 পরাজিত জার্মানী, কলকাতা ১৯৩৬।

71 La sociographic Hindone Aur Debuts De capitalisme Moderne, Paris 1936

72. Social Insurance Lagislation and statistics

73 The might of the mah in the social Philosophy of Ramkrisnna and Vivekananda, Madras 1936.

74. The Sociology of Population, Calcutta 1936.

75. The Sociology of crimes and Punishcent, Calcutta 1937.

76 Die Sozio logischen Weehesebe, Zeibzig 1937

77 বাংলায় ধনবিজ্ঞান (১ম) কলকাতা ১৯৩৭ (সম্পাদিত)।

78. Creative India, Lahore 1937.

79. La Situation Demographique De L Inde Actuella visa vis Les Recoltes, Les Industries ET Les Capitay. Paris 1938.

80. Les Equations De la Mvilite to Sociale, Paris 1938.

81 Geopolitid Von. Indian Aus Geseheh Heidelberg 1938.

82. La Morphologic Sociate Des Villes ET Des Villages Etude Statistique International, Bucharest 1939

83. Villages and town as social patterns, calcutta 1941

84. Political Philosophies since 1905 Lahore 1942

85. The Equations of word Economy, Calcutta 1943.

86 Education for Industrialization, Calcutta 1946.

87. Dominion India in world perspectivies, Calcutta 1949.

(তালিকা — ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ কৃত আচার্য বিনয় কুমার সরকার শতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা থেকে প্রাপ্ত)

আচার্য বিনয় কুমার সরকার তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য নিয়ে যে কেবল বিবিধ বিষয়কে অবলম্বন করেই অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন তাই নয়, তিনি পৃথিবীর একাধিক ভাষাতেও পারদর্শী ছিলেন। একাধিক ইউরোপীয ভাষায় তিনি স্বচ্ছন্দে বক্তৃতা করতে পারতেন। তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে প্রসারিত ছিল বিশ্বময়। তাঁর লেখা "The Positive Back ground of Hindu Socilogy."-র পুস্তকটির আলোচনা একজন ফরাসী সমালোচক বলেছেন- "Dr. Binoy Kumar Sarkar, Well-Known in all the countries of Europe as one of the best represen tatives of Modern Indian thought in the bield of Socilogy and Education is Veritably an encyelopaedie spirit"· এটিই আচার্য বিনয় কুমারের যথার্থ সাহিত্যিক স্বরূপ।

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে স্ত্রী ইভা সরকার সহ সপরিবারে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন Dominion India in world perspectives গ্রন্থটির প্রকাশ উপলক্ষ্যে। ২৭ শে অক্টোবর ওয়াশিংটনের এক সভায় বক্তৃতা দিয়ে ফেরার পথে করোনারি থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হন। ২৪ শে নভেম্বর আমেরিকার মাটিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বাণেশ্বর দাস ঃ

১৮৮৯ খ্রীঃ মালদহ জেলার পরানপুর গ্রামে বাণেশ্বর দাসের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম মাধবচন্দ্র দাস। গ্রামের বিদ্যালয়েই প্রাথমিক পাঠ শেষ করে বাণেশ্বর দাস মালদহ শহরের জেলা স্কুলে ভর্তি হন। এরপর আচার্য বিনয় কুমার সরকারের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। পরবর্তী সমগ্র জীবন আচার্যের আদর্শ এবং নির্দেশিত পথেই তিনি জীবনের অভিষ্ট এবং উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন।

আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৩ সালে যোগ্যতার সঙ্গে বি.এস.সি.এইচ.ই উপাধি লাভ করেন। তারপর দীর্ঘকাল তিনি টমাস আলভা এডিসনের কারখানায় চীফ-কমিষ্টের পদে কাজ করেন। এই সময় তাঁর তত্ত্বাবধানে একাধিক ডক্টরেট উপাধিধারী আমেরিকায় কাজ করতেন। প্রায় ১৩ বছর ধরে জার্মান, আমেরিকা ইত্যাদি জায়গায় কর্মাপোলক্ষে কাটিয়ে ১৯২৪ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন, ১৯২৫ খ্রীঃ বিনয সরকারের নির্দেশে 'যাদবপুর কলেজ অব এঞ্জিনীয়ারিং এন্ড টেক্‌নোলজিতে' রসায়নিক এঞ্জিনীয়ার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই কলেজে দীর্ঘ ২৭ বছর কাজ করার সময় ধাতুবিদ্যা, তৈলবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করেন। শুধু তাই নয় কলকাতায় অবস্থিত মালদহ সমিতির সদস্য হিসাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আম সংরক্ষণ, জেলি, আচার, কাসুন্দিচূর্ণ ইত্যাদি আম্রজাত দ্রব্য নিয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করেন।

বাণেশ্বর দাসর মুদ্রিত কোন পুস্তক নেই বটে কিন্তু তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধ তৎকালীন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে পন্ডিত মহলে যথেষ্ট আদৃত হয়েছিল। এছাড়া 'The social and Economic Ideas of Benoy Sarkar' নামে ৬৭২ পৃষ্ঠার যে বিরাট গ্রন্থটির তিনি সম্পাদনা করেছেন, মূল্যবান সেই গ্রন্থটিই তাঁকে গ্রন্থকারের মর্যাদা দিয়েছে।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী ঃ

মালদহ জেলার ইতিহাস গবেষণার সাথে যাঁর নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে তিনি রজনীকান্ত চক্রবর্তী। সংস্কৃত সাহিত্যের সুপন্ডিত এই মানুষটির কিন্তু ইতিহাস বিষয়ে কোন প্রথাগত শিক্ষা ছিল না। কেবল সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি আশৈশব অকৃত্রিম অনুরাগ-ই তাঁকে কালজয়ী ঐতিহাসিকের সম্মান এনে দিয়েছে। রজনীকান্ত সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তৎকালীন প্রায় সমস্ত ইতিহাসবিদ-ই। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছিলেন -— "যাঁহার অনুরোধ মুসলমান অধিকার কালের ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম তিনি গ্রন্থ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; মালদহ নিবাসী পূজ্যপাদ রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম মুসলমান

অধিকার যুগের মৌলিক ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তদ্‌রচিত 'গৌড়ের ইতিহাস' বাঙ্গালা সাহিত্যে অমূল্য গ্রন্থ। চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে বাঙ্গালাদেশের মুসলমান অধিকার কালের ইতিহাস সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা বহু অনুসন্ধান করিয়াও অন্যান্য গ্রন্থে দেখিতে পাই নাই এবং সমস্ত কথা সত্য জানিয়া এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

ইতিহাস বিষয়ে অনুসন্ধানের খ্যাতি যাঁকে ভারত বিখ্যাত করেছে সেই মানুষটির ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। লেখকও এই সম্পর্কে কোথাও কিছু বলেন নি। যতদূর জানা যায় মালদহ তাঁর আদি নিবাস নয়, তিনি জন্মগ্রহন করেছিলেন যশোহর জেলার সিদ্ধিপাশা গ্রামে। ঢাকার নর্মান স্কুল থেকেই তিনি পড়াশুনা করেন। তারপর সপরিবারে মালদহে এসে 'মালদা জেলা স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগদান করেন। ইতিহাস গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য সংস্কৃত ভাষার সাথে সাথে তিনি ফার্সী এবং ইংরেজী ভাষাতেও যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেন।

সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে তাঁর কীর্তির মধ্যে রয়েছে বিদগ্ধ জনের প্রশংসা খ্যাত 'গৌড়ের ইতিহাস, যা তিনি বাংলায় হিন্দু রাজত্বকাল এবং মুসলমান রাজত্বকাল এই দুই খন্ডে ভাগ করে লিখেছিলেন। যার প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৯০৭ এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ। এছাড়া 'নামকোষ' নামে একটি গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ রচনা করেন। যথাক্রমে — পুরাণে বিজ্ঞান (গম্ভীরা পত্রিকা), মালদহ জেলার গল্পগুজব ও ইতিহাস, গৌড়ের ভগ্নাবশেষ, মালদহের চারপীর, রাজাধিরাজ ধর্মপাল, পাল রাজগণ, কতিপয় প্রাচীন মূর্তি (সাহিত্য পত্রিকা) ইত্যাদি। এছাড়া ধর্মপালের খলিমপুর তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার, শেখ শুভোদয়ার প্রতিলিপি প্রস্তুত করন ইত্যাদি তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আঞ্চলিক ইতিহাসের জন্মদাতা তথা স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ তৈরীর পথপ্রদর্শক রজনীকান্ত চক্রবর্তী দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে স্থানীয় গম্ভীরা পত্রিকা লিখেছিল- "গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা পন্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী আর ইহধামে নাই। পন্ডিত মহাশয় মালদহের গৌরব ছিলেন।"

হরিদাস পালিত ঃ

মালদহ জেলার ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার জন্য রজনীকান্ত চক্রবর্তীর সাথেই যাঁর নাম সমান শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হতে পারে তাঁর নাম হরিদাস পালিত। তাঁর লেখা 'আদ্যের গম্ভীরা' বইটি প্রকাশিত হলে স্যার আশুতোষ মুখোপাধায় বইটি সম্পর্কে ভূয়সী প্রসংসা করেন শুধু তাই নয় তিনি লেখককে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বিভাগে একটি চাকুরী দিতেও আগ্রহ প্রকাশ করেন।

'আদ্যের গম্ভীরা' বইটি মালদহের বিশিষ্ট লোক সংস্কৃতি গম্ভীরা'র উৎস বিস্তার এবং প্রকৃত স্বরূপের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বইটির জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে সম্প্রতি পুর্ণমুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল- গৌড়ীয় নৌ শিল্প, গৌড়ীয় এনামেল ইষ্টক, গৌড়ীয় মঙ্গলচন্ডীতে বৌদ্ধভাব, মালদহের পল্লীভাষা, পালনগরী রামাবতী,

মালদহেব রূপ সনাতন ইত্যাদি। এছাড়া 'গনেশা' ও 'চান্দেলী' নামে দুটো নাটক, 'গৌড় ও পাণ্ডুয়া প্রদর্শিকা', বাংলা ও সংস্কৃত ধাতুর গোড়া এক', 'সোনার দেশ', 'বঙ্গীয় পণ্ডিত জাতির কর্মী, 'মালদহের রাধেশচন্দ্র' ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এমন একটি মানুষ যাকে একাধিক গ্রন্থের পরিচয়ে চেনা যায় তার জন্মস্থান মালদহে নয় এমনকি জীবনের শেষ দিনগুলিও তিনি মালদহে অতিবাহিত করেন নি। তবুও মালদহের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল নিবিড়। বলা যায় জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা তিনি মালদহেই অতিবাহিত করেছেন। পরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আমলে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ বিভাগে চাকরী লাভ করে মালদহ ছেড়ে চলে যান। এরপর প্রয়োজনে তিনি মালদহে এসেছিলেন মাঝে মাঝে কিন্তু শেষ জীবনটা তাঁর কলকাতাতেই কাটে।

ইলাহি বক্স ঃ

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ জেলার ইংরেজবাজারে ইলাহি বক্স জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আলি বক্স তিনি স্থানীয় ভাবে লেখাপড়া শিখে মালদহ জিলা স্কুলের উর্দূ এবং ফার্সী ভাষার শিক্ষক রূপে নিয়োজিত হন। একজন দায়িত্ববান শিক্ষক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তা সত্ত্বেও জীবনের শেষ দিকটা এই মানুষটির যথেষ্ট দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ ৬৮ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রতি আন্তরিকভাবে নিষ্ঠাশীল এই মানুষটি একটি মাত্র বই রচনা করেছিলেন তার নাম 'খুরসীদ-ই-জাহান্-নুমা' এই বইটি রচনার জন্য তিনি ঘুরে ঘুরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। সেই সময় প্রাপ্ত অনেক পুস্তক ও লিপির পাঠ উদ্ধার করেন। যদিও এই বইটির পুর্ণমুদ্রন আর সম্ভব হয় নি, কিন্তু সেই সময় এই বইটির প্রশংসা করেন র‍্যাভেনশ, কানিংহাম, মেজর স্টুয়ার্ট, রাজশাহীর বিচারপতি পার্জিটার সাহেব, বেভারিজ এবং বাংলার বিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়।

মহম্মদ আবীদ আলি খাঁন ঃ

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ জেলার রতুয়া থানার অন্তর্গত আড়াইডাঙ্গা গ্রামে আবীদ আলী খাঁন মহাশয় জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী তুরাব খাঁন। আড়াইডাঙ্গা গ্রামেই প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত করে আবীদ আলী শহরের মালদহ জেলা স্কুলে ভর্তি হন। এরপর কিছুদিন কলকাতার মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন, সেখান থেকে প্রথমে বিহারের বাঁকেপুর ইঞ্জিনীয়ারিং এবং তারপর শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে বিদ্যালাভ করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে চাকরী নিয়ে মালদহতেই ফিরে আসেন।

সরকারী উদ্যোগে এরপর আবীদ আলীর পরিচালনায় গৌড়-পাণ্ডুয়ার সৌধগুলি রক্ষণাবেক্ষনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেই সুবাদেই জেলার ইতিহাস প্রাচীন সৌধ গুলির সঙ্গে তিনি সুপরিচিত হন, এবং আগ্রহান্বিতও হন। বিশদ জানতে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ সংগ্রহ করে তিনি পড়াশুনা করে এই বিষয়ে তিনি একটি পুস্তক রচনা করেন- 'Memoirs of Gour and Pandua'— এই একখানি বই এর জন্য তিনি মালদহ এবং বাংলাদেশের মানুষের কাছে চিরস্মরণীয়

হয়ে থাকবেন। যদিও বইটি তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালের ১৪ই নভেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

ঐতিহাসিক এই বইটি ছাড়াও আরও কয়েকটি ধর্মীয় নির্দেশমূলক বই তিনি লিখেছিলেন, সেগুলি হল যথাক্রমে —

1. Prayer book for Muslims.
2. Gulshan - Hind.
3. An urdu primer.
4. A Bengali Primer.
5. মৌলুদ শরিক ও হজরত চরিত।
6. সচিত্র নমাজ - 'দর্শন'।
7. গুলশনে হিন্দ।
8. শাহাজাত নাম বা মহরম পর্ব।
9. সচিত্র বাঙ্গলা শিক্ষা।
10. উর্দু প্রাইমার।
11. Namaz.

গোলাম হোসেন ঃ

জন্মসূত্রে মালদহবাসী না হয়েও মালদহ জেলার ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে যাঁর নাম অগ্রগণ্য, বলা যায় আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় যিনি পথ প্রদর্শক তাঁর নাম গোলাম হোসেন।

অযোধ্যার জয়েদপুরের অধিবাসী এই মানুষটি মালদহ এসেছিলেন জীবিকার সূত্রে। ইংরেজবাজারের রেশম ফ্যাক্টরীর তৎকালীন ম্যানেজার মিঃ জর্জ উডনির অধীনে তিনি 'ডাব মুনসী' বা পোষ্ট মাষ্টারের চাকরী করতেন।

ইতিহাসের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা লক্ষ্য করে জর্জ উডনী তাঁকে সবরকম উৎসাহ ও সাহায্য দান করেন। ফার্সী ভাষায় বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস বিষয় যে গ্রন্থখানি তিনি রচনা করেন তাঁর নাম 'রিয়াজ-উস-সালাতীন', এটি তিনি লেখেন ১৭৮৭ থেকে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। পরবর্তী প্রায় প্রত্যেক ইতিহাস রচয়িতাদের তথ্য সংগ্রহে এই বইটির উল্লেখ দেখা যায়। গোলাম হোসেন এই একটি মাত্র গ্রন্থ-ই রচনা করেছিলেন।

১৮১৮ খ্রীঃ গোলাম হোসেন দেহত্যাগ করেন এই জেলাতেই। তাঁর সমাধিটি আজও মালদহ শহরে রয়েছে।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর মালদহ জেলার চাঁচোল গ্রামে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম মুক্তকেশী দেবী।

বাল্যকালে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় ভাবে লেখাপড়া শিখে ১৮৯৯ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি ইন্ডিয়ান পাবলিশার্স হাউস' এর

সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সাহিত্য জীবনের কৃতিত্বময় পদক্ষেপ ১৯০৯ থেকে ১৯২৪ খ্রীঃ পর্যন্ত। 'প্রবাসী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে গুরুদায়িত্ব পালন, এছাড়া 'ভরতী' পত্রিকার সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কবিতা এবং প্রবন্ধ লেখালেখির মধ্যে দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত। তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে এবং সাহচর্যে এসে বিবিধ রকমেব ছোটগল্প এবং উপন্যাস রচনা করেন। শুধু তাই নয় বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস বিষয়েও তাঁর আগ্রহ ছিল আন্তরিক। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন বেশ কিছুদিন (১৯১৯ খ্রীঃ) এরপর ১৯২৪ খ্রীঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কে বলা যায় রবীন্দ্র প্রভাবিত লেখক। তীব্র অনুভবশীলতায় তাঁর গল্প উপন্যাসগুলি প্রানবন্ত। কবিত্বময় আবেগ উচ্ছ্বাস, দেহাশ্রিত প্রেমের বৈচিত্র্যময় বিবরণ, নীচুতলার মানুষের জীবন কাহিনী তাঁর রচনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিগুলির মধ্যে রয়েছে-বঙ্কিম প্রসঙ্গ ('আলো' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত / এটিই প্রথম রচনা) 'সারমেয় কথা' প্রথম গল্প প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত। এছাড়া অন্যান্য রচনাগুলি হল -

উপন্যাস — পঙ্কতিলক, আগুনের ফুলকি, (জার্মান লেখক হাউফেব গল্পের অনুবাদ), যমুনা পুলিনে ভিখারিনী, চোরকাঁটা, সর্বনাশের নেশা, জোড় বিজোড়, নোঙব ছেড়া নৌকা, অদর্শনা, সদানন্দের বৈরাগ্য, বায়ুবহে পুরবৈয়া, ব্যবধান, আলোকলতা।

গল্পগ্রন্থ — পুষ্পপাত্র, সওগাত, চাঁদমালা, ধূপছায়া, বরণডালা, মনিমঞ্জীর, কনকচূড়, পঞ্চদশী, বনজোৎস্না, শমীশাখা, দেউলিয়ার জমাখরচ, বজ্রাহত বনস্পতি, যাত্রা সহচরী।

অনুবাদ — অবিমারক (ভাস), রত্নাবলী, পারস্য উপন্যাস, রবিনসন ক্রুশো, ঈশপের গল্প, কাদম্বরী।

শিশুপাঠ্য — বিষ্ণুপুরাণ, ভাতের জন্মকথা।

প্রবন্ধ নিবন্ধ — রবির শিল্প (দুইখন্ড), বেদবানী (প্যারীমোহন সেনগুপ্ত), চন্ডীমঙ্গল বোধিনী, বিদ্যাপতি চন্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা (সম্পাদিত) শূন্যপূরাণ, কবিকঙ্কন চন্ডী ইত্যাদি।

আজীবন সাহিত্য চর্চায় নিজেকে উজাড় করে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পরলোক গমন করেন।

শিবরাম চক্রবর্তী ঃ

''পুরানো পোড়োবাড়ির খপ্পর থেকে কলকাতার ফুটনাথে গিয়ে পড়লাম। সেখান থেকে উঠলাম এসে মুক্তারামের মেসে মালদহের তথাকথিত এক রাজপ্রসাদ থেকে চোরবাগানের এই দামাল দাহে।'' (ভালবাসা ঈশ্বর পৃথিবী / শিবরাম চক্রবর্তী)

১৩ই ডিসেম্বর ১৯০৩ সালে মালদহ জেলার চাঁচোল থানার পাহাড়পুর গ্রামে শিবরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন চাঁচোল জমিদার পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতার নাম শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। মাতা শিবরানী। স্থানীয় ভাবে লেখাপড়া করে শিবরাম মালদহ

জেলা স্কুলে ভর্তি হন। ১৯২০ খ্রীঃ টেষ্ট পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টকরলেও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়াব কারণে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাটা শেষ পর্যন্ত দেননি। এরপর গৌড়ীয় সর্ববিদ্যালয় থেকে আদ্য, মধ্য ও অন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ন। এই সময় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সংস্পর্শে এসে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে আবও বেশি পরিমানে যুক্ত হয়ে পড়েন। ফলস্বরূপ কারাদন্ডে দন্ডিত হন। কারাজীবনের এই অবসরে তাঁর সাহিত্য সাধনার শুরু। বন্দীজীবনের শেষে রোজগারহীন কঠোর বাস্তবতার সামনে দাঁড়ালেন তিনি। আশ্রয়হীন এই মানুযটার তখন রাত কেটেছে কলকাতার ফুটপাথে, রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করেছেন সকালের 'বসুমতি', 'যুগান্তর' পত্রিকা। এরপর আশ্রয় পান ১৩৪ নং মুক্তারাম বসু স্ট্রীটের এক মেসবাড়ীতে। সেইখানেই থেকেছেন জীবনেব শেষদিন পর্যন্ত।

'বসুমতী' পত্রিকার 'বাঁকা চোখে' নামক ব্যঙ্গাত্মক রচনা দিয়ে তাঁর লেখক জীবনের সূত্রপাত, এরপর আনন্দবাজার পত্রিকায় 'অল্পবিস্তর' নামক রম্যরচনায় তার ব্যপ্তি। তত্ত্ববোধিনী কল্লোল, আত্মশক্তি ও ভারতী পত্রিকায় লিখেছেন অজস্র। মৌচাক ও আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে ১৯৬০ ও ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রকাশিত প্রথম কবিতা গ্রন্থের নাম 'মানুষ' (১৯২৯) এবং 'চুম্বন' (১৯২৯)। গল্প— মেয়েদের মন, প্রেমেরে বিচিত্র গতি, আজ কি মজার দিন, আত্মীয়তা বজায় রাখা সোজা নয়, আমার অচেনা, আমার ভাল্লুক শিকাব, আমার ভূত দেখা, উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে, এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চাব, কথায় কথায় ফ্যাসাদ, কলকাতার হালচাল, কালান্তর, লাল ফিতে, কাকাবাবুর কান্ড, কৃতান্তের দন্ডবিকাশ, কে হত্যাকারী, কেবল হাসির গল্প, কেরামতের কেরামতি, গোলদিঘির ভাবী গোল, ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি, চক্রবর্তীরা কঞ্জুষ হয়, চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন, চুলচেরা শোধবোধ, ছোটদের প্রিয় গল্প, ছোটদের সরস গল্প, জন্মদিনের উপহার, জন্মদিনের হাসিখুশী, জীবনের সাফল্য, টম সয়্যারের গল্প, দাদু নাতির দৌড়, নাক নিয়ে নাকাল, নিখরচায় জলযোগ, পঞ্চরং, পঞ্চাননের অশ্বমেধ, পেযাবা স্বর্গ, ফাঁকির জন্য ফিকির খোঁজা, ফাস্টবয়, ফুটবলের দৌড়, বক্রেশ্বরের লক্ষ্যভেদ, বন্ধু চেনা বিষম দায়, বর্মার মামা, বাজার করার হাজার ঠেলা, বাড়ি থেকে পালিয়ে, বাবুম বুবুম বুম, বিনির কান্ডকারখানা, বিশ্বপতি বাবুর অশ্বত্ব প্রাপ্তি, ভারী বিপর্যয় ব্যাপার, ভালো ভালো গল্প, মধুচক্রান্ত, মধুরেণ সমাপয়েৎ, মধুর মাস্টার, মানুষের উপকার করা, মামার জন্মদিন, মালাই বরফ, মৃত্যুর মুখোমুখি. যত হাসি তত মজা, যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন, রসময় যার নাম, লেজের প্রিভিলেজ, শঙ্কর আমাদের সব পারে, শিব্রাম চকরবরতির মতো কথা বলার বিপদ, গুঁড়ওয়ালা বাবা, হর্ষবর্ধন অপহরণ, হর্ষবধন আর গোবর্ধন, হর্ষবধনের হর্ষধ্বনি, হাওড়া - আমতা রেলের দুর্ঘটনা, হাসিখুশীর মেলা, হাসির গল্প, হাস্নাহানা, হিপ্ হিপ্ হুররে, স্বামী মানেই আসামী, অনেক হাসি, দিগ্বিজয়ী হর্ষবধন, দারুন হাসির গল্প, অকথিত কাহিনী, হর্ষবর্ধনের নানান কান্ড, অদ্বিতীয় শিবরাম, হর্ষবর্ধনের নানা রঙ্গ, লাভের বেলায় ঘন্ট, কল্কে কাশির গোয়েন্দাগিরি, কলকাতায় এলেন হর্ষবর্ধন, হাতির সঙ্গে হাতাহাতি, রসময়ের রসকথা, শিবরামের বারোয়ারী, প্রজাতির পক্ষপাত, সুখ ও শারি।

নাটক — যখন তারা কথা বলবে, প্রাণকেষ্টর কান্ড, পন্ডিত বিদায়।

উপন্যাস — ফুটল বিয়ের ফুল, জমিদারের রথ, গুম্ফবতী, প্রাণ নিয়ে টানাটানি, হর্ষবর্ধনের জয়ধ্বনী (কিশোর)।

প্রবন্ধ — মস্কো বনাম পন্ডিচেরী।

আত্মজীবনী — ভালবাসা ঈশ্বর পৃথিবী।

অকৃতদার এই মানুষটি আজীবন আপোষহীন লাড়াই করেছেন অন্যায়ের বিরূদ্ধে, দারিদ্র তার সঙ্গী ছিল জীবনের শেষ দিনেও তবুও অনমনীয় মনোভাবে থেকে গেছেন নিজস্বতায় স্বতন্ত্র। তাঁর রচনার মধ্যে হাসির উপাদানই বেশি। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঐ হাসির অভ্যান্তরেই লুকিয়ে আছে নিজের জীবনের বিষাদ কণাগুলি।

২৮শে আগষ্ট ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'বাংলাদেশের তিন পুরুষের হাসির রাজা এস.এস.কে.এম হাসপাতালে প্রায় পরিজনহীন অবস্থায় দেহত্যাগ করেন।

বীরেন্দ্রনাথ রায় ঃ

কিসে কত লাভ সে হিসাব বোঝ ধরনী
কিসে কত ক্ষতি সে হিসাব আজও করনি,
মন্দের গড়া মিথ্যার পাশা খেলিয়া
চিরকাল তুমি ভালোরে রাখিলে ঠেলিয়া,
মন্দের মাতো ভালোর বিমাতা তুমি যে,
ভাল সে বৃথাই তোমারে খুঁজিয়া মরিছে।

(ক্ষতি/মাটির শিখা কাব্যগ্রন্থ/বীরেন্দ্রনাথ রায়)

আজ কবিতার শরীর থেকে অকারণ উপদেশের বোঝা নেমে গিয়েছে। কিন্তু যিনি এই কবিতার রচয়িতা তিনি একথা বিশ্বাস করতেন না, তাঁর সাহিত্যিক দায়বদ্ধতা ছিল নিজের কাছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে, সর্বোপরি দেশীয় ঐতিহ্যের কাছে।

১৯২৬ খ্রীঃ ২রা ফেব্রুয়ারী মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে বীরেন্দ্রনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পতিনাথ রায়, মাতা শ্রীমতি বিন্দুবাসিনী দেবী. স্ত্রী শ্রীমতি অপর্না রায় ও একমাত্র পুত্র শ্রী বিজন রায় (অধ্যাপক মালদা কলেজ)। প্রথাগত পড়াশুনা সাহারসা জেলার সুপোল হাইস্কুলে। বহরমপুর কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট (১৯৪২), কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে স্নাতক (১৯৪৪), স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৬)। কর্মজীবনে কিছুদিন বীরভূমের হেতমপুর এবং ভাবতা কলেজ, নদীয়ায় কিছুদিন শিক্ষকতা, এরপর মালদা কলেজে অধ্যাপক পদে যোগ দেন ১৯৪৯ এর ডিসেম্বরে।

আজ এই মুহুর্তের সমাজ মানস যে পথে চলছে সেই আত্ম সঙ্কীর্ণতার দৃষ্টিতে উত্তর আধুনিক নামক বিচ্ছিন্নতার নিরিখে তাঁকে বিচার করা ভুল হবে। কারণ আধুনিক সমালোচনকের দৃষ্টিতে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য উৎকর্ষতার পথে অবশ্যই অন্তরায় হবে তাঁর আবেগ, তিনি চিহ্নিত হবেন প্রাচীন বলে। কিন্তু স্রষ্টার উদ্দেশ্য যদি হয় সাহিত্য উপকরণের সাহায্যে মানুষের শুষ্ক হৃদয়ে আবেগ মানক রস সঞ্চার করা, উদ্দেশ্য যদি হয় এই বিশ্বায়নের যুগে পরিচয়হীন, ঠিকানাহীন

মানুষকে স্বস্থানে, স্বনামে ফিরিয়ে দেওয়া তাহলে সাহিত্যিক হিসাবে তিনি সার্থক।

স্বল্পবাক্, স্থিতধী, প্রচার বিমুখ এই মানুষটি লিখেছেন প্রচুর. প্রথম প্রকাশ — কলেজ পাঠক্রম অনুযায়ী রচনা College essays. Amplification.

সমাজ মনস্তত্ত্বমূলক রচনা — জীবনের পথে পথে।

কবিতা সংকলন — মাটির শিখা (১৩৬৯ আশ্বিন)।

শিশুসাহিত্য — ছোটদের নীতিকথা।

ভারতীয় মহাকাব্যে প্রচারিত জীবন দর্শনমূলক রচনা ঃ

নাট্যকাব্য — রামকৃষ্ণ,

অনুবাদ কাব্য — গীতা।

সামাজিক উপন্যাস — জলছবি (১৩৭৬ অগ্রহায়ণ), মানসযাত্রী (১৩৭৬ আষাঢ়)।

ঐতিহাসিক উপন্যাস — 'অগ্নিকন্যা' (১৩৯৬ অগ্রহায়ণ)।

ঐতিহাসিক নাটক — শিবাজীর স্বপ্ন (১৩৯২ ফাল্গুন)।

বিশ্লেষণ ধর্মীরচনা — মহাভারতের কৃষ্ণ (১৩৯৬, চৈত্র)।

ছোটগল্প সংকলন — পুতুলের কান্না।

ইংরাজী রচনা — Indian Dialougues , Indian speechis.

অধ্যাপনার কাজে ইংরেজী তাঁর পড়াবার বিষয় হলেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে তেমন পছন্দ করতেন না। যেমন পছন্দ করতেন না ভারতীয় বা হিন্দুধর্মের কেবল আচারগত, সংস্কারাচ্ছন্ন দিকটিকে। Indian Speeches বইটির ভূমিকায় তিনি বলেন "Here we have the voice of India which is at the same time the voice of man." ভারতীয় দর্শনের অন্তরালে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠাব যে শিক্ষা আছে যা একই সঙ্গে সাময়িক এবং চিরন্তন, সাহিত্য তাকে ফুটিয়ে তোলার কাজে তিনি কথায় ও কাজে একাগ্র। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি বেশিরভাগই ঐতিহাসিক এবং পৌরানিক, এছাড়া গল্পের, উপন্যাসের কাল্পনিক চরিত্রগুলি সমকালীন ও সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও জীবন সম্বন্ধে তাঁরাও পোষণ করে কিছু গভীর চিন্তা ও অনুভূতি। এইরকম ভাবেই স্বপ্ন সরনী তৈরীর কারিগরীতে তিনি নিজেকে নিমগ্ন রাখেন আজীবন...

স্বপ্নের জাল পড়েছে ধরনী ছেয়ে
স্বপ্ন দেখিয়ে জাগিয়া উঠিছে প্রাণ,
স্বপ্ন ঝরিছে লক্ষ চক্ষু বেয়ে,
এ জীবন বুঝি স্বপ্নেরই সন্ধান।"

(স্বপ্ন/মাটির শিখা)

মালদা কলেজ থেকে অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ রায় অবসর গ্রহন করেন ১৯৯১ এর ২৮ শে ফেব্রুয়ারী। এরপর মালদহ জেলার নিজ বাসগৃহেই শেষ নিঃশ্বস ত্যাগ করেন ১৯৯২ এর মার্চ মাসে।

হরিপ্রসন্ন মিশ্র ঃ

হরিপ্রসন্ন মিশ্র ছিলেন সাপ্তাহিক 'সঙ্কল্পের সম্পাদক' কবি ও ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'বাসর', স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ এই কবি স্বদেশকে জননীরূপে ধ্যান করেছেন। কারান্তরালে বসে লেখা 'মা' কবিতায় স্তন্যদাত্রী জননীকে আশ্চর্য রূপদক্ষতায় বিশ্বের আদি মাতায় উত্তীর্ণ করেছেন। এই পর্যায়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিতা 'কারাতীর্থ', 'রূপকথা ও তর্পণ'। সমাজ মূল্যবোধের কিছু কবিতাও তিনি লিখেছেন। এছাড়া বেশ কিছু প্রেম সম্পর্কিত কবিতাও তাঁর আছে।

দীপ্তিময় সরকার ঃ

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট মালদহে জন্মগ্রহন জন্মগ্রহণ করেন অধ্যাপক ডঃ দীপ্তিময় সরকার। পিতা নন্দগোপাল সরকার। মাত্র ৯ বছব বয়সে এই পিতাকে হারিয়ে দীপ্তিময অসহায় হয়ে পড়েন। মালদহের পৈত্রিক বাড়িতে থেকেই তাঁর পড়াশুনা শুরু হয় প্রথমে মালদহের টাউন স্কুলে (তখন যার নাম ছিল দি.এম.ই স্কুল) তাঁরপর অক্রুরমনি, মালদা কলেজ থেকে স্নাতক এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. এবং পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ।

কর্মজীবনে ক্রমান্বয়ে মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত বাঙ্গীটোলা হাইস্কুলের শিক্ষকতা, পরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের শিক্ষকতা, এবং গাজোল থানার এইচ.এন.এম. হাইস্কুলে শিক্ষকতা। এরপব ১৯৬৯ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে তিনি মালদহ মহাবিদ্যালয়ের সান্ধ্য বাণিজ্য বিভাগে বাংলা ভাষার অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন।

আপাদ মস্তক কবি এই মানুষটির সাহিত্য সৃষ্টির অধিকাংশ জায়গা জুড়েই আছে কবিতা। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থটির নাম 'আকাশ স্বপ্ন দেখে' (১৯৬৯ খ্রীঃ), এরপর যৌবন অভিমন্যু হও (১৯৭৭ খ্রীঃ)।

গদ্যগ্রন্থ — বিভূতিভূষণ কবি ও প্রকৃতি 'সাধক' (১৯৮৩ খ্রীঃ),

আলোচনা গ্রন্থ — জহুরা মন্দির, মালদা উৎসব ও মেলা, (১৯৮১ খ্রীঃ)।

গবেষণাধর্মী অন্যান্য প্রবন্ধ — মালদহের সংস্কৃতি, একাল ও সেকাল (১৯৮৫ খ্রীঃ/উত্তরবঙ্গ সংবাদ), মালদহের প্রধান লোক উৎসব গম্ভীবা (দর্শক পত্রিকা ১৯৮১খ্রীঃ), মালদহের সাঁওতাল : সংস্কৃতি ও জীবনচর্যা (মধুপর্নী/১৯৮৫ খ্রীঃ), এছাড়া বাংলা দীর্ঘ কবিতার সঙ্কলন গ্রন্থ এবং নিসর্গের কবিতা সঙ্কলন গ্রন্থ যে দুটি কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৮০ এবং ১৯৮৩ খ্রীঃ তাতেও দীপ্তিময় সরকারের কবিতা প্রকাশিত হয়।

১৯৮৬ সালের ৯ই মার্চ হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলন জনিত কারণে তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রভাত কুসুম ভাদুড়ী ঃ

এই কবির লেখা কবিতায় একদিকে সুকান্ত ভট্টাচার্য অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসুর প্রভাব অনুভব করা যায়। 'প্রতিশ্রুতি' গদ্যছন্দে লেখা। এক মালীর কাহিনী নিয়ে লেখা 'ইতিহাস' কবিতাটি। এছাড়া এই পর্যায়ে রয়েছে 'ভাঙ্গাবাড়ী', 'তখন আমি তুমি সে' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কবিতা।

গোপাল কৃষ্ণ ঘোষ ঃ

১৮৫০ খ্রীঃ মালদহ শহরে গোপাল কৃষ্ণ ঘোষ জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম হরচন্দ্র ঘোষ। কটক গর্ভনমেন্ট স্কুল, কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল, প্রেসিডেন্সি ও ডাফ্ কলেজের মেধাবী ছাত্র। আলিপুর কোর্ট ও হাইকোর্টেব উকিল পরে ১৮৮১ তে মুনসেফ পদে যোগদান। এডুকেশন গেজেট, বঙ্গদর্শন, Indian daily news প্রভৃতি পত্রিকায় বাঙ্গলা ও ইংরাজীর পদ্যপদ্যের লেখক। ন্যাশনাল ম্যাগাজিনে 'কপাল কুন্ডলা' উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বয়েছে 'কুসুমমালা (কাব্য - ১৮৭৭), ব্রহ্মচারী (কাব্যোপন্যাস), 'অর্পণা' (উপন্যাস) ইত্যাদি।

সুধীর কুমার চক্রবর্তী ঃ

১৩২৭ বঙ্গাব্দে তথা ১৯২১ খ্রীঃ ১৪ই এপ্রিল মালদহ জেলাব কালিতলা নামক স্থানের এক ভাড়া বাড়িতে সুধীর কুমর চক্রবর্তীর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁব পিতার নাম ড: করুণাকান্ত চক্রবর্তী ও মায়ের নাম সরোজিনী দেবী। সুধীব চক্রবর্তী খুব সচেতন ভাবে সাহিত্যচর্চা করেননি। বলা যায় রাজনীতি ও সাংবাদিকতা তাঁকে মালদহ জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক ও নানাবিধ বিষয়ের তথ্যধর্মী বিষয় লিখতে উৎসাহ দিয়েছে। জীবনের প্রথম দিক থেকেই তিনি ছিলেন অনুশীলন দলের সদস্য। তারপর বামপন্থী রাজনীতি। সাংবাদিকতা করেছেন একটানা পঞ্চাশ বছর, দৈনিক বসুমতি' স্বাধীনতা, কালান্তর ইত্যাদির সাংবাদিক ছিলেন। মালদহ জেলা থেকে আজও প্রকাশিত গৌড়বার্তা, গৌড়কণ্ঠ, গঙ্গাহৃদি মালদা, এই সব প্রত্রিকার জন্মদাতা ও সম্পাদক ছিলেন তিনি। দীর্ঘ কুড়ি বছর ছিলেন মালদহ মিউজিয়ামের কিউরেটর। চার থেকে পাঁচটা ভাষা তিনি জানতেন। ভালবাসতেন উর্দু শায়র লিখতে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে — গৌড় পাড়ুয়ার ধবাম্লানে মালদহ, বিন্ধ্যকুশী গঙ্গাকন্যা মালদহ, একনজরে মালদহ, ইতিহাসের প্রবাহে ইসলাম, ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বাঙ্গালী, রামকেলী।

মালদহেব জুবলী রোডের এক বাড়িতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অকৃতদার এই মানুষটি বাস করেন। মারা যান ২০০২ সালে।

ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ ঃ

১৯৪০ সালে বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যশোহর জেলার সাগর দাঁড়ি গ্রামে ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন।

মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে ডঃ ঘোষ এক উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি একাধিক মহাবিদ্যালয়ে (মালদা কলেজে দীর্ঘদিন) তাঁর অধ্যাপনার জীবনে এবং ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পন্ডিত মনীষার সাহচর্য পেয়েছেন। তাঁর লেখালেখির বিষয় যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন। প্রায় পঞ্চাশের উপর তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব ইতিহাস, স্থাপত্য, মূর্তিতত্ত্ব, লোক সাহিত্য ও শিল্প ইত্যাদি রয়েছে। প্রত্যেকটি বিষয়ে লেখক অনুসন্ধান করেছেন গভীরভাবে, তুলনা করেছেন সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থাদির সঙ্গে তারপর সিদ্ধান্তে এসেছেন, এই ব্যাপারে প্রয়োজনে তিনি প্রচলিত ধারণার বিপরীতে গেছেন, এবং যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁর নিজস্ব মত। মালদহ জেলার লোক সংস্কৃতির

চর্চায় বিশেষ করে 'গম্ভীরা' অনেক নতুন দিগন্ত তাঁর হাতে উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর রচিত মৌলিক গবেষণা গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে, —

1. Kalighat Pats : Annals and Appraisal,
2. লোকসংস্কৃতি ঃ গম্ভীরা।
3. লোক সংস্কৃতি ও গম্ভীরা পূর্নমূল্যায়ন।
4. গৌড়বঙ্গের স্থাপত্য।
5. মালদহ জেলার পুরাকীর্ত্তি।
6. আচার্য বিনয় কুমার সরকার।
7. শ্রী চৈতন্য ঃ জীবন সাহিত্য ও দর্শন।
8. Chittabrosad : A doyen of Art world.
9. মালদহ জেলার ইতিহাস (১ম খন্ড ও দ্বিতীয় খন্ড)।

অমিত গুপ্ত ঃ

১৯৩৩ সালে কবি অমিত গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুকুমার গুপ্ত, মাতা মৃণালিনী গুপ্ত। কবির জীবনের শৈশব কেটেছে কার্শিয়াং জেলার পাহাড়-জঙ্গল এর সাহচর্যে, এবং সাহিত্য রস পিপাসু মায়ের সান্নিধ্যে। এই-ই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা যা পরবর্তী কালে তাঁকে কবিতা লেখার প্রেরণা ও উপকরণ দিয়েছে। এরপর লেখাপড়া কলকাতা ঢাকুরিয়া রামচন্দ্র হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। এরপর থেকেই মালদহ জেলার স্থায়ী বাসিন্দা। অক্রুরমণি স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় থেকেই কংগ্রেস বিরোধী সক্রিয় বামপন্থী রাজনীতিতে যোগদান। আত্মগোপন করে থাকেন দীর্ঘদিন। ধরা পড়েন গড়মুহুরী থেকে। পরবর্তী পড়াশুনা মালদা কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ। ১৯৫৭ সালে স্নাতকোত্তর লেখাপড়া শেষে কালেক্টরেটে সরকারী চাকরী পান। সেই বছরই রাজনীতির কারণে বহিস্কৃত। ১৯৬২ থেকে বাম রাজনীতির সর্বক্ষণের সদস্য। তখন পার্টির কাজে বাঁকুড়া জেলার দামোদরের দুই পারে জমি দখলের লড়াই-এর কাজে তিনি একজন দক্ষ সংগঠক এবং এখানেই হোদল নারায়নপুর স্কুল এ হেডমাস্টার পদে যোগ দেন। শালী নদীর তীরের এই স্কুল এখানকার লোকজীবন তাঁকে পরবর্তীকালে অনেক সাহিত্য উপাদান দিয়েছে। তারপর আবার মালদহ শহরে ফিরে এসে অক্রুরমণি করোনেশন স্কুলে সহ শিক্ষক পদে যোগদান এবং এখান থেকেই অবসর জীবন যাপন। তিনি তাঁর কবিতা বিশেষ করে গল্প লেখার জন্য একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন। যার মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা বাংলার জন্য 'পেনের পুরস্কার ও রয়েছে। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্যে আছে —

কবিতা — শব্দে নিঃশব্দে।

গল্পগ্রন্থ — কাঠের পুতুল, ভাঙ্গাচোরা মানুষ সোজা জীবনের বৃত্তান্ত, তিনকান্ডের এক খিদে, সঞ্জয় উবাচ, পুনশ্চ সঞ্জয়, কালো মেঘের গায়ে হলুদ।

সম্পাদিত পত্রিকা — মালদহ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।

স্বপ্না রায় ঃ

মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন সাহিত্যিক শিশু মনের উপযোগী বিষয় নিয়ে ভাবেন এবং

লেখেন স্বপ্না রায় তাদের অন্যতম। প্রাক্ প্রাথমিক এবং প্রাথমিক বিষয়ের সঙ্গে প্রায় চার দশক ধরে যুক্ত থাকার ফলে তাঁর লেখালেখির বিষয় শিশু মনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তাঁর প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে আছে 'মিষ্টি কড়া বিশটি ছড়া (১৯৯৭), হাঁসুর বোধোদয় (১৯৯৭), অতুল মিতুল রাতুলেরা (২০০২), বেড়ালের নাম আহ্লাদী (২০০৫)। একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত ও তিনি হয়েছেন, উৎপল হোম রায় স্মৃতি পুরস্কার (নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য ফাউন্ডেশন, (২০০২), শিবরাম চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলন, মালদা শাখা, ২০০৫), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি সম্বর্ধিত 'জোয়ার' পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য তিনি। স্বপ্না রায়ের সাহিত্য সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে সমালোচক অরুণ মুখোপাধ্যায় বলেন---- ''স্বপ্না রায়ের লেখায় সারাক্ষণ শিশুমন কাজ করে, কল্পনা রূপকথা, পশুপাখির মনের সঙ্গে শিশুমনের সাযুজ্য তাঁর লিখন শৈলির বৈশিষ্ট্য। গল্পগুলি পড়তে গিয়ে মনে হয় স্বপ্না রায়ের আরও লেখা উচিত, কারণ স্বপ্না রায় অত্যন্ত সম্ভাবনাময়ী শিশু সাহিত্যের এক লেখিকা। যাঁর হাতে রয়েছে কলম নামক জাদু দন্ড যা শিশু মনের চাহিদাকে মেটাতে অবশ্যই সাহায্য করবে।'' ১৯৪৫ সালে হাওড়া জেলায় জন্ম। বাবা প্রয়াত সিদ্ধেশ্বর দত্ত মা প্রয়াত তারকবালা দত্ত। স্থানীয় মুক্তারাম দে জুনিয়ার স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেনী পর্যন্ত এবং ব্যাঁটরা মধুসূদন বালিকা বিদ্যালয়ে স্কুল ফাইনাল। হাওড়া গার্লস কলেজ থেকে সাম্মানিক বাংলা সহ বি.এ. ও কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম.এ । পরবর্তী কালে উঃ বঃ বি.এড করেন। শ্রীমতী রায় ১৯৭০ সাল থেকে মালদা জেলায় পাকাপাকি ভাবে বাস করেছেন।

পুষ্পজিৎ রায় ঃ

পেশায় অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ডঃ পুষ্পজিৎ রায় দীর্ঘদিন ধরে নিরলস ভাবে গদ্য-পদ্য, ছড়া-প্রবন্ধ-নিবন্ধাদির চর্চা করে আসছেন। তাঁর প্রকাশিত প্রায় দশটি ছড়া বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে (১) ছড়া শুধু ছড়া নয়, (২) হৈ চৈ ছড়া ঐ, (৩) বাছাই করা টাটকা ছড়া, (৪) ভিটেমাটি, (৫) আপনি কেমন করে হাটেন এত (৬) দৈত্যের জলযোগে আমার সন্তান, (৭) পারিজাত ফিরে আয়, (৮) বিতান সরকারের কবিতা, (৯) এইভাবেই বেঁচে আছি, (১০) পরমা নামের কুসুমগুলি, ইত্যাদি। তাঁর রচিত সুখপাঠ্য ছড়াগুলি স্পর্শ করেছে মানুষের মনের কোমল অনুভূতিগুলিকে স্পর্শ করেছে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার স্বরূপকে। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কিছু গদ্য রীতির কবিতা আছে। বিষয় অনুসারে আঙ্গিক নিয়ে সেগুলির মধ্যে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ, যার মধ্যে ভাষা, পুরাতত্ত্ব লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক, লোক সংস্কৃতির উপর লেখা তার বই 'গম্ভীরা'। যে বইটি সম্পর্কে গবেষক বিমলেন্দু দাম বলেছেন- 'তাঁর গম্ভীরা গ্রন্থ পূর্বসূরীদের গবেষণাদির সাহায্য নিলেও প্রধানত ক্ষেত্র সমীক্ষাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর এই সমীক্ষায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়ায় তা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে। (দৈনিক বসুমতী ২৪/১২/২০০০)। গবেষণা করেছেন লোকসংস্কৃতি নিয়ে যার মুখ্য উদ্দেশ্য এপার বাংলার লোকসংস্কৃতির তুলনামূলক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য।

১৯৪২ এর দিনাজপুর জেলায় জন্ম, বাবা রজনীকান্ত রায়, মা হেমন্তবালা দেবী। প্রাথমিক

লেখাপড়া জ্ঞানাঙ্কুর হাইস্কুল, তারপর রায়গঞ্জ কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর পড়াশুনা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্যক্তিগত পুরস্কার পেয়েছেন উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে (১৯৯৫) দক্ষিণবঙ্গ শিশু সাহিত্য সম্মেলন থেকে (২০০৩)। তাঁর সম্পাদিত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা জোয়ার (৩৫ বৎসর) বাংলা একাডেমী ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকা এবং সম্পাদনার জন্য পুরস্কৃত হয়েছে ২০০০ সালে।

গৌড় খন্ড মালদহ জেলার যে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর বিশ শতক থেকে তার প্রবাহ আজও বর্তমান। উল্লেখ্য বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক ছাড়াও আরও অনেক ব্যক্তিত্ব তাঁর মননশীলতায় নিত্য উন্মোচিত করেছেন নিজেকে এবং জেলার বিচিত্র বাতাবরণকে।

জেলার লোক সংস্কৃতি ও ভাষা বিজ্ঞান সম্পর্কে গদ্যরচনায় ডঃ রাধা গোবিন্দ ঘোষ, ডঃ ফনী পাল, ডঃ সুনীল ওঝা, সুবোধ চৌধুরী, মঃ আতাউল্লাহ্, কমল বসাক, প্রবাল রায়, এম.ডি. ইউনুস আলি, গোপাল লাহা, সত্য চৌধুরী, আবদুস সামাদ ইত্যাদিরা উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস সমাজ ভাবনা মূলক উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় উল্লেখযোগ্য হলেন-চিনু গুপ্ত, সুনীল গুপ্ত ত্রিদিব গুপ্ত, প্রশান্ত মিশ্র, শিবেশ দাস, যুগল কিশোর চক্রবর্তী, অঞ্জন সেনগুপ্ত, তৃপ্তি সাহা, অনুরাধা কুন্ডা ইত্যাদিরা। নাট্য রচনার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন নির্মল সান্যাল, নির্মল সেন, মিহির গোস্বামী, রবি ভট্টাচার্য, নীরেন চৌধুরী, দীপক ভট্টাচার্য্য ও প্রশান্ত মিশ্র।

কাব্য কবিতার ক্ষেত্রেও আছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। স্বাধীনতা লাভের আগে এবং অদ্যাবধি পর্যন্ত যে সমস্ত কবিদের নাম আমরা পাই তারা হলেন - গৌরগোবিন্দ সেন, অমল গুপ্ত, শিবেন্দু শেখর রায়, হরিপ্রসন্ন মিশ্র, কৃষ্ণবন্ধু দাস, অজিত মুখোপাধ্যায়, গৌর দাস, তুহিন দাস, পিনাকী চৌধুরী, পিনাকী রঞ্জন ঝা, জ্যোতি ঝা, অনির্বাণ সেন, দেবযানী চক্রবর্তী, প্রভাস চৌধুরী. দিলীপ তলোয়ার, তৃপ্তি সান্ত্রা, অনুরাধা কুন্ডা, অঞ্জন সেনগুপ্ত, নরেশ কুণ্ডু, শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস, বিপ্লব সেনগুপ্ত, নিলয় রায়, মিনতি দত্ত মিশ্র, অসীম গোস্বামী, নুরুল ইসলাম, মোহন চৌধুরী, সৌমিত্র সরকার, প্রদীপ দাস, ভারতী রায়।

মালদা থেকে প্রকাশিত ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা সমূহ

- মুরলী - সঃ তারাপদ মৈত্রেয় (১৯৯২) .
- কুমকুম - সঃ এ.কে.এস.নূর মহাঃ (১৯৩৯),
- বেনামী, জাগরণ, সুভাষ, আলপনা,
- পাণ্ডুলিপি - অসিত দাশ ও সুনীল গুপ্ত।
- বিষয়ক পত্রিকা (সংবাদ ও সাহিত্য)
- কুসুম - সঃ রাধেশ চন্দ্র শেঠ (১৮৯৭).
- মালদা সমাচার - সঃ,
- গৌড়দূত - সঃ লালবিহারী মজুমদার (১৯০৭),
- গৌড়দেশ - সঃ রাধেশচন্দ্র শেঠ .

- গৌড়বার্তা - সঃ রাধেশ চন্দ্র শেঠ (১৯০৭),
- মালদহ হিতৈষী - সঃ রমাপ্রসন্ন সাহা,
- গম্ভীরা সঃ কৃষ্ণচরণ সরকার (১৯১৪),
- মালদা আখবার - সঃ আব্দুল গনি (১৯২৪),
- মিনার - সঃ আব্দুর রহমান (১৯৩৮),
- ডমরু সঃ নন্দগোপাল চৌধুরী (১৯৩৮),
- আদিনা সঃ আকবর আলি চৌধুবী
- যুগসাহিত্য - সঃ বিধু মিশ্র ও প্রভাত কুসুম ভাদুরী (১৯৫০)
- সৃজনী - সঃ প্রভাত কুসুম ভাদুরী (১৯৫২)
- অনামী - সঃ দেবব্রত ভট্টাচার্য (১৯৫৩)
- কলকল্লোল - সঃ অজিত মুখোপাধ্যায় (১৯৫৪)
- দিশাবী - সঃ ভবতোষ খাঁ (১৯৫৭)
- পঞ্চমুখী - সঃ কেদারনাথ ভাদুড়ী (১৯৫৮)
- সৃষ্টি সঃ নিখিল বিহারী গুপ্ত (১৯৫৮)
- এ্যাটম - সঃ শিশর গুহ ও সমীর নিয়োগী (১৯৫৯)
- অগ্নিশিখা - সঃ শিবশঙ্কর চক্রবর্তী (১৯৫৯)
- ত্রিলেখা - সঃ দিলওয়ার হোসেন (১৯৬৫)
- প্যানোরমা - সঃ ডঃ মিহির কুমাব গোস্বামী, ছোটকারখানা, পুড়াটুলি
- সংকল্প - সঃ হরিপ্রসন্ন মিশ্র, সিঙ্গাতলা
- সারথি, আহ্বান, অন্বয়, চিহ্ন
- উত্তর মেঘ - সঃ দীপ্তিময় সরকার (১৯৭২)
- মালদার মাটি - সঃ অমর চন্দ্র ঝাঁ, এন.এস.রোড।
- মুক্ত মেঘ - সঃ তুহিন দাশ (১৯৬৭)
- শিশু আলেপন - সঃ সঞ্জিৎ সাহা, সর্বমঙ্গলা পল্লী।
- উৎস সুকান্ত - সঃ দেবযানী চক্রবর্তী বাঁশগাড়ী।
- শতাব্দী - সঃ নিখিল সাহা, হায়দারপুর।
- শ্রদ্ধার্ঘ্য - সঃ সুভাষ চক্রবর্তী, সিঙ্গাতলা।
- সাহিত্য পত্র - সঃ অঞ্জলী দাশ, বি.জি.রোড।
- বাল্মিকী - সঃ দিলীপ তলয়ার, মালঞ্চপল্লী।
- দশে দিক - সঃ দিলীপ তলয়ার, মালঞ্চ পল্লী।
- যুগলবন্দী - সঃ প্রবীর রায় ও দিলীপ তলয়ার, আনন্দম, বি.জি.রোড।

- স্বাক্ষর - সঃ রঞ্জিৎ মন্ডল, দৌলত নগর।
- সূর্যমুখী - সঃ শচীন্দ্রনাথ বালা, দাল্লা।
- মুহূর্ত এবং ভাবনা চিন্তা - সঃ অচিন্ত্য সেন, মকদুমপুর।
- অঙ্কুর - সঃ আনন্দসাগর রায়, চাঁচোল।
- কচিপাতা- সঃ আব্দুর রজ্জাক, বাবলা, মেহেরপুর।
- উন্মেদ - সঃ সফিউল আলম, নৈকন্দা, চাঁচোল।
- সংলাপ - দীপক বসু (অমিয় সুইট)
- স্পন্দন - সঃ অঙ্কন গুপ্ত, গ্রীন পার্ক।
- মেঠোসুর - সঃ আশিষ সেন, মানিকচক।
- কিশোরমন - সঃ পলাশ গঙ্গোপাধ্যায়, অভিরামপুর।
- দর্পণ - সঃ রবীন্দ্রনাথ পান্ডে ও অসীম সিংহ, কেন্দুয়া, আইহো।
- মুখ ও মুখোশ - সঃ সাধন দে, সনৎ ঝাঁ, কালীতলা।
- শিরস্ত্রাণ - সঃ নির্মল সান্যাল, ব্রডকাষ্ট, হায়দারপুর।
- অচিন মল্লার - সঃ অমিত মুখার্জী, নজরুলবাগ।
- অনবদ্য - সঃ এম.এ.রজ্জাক, বাবলা, মেহেরপুর।
- জনরব - সঃ মোহন চৌধুরী, কে.জে.সান্যাল রোড।
- যখন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ - সঃ অসীম শর্মা, রাজীব সিংহ, গঙ্গাবাগ।
- মুখর - সঃ দিলীপ তলয়ার (মালদা সাহিত্য পরিষদ), কালীতলা।
- অমৃতস্য - সঃ ধর্মব্রত চৌধুরী, মোথাবড়ী।
- কার্তুজ - সঃ রাজীব সিংহ, সিদ্ধার্থ রঞ্জন চৌধুরী, দীপঙ্কর রক্ষিত, বিধান পল্লী।
- অন্যমনে - সঃ মহুয়া মজুমদার, বিবেকানন্দ পল্লী।
- শূন্বান্তি - সঃ ঋত্বিক ঘোষ, গয়েশপুর।
- অন্বেষা - সঃ মলয় রঞ্জন সাহা, ব্যাঙ্ক কলোনী।
- মেঠোধূলি - সঃ ফিরোজ সরকার মুন্না, পাকুয়াহাট।
- সাহিত্য তৃষা - রাজীব সিংহ, গোলাপট্টী।
- আনন্দম্ - সঃ প্রবীর রায়, বি.জি.রেড।
- সর্বশেষ সংস্করণ - সঃ তুহিন দাশ, সিঙ্গাতলা।
- দিন যায - সঃ দিলীপ তলয়ার ও অসীম রায়, রেলকলোনী।
- অনুভব - সঃ প্লাবন রায় ও চন্দন দত্ত, বিধান পল্লী।
- উবাচ - সঃ সংরাগ চক্রবর্তী, অর্ঘপ্রসাদ নাগ ও সৌরীশ ঝাঁ, সুভায পল্লী।
- রোহিতাশ্ব - সঃ দিলীপ তলয়ার ও রাজীব সিংহ, মালঞ্চ পল্লী।

- উৎস - সঃ দিলীপ তলয়ার, মালঞ্চ পল্লী।
- এগিয়ে এসো - সঃ পার্থ রায়, জামতলী, পুড়াটুলী।
- বিহঙ্গ - সঃ প্রণতি নাথ, পিরোজপুর।
- পুষ্পপ্রভাত - সঃ অনুয়ারল হক, শেরশাহী।
- দিপান্বিতা - সঃ বিপ্লব সেনগুপ্ত, দেশবন্ধু পাড়া, ঝলঝলিয়া।
- উদয়ন - সঃ প্রবাল আচার্য (সাহিত্য শারদ), সর্বমঙ্গলা পল্লী।
- সাহিত্য এক্তেলা - সঃ নিলয় রায়, বিধান পল্লী।
- জোয়ার - সঃ পুষ্পজিৎ রায়, রামকৃষ্ণ পল্লী।
- আরণ্যক - সঃ অসীম গোস্বামী, বি.এস.রোড।
- এই সময়ের স্বরলিপি - সঃ অশোক সেন, পূর্বদেশবন্ধু পাড়া।
- মালদা সাহিত্য পরিষদের পত্রিকা - সঃ অমিত গুপ্ত, কালীতলা।
- বাদিয়াবার্তা - সঃ আবদুল সামাদ, মীরচক।
- বনি আদম - সঃ আব্দুল সামাদ, মীরচক।
- শেরপা - সঃ নৌশাদ আলি, মীরচক কারবালা।
- ভিটেমাটি - সঃ হরিচরণ সরকার মন্ডল, কালিয়াচক।
- গৌড় মানস - সঃ ওংকার চৌধুরী, সিঙ্গাতলা।
- মেখলি - সঃ অমিতাভ চক্রবর্তী, গৌড়রোড গার্ডেন।
- রূপান্তরের পথে - সঃ প্রভাস চৌধুরী, অভিরামপুর।
- একবিংশ - সঃ বেণু চৌধুরী, বিধান পল্লী।
- সান্নিধ্য - সঃ পলাশ গঙ্গোপাধ্যায়,অভিরামপুর।
- বিকল্প - সঃ রাজীব সিংহ, গোলাপট্টি।
- শতফুল - সঃ দেবাশিস দেবশর্মা, অতুল মার্কেট।
- ধ্রুবজ্যোতি - সঃ অসিত দাশ, অভিরামপুর।
- রাজ নগর - নিশীথ কুঃ মন্ডল, রাজনগর, কালিয়াচক।
- সিসৃক্ষা - সঃ সৌমিত্রি রঞ্জন চৌধুরী, সিঙ্গাতলা।
- আমোঘ - সঃ আচার্য সুসতানন্দ অবধূত, এন.এস. রোড।
- গঙ্গা মহানন্দা - সঃ রবীন্দ্রনাথ পান্ডে, মধ্যম কেন্দুয়া, আইহো।
- সাহিত্য তরঙ্গ - সঃ পার্থ বসাক, শরৎচন্দ্র রোড।
- নবতরঙ্গ - সঃ মহঃ সাফিজুদ্দিন আহমেদ, যদুপুর।
- গৌড় পান্ডুয়া - সঃ মহঃ ওয়াহেদ আলি, চাঁচোল।
- দীদার - সঃ মহঃ ওযাজেদ আলি, মীরচক।

- সমান্তরাল - সঃ এম.ডি.ইউনুস আলি, বাহারাল।
- শান্তিদূত - সঃ এম.ডি.ইউনুস আলি, বাহারাল।
- দীপশিখা - সঃ কনককান্তি পাল, নালাগোলা।
- এই প্রজন্ম - সঃ কৌশিক জোয়ারদার, রামকৃষ্ণ পল্লী।
- কল্পতরু - সঃ রবীন্দ্রনাথ পান্ডে, মধ্যম কেন্দুয়া, আইহো।
- দীপিকা সঃ এম হামিদুল হক, যদুপুর।
- নান্দনিক - সঃ তারক সরকার, চাঁচোল।
- অন্বয় - সঃ বণজিৎ চৌধুরী, বিবিগ্রাম।
- নবরূপে কান্ডারণ - সঃ সুবোধচন্দ্র সরকার, কান্ডরণ, সামসী।
- লৌকিক সৃজনী - সঃ সুবোধ চৌধুরী, মালদা।
- সৃষ্টি - সঃ বিমল গুপ্ত, পিরোজপুর।
- উত্তরণ - সঃ রফিকুল হক, জামতলা, গাজোল।
- গুড় গুড়িবা - সঃ আবু ইকবাল, বারোগাছিয়া, চাঁচোল।
- প্রিয়কথা - সঃ এম.ডি.আনুয়ারুল হক, মোসেমপুর, সুজাপুর।
- যাত্রিক - সঃ মহঃ আকমল হোসেন, ছোট সুজাপুব।
- নান্দীক - সঃ সৌমিত্র সরকার, স্টেশন রোড।
- যোগাযোগ - সঃ বিশ্বজিৎ সাটিয়ার, বালিয়াডাঙ্গা, কালিয়াচক।
- কুশ - সঃ নির্মাল্য চক্রবর্তী, ডি-৮৮, পূবারুন, মালদা।
- বোধিতল - সঃ অনুপ চক্রবর্তী, এ-১২৮ পুবারুন, মালদা।
- এক পশলা ইচ্ছে - সঃ সুরঞ্জনা রায় ও অন্যান্য, সর্বমঙ্গলা পল্লী।
- শব্দনৈঃশব্দ - সঃ দিলীপ তলয়ার, মালঞ্চ পল্লী।
- গৌড়ভূমি - সঃ দীপক চৌধুরী, কালীতলা (শারদ)।
- গৌড় মালদা সংবাদ - সঃ অভিজিৎ চৌধুবী, কালীতলা (শারদ)।
- আলাপন - সঃ আবদুল আহাদ, বিবিগ্রাম।
- উত্তর দিগন্ত - সঃ অজিত মুখোপাধ্যায় ও সন্তোষ চক্রবর্তী, ফুলবাড়ী।
- কলোকল্লোল - সঃ অজিত মুখোপাধ্যায় ও মিহির আচার্য, ফুলবাড়ী।
- উত্তাল কলোরোল - সঃ সত্য চৌধুরী, কালীতলা।
- গ্রন্থনা - মালদা জেলা বইমেলা কমিটি।
- এষণা - সঃ বনবিহারী চৌধুরী, সিঙ্গাতলা।
- সেনাপতি - সঃ দীপঙ্কর রক্ষিত, চাঁচল।

জীবিকা-ধারা ঃ

জীবিকা কে কেন্দ্র করেও নির্দিষ্ট স্থানে একটি জনবসতি গড়ে ওঠে। এটি সাধারণত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবিকাকেই সুনির্দিষ্ট করে। যেমন - সাহাপুর, পুড়াটুলি, কুমারপাড়া, তাঁতিপাড়া ইত্যাদি।

● **তথ্য সহায়তা**

১. বঙ্গীয় লোক সাহিত্য কোষ — সংসদ।
২. সাহিত্য চরিতাভিধান — সংসদ (১ম, ২য় খণ্ড)।
৩. ভূমি রাজস্ব ও জরিপ — টোডরমল।
৪. মালদহের পূর্বসূরী গ্রন্থকার, জীবনালেখ্য — কমল বসাক।
৫. ভ্রমণে, দর্শনে মালদহ — কমল বসাক।
৬. গৌড় পাণ্ডুয়ার কাহিনী ও কিংবদন্তী — শ্রীকৃষ্ণকমল সরকার।
৭. আমি কালাপাহাড় — শ্রীবিশ্বনাথ বসাক।
৮. বাংলা পীর-ফকিরদের কথা — গিরীন্দ্রনাথ দাস।
৯. কবিকঙ্কন মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল — আশিস কুমার দে, বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত।
১০. বাংলা ভাষায় আরবী, ফারসী, তুর্কী, হিন্দী, উর্দু শব্দের অভিধান — সম্পাদনা রফিকুল হক, বাংলা একাডেমী।
১১. সরল বাংলা অভিধান — সুবল চন্দ্র মিত্র, সংসদ।
১২ বঙ্গীয় শব্দ কোষ — হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মালদহ্ জেলার আঞ্চলিক শিকড় অনুসন্ধান

ইতিহাসের যে অংশে স্থাপত্য ভাস্কর্য, শাস্ত্র সাহিত্য, শিলালিপি, মন্দির, মসজিদ অথবা নগর — সেগুলি একটি জাতির উত্থানের, উন্নয়নের প্রশাসনিক সালঙ্কৃত নিদর্শন; সেখানে সাধারণ জনজাতির বেদনার ইতিহাস মিলবে না। একটি জাতিকে সমাজ দর্পণের নিরিখে, আত্মনিয়ন্ত্রণের সত্য স্বরূপে বিচার করতে হলে খুঁজতে হবে বিভিন্ন সময়ে অসচেতন ভাবে ফেলে রেখে যাওয়া যুগ চিহ্নের ভেতরে, যেখানে তার প্রত্যাশার, প্রত্যয়েব কথা অনবগুণ্ঠিত হয়ে প্রকটিত। বাঙালী জাতির মননচর্চার স্বকীয়তা খুঁজতে যেমন আমাদেব দ্বাবস্থ হতে হবে নাথসাহিত্য, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন, মনসার ভাসান, চন্ডীর অনুধ্যান, আধ্যাত্ম সঙ্গীত, প্রণযগাথা, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথায় লিপিবদ্ধ জৈব বাসনার বিচিত্র আন্তরিক প্রকাশে; তেমনি ভাবে এই স্বকীয়তা লুকিয়ে থাকে তার ছোট্ট গৃহকোনটির অলঙ্করণে, বাসভূমিটির সৌন্দর্য অনুধ্যানেও। তাই একটি জাতির নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের জন্য স্থান নামের আন্তরিণ প্রত্নফসিলের স্তবে স্তবে আলো প্রক্ষেপণ সংস্কৃতিরই অন্যতম অঙ্গ। স্থান নামকে আমরা বর্তমানের সুবেশিত রূপেই চিনি বা জানি কিন্তু তারই প্রকোষ্ঠে, গর্ভগৃহের ছায়াছন্ন অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহাসিক নানা লুপ্ত, বিস্মৃত উপাদান বা আমাদের ঐতিহ্যের বুনিয়াদ কিন্তু পরিচর্যার অভাবে যা লুপ্ত, বিস্মৃত প্রায়। আমাদের পূর্বপুরুষের আচরিত ধর্ম-কর্ম, অধ্যাত্ম-দর্শন, আচার-সংস্কার, দেবতা-অপদেবতা, পাথরের স্তূপ ভগ্নশিলা এককথায় তাদের প্রাত্যহিক জীবন ভীষণ ভীষণ ভাবে বেঁচে রযেছে আমাদের চতুর্দিকে, বহু বছরের বিবিধ সংস্কৃতায়নও যে বলি রেখা মুছে ফেলতে পারে নি।

সমগ্র ভারতবর্ষ যে সংস্কৃতি নিয়ে বিশ্বের মধ্যে ব্যাতিক্রম পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র জেলা মালদহও তার বাইরে নয়। আধুনিক নৃবিজ্ঞানেব সাক্ষ্যে বাঙ্গালী একটি মিশ্র সংকর জাতি। কোল ভাষাভাষী অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠী, দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী, ভোট-চীনায় মোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠী এবং উত্তর-ভারতীয় আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে এই সংকর জাতির উদ্ভব। মালদহের স্থান নামে এখনও এই প্রাক্ আর্যজনের শাব্দিক দান প্রচুর।

মালদহ জেলার বর্তমান থানার সংখ্যা এগারটি — (১) ইংরেজবাজার, (২) কালিয়াচক (৩) মালদহ (৪) হবিবপুর, (৫) রতুয়া, (৬) মানিকচক, (৭) খরবা, (৮) চাঁচল, (৯) হরিশ্চন্দ্রপুর,

(১০) গাজোল, (১১) বামনগোলা। এই থানাগুলির নাম তথা একাধিক মৌজার বিবরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জেলার জনজাতি, তাদের আচার ব্যবহার ও সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়।

পুরাতন মালদহ ঃ

মালদহ জেলার এগারটি থানার অন্যতম হল পুরাতন মালদহ থানা। পাঠান, মুঘল এমনকি ইংরেজ আমলেও প্রখ্যাত বন্দর নগর এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল এই এলাকাটি। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের অন্যতম সিকন্দর শাহর (১৩৫৯ - ৯০ খৃঃ) মুদ্রায় এই শহরটিকে শহর-ই-নৌ বা নতুন শহর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২২৪ বর্গ কি. মি. আয়তনের ত্রিভুজাকৃতি এই থানাটি মহানন্দা, টাঙন, কালিন্দ্রী নদী দিয়ে তিন দিকে বেষ্টিত। বর্তমানে এই থানা প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির অংশবিশেষ হলেও বরেন্দ্রভূমের ভৌগোলিক বিশেষত্ব থেকে এই অঞ্চলের পার্থক্যও রয়েছে। বরিন্দ অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত নীচু এই এলাকাতেই রয়েছে অসংখ্য পুরাতন নদী, খাত, খাল, বিল, দহ, দাঁড়া ও পুকুর। উচ্চভূমি এবং নিম্নভূমির সমন্বয়েই এই অঞ্চলটি মাল এবং দহ'র মিশ্র প্রকৃতির চেহারা নেয়, যা মালদহ নাম দিয়ে সমগ্র জেলাটিকে চিহ্নিত করে।

সংস্কৃতির দিক থেকেও এই অঞ্চলটি মিশ্র প্রকৃতির। এখানকার নিজস্ব অধিবাসী যেমন, মালো, কৈবর্ত, পাঁঝরা, কুঁঝরা, নাড়েগুস্তি, মোমিন ইত্যাদিরা রয়েছেন তেমনি বন্দর শহর হওয়াতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির মানুষ এখানে এসে তাদের আস্তানা গড়ে তুলেছেন। এদের মধ্যে মুসলমান, মারোয়াড়ী, পাঞ্জাবী, হিন্দু, শিখ, গুজরাটি এবং বিহারীরা রয়েছেন। বরিন্দ অঞ্চলের বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিচিত্র রীতি নীতি মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছে। এছাড়া মুসলীম সংস্কৃতিও তার নিজস্ব ছাপ রেখে গিয়েছে।

১২৪টি মৌজা, একটি পৌরসভা, উচ্চশিক্ষার জন্য একটি মহাবিদ্যালয় নিয়ে নতুনভাবে গড়ে উঠছে পুরাতন মালদহ থানা শহরটি।

মালদহের কীর্তিমান মানুষদের অনেকেরই জন্মস্থান এই পুরাতন মালদহ। জন্মেছেন বিখ্যাত গম্ভীরা শিল্পী সৈয়দ সোলেমান বা মোহাম্মদ সোলেমান।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মৌজা ঃ

আইহো রানী (১৩) ঃ

বরিন্দ অঞ্চলে প্রাচীন আধিবাসী কোচ রাজবংশীদের বাস। তাদেরই একটা সম্প্রদায় এই অঞ্চলে বসবাস করে। এই সম্প্রদায়ের পূজিত প্রাচীন গ্রামদেবী চণ্ডীর প্রচলিত নাম 'রাইহো'। রাজবংশী ভাষায় 'র'-ধ্বনি অ-ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে 'আইহো'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। এখনও এই প্রাচীন দেবীর স্থানে উৎসব হয়। অঞ্চলটি প্রাচীন কাল থেকেই বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল অনুমান করা যায়। এই গ্রামে এখনও দুটি শিবমন্দির আছে। 'মঠের গম্ভীরা' নামে গম্ভীরা পুজো হয় বলে মন্দিরটির নামও মঠের গম্ভীরা শিবমন্দির। প্রায় শতাব্দী প্রাচীন এই শিবমন্দিরের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ ভাগে নির্মিত আরও একটি শিবমন্দির আছে। সেখানে চারটি শিবলিঙ্গ এবং দুইটি সুন্দর পাথরের বিষ্ণুমূর্তি আছে।

গম্ভীরা উৎসব এই গ্রামের বৈশিষ্ট্য। আর্থিক এবং অন্যান্য কারণে এই পূজোর সংখ্যা অনেক কমে এলেও এখনও বছরে ১৬ থেকে ১৭টি গম্ভীরা পূজা হয়। টাপা নাচের জন্যও এই অঞ্চল প্রসিদ্ধ। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের এবং আনন্দের পরিচয়বাহী এই টাপা নাচ। কাপড়ে ঢাকা বৃহৎ টাপার মধ্যে নর্তক বা শিল্পী বসে হাতটিকে টাপার মুখ দিয়ে বের করে রাখে। হাতটি সাদা কাপড়ে ঢাকা থাকে, দু' আঙ্গুলে কাগজের বকের ঠোঁট। খালে বিলে মাছ ধরার চিত্র অত্যন্ত সার্থকভাবে চিত্রিত এই একক নৃত্যভঙ্গিমার মাধ্যমে।

ফার্সী ভাষায় (?) 'রাহী' শব্দের অর্থ পথিক বা তীর্থযাত্রী। পূর্বাঞ্চলবাসী পাণ্ডুয়া যাত্রীরা এই জায়গায় বিশ্রাম নিত। রাহী (হো) > রাইহো > আইহো। এইভাবেও স্থান নামটি চিহ্নিত হতে পারে।

বিখ্যাত গম্ভীরা শিল্পী ইন্দ্রদমন শেঠ (১৯০৫ - ১৯৮০) এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁর অনেক বিখ্যাত অসাম্প্রদায়িক রচনার একটি হল —

সমান চোখে দীন-দুনিয়াকে দেখো পশুপতি
দুনজর‍্যা (দুইচোখে) কর‍্যা শেষে ভেঙ্গো না পীরিতি।

এখানে বসবাস করতেন অন্য একজন গম্ভীরা শিল্পী ভূপেন্দ্রনাথ সাহা।

মহিষবাথানি (১৯) ঃ

মালদহের এই অঞ্চল দীর্ঘ সময় ছিল বাণিজ্য সমৃদ্ধ এবং নিম্নমধ্যবিত্ত মৎস্যজীবী অধ্যুষিত। এরপর মালদহে চৈতন্যদেবের আগমন উপলক্ষ্যে এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। বেড়ে যায় নিরামিষ ভোজী মানুষের সংখ্যাও, কারণ এই অঞ্চলের বসবাসকারী জৈন এবং আগরওয়ালা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষও নিরামিষাষি। তখন দুগ্ধজাত খাদ্য দ্রব্যাদির প্রয়োজন মেটাতেই একটি বিশাল এলাকা গরু-মহিষের বাথানে পরিণত হয়েছিল। আজও সেটি মহিষ-বাথানি নামেই পরিচিত।

কমলদিঘী (২৯) ঃ

এই দিঘীটির আসল নাম কালুয়াদীঘি। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত পীর মখদুম শাহ জালালুদ্দিনের প্রথম শিষ্য কালু ঘোষ যিনি এই অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন তারই নামে চিহ্নিত। এক সময় এই দিঘীতে প্রচুর পদ্ম ফুটত। কালুয়া দিঘী মৌজা তাই কমল দিঘী নামেই সুপরিচিত।

ধূমদিঘী (৩০) ঃ

গাদ্দি পূজার নাচ এই গ্রামের অন্যতম উৎসব। মালদহের নিজস্ব লোক উৎসবের অন্যতম এই 'গাদ্দি পূজা'। জৈষ্ঠ্য মাসে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই কবিরাজ বা সন্ন্যাসী দিন তারিখ নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করেন। নানারকম অসুখ-বিসুখ, রোগ-ভোগ, ও মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই পূজা করা হয়। কালী বা চণ্ডীর মতোই শক্তিদেবী হচ্ছেন এই গাদ্দি দেবী। ধূপ-ধুনো. সিঁদুর ও অন্যান্য উপাচারে নিজেরাই পূজো করেন। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ডাকা হয় না। পূজোয় পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। দশ-বারোজন সারাদিন

উপবাসে থেকে রাত্রে তামাসা ও ভূত নাচানো অনুষ্ঠান করেন। এই পর্বই গাদ্দি পূজোর নাচের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রতি বছর পূর্ব-নির্ধারিত ব্যক্তিরাই এই নাচে অংশ গ্রহণ করে থাকে। আতপচাল এবং চিনি খেয়ে, ঢাকের বাদ্য শুরু হলে নাচ শুরু হয়। পোশাক হিসাবে ব্যবহৃত হয় লাল ধুতি এবং উর্ধাঙ্গে লাল জামা যা ব্লাউজের মত ছোট। হাতে পিতলের চুড়ি, শাঁখা, গলায় চাঁদির মালা অথবা শোলার মালা। শোলার তৈরী কালী, চণ্ডী কালী, চামুণ্ডা মোখা সহযোগে ঢাকের তালে তালে দলবদ্ধভাবে এই নাচ গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলতে থাকে।

ভাট কালনা (৫৭) ঃ

পুরাতন মালদহের এই গ্রামটিও এক সময় সমৃদ্ধ ছিল মনে হয়। .... বিখ্যাত তেভাগা অন্দোলন যা সমস্ত বাংলাদেশের ভাগচাষীদের অধিকারকে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শুরু হয়েছিল, মালদহে তার সূত্রপাত হয় এই গ্রাম থেকেই। স্থানীয় মানুষজনেরা আজও সেই লড়াই-এর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

বৃদ্ধি কামঞ্চা (৬৬), কামঞ্চা (৮৮) ঃ

ঐতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে খালিমপুর তাম্রশাসনে 'ক্রৌঞ্চশুভ্র' নামে যে গ্রামটির উল্লেখ পাওয়া যায় তারই বিবর্তিত এবং পরিবর্তিত নাম কামঞ্চা। প্রাচীনকালে দুটি মৌজার মিলিত রূপই অভিন্ন ক্রৌঞ্চশুভ্র গ্রাম ছিল এই রকম অনুমান করা যেতে পারে; যা এক সময় ভৌগোলিক দিক থেকে পরিচ্ছন্ন এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধও হয়ত ছিল।

রাজবংশী জাতি অধ্যুষিত এই গ্রামটি হিন্দু, বৌদ্ধ আমলে যে যথেষ্ট জনবহুল এবং সমৃদ্ধ ছিল তার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। পুরানো লাল শক্ত মাটির গ্রাম এই কামঞ্চা। গ্রামের মধ্যস্থলে রয়েছে সুবিশাল প্রাচীন বটগাছ। এই বটগাছের তলায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজবংশীদের আরাধ্য দেব দেবী কালী, লক্ষ্মী, ভূত, সাহাজা পীর। মুসলিম প্রভাবে পীর ও স্থান করে নিয়েছেন এখানে। দেবী কালীর জন্যে নির্দিষ্ট পাঠা আর পায়রা, লক্ষ্মীকে ধান কলা আর দুধ, পীরকে গুড়, ধুপ আর মাটির ঘোড়া। এখানকার জনপ্রিয় উৎসব হল নবান্ন, অঘ্রাণ মাসের প্রথম মঙ্গলবার যা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের সকলে এই সময় মানত করে। এই উপলক্ষে সারাদিন ব্যাপী পূজা ও মেলা বসে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সেখানে আনন্দে মেতে উঠে।

পপরা (৬৯) ঃ

পুরাতন মালদহ তখন শুধু এক বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্রই ছিল না, রাজধানী পাণ্ডুয়ার মূল্যবান পণ্যসমূহ প্রেরণ করার জন্য মধ্যবর্তী পর্যায়ে পুরাতন মালদার কাটরায় তা রক্ষিত থাকতো। কাটরার প্রবেশ দ্বারে সুদৃঢ় স্তম্ভ এখনও বর্তমান। অন্য দুটি নিশ্চিহ্ন। উত্তর-দক্ষিণে একটি দীর্ঘ দরদালান জাতীয় অংশ আছে। তার মধ্যে দিয়েই পাকা রাস্তা গেছে। ষোড়শ শতকের শেষভাগে এটি তৈরী হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। এই কাটরাই বর্তমান পপরা।

তিল ভোগ - সর্দারপুর (৭২) ঃ

রামবাবা আশ্রমে সাঁওতালী সমাজের অভিনব বাসন্তী পূজা ও বিজয়া দশমীর মেলা

বিখ্যাত। এছাড়া ইটাখোলার প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রীপাটের অন্নকূট উৎসব। তিলভোগ নামটি এই উৎসবেরই একটি অন্যতম অঙ্গ থেকে আসতে পারে।

কুতুবপুর (৭৯) :

ইসলাম শাসনের ইতিহাসে হযরত-নুর-কুতুব-আলমের বিশেষ ভূমিকা আছে। মালদহ জেলায় তিনি পাণ্ডুয়ায় অবস্থান করতেন। তাঁর অনুগামীরা মালদহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করতেন এবং অনুরাগবশতঃ সেই অঞ্চলে নামকরণ করতেন পীরের নামে। এই রকমই একটি গ্রাম বর্তমান পুরাতন মালদহের কুতুবপুর। এটি পীর প্রতিষ্ঠিত একটি 'চিল্লাখানাও' হতে পারে। এই অঞ্চলটি এক সময় কাঁসার বাসন তৈরীর জন্য বিখ্যাত ছিল। এখনও এখানকার কংসবণিকরা সে গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এখানে আছে ৮৬ বছরের পুরাতন বিখ্যাত প্রশান্ত শেঠের গম্ভীরা গানের দল।

কালুয়ারী (৮২) :

মালদহ শহর থেকে উত্তরদিকে চার কি.মি. দূরে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পাশে নারায়নপুর B.S.F Camp থেকে পূর্ব দিকের চার কি.মি. পিচ রাস্তা সোজা চলে গেছে কালুয়ারীর দিকে। মুসলিম অধ্যুষিত এই মৌজাটি ঘিরে রয়েছে সাঁওতাল অধ্যুষিত কমলপুর, পালিয়া কামঞ্চা, শ্রীরামপুর, পাথর মাধাইপুর, যাত্রাডাঙা এবং নতুন করে গড়ে ওঠা মুসলিমপুর। (বশাতলী অংশ)

এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। বিশেষত তারা 'আহলে হাদিস' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার জনগণ বাইরের লোকেদের সাথে বাংলা ভাষায় কথা বললেও গ্রামের প্রচলিত ভাষা 'বাদিয়া'।

এই গ্রামের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল এদের নিজস্ব উৎসব পালনের প্রক্রিয়ায়। মূলত দুটি উৎসব এরা পালন করে একটি ঈদ-উল-ফিতর অপর ঈদ-উদ-জোহা।

প্রথম ঈদের আকর্ষণ হল এই উৎসবের আগে নিয়ম মাফিক প্রত্যেক গ্রামবাসীর (দেয় ক্ষমতা সম্পন্ন) কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ ফেতরা নেওয়া হয়। যা উৎসবের দিন গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অন্যদিকে ঈদ-উদ-জোহাতে এই গ্রামে পশু কুরবানী দেওয়া হয়, যার তিনভাগের দুইভাগ বিতরণ করা হয় গরীব দুঃখীদের মধ্যে। হিন্দু - মুসলমান, আত্মীয়-স্বজন নির্বিশেষে সবাই আমন্ত্রিত হন এবং মহা সমারোহে দিনটি প্রতিপালিত হয়।

এই গ্রামের লোকের প্রধান পেশার মধ্যে রয়েছে কৃষিকাজ এবং ব্যবসা। ইদানিং শিক্ষিত লোকেরা শিক্ষকতা এবং পুলিশ ফোর্সে কর্মরত। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান ছাড়া অন্যান্য সব্জিও রয়েছে।

কালুয়ালী মৌজার অন্তর্ভুক্ত অন্যতম একটি গ্রাম বলাতলী। প্রায় ১০০ বছরের পুরাতন এই গ্রাম গড়ে ওঠে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে, ইংরাজী ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রামের অভ্যুত্থানের পেছনে আছে ব্রিটিশ শাসনাধীন শোষিত বাংলার এক চালচিত্র। ব্রিটিশ শাসকের পীড়নে মালদহের মানুষ যখন প্রায় সর্বস্বান্ত এবং দিশাহারা ভিটেমাটি ছাড়া প্রায় অনেকেই, এই বিপর্যয়ে প্রকৃতিও

হয়ে উঠল বিমুখ। কলেরা বা ওলাওঠার মত কালান্তক রোগ মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল প্রত্যন্ত এই সব গ্রামে। মানুষজন দলবদ্ধভাবে গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগল এই দুঃসময়ে ফজর হাজি, আমীর হাজি, ওয়াহেদ হাজি ইত্যাদি বেশ কিছু অবস্থা সম্পন্ন লোক এই স্থানটি অনুসন্ধান করেন এবং নিরাপদ বুঝে এইখানে বসতি নির্মাণ করেন। তখন এই স্থানে বাস করত কয়েক ঘর সাঁওতাল পরিবাব।

বর্তমানে বলাতলী নামে পরিচিত এই গ্রামটির পূর্ব পরিচয় ছিল বটতুলী নামে। নামকরণের এই ইতিহাসের পশ্চাতে রয়েছে এক বটগাছ। বিশাল আকৃতির এই বটগাছটির বিস্তৃতি প্রায় এক একর জায়গা জুড়ে। উৎসব অনুষ্ঠান মানুষজনের বিশ্রাম - আলোচনা এবং বাইরের মানুষের কাছে গ্রামের পরিচয়ে এই বটগাছটিই ছিল অন্যতম, স্থানীয় জমিদার কালু চৌধুরী তাঁর প্রিয় হাতীটিকেও এইখানেই বেঁধে রাখতেন। এই গ্রামের উত্তরে রয়েছে এক বিশাল বিল যা 'বড়াবিল' নামে পবিচিত। গ্রামটির নামকরণে এই বিলটির ভূমিকাও কম নয়। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে রয়েছে সরকারী সংরক্ষীত অরণ্য, উত্তব প্রান্তে বনসাহেবের বাগান বা 'ঘ্যারা', জামি মসজিদ সহ চারটি মসজিদ এবং ঐতিহ্যসম্পন্ন কিছু বাড়ীও রয়েছে এই গ্রামে, একটি হাইস্কুল ও একটি প্রাইমারি স্কুলও আছে। এই প্রাইমারী স্কুলটির পেছনে আছে কচারিপুকুর। ১৯১৫ - ২০ সালের কাছাকাছি কোনও এক সময়ে এই এলাকার জমিদারের কাছারি বাড়ি ছিল এই পুকুরের পাশেই। আর এই কাছারি থেকেই পুকুরের নাম হয় কচরি পুকুর। মুসলিম অধ্যুষিত এই বিশাল গ্রামটির জনসংখ্যা ২০০৫ সালের বুথ ভিত্তিক গণনা অনুযায়ী চার হাজার একত্রিশ জন।

পাথর মাধাইপুর (৮৫), মাধাইপুর (৮৬), মোরগাঁ (৮৭) ঃ

জনশ্রুতি আছে যে সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন তাঁর রাজধানীর চারদিকে যে চারটি দ্বার অধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার অন্যতম মাধাইচণ্ডী ছিলেন এইখানে প্রতিষ্ঠিত। সেই প্রাচীন মন্দির বা সৌধের কোন চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই। বর্তমানে এখানে একটি কালীমন্দির আছে। মন্দিরের ভিতরে বেদীর উপরে উঁচু ঢিবি আছে, যার উপরে কতিপয় মুখোশ দেখা যায়। প্রাঙ্গনে মূর্তির বহু টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মন্দিরের বিপরীত দিকে উঁচু বেদির উপরে মৃত্তিকার ঢিবি বাশুলীর থান বলে পরিচিত। অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীরাও আছেন। তারা হলেন — ঝাপরী মা, বুড়ি মা, গহরা মা ইত্যাদি।

প্রাচীনকালে এই স্থানটি যে সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান ছিল তা বোঝা যায়। পাল আমলেব বেশ কিছু মূর্তি এখানে পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে মহীপাল দেবের রাজত্বের একটি বুদ্ধমূর্তি আছে যেটি বর্তমানে মালদা মিউজিয়ামে রাখা আছে।

চৈতন্যদেবের সহচর ইতিহাস প্রসিদ্ধ রূপ, সনাতন গোস্বামীর মাতুলালয় এই মাধাইপুর। এই মাতুলালয়েইতাঁরা বড় হয়েছেন। এখনও একটি স্থানকে স্থানীয় বাসিন্দারা রূপ, সনাতনের জন্মস্থান বলে চিহ্নিত করে।

মোরগাঁ নামক গ্রামটি এক সময় উৎকৃষ্ট রাজমিস্ত্রিদের বসবাসের জায়গা ছিল। শোনা যায় ফিরোজ শাহ তাঁর বিখ্যাত মিনার নির্মাণে ত্রুটির জন্য প্রধান স্থপতিকে হত্যা করে সহচর হিঙ্গাকে মোরগাঁ যেতে বলেন। আদেশের গূঢ় অর্থ বুঝতে না পেরে হিঙ্গা মোরগাঁ এসে ঘোরাঘুরি

করতে থকেন। পাশের গ্রাম মাধাইপুর নিবাসী দুই যুবক হিঙ্গাকে মোরগাঁর বিখ্যাত রাজমিস্ত্রি নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এই ঘটনায় সুলতান প্রীত হয়ে যুবকদ্বয়কে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। এই দুই যুবকই রূপ ও সনাতন।

জিতুর পথপ্রদর্শক কাশীশ্বর চক্রবর্তীর কালীমন্দির ছিল মাধাইপুর সংলগ্ন এলাকায়। সেখানে সাঁওতালদের তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা হত। এই এলাকার সাঁওতালরা জিতুর আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন।

এই গ্রামের একেবারে মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে টাঙন নদী। গ্রামে রয়েছে রাজকর বিল। এই গ্রামের জনসংখ্যা ৪৫০০। সব মিলিয়ে ৯০০-র বেশী পরিবার বাস করেন, তার মধ্যে ৮০০ পরিবারের জীবিকা কৃষি। আছে একটি মাত্র প্রাইমারি স্কুল, একটি জুনিয়ার হাই স্কুল। যা ১৯৭৪ সালে তৈরী হয়েছিল। অনেক সমস্যার মধ্যে গ্রামের মানুষদের সান্ত্বনা বলতে একটাই গ্রামে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করলেও সম্প্রীতি নিয়ে কোন সমস্যা নেই। গ্রামবাসীরা দাবি করেন তাদের এই সম্প্রীতি কোনও দিন নষ্ট হবে না কারণ তারা রূপ সনাতন গ্রামের বাসিন্দা।

মন্দিলপুর / মন্দিরপুর (৯৩) ঃ

এখানে আছে অতি প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি কালীমন্দির। ১৯২৭ খৃঃ ৮ই মে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সত্যম্ শিবম্ সাঁওতালী সমাজের নেতা জিতু হেমব্রম এই মন্দিরে পুনরায় পূজার প্রচলন করেন। এখনও এখানে বাৎসরিক মহোৎসব হয়।

কলুদেওয়ান পুর (৯৪) ঃ

পুরাতন মালদা থানার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালুদেওয়ানপুর মৌজায় প্রতি বুদ্ধ পূর্ণিমায় হয় শ্রী শ্রী গন্ধেশ্বরী কালিকা মাতার পূজো আর সেই উপলক্ষ্যে বলে বিরাট মেলা। সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো তিনটি বেদিতে পূজো হয়। দেবী গন্ধেশ্বরী কালিকা ছাড়াও দেবী মনসা আর দেবী জগধাত্রী অদূরে হিজল গাছের ছায়ায় বজরংবলী। মূলত এই পূজো রাজবংশীদের হিন্দু ছাড়াও এই মেলার আনন্দ উপভোগ করতে আসেন মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ। পূজার উপকরণ ফুল, ফল ছাড়াও কেউ কেউ সঙ্গে নিয়ে আসেন এক বছরের পুরনো বিয়ের শোলার মুকুট। এই মুকুট ওরা নিয়ম করে ভাসিয়ে দেয় মন্দির সংলগ্ন দেবকুন্ডে। এই কুন্ডে অবগাহন করে সিক্ত অবস্থায় দেবী গন্ধেশ্বরীর কাছে কায়মনো বাক্য প্রার্থনা করলে বন্ধ্যা নারী অচিরেই সন্তানবতী হন। এই বিশ্বাসের অপর কারণ মনসা মঙ্গলে উল্লিখিত এটিই নাকি একমাত্র স্থান যেখানে সতী সবহুলা তার মৃত স্বামী লক্ষ্মীন্দর সহ এসেছিলেন আর দেবী মনসা ধোবীর ছদ্মবেশে তার পরীক্ষা নিয়েছিলেন। সেই থেকে এই স্থানটির নাম ধোবী ঘাট। মন্দিরের সামনে প্রবহমান সেই নদীটিই বর্তমান বেহুলা নদী। এই এলাকাটি একসময় ছিল পুরাতন মালদার বনেদি জমিদার গোস্বামীদের। পরবর্তী কালে জমিদারী বিলুপ্তির পর থেকে এটি হস্তান্তরিত হয় জনৈক অশ্বিনী কুমার খাঁ এর হাতে। যিনি বর্তমান মন্দির সেবাইত অসীমকুমার গোস্বামীর পিতা।

নবাবগঞ্জ (৯৬), বালিয়া (৯৭) ঃ

মহানন্দার তীরে অবস্থিত এই ছোট্ট শহরটি এক সময় ছিল গঙ্গার সঙ্গে যোগাযোগের জংশন স্টেশন। এই জলপথে নালাগোলা হয়ে দিনাজপুর, রাজশাহীর সাথে ষ্টিমার চলাচল করত নিয়মিত। মুঘল আমলেও এই স্থানটি ব্যস্ততম অঞ্চল ছিল। মহানন্দা তীরবর্তী এই সব অঞ্চল তখন বাণিজ্যেরও অন্যতম ক্ষেত্র ছিল। ব্যস্ততম জনপদের খাদ্যসামগ্রী যোগানের অপরিহার্যতার কারণেই এইখানে বাজার তৈরী হয়। খাদ্য-শস্য, তরি-তরকারীর বিশাল এবং পুরাতন এই বাজারের অদ্যাবধি খ্যাতি রয়েছে সমগ্র মালদা জেলা জুড়ে। মালদহের আমের পাশাপাশি এই অঞ্চলের উৎপাদিত বৃহৎ সাইজের বেগুনের নামও উচ্চাবিত হয় জেলার বাইরেও।

বালিয়া অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ উত্তর প্রদেশের বালিয়া অঞ্চল থেকে আগত। প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে এখানে এসেছিল, বর্তমানে এই জেলার সাথে মিশে গেলেও আচারে এখনও উত্তর প্রদেশি, তারা বেশীরভাগ আগরওয়ালা অথবা শেঠ।

শর্বরী (৯৮) ঃ

'খুরশেদ জাঁহা নামা' থেকে জানা যায় যে, ইসলাম শাসনের মধ্যবর্তীকালে একমাত্র হিন্দু বাজা গণেশ প্রচণ্ড প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন। তাঁর আমলে পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত পীর নুর কুতুব আলমের পুত্র শেখ আনোয়ার সুবর্ণ গ্রামে নিহত হন কিন্তু তার মাথা মালদহের এই স্থানে প্রোথিত হয়েছিল বলে স্থানটি শিরগড়ি / শিরবারি বলে পরিচিত হয়। এরপর মুঘলযুগে এই স্থানটিকেই বধ্যভূমি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীকালে লোকমুখে এই নাম শর্বরীতে রূপান্তরিত। এই মৌজায় আছে একাধিক স্থাপত্য কীর্তি, যার অধিকাংশই নির্মিত হয়েছিল সুলতান আমলে।

জামি মসজিদ — মালদহ পৌবসভার ৩নং ওয়ার্ডে শহরে যাওয়ার পাকা সড়কের উপর বিশাল তোড়ন ও প্রাচীর বেষ্টিত যে মসজিদটি চোখে পড়ে তাই হল জামি মসজিদ। ঐতিহ্যশালী ও বৃহৎ এই পুরাতন তিনটি জামি মসজিদ গাত্রের এক শিলালিপিতে দ্বিতীয় কাবা বলে উল্লিখিত হয়েছে। আরবী ভাষায় এই মসজিদের অপর নাম 'বহিতুল্লাহ্ আল্ হরাম'। মাসুম এই মসজিদ নির্মাতাব নাম।

প্রাচীর বেষ্টিত সুদর্শন, আয়তাকার, জামি মসজিদের চতুর্দিকের আয়তন হল ৭২ ফুট ২৭ ফুট। আংশিক খোদাই করা অলংকৃত ইট ও আংশিক পাথরের তৈরী এই মসজিদটির দেওযাল পলেস্তারা দ্বারা আবৃত। এর সামনের দরজার উপরে গ্রথিত শিলালেখ অনুযায়ী নির্মানকাল ১০০৪ হিজরী অব্দ / ১৫৯৬ খৃঃ।

শাকমোহন মসজিদ — শর্ববী মৌজায় অবস্থিত দ্বিতীয় মসজিদটি মহানন্দা নদীর পূর্ব পাড়ে শাকমোহন মসজিদ। গৌড়ীয় ইটে তৈরী এই মসজিদটি শাকমোহন মহল্লার নাম অনুযায়ী রাখা হয়েছে। মসজিদে প্রবেশ পথের ডানদিকে তিন পংক্তির যে শিলালেখটি পা ওয়া যায়। শিলালেখটি সুলতান ইউসুফ শাহের আমলের। নির্মান কাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে— ''সুলতান মাহমুদ শাহের পুত্র বারবক শাহেব তস্য পুত্র সুলতান সামসুদ দুনিয়া ওয়াদীন আবুল মুজাফ্ফর ইউসুফ শাহের

আদেশে ৮০০ হিজরী লা জমা দিউল অউয়াল' (ইং ১৪৬৫ খৃঃ) এই মসজিদ নির্মিত হয়। অপর আর একটি শিলালেখ দ্বারা জানা যায়— 'নবী (স্বাঃ) তার উপর আল্লাহর আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর জন্য যিনি এইরূপ মসজিদ তৈরী করবেন।'' প্রচলিত মতে এই মসজিদটি শেখ ভিখুর ভ্রাতা শেখ ফকির মুহাম্মদ এর নির্মাতা। 'শাকমোহন' শব্দটির 'শেখমহল' হতে পারে। এই মসজিদ নির্মাতা শেখ ফকির ছিলেন সেকালের সুবিখ্যাত কাপড় ব্যবসায়ী। যিনি মালদহ থেকে বিপুল পরিমান বস্ত্র সম্ভার বিদেশে চালান দিতেন জাহাজে করে।

ফুটি মসজিদ — বর্তমান পৌরসভা ভবনের অদূরে তুঁতবাড়ীতে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। কানিংহামের বর্ণনা অনুযায়ী এই মসজিদের নির্মানকাল ১৪৯০ খৃঃ। মসজিদেব সৌন্দর্য ও গঠনশৈলীতে অভিনবত্ব আছে। ব্যবহৃত হয়েছিল মিনাকরা ও অলঙ্কৃত ইট, মসজিদের মূল গৃহ ছিল বৃহৎ একটি গম্বুজ এবং বারান্দা জুড়ে তিনটি ছোট আকারের গম্বুজ। এক ভূমিকম্পে মসজিদটি ভেঙে চুরে যাওয়ার দরুন, লোকমুখে এর নাম ফুটি মসজিদ।

হিলালের মসজিদ — সুলতান নাসিরুদ্ দুনিয়া ওয়াদ্দীন আবুল মুজাফ্ফর মাহমুদ শাহের আমলে দর্গাহের খাদেম (সেবক) হিল্লাল কর্তৃক ৮৫৯ হিজরী অব্দে এই মসজিদ নির্মিত হয়। মোগলটুলিতে শাহ গাদার দরগাহে যে দুটি শিলালিপি আছে তা থেকেই হিলালের মসজিদ এর অস্তিত্ব জানা যায়।

ফকির তাকিয়া — শুড়ি পাড়ায় আছে 'ফকির তাকিয়া'। এখানে পীর পোক ধেয়ান শাহ ও তাঁর ভ্রাতা বুজুগ পীর পালের দুটি সমাধি, অন্যটি আলি মর্দান শাহের সমাধি। রমজান মাসে মুসলিম ফকিরেরা এখানে তিনদিন বিশ্রাম করে পান্ডুয়ায় নুর কুতুব আলমের দরগাহে যাত্রা করেন তাই এই স্থানটির নাম 'ফকির তাকিয়া'। পার্শ্ববর্ত্তী একটি অংশে একটি উপযুক্ত চত্বর আছে যেটি এক সময়ে নুর কুতুব আলমের চিল্লাখানা বলে জনশ্রুতি আছে। প্রতি বছর ইদ্‌লফিতরের দিন এই দুই পীরের সমাধি স্থানে 'ফাতিহা উৎসব' পালিত হয় আজও।

কাটারা বা সুরক্ষিত সরহিখানা — কাট্‌রা একটি ফার্সী শব্দ। এর অর্থ যাত্রীদলের জন্যে বিশ্রামস্থল। মধ্যযুগীয় বাংলার রাজধানী শহর পান্ডুয়ায় চালান দেওয়ার জন্য আমদানী করা মূল্যবান পণ্যসামগ্রীর বিশাল গুদাম ঘর হিসাবে এটি নির্মিত হয়েছিল। কাট্‌রার নির্মাণ কাল নিয়ে স্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। র‍্যাভেন শ এর মতে জামি মস্‌জিদ নির্মাতা বা সংস্কারকারীর ভ্রাতা এই কাট্‌রা নির্মাণ করেন। এই তথ্য সঠিক হলে মোগল সম্রাট আকবরের প্রতিষ্ঠিত ফতেপুর সিক্রির কাট্‌রার সঙ্গে আলোচ্য কাট্‌রার মিল দেখতে পেয়েছেন।

হিন্দু রাজত্বে শেষভাগে এখানে পণ্য বিনিময়ের বাজার বসতো। এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল আনুমানিক একশত গজ লম্বা এবং প্রস্থেও একশত গজ লম্বা বর্গাকার একটি স্থান। কেউ কেউ বলেন এই বাজার স্থাপিত হয় ১৩৫৩ খৃঃ। এই দালানটির নীচে ছিল গোলাকার খিলানের মত ছোট ঘর। উচ্চতা সাত ফিট। প্রস্থে ছয় ফিট এবং লম্বায় পাঁচ ফিট। ছাদের উপরও ছিল অনেক কুঠুরী। পরবর্তী কালে এই বাজার আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠলে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ব্যবসায়ীর মুল্যবান সামগ্রীর নিরাপত্তার জন্যে উপরের ঘরগুলিতে থাকার ব্যবস্থা আর নীচের

ঘরগুলি তাদের অশ্বাগার এবং বিপনী হিসাবে ব্যবহৃত হতো। ছিল উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদেরও থাকার জায়গা। এই প্রাচীর বেষ্টিত স্থানটির উত্তর-দক্ষিণে ছিল প্রস্তর নির্মিত দুটি বিরাট দরজা। যার উচ্চতা আনুমানিক দশ ফিট। আর দরজার উভয় দিকে মাথাব উপর গোল খিলান যেখা:· থাকত সশস্ত্র দ্বাররক্ষী।

দরবেশ শাহ গাদার দরগাহ্ — জামি মসজিদ ও কাটরার মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে শাহ গাদা নামে এক দরবেশের সমাধি। গম্বুজযুক্ত এই সমাধি কক্ষটির মাপ ১২৬*১২৬। কিংবদন্তী আছে পূর্ব প্রান্তের ক্ষুদ্র কবরটি দরবেশের পোষা প্রিয় তোতা পাখির। কোরাণের অংশ বিশেষ এই পাখিটির নাকি মুখস্থ ছিল। অন্য তিনটি সমাধির একটি দরবেশ শিষ্য মস্তান মিঞা লেঙ্গোটবঙ্গের, দ্বিতীয়টি শাহগাদা পত্নী দরবেশ-ই-বিবির আর শেষেরটি দরবেশের ধাত্রী মাতার। এখনও পুরাতন মালদার হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারা বিবাহের সময় আতপ চাল ও অন্যান্য উপকরণ খানে নিবেদন করেন।

শিখ সম্প্রদায়ের গুরুদ্বার — ১৫৬৪ খৃঃ ৭ই আষাঢ় শিখগুরু নানক পুরাতন মালদহে আসেন সৎধর্ম প্রচারের জন্যে। তিনি এখানে এসে তার এক প্রচারক সঙ্গী ভাযুজীকে দীক্ষা দেন। ও তাঁকে পুরাতন মালদহে সৎধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দেন। এরপর তিনি রাজমহলে গেলে সেখানকার তৎকালীন রাজা রামদেব তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন এবং পুরাতন মালদহ স্থিত নিমের একখন্ড ভূমি গুরুজীকে দান করেন। সম্ভবত তিনিই সেখানে একটি সরাইখানা বা পান্থনিবাস তৈরী করান। সেই পান্থনিবাসে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই বিশ্রাম করার অধিকার ছিল। এই স্থানটি গুরুর বাগান নামে জনপ্রিয় ছিল। এখানে গুরুদেবের ব্যবহৃত একটি কূপ, কলসি, ঘটি এবং ধ্যানের নিমিত্ত পাথরের চৌকি আজও আছে। এই পুরাতন মালদহের এই স্থানে ৩ মাস ৭ দিন থাকার পর তিনি পাঞ্জাবে ফিরে যান। ১৬৬১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আবার এখানে আসেন নবম গুরু তেগবাহাদুর সাহেবজী। তিনিও এই কূপের জল পান করতেন ও পাথরের চৌকিতে ধ্যান করতেন। এখানে আরও আছে গুরু তেগবাহাদুরের দুটি তরবারি যা লম্বায় প্রায তিনফুট। এরপর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই বাগান / পান্থশালা জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। এরপব সাম্প্রতিক কালে মালদহ জেলায় কালেটরেট হয়ে আসেন শের শিং। তিনি উদ্যোগী হয়ে পুনরায় এই স্থানে মন্দির নির্মানের উদ্দেশ্যে বাগানের মধ্যভাগে বাগানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর ১৯৯০ সাল থেকে গোলা সিং, যশোধর সিং, বাবা গুরুনাম সিং, মোক্তার সিং, কল্যান সিং প্রভৃতি ভক্তদের উদ্যোগে কর সেবার সাহায্যে এক সুদৃশ্য মন্দির নির্মান করা হয়েছে। সুদৃশ্য এই মন্দিরের গম্বুজ ৪টা, মাথায় ঘূর্ণায়মান সোনার পতাকা আছে। পুরাতন লঙ্গরখানার ধাঁচে আবার তৈরী হল নতুন লঙ্গরখানা। দিনে রাতে সেখানে খাবার বন্দোবস্ত আছে।

মোকাত্তিপুর (৯৯)ঃ

ওল্ড মালদা রেলস্টেশনের উত্তর দিক দিয়ে বয়ে চলেছে শীর্ণকায়া বেহুলা নদী। এখানকার প্রচলিত প্রবাদ এই যে, এই নদী দিয়ে বেহুলা তার মৃত স্বামীকে ভেলায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। পুরাতন মালদহের উত্তরের এই প্রান্তে এসে উপস্থিত হলে এক সাধুর সাথে তার পরিচয় হয়। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে সাধু সন্তুষ্ট হলে নিকটবর্তী একটা পুকুরের ধারে তাকে নিয়ে আসেন সেই

পুকুরের জল দিয়ে বেহুলাকে তাঁর স্বামীকে স্নান করাতে বলেন। স্নান করানোর পর লক্ষ্মীন্দর প্রাণ ফিরে পান। সেই কারনে এখানকার এই পুকুরটির নাম জীয়ৎ কুন্ড। কিংবদন্তী চলে আসছে যে, এই জলাশয়ের জল পান করলে মানুষ রোগমুক্ত হয়। মুলো ষষ্ঠীর দিন এই জলাশয়ের ধারে যে মা ষষ্ঠীর পূজো হয় ও মেলা বসে তাতে অনেক নরনাবীর সমাগম হয়। এই মেলার অপর বৈশিষ্ট্যটি হল ঐ দিন এখানে বসে জুয়াড়ী মেলা। এই দিনে গ্রাম সন্নিহিত এমনকি মালদহ জেলার বাহিরে থেকেও জুয়াড়ীরা আসেন জুয়া খেলতে, পিতা-পুত্রের একই সাথে বসেও জুয়া খেলার দৃশ্য বিরল নয়। মেলাটির স্থান জলাশয়ের ধারে বনাকীর্ণ আম্রকাননে। বলা হয় যে, বাঘ আর তস্করের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এই জুয়া খেলার প্রচলন হয়েছিল।

বাঁশহাটা (১০২)ঃ

কেবলমাত্র বাঁশ কেনাবেচার জন্য এই অঞ্চলে সপ্তাহের প্রতি বুধ এবং রবিবার বিশাল হাট বসে। পুরাতন মালদহের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে এই হাটের ভূমিকা ছিল অনেকখানি। এখানকাব বাঁশ কালিন্দ্রী, মহানন্দা, গঙ্গার জলপথে ভারত এবং ভারতের বাইরে পৌঁছে যেত। এখন আব সেই দিন না থাকলেও হাটটি আছে, কেনাবেচাও চলে।

বাচামারি (১০৪)ঃ > বিশালাক্ষী > বিসলমারী > বিচলমারী > বাচামারি

বাচামারি গ্রামটি অতি প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পন্ন গ্রাম। এইখানেই আছে প্রাচীন গঙ্গা খাতের অংশ ধর্মকুণ্ড, রয়েছে দেবকুণ্ড নামে আরও একটি পুষ্কবিণী। ইতিহাসের ধর্মপাল ও দেবপালের নাম এই দুটি জলাশয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই অনুমান।

অনুমান অমূলক নয় তা বোঝা যায় এই বাচামাবি নামকরণেই। বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক পাল রাজাদের আরাধ্য দেবী ছিলেন বিশালাক্ষী বা বিসলমাবী। আর বৌদ্ধ ধর্মাশ্রিত বাজবংশীবাও এই দেবীর একান্ত অনুগত। এখনও এই গ্রামের রাজবংশী সম্প্রদায়ের গম্ভীবা পূজা ও নর্তনে বিখ্যাত। রয়েছে জোড়া কালী ও চামুণ্ডার মন্দির।

বাচামারির কায়স্থ পাড়ায় কয়েকশো বছরের পুবনো নিমগাছের নীচে। যেখানে আব এই, দেবী চামুণ্ডা এবং কালীর থান ছিল।কথিত আছে তাঁবা দুই বোন। কোনও এক সময়ে এই দুই বোনের বিরোধ বাধে তার প্রমাণ স্বরূপ দেবীব মুখোশ মাঝে মাঝেই মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। জিভ এবং মুখোশ হারিয়ে যেত যদিও পববর্তীকালে স্বপ্নাদেশে সেগুলি পাওয়া গেছে। এরপর স্বপ্নাদেশেই দেবীরা বলেন, তাদের আলাদা মন্দির নির্মাণ করে দিতে। এর ফলে চামুণ্ডা দেবী থেকে যান কায়স্থ পাড়াতেই শুধু দেবী কালী চলে যান বদ্যি পাড়ায়। বছরে একবার ৩রা বৈশাখ ভোরবেলায় এই দুই বোন মিলিত হন দুই মন্দিবের মধ্যবর্তী একটি থানে। সেখানে বহু মানুষের মানত থাকে। কয়েক কুইন্টাল বাতাসার লুট হয়। অনুষ্ঠিত হয় গম্ভীরা উৎসব। সারা জেলার মুখা শিল্পীবা আসেন। যিনি ঢাক বাজান তিনি বংশানুক্রমিক ঢাকী। মাতান এর তালে তালে নৃত্যবত শিল্পীর ভর হয়, কচি পায়বাব রক্ত দিয়ে সেই 'ভর' নামান হয়। তারপর দুই বোন যে যার জায়গায় ফিরে যায়।

মঙ্গলবাড়ি সামন্তি (১০৫):

এই অঞ্চলে সতী বেহুলা নদীর ধারে রয়েছে সর্বমঙ্গলা ও শীতলা দেবীর থান। এটি জাগ্রত দেবীর থান বলে লোক প্রচলিত। এখনও এখানে উৎসব উপলক্ষ্যে প্রচুর জনসমাগম হয়। সেই হিসাবে মঙ্গলবাড়ি নামটি প্রচলিত।

মুঘল আমলে এই মৌজাটি ছিল বন্দর শহরটির প্রধান সব্জি বাজার বা মণ্ডি। হাট আকারে যা প্রতি মঙ্গলবারে বসে থাকতে পারে। বর্তমানে এটি পুরাতন মালদার কেনাবেচার প্রধান কেন্দ্র তো বটেই, এলাকার একমাত্র উচ্চশিক্ষার একমাত্র পীঠস্থান এই মঙ্গলবাড়ী।

এখানে দুটি সমাধি আছে। একটি পীর শাহ ইব্রাহিম লঙ্কাপতির অন্যটি সৈয়দ সুলতান ওমরিয়ার। পীর সাহেব ইব্রাহিম গরীব ও দুঃস্থদের জন্য লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করেছিলেন। লঙ্গরপতি থেকে লঙ্কাপতি হয়ছে বলে অনুমান। এখনও প্রতি বছর আরবী শাবানা মাসের ২৫ তারিখ পীরের ফতিহা (উরষ) উৎসব পালিত হয়।

ছাতিয়ান মোড় (১০৮)

কয়েকটি রাস্তার সংযোগস্থলে দিশা চিহ্ন হিসাবে এখানে একটি বিশাল সপ্তপর্ণ বা ছাতিম গাছ ছিল, সেইজন্য এটি ছাতিয়ান মোড় নামে চিহ্নিত ছিল। বর্তমানে নামটি বর্তমান থাকলেও গাছটির কোন অস্তিত্ব নেই।

সাহাপুর (১১০):

মুঘল আমল পরবর্তী ইংরেজ আমলে মালদহ জেলার স্বল্প পুঁজির কাপড় ব্যবসায়ীগণ ইংরেজ প্রচলিত কর-কাঠামোয় পেরে উঠতে না পেরে তারা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে, এরা অধিকাংশ সাহা উপাধিধারী তাই অঞ্চলটি সাহাপুর নামে খ্যাত।

জেলার প্রাচীনতম গম্ভীরার চড়ক উৎসব এখনও সাহাপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে মহানন্দা নদীর ধারে গড়ে উঠেছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। প্রতি বছর বাসন্তী পূজোয় এখানে উৎসব ও মেলা বসে। সম্প্রতি বাউল গানের আসরও বসছে প্রতি বছর।

শান্তিপুর (১১৭):

মালদহ থানার বৌদ্ধ ভাস্কর্যের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য শন্তিপুর বৌদ্ধ মূর্তি। ১৯৮৬-র ২৫শে এপ্রিল একটি পুকুর খননকালে নারায়ণ ঘোষ এটি আবিষ্কার করেন। পাদপীঠের একদম তলায় দশম একাদশ শতকের বঙ্গাক্ষরে লিখিত একটি লিপি আছে। মহীপালের সময়ে এটি উৎকীর্ণ হয়েছিল এটুকু বোঝা যায়।

মুচিয়া (১২৪):

জনৈক চর্মকার সন্ত ব্যক্তি বা পীরের নামেই এই গ্রামনাম। মুচিয়া গ্রামে অশ্বত্থ বটতলে মুচি পীরের আস্তানায় বার্ষিক হরিসভা, হিন্দুধর্ম ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন এখনও হয়ে থাকে।

কালিন্দ্রী মহানন্দার বিস্তীর্ণ দুপারের নিম্নবিত্ত মানুষেরা অধিকাংশ-ই ছিল মৎস্যজীবী।

অন্যটি বাণিজ্য অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ায় সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসাবেও সুপরিচিত ছিল। সেই সময় এই সব অঞ্চলে একাধিক লোক উৎসব মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে মিশিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল। এই লোক উৎসবগুলি এক সময় সাধারণ মানুষের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। সাধারণ মানুষ অন্তরের আবেগ, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ঈশ্বরের বিশ্বাস মিশিয়ে এই আচার-আচরণগুলি তৈরী করেছিল। এই অঞ্চলে প্রচলিত এই রকম একটি লোকানৃত্য'বুড়াবুড়ি নৃত্য'। এটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীমূলক না হলেও পরিচিত গ্রাম পরিবারের অন্তবঙ্গ আলেখ্য। গ্রামের সাধারণ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার প্রতিদিনের কাজকর্ম স্থূল কোন্দল, মাছ অভিযান ও গভীর দাম্পত্য-প্রীতির রসোজ্জ্বল ছবি দুটিমাত্র চরিত্রে পরিবেশিত হয়। এই নাচে ব্যবহৃত হয় হাস্যময় দুটি বুড়াবুড়ির মুখা। প্রসঙ্গত বলা দরকার 'বুড়াবুড়ি'-র নাচঅন্যান্য থানাতে প্রচলিত থাকলেও মহাদেবপুর-মুচিয়ার বুড়াবুড়ি মুখার মত আকর্ষণীয় মুখা দেখা যায় না। এই উৎসব অনুষ্ঠানের সার্বিক মৌলিক মেজাজটিকে ঢাক বাজিয়ে ধরে রাখতে সাহায্য করেন রবিদাস সম্প্রদায়ের মানুষেরাই।

নারায়ণপুর ঃ

এই মৌজার পীরপাল গ্রামে আছে গৌড়বঙ্গ বিজেতা ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজিব সমাধি।

অন্যান্য মৌজা (জে. এল. নাম্বার অনুসারে) ঃ

(১) বলরামপুর, (২) বরখোল, (৩) উত্তর ভাটরা, (৪) পৈতি, (৫) সাঞ্জাইল, (৬) বেলাহার, (৭) মহেশকুরি, (৮) সবদলখানি, (৯) সাহারা, (১০) কেশরাইল পীরগাঁ, (১১) তুলখান, (১২) গোয়ালপাড়া, (১৩) আইহোরাণী, (১৪) গোটপাড়া, (১৫) সামসাবাদ, (১৬) মেকপুর, (১৭) বাঙ্গাবাড়ি, (১৮) পাতামারি, (১৯) মহিষবাথানি, (২০) কদমতলি, (২১) বদনপুর, (২২) ছোটপাড়া, (২৩) লক্ষ্মীবাঁদর, (২৪) মুরলীঘাট, (২৫) সুলতানদিঘি, (২৬) হরিরামপুর, (২৭) রক্ষভাগাও, (২৮) যদুপুর, (২৯) কমলদিঘি, (৩০) ধুমদিঘি, (৩১) গুনগাঁও, (৩২) পশ্চিম বাঁধপাড়া, (৩৩) মহাজিবনগর, (৩৪) গুন সাঁকরুল, (৩৫) ফতেপুর, (৩৬) কুরিয়াপাড়া, (৩৭) ভাবুক, (৩৮) পরমণিকা, (৩৯) চিড়াকুটি, (৪০) হাতিডুবি, (৪১) বাগমালঞ্চা, (৪২) সৈয়দপুর, (৪৩) ঝড়পুকুরিয়া, (৪৪) পাঁচ গাও, (৪৫) রঞ্জুবিল, (৪৬) দরিয়াল, (৪৭) পূর্ব ঝাঁকাপাড়া, (৪৮) হরখোরখা, (৪৯) ধলসনা, (৫০) ধরমপুর, (৫১) বিনতড়া, (৫২) আখিরপুকুর, (৫৩) সোনা কাঁদর, (৫৪) ফুলডাঙা, (৫৫) বগলাহাগী, (৫৬) কুচিগুা, (৫৭) ভাট কালনা, (৫৮) গন্ধা, (৫৯) হাত্রা কাঁদর, (৬০) দুধবাড়ি, (৬১) চিনিবাড়ি, (৬২) গংরা, (৬৩) গুয়াবাড়ি, (৬৪) রছুলপুর, (৬৫) বড়বাড়ি, (৬৬) বৃদ্ধি কামঞ্চা, (৬৭) ইটপর্ঝা, (৬৮) পপরা, (৬৯) গোয়ালচৈতা, (৭০) চৈতা, (৭১) মস্তাফাপুর, (৭২) তিলভোগ সর্দারপুর, (৭৩) সাতবাড়িয়া, (৭৪) মঝিল খাঁ, (৭৫) মেহেরপুর, (৭৬) পাথর উজরং, (৭৭) হালনা, (৭৮) মহম্মদপুর, (৭৯) কুতুবপুর, (৮০) বাসুদেবপুর, (৮১) ইজ্জতপুর, (৮২) কালুয়ারী, (৮৩) যাত্রাডাঙ্গা, (৮৪) কোয়ার, (৮৫) পাথর মাধাইপুর, (৮৬) মাধাইপুর, (৮৭) মোরগাঁ, (৮৮) কামঞ্চা, (৮৯) মালিগ্রাম, (৯০) সুখানদিঘি, (৯১) মেহমানপুর, (৯২) মিনাপাড়া, (৯৩) মন্দিলপুর, (৯৪) কালুদেওয়ানপুর, (৯৫) সুজাপুর, (৯৬) নবাবগঞ্জ, (৯৭) বালিয়া, (৯৮) শর্বরী, (৯৯)

মোকাতিপুর, (১০০) আবাদপুর, (১০১) ঝাংরা, (১০২) বাঁশহাটা, (১০৩) মউলপুর, (১০৪) বাচামারি, (১০৫) মঙ্গলবাড়ি সামণ্ডি, (১০৬) খইহাটা, (১০৭) রসিলদহ, (১০৮) ছাতিয়ান মোড়, (১০৯) নাগেশ্বরপুর, (১১০) সাহাপুর, (১১১) কাদিরপুর, (১১২) নিত্যানন্দপুর, (১১৩) দিলালপুর, (১১৪) দক্ষিণ ভাটরা, (১১৫) জলকর বিতান, (১১৬) সাধাইল, (১১৭) শান্তিপুর, (১১৮) সকর্মা, (১১৯) জ্যোৎগোবিন্দ, (১২০) আজমতপুর, (১২১) আদমপুর, (১২২) মেমুয়া, (১২৩) মবারকপুর, (১২৪) মুচিয়া।

ইংরেজবাজার থানা ঃ

১৬৭৬ খৃঃ অক্টোবরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাশিমবাজার কুঠির ডাইরিতে প্রথম মালদায় একটি কুঠি খোলার সম্ভাবনা বিচার করে দেখা হয়। কাশিমবাজারের পর দ্বিতীয় কুঠি যাতে মালদায় খোলা যায় সেইজন্য স্পেশাল কমিশনের ষ্টেইনহ্যাম বিশেষ উদ্যোগ নেন। ১৬৭৬-এর ১৪ই অক্টোবর এই উদ্যোগের রূপায়ণে বোর্ড চারশো থেকে পাঁচশো টাকার কাপড় কেনার এক সিদ্ধান্ত নেন এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্র প্রস্তুতির সপক্ষে মিঃ এডোয়ার্ড কে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৬৭৬ এ ৬ই ডিসেম্বর এডোয়ার্ড সেই রিপোর্ট প্রস্তুত করে জানান — "গঙ্গার একটি শাখা (কালিন্দ্রী) ও মোরাণ্ড থেকে উৎপন্ন একটি ছোট নদীর (মহানন্দা) সংযোগ স্থলের খানিকটা নীচে অবস্থিত মালদা শহরটি ছোট হলেও ত্রিশ - চল্লিশ মাইল দুর থেকেও এখানকার মূল পণ্য দ্রব্য কাপড় আমদানি হয়। মূলত আগ্রা, গুজরাট ও বেনারসের কুঠিয়াল ব্যবসায়ীরা বাৎসরিক প্রায় পনের থেকে পঁচিশটি পটেলা ভর্ত্তি মাল স্বদেশে পাঠায় এবং এক একটি পটেলায় প্রায় এক লক্ষ টাকার পণ্য দ্রব্য বোঝাই করা যায়। এর মধ্যে থাকে দেড় থেকে পাঁচ টাকা মূল্যের কোশা, মলমল, মন্ডীল ও এলাচী। এর পর ১৬৮০ ডিসেম্বর তারা মালদহের স্থানীয় জমিদার রাজা রায় চৌধুরীর কাছ থেকে আট বিঘা বর্গাকার জমি তিনশত টাকায় ক্রয় করে। এটি ছিল মালদহ থেকে দুমাইল দূরে। ১৬৮১-র ফেব্রুয়ারির মধ্যে পূর্ণিয়া থেকে কাঠ এনে তাদের জায়গাটি ঘিরে কুঠি গড়ার কাজ শুরু হয়। এরপর ডাচ্‌দের সাথে স্থানীয় জায়গীরদারদের সংঘর্ষ বাধে যে সংঘর্ষের জেরের আঁচ ইংরেজদের উপরও পড়ে। যদিও তখন থেকেই তারা কুঠি সংলগ্ন শহরকে ইংরেজাবাদ কুঠি বলেই পরিচিতি দিতে থাকে। এরপর কিছুদিন মুঘল ফৌজদারদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ বাধে এবং তখন ইংরেজবরা নতুন কুঠি তৈরী করেও বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারছিল না। এরপর জব চার্ণককে কোম্পানীর পরিচালক মন্ডলী ইংলেজাবাদের কুঠির কাজকর্ম শুরু করার জন্যে সুপারিশ করেন। কারণ বিনিয়োগের তুলনায় এইসব জায়গায় অনেক বেশী লাভ ছিল। এই সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে জব চার্ণক শায়েস্তা খাঁকে মুঘলদের হাতে নষ্ট হয়ে যাওয়া ইংলেজাবাদ কুঠি নির্মাণে বাধ্য করেন। এরপর বেশ কিছুদিন ইংরেজদেব অপেক্ষা করতে হয়েছিল নানারকম রাজনৈতিক কারণে। ১৭৬৫ - তে ইংরেজরা বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার আংশিক স্থানের উপর দেওয়ানি লাভ করে। এই আনন্দ সংবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স রাজস্ব, উৎপাদন এবং কোম্পানীর মূলধনের লগ্নি বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা নেয়। এরপর একজন ফরাসী ব্যক্তির সাহায্যে বাংলায় প্রথম গুটি থেকে রেশম সুতো বার করার কাজ আরম্ভ হয়। মালদহে প্রথম এই ধরনের কুঠি স্থাপিত হয় জর্জ

উডনির উদ্যোগে সিঙ্গাতলায়। এই সময় থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই সুতার বয়ন উন্নতিকরণ ও হলুদ ছাড়া অন্য রঙ দিয়ে কাপড় বঙ করার কাজের উপর জোর দেয়। ১৭৭০ খৃঃ টমাস হেঞ্চম্যান ইংলেজাবাদে কর্মাশিয়াল বেসিডেন্ট ও সিল্ক কাপড়ের উপর লাক্ষার কাজ করার জন্য কুঠি নির্মান করেন এবং কেবলাত্র রেশম সুতা দিয়ে কাপড় তৈরীব কৃতিত্বের জন্য হেঞ্চম্যান সম্মানিত হন। এইসময় থেকেই ইংলেজাবাদ ক্রমে ইংরেজবাজার নামে পরিচিত হয়।

উত্তর চণ্ডীপুর (১), খাসকোল চণ্ডীপুর (৪), দক্ষিণ চণ্ডীপুর (১০) ঃ

বল্লাল সেন যুগেব আবাধ্য দেবী ছিলেন চণ্ডী। তাঁর শাসনাধীন সমগ্র রাজ্যেই দেবী চণ্ডীর মূর্তি বা মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। বল্লাল সেন তাঁর গৌড় নগরীর চারকোণে দেবী চণ্ডীর মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। উল্লেখ্য মৌজাগুলি প্রাচীন গৌড় নগরীর একটি দিক নির্দেশ করছে। তাই চণ্ডী নামাঙ্কিত একাধিক মৌজার অস্তিত্ব আজও দেখা যায়। প্রাচীনকালে সমগ্র অঞ্চলটি অবিভক্ত ভাবে ছিল।

খাসকোল চণ্ডীপুর (৪) ঃ

আজ দুই/তিন শত বছব আগে গঙ্গা তীরবর্তী গ্রাম ছিল এই খাসকোল। তারপর ধীরে ধীরে গঙ্গা এই গ্রামের থেকে ১৪/১৫ কিলোমিটার দূরে চলে যায়। বর্তমান গঙ্গার ভাঙন এই দূরত্বকে আবার কমিয়ে এনেছে ৫০০ মিটারে। এই ভাঙন গঠনের কোনও এক সময় এই অঞ্চলের একটি বৃহৎ কোন গঙ্গায় ভেঙ্গে পড়ে য়ায় আবার কিছু খাস জমি গঙ্গার তলদেশ থেকে উঠে চড় পড়ে যায়। গঙ্গার এই খামখেয়ালিপনা এই মৌজার ভাগ্য নির্ধারণ করে বলে এই অঞ্চলের নাম খাসকোল। বন্যার সময় গঙ্গার বিপুল জলরাশিকে বাধা দেওয়ার জন্য গ্রামের পশ্চিমদিকে ৩ নং রিটায়ার্ড বাঁধ দেওয়া আছে। যদিও খাসকোল চন্ডীপুর মৌজার অনেক জাম ও আমের বাগান গঙ্গার গ্রাস থেকে রক্ষা কবা যায় নি। এই অঞ্চলের মানুযের প্রধান জীবিকা মাছের ব্যবসা। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এই ব্যবসা কবে। অধিকাংশ মানুষ চাষ-আবাদের কাজে লিপ্ত। উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে যব, গম, ছোলা, অড়হব, ভুট্টা এবং নীচু জমিতে ধান। এই গ্রামে প্রায় আট হাজার লোকের বাস। এখানে প্রায় দুইশত ঘর চাঁই জাতি বসবাস করে। এরা এই গ্রামের প্রাচীন বাসিন্দা নয়। ১৯৯৮ সালের বন্যার পর উদ্ধাস্তু হয়ে এইখানে বসবাস শুরু করে। এখানকার উৎস' অনুষ্ঠানেব মধ্যে দুর্গাপূজা, কালী পূজা, মাঘ মাসে সূর্যব্রত, চৈত্র মাসে চড়ক এবং শিবের পু' এখানকাব পাগলী কালী পূজোব উৎসব বিখ্যাত। সপ্তাহ ব্যাপী কীর্তনের আসরও অন্যতম উৎসব। মুসলিম সম্প্রদায়েব মানুষেবাও তাদের অনুষ্ঠানাদি পালন করেন সমারোহের সঙ্গে। এই গ্রামে একসময় নীলের চাযও হোত। ঝিলের পশ্চিমপাড়ে বাঁশবোনা নামক উচ্চস্থানে নীলকুঠি ছিল বোঝা যায়। এখন অবশ্য সেখানে আমবাগান।

মিল্কি (৭) ঃ

ইংবেজবাজাব থানার একটি বর্ধিষ্ণু মৌজা মিল্কি। মালদহ শহর থেকে মানিকচকের পথে প্রায় মাঝামাঝি বাস্তায় ২ কি.মি. পথপার্শ্বে মিল্কি গ্রাম অবস্থিত। এখানকার জনসংখ্যা বর্তমানে আনুমানিক আট হাজার। এখানকার মোট জনসংখ্যার ৭০ ভাগ মুসলমান সম্প্রদায়,

বাদবাকি হিন্দু। হিন্দুদের মধ্যে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ গোয়ালারা। কেউ কেউ বলেন গোয়ালারাই এখানকার আদি অধিবাসী। এখানকার মূল ব্যবসা আজও দুধ সংক্রান্ত। এই গ্রামটির নামকরণ সম্পর্কে কেউ কেউ এই দুধের প্রাধান্যের কথা বলে থাকেন। অনুমান ইংরেজ আমলে ইংরেজী ভাষার সংস্পর্শে এই নামকরণ হয়। তাই Milk থেকে মিল্কী। যদিও এই ধারণা কেবলমাত্রই অনুমান মাত্র। হিন্দুদের মধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়েরা হল মিশ্র, পাঠক, জেলে, মালাকার, তাঁতি, চাঁই, নাগর, মন্ডল ইত্যাদি। এই গ্রামের উত্তরদিকে রয়েছে মালদহের অন্যতম নদী কালিন্দ্রী। এখানকার উৎপাদিত প্রধান ফসল যব, গম, ভুট্টা, কলাই, মসুর ইত্যাদি। ফলের মধ্যে আম যেমন ঃ ল্যাংড়া, হিমসাগর, গোপালভোগ, ফজলী ইত্যাদি প্রচুর পরিমানে ফলে। মুসলীমরা এখানে তাদের নিজস্ব ধর্মপালন করেন, আবার হিন্দুরা করেন দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা আর মঙ্গলচন্ডীর পূজা। বৈশাখ মাসে চড়ক এখানকার অন্যতম উৎসব। মিল্কী গ্রাম হলেও সুযোগ সুবিধা প্রাথমিক ভাবে এখানে থেকেই পাওয়া যায়। রয়েছে ১টি ব্লক হাসপাতাল, একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আটটি প্রাইমারি বিদ্যালয়। পাঠক পাড়ায় পঞ্চায়েত অফিস, সুতরাং সব মিলিয়েই এটি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

গোঁসাইপুর (৮) ঃ

গোঁসাইপুর গ্রামের জমিদার ছিলেন মালদহের বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী জনৈক গোস্বামী। এই গোঁসাই ষ্টেট থেকেই গোঁসাইপুর এবং গোঁসাইহাট নামের উৎপত্তি। কিন্তু জমিদারের খামখেয়ালিপনার কারনেই হোক অথবা তিনি সেখানে থাকতেন না বলেই হোক এই গ্রামটির তেমন শ্রীবৃদ্ধি হয় নি। এখানে প্রধানত তিন রকম জাতি বসবাস করে নাগর, মন্ডল, তিয়র এবং ছুতোর মিস্ত্রী। এরা সকলেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এখানকার জনসাধারণ বেশির ভাগই চাষআবাদের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদিত ফসলের মধ্যে আছে যব, গম, ভুট্টা, ছোলা, কলাই, ধান, আখ ইত্যাদি। এছাড়া আছে আম। শিক্ষা ব্যবস্থা এই গ্রামে একেবারেই নূন্যতম। রয়েছে কেবল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা পার্শ্ববর্তী বাঙ্গীটোলা বা মিল্কি স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়াশুনা করে। এখানকার উৎসবগুলির মধ্যে আছে কালীপূজা, চড়ক, মঙ্গলচন্ডী আর সূর্য ব্রত। মাঘমাসের মাঘিয়া কালীপূজা এখানকার উল্লেখযোগ্য উৎসব।

সাত্তারি / সাট্টারি (১১) ঃ

সাতটাঁড়ি > সাতটাড়ি > সাত্তারি > সাট্টারি। টাঁড়ার শব্দগত অর্থ হল চর। চরের জমিকেই বলা হয় টাঁড়া। আর অপেক্ষাকৃত ছোট চরকে টাঁড়ি। এই রকমই সাতটি টাঁড়ি বা ছোট ছোট চরের অংশ নিয়ে গড়ে ওঠা মৌজার নাম সাত্তারি এখন বর্ধিষ্ণু জনপদ।

বর্মপুর (১৫) ঃ

বিরাম হেমব্রমের পুত্র জিতু হেমব্রম জিতু সাঁওতাল বলেই যিনি বেশী পরিচিত। জিতুর আন্দোলন প্রথম দিকে ছিল মূলতঃ ধর্মভিত্তিক। তাঁর গুরু ছিলেন দিনাজপুরের বালুপুর নিবাসী বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর পুত্র কাশীশ্বর চক্রবর্তী (১৮৭৯ - ১৯৩৯)। এই কাশীশ্বর চক্রবর্তী সাঁওতালদের মধ্যে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ গোষ্ঠীর সূচনা করেন। এই গোষ্ঠীভুক্তরা নিজেদের

হিন্দু বলে দাবি করতেন এবং শূয়োর, মুরগী ইত্যাদি নিষিদ্ধ খাদ্য খেতেন না। জিতু হেমব্রমের পিতা বিরাম হেমব্রমের সাঁওতালদের মধ্যে জনপ্রিয়তা ছিল অসম্ভব। তাঁর নামানুসারেই এই মৌজার নাম বিরামপুর বা বরমপুর।

এই মৌজার জনসংখ্যা নয় শত। তার মধ্যে দুই ঘর ব্রাহ্মণ, গঙ্গোত একচল্লিশ ঘর, কর্মকার বা নাহার সম্প্রদায় নয় ঘর, তিয়র আট ঘর, নাগর - মন্ডল সাত ঘর, মুচি তিন ঘর, নাপিত তিন ঘর, কবীর পন্থী সাধু এক ঘর। এই সমস্ত মানুষেরা তাদের জাতিগত ব্যবসা করেন বা অন্য সময় কৃষিকার্য করে থাকেন। প্রাচীন ভাষা খোট্টা, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতিরা তাদের বিবাহ সীমাবদ্ধ রাখে নিজ জাতের মধ্যে। দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদি ছাড়া পূজা পার্বণের ক্ষেত্রে এই গ্রামের একটি বিশেষত্ব আছে। তারা পূজা করে গ্রাম্য দেবতার প্রচলিত ভাষায় যা গ্রাম দেবতী বলে পরিচিত। প্রতি বছর অম্বুবাচীর সময় এই পূজা হয়। শুদ্ধভাষায় আবার 'প্রেমরাজ দেবতার পূজা' কেউ কেউ বলে থাকেন। নিষিন্ধা গাছের গোড়ায় বেদিতে মূর্তীহীন এই পূজা হয়। আসলে এটি মশান কালীর অবয়বহীন মূর্তি। মাটি দিয়ে একটি উঁচু ঢিবি এবং তার নীচে প্রজনন চিহ্ন স্বরূপ আরও দুটি ছোট ছোট মাটির ঢিবি তৈরী করা হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে মানুষ ও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

লালাপুর (১৬) ঃ

সাত শত এই জনসংখ্যা নিয়ে ধরমপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম লালাপুর। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ চল্লিশ ঘর, নাগর মন্ডল চৌষট্টি ঘর, নাপিত এক ঘর। এদের প্রায় সকলেরই মুখের ভাষা খোট্টা। তবে শিক্ষা দীক্ষার একটু ছাপ পড়ায় কেউ কেউ সাধারণ বাংলাও বলে থাকেন। শিক্ষায় অবশ্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ই অগ্রসর। অন্যান্য সম্প্রদায়রা তুলনামূলক কম হলেও আগ্রহী হচ্ছে। পূজা পার্বণ ও আচার অনুষ্ঠানে তারা নিকটবর্ত্তী গ্রাম ধরমপুরকেই অনুসরন করে থাকে।

আটগামা (১৭) ঃ

কালিন্দ্রী নদীর তীরে মিল্কি গ্রাম থেকে পাঁচশত মিটার ব্যবধানে আটগামা মৌজা অবস্থিত। তৎকালীন আটটি গ্রাম নিয়ে এই মৌজাটি গঠিত হয় বলে বোধ হয় এটির নাম আট গামা। এখানকার জনসংখ্যার প্রায় দেড় হাজার দু - এক ঘর মুচি ছাড়া বাকী প্রায় সবাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। মুসলিমদের মধ্যে আবার এরা পাঠান সম্প্রদায়ের। ইটভাটায় কয়লা সরবরাহ করা, গাছ কিনে বিক্রি করা এগুলিই বেশিরভাগ লোকের ব্যবসা। ব্যবসার মধ্যে কয়লার ব্যবসাই প্রধান। এছাড়া ইট ও আমের ব্যবসা করে বর্তমানে অনেকে বেশ অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছে। উৎপাদিত ফসল হল যব, গম, ছোলা, ভুট্টা, মুসুর, কলাই ইত্যাদি।

ফুলবাড়িয়া (২৪) ঃ

এই গ্রাম থেকে একটি কালো পাথর নির্মিত স্তম্ভ পাওয়া গেছে যা উচ্চতায় প্রায় সাত ফুট। এই স্তম্ভে একটি মনসা মূর্তি আছে এবং সাপের ফণা পুরো স্তম্ভ জুড়ে আছে। এটি পেয়েছেন স্থানীয় শ্রী মহেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়। বর্তমানে এটি স্থানীয় মনসা মন্দিরে রাখা আছে।

নঘরিয়া (২৫) নয়াঘর > নয়ঘর > নঘর > নঘরি > নঘরিয়া ঃ

নঘরিয়া প্রসিদ্ধ ছিল বাণিজ্য পোতাশ্রয় হিসাবে। সুলতানী আমল তথা ইংরেজ আমলেও মালদহ ছিল তুঁত, মশলা, কাঁসার বাসন, গুড়, রেশম ইত্যাদির অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। বড় বড় নৌকায় বাণিজ্য দ্রব্য পরিবাহিত হত গঙ্গা-কালিন্দ্রীর জলপথে। বাণিজ্যদ্রব্য যেত কলকাতা, ভাগলপুর, পাটনা, মুঙ্গের, এলাহাবাদ ইত্যাদি শহরে এই বাণিজ্যপথের অন্যতম বন্দর ছিল। নঘরিয়া। এখানকার বন্দরস্থিত ঘরগুলিতে হিসাব করে পুটুলি ভর্তি থাকত মালদায় উৎপন্ন কাতার, মুসারী, রেশম ইত্যাদি বস্ত্র সম্ভার। যা জাহাজ বা বড় নৌকাগুলি চাহিদা অনুযায়ী তুলে নিয়ে যেত। সেই থেকেও এই পোতাশ্রয় নয়ঘর/নয়াঘর বা নঘরিয়া বলে পরিচিত হতে পারে।

লছমীঘাট (২৬) ঃ

নঘরিয়া পোতাশ্রয়ের অদূরেই মহানন্দা নদীর তীরে লছমী ঘাট-এ বাইচের মেলা প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন। আশেপাশের গ্রাম থেকেও প্রচুর যুবক বৃদ্ধ বাইচ খেলায় অংশ নেবার জন্য তথা এখনও দর্শক হি[illegible] উপস্থিত হন।

সোনাতলা (২৯) ঃ

এই মৌজায় রয়েছে বিখ্যাত অমৃতি গ্রাম।

রামাবতী > আমাবতী > আমারতি > আমরতি > অমৃতি

১১৪০-১১৫৫ খৃঃ পালবংশের সপ্তদশ পুরুষ মহারাজ রামপাল দিয়ারার মাটিতে 'রামাবতী' নগরী স্থাপন করেন। এই নগরী থেকেই তিনি গৌড় দেশ শাসন করতেন। সেই রামাবতী নগরীর বর্তমান রূপনাম অমৃতি। এই অমৃতি গ্রাম কালিন্দ্রী নদীর দক্ষিণ তীরে আজও আছে। রামাবতী থেকে অমৃতি উচ্চারণ বিবর্তণের রূপটি হল রামাবতি > আমাবতী (মালদহের নিজস্ব উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য 'র' 'অ' স্বরবর্ণে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আবার সেই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে শব্দের মধ্যস্থানের 'ব' 'র' হয়ে যায়। ফলে আমারতি। এরপর আমরতি হল মাগধী উচ্চারণের প্রভাবে, শেষের অক্ষরের উপর হলন্ত 'র' এর উপর জোর পরে। এছাড়া প্রচলিত লোকজ শব্দকে বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করার বিশেষ প্রবণতা থেকেও 'অমৃতি' হতে পারে। ১৯২৮ খ্রীঃ মালদহের লেখক রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রণীত 'ভূগোল শিক্ষা প্রণালী ঃ মালদহ জেলার বিবরণ' গ্রন্থে বলেন 'অমৃতি' নামক জলপাত্র এই নগরের আমরতি নামক স্থানে প্রস্তুত হইত, কড়ির দর্পণ, লন্ঠন ইত্যাদিও কুটীর শিল্প আকারে প্রস্তুত হোত।

কালের বিবর্তণের সাথে সাথে রামাবতী তার গুরুত্ব হারায় কিন্তু মাটির সঙ্গে মিশে থাকে তার রাজকীয় ঐশ্বর্য। এখানকার মাটিতেই বোধ হয় সোনা মিশে ছিল। কারণ অদূরেই চাঁচল থানার অন্তর্গত কাণ্ডারণ মৌজা থেকে পাওয়া ৫/৬টি মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশে অভ্র ও সোনার কণা মিশ্রিত রয়েছে। সেই জনাই পরবর্তীকালে অমৃতি রামাবতীর একটি খণ্ডাংশের পরিণত মৌজার নাম 'সোনাতলা'।

অমৃতিতে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বসে বিরাট মেলা। নাম মহানন্দ মেলা। প্রায় ৫৮ বছর আগে শেঠ মহানন্দ দাস এই মেলার সূচনা করেছিলেন। যারা দুঃস্থ, অথবা পরিবার পরিজনদের

কাছে ব্রাত্য, হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে এই সব মানুষদের কাছে এই মেলা কমিটি তুলে দেন ধুতি শাড়ি, চাদর ইত্যাদি। বছরভর স্থানীয় মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে মন্দির কর্তৃপক্ষের বিরাট কর্মসূচী যেমন হোমিওপ্যাথী চিকিৎসালয়, অ্যাম্বুলেন্স পরিসেবা এমনকি লোক আদালত ইত্যাদিও। সব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই মেলা তাই শুধু আনন্দের নয়, প্রয়োজনেরও বটে।

শাহজালালপুর (৩৪) ঃ

মালদহ জেলার ইংরেজবাজার থানায় যে কটি শতাব্দীপ্রচীন ঐতিহ্যমন্ডিত দুর্গাপূজা হয় শাহজালালপুর মৌজার কোতয়ালী গ্রামের পূজা তাদের অন্যতম। ১৫০ বছরের প্রচীন এই পূজা অভিজাত্যে কৌলিন্যে, কৃষ্টিগত মর্যাদায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার জমিদার সেন বাড়ির নামেই এই পূজা 'সেন পাড়ার পূজা' নামে বিখ্যাত। এই সেন পরিবারের জমিদারদের পূর্ব বাসস্থান ছিল বর্ধমানের শ্রীখন্ড। এখানকার জমিদাব রাধানাথ চৌধুবী ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি কোতুযালীর বর্তমান ভুখন্ডটি ক্রয় করে তাঁর ভাগিনেয় রঘুনন্দন সেনকে নিয়ে এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি বৈষ্ণব মতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একদিন দুর্গা পূজো করার জন্য স্বপ্নার্দিষ্ট হন। তারপর বাড়ির বাগানে বর্তমান নিমগাছের পূর্বাংশে প্রথম পূজা হয়। শ্রীখন্ডেব জমিদার বাড়ীতে বলিদান প্রথা থাকলেও তিনি এই প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। এই পূজার প্রচলন হয় বাংলা ১২৬২ সালে। রঘুনন্দন তিনটি বিবাহ করেন। চার পুত্র এবং চার কণ্যা সন্তানের জনক হন। এরাই যথাক্রমে যদুনন্দন সেন, জানকীনন্দন সেন, গিরিজানন্দন সেন, এবং সুরেন্দ্রনাথ সেন, কন্যারা রাজেশ্বরী দেবী, শরদেশ্বরী দেবী, নীরদেশ্বরী দেবী, ও ব্রজাঙ্গনা দেবী। এরাই বংশ পরম্পরায় এই পূজো বিশেষ বিধি ব্যবস্থার সাথে নিষ্ঠাভরে পালন করেন। ঐতিহ্য মন্ডিত এই পূজোয় পুরোহিতের দায়িত্ব নির্দিষ্ট। এই দায়িত্ব দীর্ঘদিন ধরে পালন করে আসছেন নলিনীকান্ত মুখার্জী, শ্রী রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং বর্তমানে আড়াপুরের শ্রী বিপ্লব চক্রবর্তী। ষষ্ঠীর দিন সকালে সুদৃশ্য পালকী চেপে নিকটবর্তী কালিন্দ্রী নদী থেকে স্নান করে ফেরেন কলা-বৌ।

এই পূজোকে কেন্দ্র করে কোতোয়ালী গ্রামে একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে উঠছে। আগে অষ্টমী এবং নবমীর দিন নিয়মিত নাটক অভিনয় হোত। যাতে স্থানীয় নারীপুরুষ নির্দ্বিধায় অংশগ্রহন করতেন। এছাড়া হোত মালদার বিখ্যাত গম্ভীরা গান। দশমীর দিন এই প্রতিমা বিসর্জন হয় সেনবাড়ির নিজস্ব ঘাটে। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হতো উত্তেজক বাইচ খেলা, যা কালিন্দ্রীর কোতোয়ালী ঘাট থেকে পুরাতন মালদহ পর্যন্ত যেত। উল্লেখ্য যে পুরুষদের নৌকা আর মেয়েদের নৌকা ছিল আলাদা। বিসর্জনের পর গ্রামের সকল লোক জমিদার বাড়ির দুর্গাতলায় এসে মিষ্টিমুখ করে ফিরে যেতন।

পিছলি (৪০) ঃ

ইংরেজবাজার অমৃতি গ্রাম থেকে ৩/৪ কিমি এগিয়ে পাওয়া পিছিলা মৌজা। এর পাশেই ৩৯ নং গঙ্গারামপুর মৌজা থাকার কারণে এই অঞ্চলটি পিছলি গঙ্গারামপুর বলেও পরিচিত। এই অঞ্চলটি থেকে প্রবাহিত কালিন্দ্রী নদীর গতিপথ ভয়াবহ ভাবে পরিবর্তিত হয়ে প্রতি বছর ব্যাপক ধ্বংসের আকার ধারন করে। তারই প্রমাণ স্বরূপ পিছলির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে অনুচ্চ মৃত্তিকা স্তুপ বা ঢিবি এবং এখানে সেখানে জলপূর্ণ গর্ত অথবা মজে যাওয়া

নানান নামের বহু প্রাচীন পুকুর। জনশ্রুতি এই স্থানটি প্রাচীনকালে হিন্দু রাজা আদিশূরের রাজধানী ছিল। শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল বলেও কেউ কেউ মনে করেন। এই এলাকা থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত বহুবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি প্রামান করে যে প্রাচীনকালে এখানে একটি উন্নত জনবসতি ছিল। শুধু তাই এই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত প্রত্ন সামগ্রীর সময়কাল প্রমান করে যে সুদূর পাল রাজত্বকাল থেকে গৌড়ের মুসলমান বাদশাদের আমল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে এই এলাকাটি একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল।

প্রতি বছর বন্যায় কালিন্দ্রীর পাড় কিছু কিছু ক্ষয়ে গিয়ে, উঁচু ঢিবি ইত্যাদি বর্ষার জলে ধুয়ে গিয়ে এবং সেখানকার বনজঙ্গল বিভিন্ন কারনে পরিস্কার অথবা চাষআবাদের কারনে খোঁড়াখুঁড়ির ফলে বিভিন্ন প্রকার প্রাচীন প্রত্ন নিদর্শন মাটির নীচ থেকে অহরহ বেড়িয়ে এসেছে। এদের মধ্যে আছে, প্রস্তর মূর্তি, তৈজস পত্র, পাথরের তৈরী জলচৌকি, বিরাট বিরাট অট্টালিকার ভিত্তি, ইট দিয়ে বাঁধানো পাকা রাস্তার নিদর্শন ইত্যাদি। এছাড়া প্রাচীন মুদ্রা বলতে স্বর্ণমুদ্রা এবং স্বর্ণালঙ্কার প্রাপ্তির কথাও মাঝে মাঝে শোনা যায়। পিছলীতে আবিস্কৃত বিভিন্ন শিলামূর্তির মধ্যে আছে ফুলবাড়িয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মনসা মূর্তি, বিনপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত মনসা মূর্তি, মালদহ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত কয়েকটি বৌদ্ধ প্রস্তর মূর্তি, এর মধ্যে বরাহী মূর্তিও আছে। এছাড়া ক্যাপ্টেন লয়ার্ড মিঃ জে জে গ্রে সে সময় তিনটি প্রস্তর মূর্তি পিছলি থেকে সংগ্রহ করে এশিয়াটিক সোসাইটিকে দান করেছেন। একটি মূর্তি পালঙ্ক শয়ান শিশুকে স্তন্য দানরত স্ত্রী। দ্বিতীযটি একটি খিলান, তার মধ্যে স্তম্ভের এক পাশে বিষ্ণু এবং অন্যপাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী ও তৃতীযটি একটি রথাশ্বচালিত দন্ডায়মান সূর্য, পাশে উষা।

পিছলী থেকে প্রাপ্ত আরো বিবিধ প্রত্নসামগ্রীর মধ্যে গৌড়ে মুসলীম আমলের ফার্সী ভাষায় লেখা দুটি ঐতিহাসিক প্রস্তরলিপি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি উদ্ধার করেন আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৯০ খৃঃ। এই শিলালিপির পাঠোদ্ধারে জানা যায় যে দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে (১২১০-১২৩৫ খৃঃ) এখানে যে মসজিদটি নির্মিত হয় ঐ মসজিদটি পরবর্ত্তী কালে দিল্লীর সুলতান নাসির -উদ্দীন -মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১২৪৬-১২৬৫খৃঃ) লাখনৌতি অর্থাৎ গৌড়ের গর্ভনর জালাল-উদ-দীন মাসুদজানী কর্তৃক ১২৮৯ খৃঃ মেরামত করা হয়। এই মসজিদটির ধ্বংসাবশেষ এখনও পিছলীতে বর্তমান। এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে আছে বিশাল আয়তাকারের পূর্ণঘট খোদিত শিলাখন্ড। এখনও বিশেষ উৎসবের দিনে মুসলমান ধর্মপ্রান ব্যক্তিরা এখানে জমায়েত হন।

দ্বিতীয় শিলা লেখটি একটি ভগ্ন ফার্সী শিলালিপি। এটি ১৯৭৬ খৃঃ পিছলি থেকে সংগ্রহ করে রাষ্ট্রীয় শিক্ষক প্রশিক্ষন মহাবিদ্যালয়ে রাখা হয়। লিপিটির পাঠোদ্বার করেন মালদহ জেলার অন্যতম প্রত্ন গবেষক শ্রীকমল বসাক। এই পাঠের ফলে জানা যায় যে, গৌড়ের সুলতান সামসুদ্দিন য়ুসুফ শাহের বাজত্বকালে (১৪৭৪- ১৪৮১ খৃঃ) পিছলীতে একটি মসজিদ নির্মিত হয়।

তাম্র নির্মিত বিবিধ দ্রব্য এখানে প্রস্তুত করা হোত তা মালদহের লেখক রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর ভূগোল শিক্ষা প্রণালী: মালদহ জেলার বিবরণ নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারি (২০০৫) থেকে বিশ্বভারতী ইউনিভারসিটির আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের দুজন অধ্যাপক ও ডঃ অরুন নাগ ও ডঃ শীনা পাঁজার তত্ত্বাবধাণে সেখানে পুণরায় খননকার্য শুরু হয়েছে।

শৈলপুর / শোলপুর (৪৫) ঃ

এই গ্রামে একটি পার্বতী মূর্তি, একটি সূর্য এবং অন্য আরও একটি পাথরের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু বর্তমানে কোন মূর্তিই নেই। পার্বতী মূর্তিটি চুরি হয়ে গেছে। অন্য দুটি রয়েছে স্থানীয় পুলিশের হেফাজতে। এই গ্রামে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত প্রসিদ্ধকালীপূজা অতি প্রসিদ্ধ।

নরহাট্টা (৪৮) ঃ

কালিন্দ্রী নদীর তীরে নরহাট্টা মৌজাটি বর্তমান। প্রাচীনকালে মানুষ কেনাবেচার হাট বসত বলে অনুমান। এখান থেকে একটি পাথরের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

নিম্‌সরাই / নিমাসরাই (৫৩) ঃ

ইংলিশবাজার থেকে মালদহ টাউন স্টেশনের পাশ দিয়ে আরাপুর কোতোয়ালীর পথে অথবা পুরাতন মালদহের পথে মহানন্দার পশ্চিমপাড়ে এই সুপ্রাচীন নিমা - সরাই বা নিম্‌-সরাই।

গৌড় ও পাড়ুয়া তৎকালীন বাংলার প্রশাসনিক দিক থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এই দুই কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্যমবর্তী অঞ্চলে, কালিন্দ্রী ও মহানন্দার সঙ্গমস্থলে গড়ে উঠেছিল এই গুরুত্বপূর্ণ বন্দর শহর। এখানে দেশী - বিদেশী পণ্যতরীর অবিরাম আনাগোনা, তাই আকবরের সমসাময়িক কালে এখানে নির্মিত হল একটি 'ওয়াচ টাওয়ার'। এই মিনারটির সৌন্দর্য বর্ণনায় ফতেপুর সিক্রীতে আকবরের হিরণ মিনারের এবং লাহোরের শিকাহ্‌পুরের দারাশিকোর মিনারের তুলনা বার বার উঠে আসে। মিনারটির বাইরের দিকে হাতির দাঁতের মত প্রস্তফলক বিকীর্ণ। র‍্যাভেনশ'র মতে বহিঃশত্রুর আক্রমণ অথবা যে কোন বিপদের সময় প্রস্তর ফলকের গায়ে মশাল জ্বেলে দেওয়া হত। ঈদ ইত্যাদি উৎসবের সময় মিনারটি সেজে উঠত উজ্জ্বল আলোকমালায়। তাই এর অপর নাম ছিল 'চেরাগদানি'। এফ. সি. ফ্যাসন আবার এটিকে 'শিকারগাহ' বলতে চান। কারণ বুরুজের মাথা থেকে তীর মেরে দূর থেকেই শত্রু নিধন করা যেত।

ফার্সীভাষায় 'নিম' শব্দটির অর্থ অর্ধেক। আর 'সরাই' কথাটির অর্থ পান্থনিবাস, চটি, থাকা - খাওয়া সহ রাত্রিবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি। গৌড় ও পাড়ুয়ার অর্ধ পথে এই সরাইখানাটি নির্মান করেন মাসুম নামে এক বিখ্যাত সওদাগরের ভাই। এই সরাইখানায় নিরাপত্তার কারণে কেবল খাবার বন্দোবস্ত ছিল, রাত্রিবাসের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেইজন্যই এই জায়গাটির নাম নিম্‌-সরাই এমনটি মনে করা হয়।

আর একদল পন্ডিতের মতে জায়গাটির প্রকৃত নাম নিমা-সরাই। নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে শ্রী চৈতন্যদেব গৌড়ের রামকেলীতে এসেছিলেন এই জলপথেই। কবি কর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই দুই স্বনামধন্য কবির লেখায় উক্ত মতের সমর্থন মেলে। তাঁদের রচনার নিখুঁত বর্ণনায় আছে — উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ এই দুটি যুযুধান রাজ্যের মধ্যে কেবল ১৫১৪ খৃঃ যুদ্ধ

বন্ধ ছিল। উড়িষ্যা থেকে গৌড় প্রবেশের তিনটি মুখ্য পথের দুটি ছিল তখনও অবরুদ্ধ কেবল একটি জলপথই ছিল অর্ধরুদ্ধ। সেই জলপথেই শ্রী চৈতন্যদেব (১৫১৪ খৃঃ) গৌড়ে আসেন এবং এই অঞ্চলে পদার্পণ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। সেই থেকে অদ্যাবধি এই অঞ্চলটি নিম্-সরাই অথবা নিমাসরাই নামেই পরিচিত হয়ে আসছে।

জোত (৫৫) ঃ

এক জোড়া বলদযুক্ত গাড়ী যে জমি চায করতে পারে তাকে জোত বলা হত। এখানকার জগদ্ধাত্রী পূজার মেলাতেও বহু জনসমাবেশ হয়।

আরাপুর (৫৬) ঃ

অহইৎপুর > আমীরপুর > আরাপুর। ইংরেজবাজার বাগবাড়ীর এক মাইল উত্তরে আরাপুর। যাব প্রাচীন নাম অর্হইৎপুব। নামের সঙ্গে জড়িত স্থানটিব সঙ্গে বৌদ্ধযুগের প্রথম আমলের সম্পর্ক রয়েছে। বৌদ্ধদের বিচরণ ক্ষেত্র বা থাকাব জায়গা ছিল এমনটিও হতে পারে। এই অঞ্চল মহানন্দার তীর পর্যন্ত পরিবর্ধিত ছিল। বর্তমানে কোতুয়ালী গ্রামের কাছেও আরাপুর নামে একটি স্থান আছে। এটি মুসলমান আমলে গৌড়ের প্রতিরক্ষার শিবির হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

কলতাপাড়া (৬২) ঃ

এই মৌজার মধ্যে আছে গয়েশপুর অঞ্চল।

গয়েশপুর — বীরভূম জেলার লখনোর থেকে উত্তর দিনাজপুর জেলার দেবকোট পর্যন্ত যে সুউচ্চ রাস্তা বিস্তৃত তার একটি অংশ মালদা শহর থেকে মানিকচকের পথে পড়ে। ঐতিহ ासিকগণ মনে করেন এই রাস্তাটি বখতিয়ার খিলজী শুরু করেন এবং গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ - এর আমলে নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। গিয়াসুদ্দিন নির্মিত রাস্তা থেকে এই অঞ্চলের নাম গয়েশপুর বলে মনে করা হয়। কিন্তু 'পুর' কথার অর্থ যদি সংরক্ষিত সেনানিবাস, স্কন্ধাবার, দুর্গ, কুট, নগর, গ্রামের অভ্যন্তরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ ইত্যাদি অর্থ বহন করে, তাহলে সেই দিক দিয়ে বিচার করলে গিয়াসুদ্দিনের কোন সেনানিবাস সেখানে ছিল কি না অথবা তিনি সেখানে কোন নগর তৈরীর পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা ইতিহাসগতভাবে তার কোন সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া যায় না। অপরদিকে সুলতান হোসেন শাহের আমলে চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বাসস্থান ছিল এই গ্রামটি। তাঁর পুত্র বীরভদ্র বৈষ্ণবধর্ম প্রচারার্থে খরদহে ফিরে গেলেও বীরভদ্রের মধ্যম পুত্র রামকৃষ্ণ গোস্বামী এই অঞ্চলেই থেকে যান। এই গোস্বামী বংশ মালদহে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ও প্রসারে এক উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিলো। ডঃ ফ্রান্সিস বুকানন ১৮০৯ - ১০ খৃঃ পূর্ণিয়া সফরকালে এই পরিবারটি সম্পর্কে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। তার থেকে জানা যায় রামকৃষ্ণ গোস্বামীর পরবর্ত্তী পঞ্চম পুরুষ অটল বিহারীর আমলে এই পরিবারটির প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশী বিস্তৃতি লাভ করে এবং তিনি এক বিশাল সুশৃঙ্খল শিষ্যমণ্ডলী গড়ে তুলতে সমর্থ হন। বংশ পরম্পরায় জনপ্রিয় এই গোস্বামী পরিবারটি এই অঞ্চলে এক নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল তৈরীর কারণেও এই অঞ্চল 'গয়েশপুর' বলে চিহ্নিত হতে পারে।

শেরপুর-মোকিমপুর (৬৩)ঃ

কোঠাবাড়ি — মহানন্দা নদীব পশ্চিম পাড়ের নিচু অংশের জনবহুল এলাকা কোঠাবাড়ি নামে চিহ্নিত। এখানে যাঁরা প্রথমে বসতি স্থাপন কবেন তাঁরা মূলতঃ মৎস্য এবং সব্‌জী ব্যবসায়ী। এঁরা নিজেদের পরিচয়ে 'নাড়েগুস্তি', 'পাঁঝরা' এবং 'মহল্‌দার' বা 'মহালত' এই সম্প্রদায়ভুক্ত বলে নিজেদের চিহ্নিত করেন। এইচ বেভারলি এবং এইচ এইচ রিজলির মতে এইসব বাঙালি মুসলমানদের সকলেই প্রায় বাংলার অন্ত্যজ শ্রেণী থেকে ধর্মান্তরিত। এই 'পাঁঝরা' বা 'নাড়েগুস্তি' সম্প্রদায় আগে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং পরে তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। শারীরিক দিক থেকে শক্তিশালী এবং মানসিক দিক থেকে সাহসী এইসব মানুষকে ঝড়-বৃষ্টি বন্যা এবং খরা এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হতো। প্রচলিত টিন, কাদামাটি, কাঠ বা বাঁশের তৈরি ঘর এই জায়গার পক্ষে অনুপযক্ত ছিল। মহানন্দার পুর্বপাড়ের বরিন্দ অঞ্চলের বিশেষ শক্ত মাটি ছিল তাঁদের চেনা। শোনা যায়, বরিন্দ অঞ্চলের মাটি দিয়েই তৈরি হয়েছিল দুধর্ষ একডালা দুর্গ। ফিরোজ শাহের আক্রমণকালে যাকে কামান দিয়েও বিনষ্ট করা যায়নি। শুধু তাই নয় এই মাটি নির্মিত ঘর নাকি শীতকালে গরম এবং গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা থাকে। এইসব মানুষেরা এই মাটি মহানন্দার জলপথে পশ্চিমপাড়ে নিয়ে এসে ঘর তৈরি করেছিল, যা একাধিক বন্যাতেও বিনষ্ট হত না। বাড়ি নির্মাণেব এই বিশেষত্বের জন্যই এই অঞ্চলটির নাম হয় কোঠাবাড়ি। 'কোঠা' কথাটির দু-একটি অর্থ যদি দালান বা ইমারত হয় তাহলে মৃত্তিকা নির্মিত এই ক্ষুদ্র কুঠিরগুলিও যে তার সঙ্গে স্থাযিত্বের নিরিখে পাল্লা দেবার স্পর্ধা রাখে তারই ইঙ্গিত বহন করছে এই নাম। যদিও বর্তমানে এই মৃত্তিকা নির্মিত ঘরবাড়ি আর চোখে পড়ে না বললেই হয়।

সর্ব্বমঙ্গলাপল্লী — 'সর্বমঙ্গলা' এই নামটিব উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। সেখানে শক্তি দেবতার যে নামগুলি পাওয়া যায় সেগুলি যথাক্রমে — দুর্গা, নারায়নী, ঈশানী, বিষ্ণুমায়া, শিবা, সতী, নিত্যা, সত্যা, ভগবতী, সবানী, সর্বমঙ্গলা, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, গৌরী, পার্বতী, সনাতনী ইত্যাদি। দেখা যায় যে পুরাণেব সকল শক্তিদেবতার উদ্ভবের ইতিহাসে পরস্পরিক স্বতন্ত্রতা থাকলেও কালক্রমে সবই শিবের একমাত্র পত্নীরূপে পরিণতি লাভ করেছে। আর বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিবিধ স্থানীয় অবস্থা থেকে পরস্পর স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে সব স্ত্রীদেবতার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তাই কালক্রমে এক সাধারণ চণ্ডী নামের মধ্যে এসে স্থান লাভ করেছে। পাল, সেন আমলে যে সব মূর্তি আমরা পাই সেগুলি হল ঃ সর্বানী, দুর্গা, গৌরী, পাবর্তী, মহিষমর্দিনী, অম্বিকা ইত্যাদি। কিন্তু 'সর্ব্বমঙ্গলা' নামটি আপাত অবার্চীন, যখন কোপন স্বভাব দেবীর উপর 'মঙ্গল-দায়িনী' এই অভিধাও যুক্ত হচ্ছে। সেই হিসাবে মালদহ জেলায় এই নামধারিনী দেবীব অস্তিত্ব পাওয়া যায় কালিয়াচকের বালুগ্রামে, মঙ্গলবাড়ী গ্রামে সতী বেহুলা নদীর তীরে সর্ব্বমঙ্গলা থান এবং ইংরেজবাজার শহরের মধ্যস্থলে সর্বমঙ্গলাপল্লীতে।

৩৪ নং জাতীয় সড়ক একদিকে অপরদিকে মালদহ টাউন ষ্টেশন রোড এরই মধ্যেকার একটি অঞ্চল সর্ব্বমঙ্গলাপল্লী নামে চিহ্নিত। ঘন জনবসতিপূর্ণ এই স্থানের মধ্যবর্ত্তী ২৩ শতক জমি ৭ বিঘা পুকুরের মাঝামাঝি প্রাচীন বটগাছেব নীচে জনপ্রিয় সর্ব্বমঙ্গলা থান। অনেক কাহিনী কিংবদন্তী এই স্থান এবং পুকুরটিকে নিয়ে প্রচলিত আছে। যে কোন ধরণের চর্মরোগ এবং বাত জাতীয় রোগ নাকি এই পুকুরে নিয়মিত স্নান করলে সেরে যায়। তাই পুকুরটির নাম বেতাপুকুর।

থানটি স্থানীয় মানুষজনদের মুখে মুখে এই থান ১৫০ বছরের এমনকি ৩০০/৪০০ বছরের পুরাতন-ও হতে পারে। এটি ডাকাতদের প্রতিষ্ঠিত কালীর থান, জনশ্রুতি সর্ব্বমঙ্গলা থেকে মনস্কামনা মন্দির পর্যন্ত দীর্ঘ সুরঙ্গ দ্বারা যুক্ত ছিল। ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে পুকুরের জলে এক ডুব দিয়ে মাটি তুলে অমাবস্যার রাতে মূর্তি বানিয়ে পূজো করে আবার রাতেই তাঁকে পুকুরের জলে বিসর্জিত করা হতো। এখনও পর্যন্ত কালীপূজোর রাতে একইরকম পূজা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ডাকাতরা কোন নির্দশন রাখতে চায় না এই জন্যই কিনা জানা যায় না তবে এই থানে কোন মন্দির বানানো যাবে না এইরকম জনপ্রবাদ। আগে এখানে একটি ঈদ্‌গাহ-এর মাঠও ছিল, সেটি বর্তমানে সুভাষপল্লীর ষ্টেশন রোড-এর ধারে রয়েছে। এখন এখানে ১লা বৈশাখ ঘেঁটুপুজো হয়, তাতে পাড়া-প্রতিবেশীরা তাদের সারা বছরের বিয়ে, পূজো ইত্যাদির ডালা, কুলো, ফুল, বেলপাতা এই পুকুরে বিসর্জন দেন। আর জ্যৈষ্ঠমাসেব অমাবস্যায় হয় ফলাহারী পূজো। এখানকার এক বিস্তীর্ণ জমির মালিক ছিলেন গয়েশপুরের জহুজা বিহারী গোস্বামী। তিনি তারই কিছু কিছু অংশ বিক্রি করে দেন। এখন এই জমির বৈধ অধিকারী গীতা কুণ্ডু। আর একই রাতে পূজো শেষ করার প্রাচীন পদ্ধতি বহুদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন অশোক রায় মহাশয়।

জনশ্রুতির সঙ্গে পুরাণ কিভাবে একাকার হয়ে যায় সর্ব্বমঙ্গলাপল্লী-ই তার প্রমাণ। সর্ব্বমঙ্গলা দেবীদুর্গার আর্যীকৃত নাম। কিন্তু ডাকাত দল কর্তৃক এই দেবীব প্রতিষ্ঠা হলে এই নাম তাদেব জানার কথা নয়। তাই কোন দুর্ধষ উপজাতিদের আরাধ্য অবয়বহীন চণ্ডী পূজাই পরবর্তীকালে সংস্কৃতজ্ঞ মানুষজনের হাতে পড়ে দুর্গা চণ্ডীর একীভূত, অপর নাম সর্ব্বমঙ্গলায় পরিণত হয এই রূপই অনুমিত হয়।

বাঁশবাড়ি — রামচরিত থেকে চন্ডীমঙ্গল - তৎকালীন বাংলাদেশে রচিত প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থই স্বীকার করে নিয়েছে যে, - 'খুব ভাল বাঁশের ঝাড় ছিল বরেন্দ্রীতে'। আর এই প্রসঙ্গেই খুব নির্দিষ্ট ভাবে সন্ধ্যাকর নন্দী বলেছেন - ''বরেন্দ্রীতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম উপকরণ ছিল বাঁশ তথা বাঁশ প্রজাতির আখ বা ইক্ষু। এই ইক্ষুজাত উৎকৃষ্ট গুড় থেকেই বরেন্দ্র ভূমির নাম যে গৌড়ভূমি তার শব্দতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমান ও ব্যাখা দিয়েছেন অনেকের সাথে গ্রীক ঐতিহাসিক ঈলিয়ন এবং লুক্যান।

ইংরেজবাজার ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ধরে পুরাতন মালদহের পথে মহানন্দা নদী তীবরর্তী জনবসতিপূর্ণ এলাকাটি বাঁশবাড়ি বলে চিহ্নিত। ১৯৩০ সালে মালদায় ইংরেজ আগমনের আগে পর্যন্ত প্রায় ৪ স্কোয়ার কি. মি. অঞ্চল ছিল মূলতঃ ঘন বাঁশ ঝাড়ে ঢাকা। বিভিন্ন ধরনের বাঁশ ছিল এই অঞ্চলের সম্পদ। যেমন — ডাঁশা, মাকান, ফোকলা, মুলি এবং ঝাড় বাঁশ। তাছাড়া একটু বিরল প্রজাতির ব্যম্বুসা এশিয়াটিক জাতের কিছু বাঁশ, যা উঁচু পর্বত প্রধান অঞ্চলে পাওয়া যায় তাও এখানে জন্মাত। যদিও তা পরিমাণে বা সংখ্যায় অত্যন্ত কম। চার থেকে পাঁচ ফুট উচ্চতার বাঁশ যেমন দেখা যেত তেমনি কোন কোন বাঁশের উচ্চতা ছিল ২৫ থেকে ৪৫ ফুট। মালদহ জেলাব এই বিশেষ প্রাকৃতিক সম্পদটি এই অঞ্চলকে বহুদিন ধরে সমৃদ্ধ করেছে। জন্ম দিয়েছে একাধিক গ্রামীণ কুটির শিল্পের। মহানন্দার অপর পারে বরেন্দ্রভূমিতে ছিল শাল-সেগুনের গভীর

অরণ্য, সেই কারণে অথবা কারণ যাই হোক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল বাঁশ গাছের জন্য যথাযথ। তাছাড়া মহানন্দার নিম্ন অঞ্চলের মাটির উৎকর্ষতাও বাঁশ প্রজননের সহায়ক ছিল।

একটা সময় পর্যন্ত বাঁশকে কেন্দ্র করে মালদহের অর্থনীতি যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল, পুরাতন মালদহের কেবলমাত্র বাঁশ কেনাবেচার নির্দিষ্ট বাজার 'বাঁশহাট্টা'-ই তা প্রমাণ করে। গঙ্গা-পদ্মা মহানন্দার স্রোতে ভেসে ভেসে এই বাঁশ চলে যেত বাংলাদেশ তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে।

এদেশে ইংরেজ আগমনের পর গ্রামীণ অর্থনীতি যখন নতুন মোড় নিল তখন কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি কুটিরশিল্প কিছু কিছু মানুষের হাতে উদ্বৃত্ত ধন এনে দিল। ফলে ব্যক্তিস্বার্থ ভাবনা সাম্যবাদী সমাজে ফাটল ধরাল। উদ্যোগী পুরুষরা নিজস্ব আদি বাসভূমি সংলগ্ন ভূমিতে স্বত্ত্ব বিস্তার করতে লাগলেন । খাত কেটে উঁচু আল দিয়ে ব্যক্তিস্বত্ত্ব সুনিশ্চিত করলেন তারা। পরোদ্ভুত এই বণিক শ্রেণীর ব্যক্তি ভোগভূমি আবাদ বা 'সাঁওতালী আবাড়' বা 'বাড়ি' এই নামে চিহ্নিত হলো।

স্থান নামের সঙ্গে যখন 'বাড়ি' শব্দটি যুক্ত হয় তখন তার অর্থ হয় — 'বাস্তু-সংলগ্ন ভূমি, তরি-তরকারী উৎপাদন যোগ্য উঁচুজমি'। দ্বাদশ শতকে ঈশ্বর ঘোষের লিপিতে 'বাড়ি' অর্থে বৃক্ষ-সম্পৃক্ত শব্দই বোঝান হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত হয়েছে 'উদ্যান' অর্থে। বাড়ি শব্দটির মূল সংস্কৃত 'বর্ধ' ধাতু। এখান থেকেই বাটিকা > বাটিঅ > বাড় > আবাড় > বাড়ি ইত্যাদি। আজ মালদার সেই স্বর্ণসময় অন্তর্হিত। তবুও কেবলমাত্র বাঁশের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলই লোকের মুখে মুখে একদিন 'বাঁশবাড়ি' এই নামে সুপরিচিত হয়ে গেল।

কুতুবপুর (৬৪), পুড়াপাড়া (৬৫) ঃ

১২০২ খৃঃ ইখতিয়ার উদ্দিন - বিন বখতিয়ার খলজির হাতে লক্ষণ সেন পরাজিত হলে নিজেকে গৌড়ের শাসনকর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই তুর্কী। মহানন্দার পশ্চিমপাড়ের (৩৪ নং জাতীয় সড়কের ডানদিকে)। আমাদের আলোচ্য অঞ্চলটি তখন মৎস্যজীবী অধ্যুষিত গ্রাম মাত্র। এর পরের ইতিহাস চারশো বছরের সুলতানী শাসনের। এই সুদীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশে ইসলামী শাসন এবং ইসলাম ধর্ম যে সুবিস্তৃতি এবং সুসংহতি লাভ করেছিল তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল একাধিক সুফী দরবেশের উন্নতমানের জীবন ধারণা।

এইরকমই একজন সুফী দরবেশ ছিলেন হযরত - নুর - কুতুব - উল্ - আলম। ইতি বিখ্যাত শেখ আলাওল হকেব সুযোগ্য পুত্র ও সার্থক আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী।

এই প্রাজ্ঞ পুরুষ 'অহদাতুল ওজুদ' (মূলের ঐক্য) নামক এক অসাম্প্রদায়িক মতবাদের প্রবক্তা। শুধু তাই নয়, মানব কল্যাণে তিনি একটি মাদ্রাসা, চিকিৎসালয় ও একটি লঙ্গরখানা নির্মাণ করেছিলেন। যেগুলি নির্মান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বয়ং হোসেনশা্ ৪৭ খানা গ্রাম দান করেছিলেন। তৎকালীন রাজনীতির উপর এই দরবেশের প্রভাব ছিল বিস্তৃত।

নুর কুতুব মালদহে অনেকগুলি 'খানকাহ' নির্মাণ করেন, কুতুবপুর তারই একটি। খানকাহ্ গুলি ছিল তার অসাম্প্রদায়িক মতবাদ 'অহদাতুল ওজুদ' প্রচারের আধ্যাত্মিক মানবকল্যাণ তথা বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যাবলীর প্রধান কেন্দ্র। 'কুতুব' এই আরবী শব্দটির অর্থ পবিত্র। আর 'পুর'- এই

শব্দটির আর্য পরিভাষা 'প্রাচীন পরিখা বেষ্টিত সেনানিবাস' কিন্তু দ্রাবিড় 'উল' (পুর) এই শব্দের অর্থ হল, 'জলের ধারে লোকালয়' এবং 'নদীর ধারের কর্দম জমি'। আজ থেকে সাত / আটশত বছর আগে বাঁধহীন মহানন্দার পাড়স্থিত জমির চেহারাটা যে অনুরূপ ছিল তা কল্পনা করতে আমাদের অসুবিধা হয় না। নামহীন এই অঞ্চলটি চিহ্নিত হল এই মহাপুরুষের নামে। এককথায় অর্থ দাড়ায় 'নদীর ধারের পবিত্র জমি'। 'অহদাতুল-ওজুদ' মতবাদে বিশ্বাসী মুসলমান সম্প্রদায় এই দরবেশের স্মৃতিকে অমর করে আরও একাধিক খানকাহ্‌কে চিহ্নিত করেন, নুরপুর ('আরবী অর্থ আলো), আলমপুর (আরবী অর্থ জগৎ) এবং পাণ্ডুয়ার কাছে কুতুবপুর শহর নামে।

হায়দারপুর — ১৫৬৪ খৃঃ তাজ খাঁর মৃত্যু হলে তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা হজরতে-আলা-মিঞা-সোলেমান কররানী গৌড় অধিকার করলেন (১৫৬৩ - ১৫৭২ খৃঃ) কিন্তু গৌড়ের জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় শেষে গৌড়ের কাছেই তন্দা / টাণ্ডা / টাঁড়া নামক স্থানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তবিত করলেন। টাঁড়ার অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বুকানন হ্যামিল্‌টনেব মতে এটি আজকের কালিয়াচকের জালুয়াবাথাল গ্রামটির প্রাচীন নাম। তবে বেশীরভাগ ঐতিহাসিকদের মতে এটি কোতোয়ালী দরজার পশ্চিমে অবস্থিত মহদীপুর গ্রামের এক মাইল উত্তর - পশ্চিমে ভাগীরথীর অপর পারে অবস্থিত । তুলা ও তুলাজাত ব্যবসা - বাণিজ্যে তৎকালীন টাঁড়া ছিল সমৃদ্ধ। এই তুলাজাত সামগ্রীর ব্যবসায় প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন জনৈক সৈয়দ হায়দার হুসেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি একান্ত অনুগত, ইমানদার এই হায়দর হুসেন ছিলেন প্রাজ্ঞ এবং বিচক্ষণ। শুধু ব্যবসা - বাণিজ্যেই নয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ এবং প্রখর, দূরদর্শীও বলা যেতে পারে। সুলতান সোলেমান এক অস্থির সময়ে বাংলার মসনদে বসেছিলেন। রাজ্যজয়, রাজ্যরক্ষা তথা পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার এই নানাবিধ কাজে সাহায্য সহায়তা এবং পবামর্শের জন্য তাঁর প্রয়োজন হল একজন বিশ্বস্ত উজিরের। যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে সুলতানের উজিরের পদে যিনি সোলেমানের রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত বহাল ছিলেন তিনি এই সৈয়দ হায়দর হুসেন। শুধু তাই-ই নয় সুলতান তাকে এতটাই বিশ্বাস ও ভরসা করতেন যে, পারিবারিক জীবনের সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে তিনি তাকেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। এর পরবর্তী ইতিহাস দুর্দান্ত কালাপাহাড়ের। কিন্তু কররানী রাজত্বের অন্তিমলগ্নে (১৫৭২) হায়দার হুসেন রাজকার্যে বীতশ্রদ্ধ এবং নিরাসক্ত হয়ে পড়েন। সেই সময়ে তিনি ইসলাম সুফী দরবেশদের সংস্পর্শে আসেন। সুফী শাসক নুর- কুতুবের প্রজ্ঞায় পাণ্ডুয়া তখন সমগ্র উপমহাদেশে একটি সুপরিচিত নাম। প্রাণবন্ত, ধর্মীয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার কেন্দ্র হিসাবে হায়দর হুসেন পেয়েছিলেন নুরকুতুবের পুত্রদ্বয় রিফাতউদ্দিন ও শেখ আনোয়ার এবং আরও একান্ত করে তাঁদের দৌহিত্র শেখ জাহিদকে । এঁদের সংস্পর্শে তাঁর শেষ জীবনটা সন্ত জীবনে পরিবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরাধিকারী এবং অনুগামীরা এই স্থানটিকে চিহ্নিত করলেন হায়দরপুর নামে (কুতুবপুরের পাশে)। তথ্যসঙ্কেতের ভিত্তিতে উপরোক্ত নামকরণটি অনুমিত হলেও অন্য আর কোন হয়দর নামাঙ্কিত ব্যক্তিকে অনেক অনুসন্ধানেও খুঁজে পাওয়া যায় নি, যিনি এই স্থানের জমির মালিক অথবা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি হতে পারেন।

'হায়দর' শব্দটির অর্থ সাহসী। 'পুর' শব্দটির পরিবর্তিত অর্থ হল 'অট্টালিকা' শোভিত নগরী'। দ্বাদশ শতকের আগে 'পুর' নামাঙ্কিত গ্রাম প্রায় শোনা যেত না অট্টালিকার অভাবে।

মুসলমানী আমলের শাসনের শেষে এবং ব্রিটিশ শাসনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে নব্য জমিদার কুলের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁরাই স্ব-বসতি গ্রামকে আভিজাত্য দিতে গিয়ে স্বনামে ও ইষ্টনামে 'পুর-নগর' ধারার সৃষ্টি করেছিলেন। এই মানসিকতা থেকেই 'হায়দরপুর' এই নামকরণটি চিহ্নিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।

গঙ্গাবাগ — বর্তমান মালদহের ললিত মোহন স্কুল ও রূপকথা সিনেমা হল সংলগ্ন এলাকাটি গঙ্গাবাগ নামে পরিচিত। এটি গঙ্গা মাতার নামে উৎসর্গীকৃত দেবোত্তর জমি। এইরকম নামকরণের প্রাক্ পুরাতন ইতিহাসটি এই; শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য সম্প্রদায় যাঁরা নিজেদের 'দশনামি' চ্যালা' বলে পরিচয় দিত। সঠিক সময়টা বলা না গেলেও তারা সুলতানী আমলের কোনও এক সময় উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর থেকে মালদহে এসেছিল।'দশনামি' অর্থাৎ শঙ্করাচার্য নির্দেশিত উপাধি যারা বহন করছেন — এরা হলেন গিরি, পুরী, পর্বত ইত্যাদি। এদের মধ্যে কেবল গিরি, সম্প্রদায়ের লোকেরাই মালদহ অঞ্চলে এসেছিলেন। তারা সুগঠিত চেহারার অধিকারী ছিল এবং বেশীর ভাগ বাদশাহের নৌ সেনা বিভাগে যোগদান করেছিল। ধীরে ধীরে তারা এই বৃত্তি ছেড়ে শিব উপাসক হয়ে যায়, এবং এই অঞ্চলেই (গঙ্গাবাগ) তারা তাদের আস্তানা নির্দিষ্ট করে বসবাস শুরু করে। নিজেদের পরিচয়ে তারা বলত 'গৃহী সন্ন্যাসী'। একমাত্র শিব-পত্নী গঙ্গা ছাড়া আর কোন নারী দেবতার পূজো তারা করত না। গঙ্গা পূজো উপলক্ষ্যে শত শত দশনামি সন্ন্যাসি আসতেন বাইরে থেকে। বিরাট মেলা এবং হাতি সহ শোভাযাত্রায় বিপুল জন সমাবেশ হোত। গঙ্গার নামে উৎসর্গীকৃত বেশ কয়েক বিঘা জমিতে বিশাল সুসজ্জিত উদ্যান ছিল। ছিল গঙ্গামাতার মন্দির। আজও তার একটি ক্ষীণ ধারা রয়ে গেছে। গঙ্গা নামে উৎসগীকৃত দেবোত্তর জমির কারনেই এলাকাটি গঙ্গাবাগ নামে পরিচিত।

পুড়াটুলী — পুন্ড্র জাতির প্রাচীন বাসভূমি পুন্ড্রবর্ধন। উত্তরবঙ্গ এই পুন্ড্রবর্ধন। ঐতরেয় আরণ্যকে পুন্ড্রদের দস্যু বলা হয়েছে। আচার্য সুকুমার সেন অবশ্য মনে করেন — পুঁড় এক জাতীয় আখ, যারা এই আখের চাষ করতেন তাঁরা পুন্ড্র বা পোদ। তাদেরই বাসস্থান ছিল এই অঞ্চল। বেদে ইক্ষু বা গুড়ের উল্লেখ নেই, তারা মিষ্ট দ্রব্য বলতে বুঝত মৌচাকের মধু। বাংলাদেশেই পুঁড় আখের চাষ হত। ইক্ষু ক্ষেতের দেবীকে বলা হোত পুড়েশ্বরী। নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত আবার একটু ভিন্নরূপ, তাঁরা বলেন - অষ্ট্রিয় ও দ্রাবিড়ীয় জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে জনজীবি এই মিশ্রজাতির সৃষ্টি। সাঁওতালদের ধর্মে পুন্ড্রসুর আছেন - যিনি ইক্ষু ক্ষেতের অপদেবতা; মোষের রূপ নিয়ে যিনি আখের ক্ষেত তছনছ করেন। পরবর্ত্তীকালে কানিং হাম ও মনে করেন, পৌন্ড্র শব্দটি এসেছে পুন্ড্র নামে পরিচিত হালকা হলুদ রঙের এক ধরনের আখ থেকে। সাবেক গৌড় প্রদেশ ব্যাপী এখনো পর্যন্ত বিস্তীর্ণভাবে আখের চাষ হয় আবার 'পুন্ড্র' শব্দের অর্থ রেশম কীট ও বটে। রেশমকীট পালনের কাজে নিযুক্ত মানুষকেই 'পুন্ড্ররীক' বলা হতো। গঙ্গার পলিমাটি অধ্যুষিত মালদহের জমি তুঁতগাছ উৎপাদনের উর্বর ভূমি। এই তুঁতগাছের পাতা ছিল রেশমকীটের প্রধান খাদ্য 'পুন্ড্ররীক' জাতির একটি বৃহৎ অংশের মানুষ এই রেশমকীট উৎপাদন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই পুন্ড্র শব্দটিই অপভ্রংশ দাঁড়ায় পুন্ড্র — পুড় — পুড়া। 'পুড়াপাড়া' নামে একটি বিরাট মৌজার অস্তিত্ব এখনও মালদহ জেলায় আছে। আবার কেউ কেউ বলেন পুন্ড্র জাতি আদিতে

মৎস্যজীবি, বর্তমানে তারাই তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত 'পোদ' পদাধিকারী। আরও পরবর্ত্তীকালে তারা উপকূলবর্ত্তী নৌসেনা এবং কৃষিজীবি সাধারণ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। আসলে 'পুন্ড্রীক' জাতির এই লোকেরা তাদের কৌম ব্যবসায় ভুলেছে জীবন এবং জীবিকারই প্রয়োজনে। মালদহ জেলায় এই পুড়াদের মহল্লাই বোধহয় পুড়াটুলী নামে খ্যাত।

গোলাপট্টি — মহানন্দা তীরবর্তী অঞ্চলগুলি তখন মালদহ শহরের বাণিজ্য তথা প্রাণকেন্দ্র। বিশাল বিশাল নৌকা বোঝাই হয়ে বাণিজ্য দ্রব্য মহানন্দার এই বাণিজ্য এলাকা দিয়ে যাতায়াত করত। গুরুত্ব এতটাই ছিল যে ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর ১৭৭০ - ৭১ খৃঃ রেসিডেন্ট টমাস হেঞ্চম্যানের তত্ত্বাবধানে ইংরেজবাজার শহরের পত্তন হয়। ১৮১৩ সালে তৈরী হয় নতুন কালেকটরেট বিল্ডিং। শাসন এবং রাজস্ব আদায়ের কাজে প্রয়োজন হল প্রচুর শিক্ষিত লোকের। চাকরির আশায় মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, পাবনা, কানসাট ইত্যাদি জায়গা থেকে প্রচুর জনসমাগম হল মালদায়। বাড়তি এই লোকেদের চাহিদা অনুযায়ী জোগানের জন্য প্রয়োজন হল আরও বেশী পরিমান পণ্যের। প্রয়োজন হল পণ্য গুদামজাত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গার। গুদামের অপর পরিচিত শব্দ গোলা। 'পট্টি' কথার একটি অর্থ 'রেশম' বা কৌষেয় বস্ত্র', যা মালদহে উৎপন্ন হোত, অন্য অর্থ 'গ্রাম'। এইভাবেই এই এলাকাটি চিহ্নিত হয়ে রইল 'গোলাপট্টি নামে'।

ফুলবাড়ী — মালদহ শহরের মীরচকের শেষ প্রান্তের অঞ্চলটি ফুলবাড়ী নামে পরিচিত। এখানে মুঘল রীতিতে তৈরী একটি মস্‌জিদ আছে। এটি তৈরী হয় ১২০৮ হিজরী অর্থাৎ ১৭৯৪ খৃঃ। তৈরী করেন মোসাম্মাৎ ফুন্দন নামে জনৈক ধর্মপ্রাণা মহিলা। তিনি তাঁর স্থাবর সমস্ত সম্পত্তি এই মসজিদ নির্মাণকল্পে দান করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত এই মস্‌জিদই ছিল তাঁর ধ্যান - জ্ঞান। ফুন্দন -এর এই আশ্রম বা বাড়ীই পরবর্তীকালে ফুলবাড়ী। (উপভাষাগত বৈচিত্র্যে ন-এর ল-এ পরিণতি) কথিত আছে মসজিদের গায়ে যে লেখাটি আছে সেটি সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন কর্তৃক (যিনি রিয়াজ-উল-সালাতীন নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণেতা) রচিত। ফার্সীতে লেখা লিপির বাংলা অনুবাদ করলে দাড়ায় - "ফুন্দন এই মস্‌জিদ নির্মাণ করেন, অন্ত্যদশায় তিনি সুখী হোন"।

মীরচক্ — মীর সুলতান আলীচক ও মীর কুরবান আলী চক এই দুই ভাই ছিলেন সন্ত পুরুষ। তাঁরা কোথা থেকে অথবা কবে মালদহ জেলায় এসেছিলেন তা সঠিক করে বলতে পারা না গেলেও তারা থেকে যান এই শহরেই। সময়টা ১২৮৫ হিজরী বর্ষ, ইংরাজী ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে।

মৌর্যগুপ্ত আমল থেকে শুরু করে সেনযুগ পর্যন্ত হিন্দু রাজত্বের আভ্যন্তরীন অসন্তোষ তদুপরী বল্লালসেন কৃত জাতিভেদ প্রথা সাধারণ মানুষের রাজশাসনের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ধূমায়িত করে তুলেছিল তার ফলস্বরূপই শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করেন ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজী। তারপর চারশত বৎসর মুসলীম রাজত্বের ইতিহাস। এই সুদীর্ঘকাল ইসলাম শাসনের স্বপক্ষে জনমানস তৈরীতে এইসব সন্তদের ভুমিকা ছিল অসাধারণ। তারা তাদের অনাড়ম্বর জীবন, ঈশ্বরবিশ্বাসী মন ও মানব প্রেমিক হৃদয় নিয়ে আপামর জনসাধারণের মন জয় করে ফেলেছিলেন। সন্ত মীর ভাইরা ছিলেন এই রকম দুটি

অসামান্য দিব্য চরিত্র। মালদহ শহরে কালো পাথরের মাজার দুটি এই দুই ভাইয়ের সমাধিস্থান। আজও সমাধিগুলি জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষের শ্রদ্ধা উদ্রেক করে থাকে। এই দুই মীর ভাইয়ের নামেই মহল্লার পবিচিতি মীরচক নামে।

মহেশমাটি (৬৬) ঃ

বিবিগ্রাম — রাষ্ট্রীয় শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ সুদৃশ্য রাস্তাটির বর্তমান নাম ডঃ রাধাকৃষ্ণণ সরণী। কিছুদিন পূর্বেও এটির নাম ছিল 'সিমেট্রি রোড'। 'ফ্রেঞ্চ, ডাচ, আর্মেনিয়ান, পর্তুগীজ, ইংরেজ প্রভৃতি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যে সমস্ত বিদেশীরা এদেশে আসতেন তাঁদের সমাধিস্থ করার জায়গা। এই সমাধিস্থানকে কেন্দ্র করে যে পুকুর খনন করা হল সেটি তৈরীর টাকা মঞ্জুর করেছিলেন স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া। তাঁর নাম অনুসারেই খনিত পুকুরটির নাম হয় 'ভিক্টোরিয়ান ট্যাঙ্ক'। মালদহী উচ্চারণে ও পরিচিতিতে দাঁড়াল বিবির পুকুর'। এই বিবির পুকুরকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে যে বসতি গড়ে উঠল তাই বিবিগ্রাম।

রথবাড়ি — আজ থেকে প্রায় দেড়শতাধিক বৎসর পূর্বে মালদহ শহরে প্রথম যে রথটি টানা হত সেটির প্রচলন করেন তৎকালীন জমিদার চৌধুরী পরিবার। ঠিক কার আমলে এই রথ চালু হয়েছিল তা বলা না গেলেও এই রথটি বর্তমান উড়ালপুলের নীচে যে পুকুরটি আছে সেখানে ধীরে ধীরে ডুবে যায় জমিদার ভগবান চৌধুরীর আমলে; যিনি বর্তমান জীবিত পুরুষ কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীর ঠাকুরদার মায়ের ঠাকুরদা। বর্তমান কৃষ্ণপল্লীর পুকুরে দক্ষিণ পাড়ে হিন্দু রীতি অনুযায়ী তৈরী হয়েছিল মন্দির আর রথতলা, প্রতিষ্ঠিত ছিল রঘুনাথজীর বিগ্রহ। আষাঢ় মাসে এই রথ টানা হত । রথ যেত সারাফা ভবনের কাছে। অলৌকিকভাবে রথ ডুবে যাবার পর সেই রথ পুনর্নির্মিত হয়নি। বিগ্রহ রঘুনাথজী বর্তমানে আই. এম. এ. ভবনের নিকটবর্তী একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। বর্তমান ৩৪নং জাতীয় সড়কের একটি জনবহুল অঞ্চল আজও সেই রথের স্মৃতি বহন করছে রথবাড়ী নামাঙ্কনে।

রামকৃষ্ণ পল্লী — ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে অখন্ড মালদহ জেলা ১৫টি থানা নিয়ে গঠিত ছিল। হরিশ্চন্দ্রপুর, খরবা, রতুয়া, মানিকচক, কালিয়াচক, ইংরেজ বাজার, মালদা, গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর, শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল ও গোমস্তাপুর। দেশ বিভাগের পূর্বে স্বাধীন মালদহের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে বঙ্গদেশ বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হলে স্যার যদুনাথ সরকার ইত্যাদি প্রভাবশালী হিন্দুব্যক্তিরা মালদহ ও রাজশাহীকে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির আবেদন জানিয়ে সীমা নির্ধারণ কমিশনকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছিলেন (হিন্দুস্থান ষ্টান্ডার্ড, ১৯ শে জুলাই, ১৯৪৭)। আবার মালদহ জেলার ইংরেজবাজার শহর হিন্দু প্রধান হলেও সামগ্রিকভাবে মালদহ ছিল মুসলীম অধ্যুষিত অঞ্চল। এই কারণেই লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মালদহ পাকিস্থানের অর্ন্তভুক্ত এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিলেন জওহর লাল নেহেরু এবং মুহম্মদ আলী জিন্না। এরপর পশ্চিমবঙ্গের দশটি আর পাকিস্থানের পাঁচটি এই সীমা নির্ধারণ নিয়ে প্রকৃত অর্থে মালদহ স্বাধীন হল ১৯৪৭-এর ১৭ই আগষ্ট। এরপর জমি হস্তান্তরের পালা। বর্তমান মীরচকের পর থেকে সাঁকোপাড়া ইত্যাদি অঞ্চল থেকে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত

একটা বিরাট অংশেব মুসলীমরা পূর্ববঙ্গে ফিরে গেল। আবার পূর্ববঙ্গ থেকে এক বিরাট সংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তু সীমান্ত পার হয়ে জেলা শহরে প্রবেশ কবতে লাগল। এদের পুর্নবাসন দেওয়া সবকারের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে দাড়াল। সেই সময় বেলুড় মঠ থেকে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হযেছিলেন স্বামী পরশিবানন্দজী মহারাজ। মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৪২ সালে মালদা রামকৃষ্ণ মিশন শাখার অনুমোদন লাভ করে। ১৯৪৮ সালে ভূমি উন্নয়ন এ্যাক্টের ১০নং ধারার ২নং উপধারায় বামকৃষ্ণ মিশনকে এই ব্যাপারে উক্ত সমিতিকে উন্নয়ন মূলক স্কীম তৈরী করার অধিকার দেওয়া হয়। এই অধিকার বলে মালদহ শহরে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের স্থায়ী বাসস্থানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন চুক্তির ভিত্তিতে পুরাপাড়া জে.এল. ৬৫, শেরপুর জে. এল. ৬৩ এবং মোকিমপুর জে. এল. ৬৩ মৌজাগুলিতে অবস্থিত মোট ৩.৬৫ একর জমি মিশন লাভ করে। সরকার নির্ধারিত দাম ছাড়া জমি অধিগ্রহণের একাধিক শর্তের অন্যতম শর্তটি ছিল জাতীয় সড়কের ২০০ ফিটের মধ্যে কোনরূপ নির্মাণকার্য করা চলবে না। উক্ত প্লটগুলি (শেরপুর-মোকিমপুর মৌজার জে.এল. ৬৩) একমাত্র পার্ক ও খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন স্বামী পরশিবানন্দ (বেলুড়মঠ) সাধারণ সম্পাদক স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, কে.সি বর্মণ (ডেপুটি সেক্রেটারী, ভূমি ও রাজস্ব দপ্তর) এস কে. ব্যানার্জী (মেম্বার, বোর্ড অফ রেভিনিউ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)। এই শর্তাবলীর ভিত্তিতে যাদের মধ্যে জমি বিলি বন্দোবস্ত হল তারা হলেন — মোহিনী মোহন মজুমদার, মহেন্দ্রচন্দ্র আচার্য, শ্রীবিমল চক্রবর্তী, বগলা দেবী, শশীভূষণ চক্রবর্তী, হারানচন্দ্র কুণ্ডু, রঞ্জিত কুমার সান্যাল, দীনদয়াল ভৌমিক, জ্যোর্তিময় নন্দী, সুবোধ চন্দ্র চক্রবর্তী, কমলেশ চক্রবর্তী, তুলসী দাস লাহিড়ী, জগদীশ চন্দ্র চৌধুরী, আশুতোষ প্রামাণিক, ঝরুলাল দাস, সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী, বিধুভূষণ বিশ্বাস, সাতকড়ি প্রসাদ দাস, অমিতাভ হাওলাদার, অনিলবরণ চক্রবর্তী, শ্রীসুবোধ কুমাব বক্সী, গোপাল চন্দ্র দে, ক্ষিতিশ চক্রবর্তী, গঙ্গারাম বণিক, জ্যোতিষ চন্দ্র চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, নীলকান্ত সেন, দুর্যোধন দত্ত, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল সাহা, সুশীল সরকার, সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিভূতি ভূষণ চক্রবর্তী, রঘুনন্দন আচার্য, ভোলানাথ মণ্ডল, ভোলানাথ সাহা ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ মিশন নির্ধারিত স্কীম অনুযায়ী এবং সরকার নির্ধারিত দামের ভিত্তিতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়েই জমিগুলির বিলি-ব্যবস্থা হয় বলে স্থানটি বেশ কিছুদিন রামকৃষ্ণ কলোনী এই নামেই পরিচিত ছিল। ইদানিং সেটি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে রামকৃষ্ণ পল্লী এই নামে চিহ্নিত হয়েছে।

মকদুমপুর (৬৮) ঃ

মকদুমপুর — মকদুমপুর এলাকাটি সাধক হজরত মখদুম জালালুদ্দিনের স্মৃতিতে বিজরিত। ইনি সুদুর পারস্য দেশের তাব্রিজ থেকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে ধর্মপ্রচার করার লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গদেশে আসেন। ক্রমে তিনি গৌড়ভূমিতে শেখ নামে অতুলনীয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই জালালদ্দিন সম্পর্কে অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। তৎকালীন গৌড় অধিপতি লক্ষ্মণসেন নাকি অনেক আগেই সংবাদ পেয়েছিলেন যে ইসলাম ধর্মপ্রচারের জন্য শেখ জালালুদ্দিন পারস্য দেশ থেকে রওনা হয়েছেন। একদিন শোনা গেল বর্তমান পাণ্ডুয়া মসজিদের কাছাকাছি কোনও এক গাছতলায় তিনি অবস্থান করছেন। যড়যন্ত্র শুরু হল তাকে মেরে ফেলার। কিন্তু সমস্ত

ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে তিনি অলৌকিক উপায়ে বহাল তবিয়তে বেঁচে রইলেন। শেষে একদিন এই লক্ষ্মণসেনই হয়ে উঠলেন তার সেরা ভক্ত। লক্ষ্মণসেন গৌড়ভূমির অনেকখানি জায়গা তাকে নিষ্কর দান করলেন তার সাধনা ও ধর্মচর্চার জন্য। গৌড়ভূমের রাজা আর পারস্যবাসী শেখের সখ্য ও সহমর্মিতার জ্বলন্ত নিদর্শনে চিরস্থায়ী হয়ে রইল এই মকদুমপুর নামকরণে।

রাজাবাগান — রাজা চৌধুরীর বাগানবাড়ী। ১৬০০ খৃঃ নাগাদ রাজা রায়চৌধুরীরা ছিলেন মালদহ জেলাব প্রতাপশালী জমিদার। জমিদারী রক্ষার অসহায়তা অথবা সরিকি-বিবাদ - যেকোনো কারণেই হোক জমিদারীর এক বিরাট অংশ তারা ইংরেজদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হন। এরপর আস্তে আস্তে আরও অঞ্চল তাঁদের আওতামুক্ত হয়ে যায়। এখনও তাঁদের স্মৃতি বিজরিত একটি পুকুর আব একটি শিবের মন্দির আছে (গৌড় রোডে)। রাজাবাবুর বাগান ঘেরা বাড়ী থেকেই এলাকার নাম রাজাবাগান।

পিরোজপুর (৬৯)ঃ

পিরোজপুর — রিয়াজ-উল-সালাতীন ও বুকাননেব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে হাজী ইলিয়াস শামসুদ্দিন (৭৪৩ - ৭৫৯ হিজরা) ইলিয়াস শাহ নাম নিয়ে সুলতান হন। সিংহাসনে বসেই দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহের (মহম্মদ তুঘলকের খুল্লতাত পুত্র) কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশের রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, তিনি আলতামশ নির্মিত দিল্লীর প্রসিদ্ধ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হামামের মত একটি স্নানাগার তৈরী করেছিলেন। এই সংবাদ শুনে ফিরোজ শাহ তোঘলক গৌড় অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। ইলিয়াস তখন পাণ্ডুয়ার সমস্ত লোকজন নিয়ে জল - জঙ্গলে ঘেরা একডালার দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফিরোজশাহ মালদহে এসে বর্তমান সুস্তানি মোড় থেকে কাটরা মসজিদ পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে তাঁর সেনাশিবির স্থাপন করেন। একডালা জয়ের জন্য তাকে দীর্ঘদিন মালদহে থাকতে হয়েছিল। (সিরাত-ই ফিরোজশাহী এবং শামস্-ই-সিরাজ অনুযায়ী ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ জয় করেন এবং নাম রাখেন আজাদপুর। বাংলার ইতিহাস - রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় / ২য় খণ্ড এটি বোধহয় ইতিহাসগত ভাবে সম্পূর্ণ সত্য নয়)। ফিরোজ শাহের দীর্ঘকাল অবস্থান থেকে এই অঞ্চলের নাম হয় ফিরোজপুর। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর সুলতান সিকন্দার শাহ্ পিতৃ সিংহাসনে বসেন। তিনিও পিতার মত সম্রাট ফিরোজ শাহের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। এবং নিজের ইচ্ছামত রাজ্যসীমা বাড়িয়ে নিয়ে দিল্লীর নির্ধারিত রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে দেন। তাই দ্বিতীয়বার ফিরোজ শাহ (১৩৫৭ - ৫৮ খৃঃ) আবার মালদহে আসেন সিকান্দার শাহর বিদ্রোহ দমন করতে। ফিরোজ শাহের এই দ্বিতীয় অভিযান শুরু হয় ৭৫৯ হিজরায় এবং ৭৬২ হিজরার প্রথম দিকে শেষ হয়। এই দীর্ঘ দুবছর সাত মাস তার সেনা ছাউনি মালদহের এই বিস্তীর্ণ এলাকা তাঁর নামে চিহ্নিত হয়ে রইল। কোথাও কোথাও উর্দু অনুকরণে নামটি পাওয়া যায় ফিঅরোজাপুর / পিরোজপুর নামে। পরে বরেন্দ্রীর নিজস্ব ভাষারীতির ঢঙে 'ফ' এই মহাপ্রাণ বর্ণটি অল্পপ্রাণ 'প' - এ পরিবর্তিত হয়ে পিরোজপুর হয়। আরও পরবর্ত্তীকালে রাজা গণেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে মহম্মদ শাহ শর্কী ও এই অঞ্চলে সেনা ছাউনি ফেলেছিলেন। এই অঞ্চলে একটি মস্‌জিদ আছে। যার গায়ে তুঘ্রা বা তুঘ্রিল অক্ষরে লেখা একটি লিপি আছে।

সিঙ্গাতলা — সময়টা ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ। মালদহ জেলার উৎপাদিত রেশমের খ্যাতি তখন তুঙ্গে বড় বড় কাঠের নৌকা বোঝাই হয়ে গঙ্গা, মহানন্দা দিয়ে রেশম যেত বিদেশের বাজারে। রেশমের এই সুখ্যাতি শুনে ইংরেজরা এসে উপস্থিত হল এই শহরে। পুরাতন মালদহের মির্জাপুর এলাকায় তারা ঘাঁটি তৈরী করল। কিন্তু সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে তৈরী এই বাণিজ্যকুঠি মুঘলেরা ভেঙ্গে দিল। নিরূপায় ইংরেজদের লক্ষ্য তখন মহানন্দার অপর পারের অঞ্চল। জমির খোঁজে তারা উপস্থিত হল তৎকালীন জমিদার রাজা রায় চৌধুরীর কাছে। রাজাবাবুর কাছ থেকে মোট ৩০০ টাকায় ৪ খানি গ্রাম তারা কিনে নিল। আরও ১০০ টাকার বিনিময়ে গৌড়ের ইট দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করিয়ে দিতে হবে এই শর্তও লিপিবদ্ধও হল। রাজাবাবু তখন থাকতেন এখনকার বিনয় সরকার রোডে। বর্তমানে রাজাবাগান অঞ্চল রাজাবাবুর বাগানবাড়ি ছিল। রাজাবাবুর পুকুরপাড়েই নতুন শহরের পত্তন হল। ইংরেজরা নিজেদের পরিচয়ে Lion বা সিংহ বলত। আর পুকুরপাড়ে বা 'তলাওকে' কেন্দ্র করে এই বসতি গড়ে উঠল বলে এটি সিঙ্গাতলা বলে পরিচিত হয়ে গেল।

ঝলঝলিয়া (৭২) ঃ

ঝলঝলিয়া — মালদহ জেলার উত্তর-পশ্চিম দিকে মালদহ টাউন রেলওয়ে স্টেশনটি যে জায়গায় অবস্থিত সেই অঞ্চলটি 'ঝলঝলিয়া' নামে চিহ্নিত। বর্তমানে এটি ২২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত হলেও ২১ ও ২৩নং ওয়ার্ডের কিছু অংশও ঝলঝলিয়া ছুঁয়ে রয়েছে। রয়েছে একাধিক পাড়া মহানন্দা পল্লী, ব্যারাক কলোনী, তেলীপুকুর, সুকান্তপল্লী, দেশবন্ধু পাড়া, প্রান্ত পল্লী, কলতা পাড়া ইত্যাদি। ঝলঝলিয়া এই অদ্ভুত নামকরণের পেছনে সেখানকার ঝিল এবং জলাভূমির কথা মনে আসে। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী আবু বরকত আতাউর গনিখান চৌধুরীর উদ্যোগে এই আধুনিক রেলওয়ে স্টেশনটি তৈরী হওয়ার আগে পর্যন্ত জায়গাটি ছিল খানাখন্দে ভরা গভীর জঙ্গল। এই ধরনের নাম করণের জন্য আমরা একটু অতীতমুখী হতে পারি ভূ-তাত্ত্বিক গঠন পর্যালোচনার জন্য। সুদূর অতীতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে পাললিক শিলাভূমিতে যে স্থানটি বড়ে উঠেছিল সেটিই বর্তমান মালদহ জেলা। ভূতত্ত্ববিদ ও ভৌগোলিকদের মতে মালদহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রধান নদী গঙ্গা ছাড়াও প্রবাহিত হয়েছে কুশী (কৌশী), মহানন্দা (নন্দ/অপরনন্দা), পুনর্ভবা (অপূর্ণভবা) টাঙ্গন (তঙ্গন), শ্রীমতি (ছিরামতী), বেহুলা (বারমাসিয়া), কংকর, ফুলহর, কালিন্দী ও ভাগীরথী। ভূতত্ত্ববিদগণের মতে মহানন্দা, কুশী ও অন্যান্য নদীগুলোর গতিপথসমূহ পরিবর্তনের ফলে এই জেলার বেশির ভাগ অংশটাই বিল ঝিল ও জলাভূমিতে পরিণত হয়।

মালদহের উত্তরে, পশ্চিম ও পূর্ব জুড়ে এখনও বহু জলাভূমি বিল, ঝিল ইত্যাদি দেখা যায় সেগুলি এই কোশী, মহানন্দার খাত হতে পারে। ঝলঝলিয়া অঞ্চলে এখনও বহু ঝিল ও পুকুর আছে। ১৮০৯ খৃঃ ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটনের দেওযা বিবরণী থেকে জানা যায় মহানন্দার পশ্চিম পাড়ে 'মালো' জাতির বাস ছিল। এই মালোদের জীবিকা যেহেতু মাছ ধরা তাই অন্যান্য মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীও সাধারণ জনমানসে মালো' নামে আখ্যাত হয়ে থাকে। বুকাননের বর্ণনা থেকে মালদহে বসবাসকারী সেই সময়কার আরও যে সব মৎস্যজীবী জাতির কথা জানা যায় তারা হল 'কেওট' - ধর্মান্তরিত মুসলমান । এছাড়া গাঙ্গরার খারওয়ার, মারকেন্ডয়, তোরা (ধর্মান্তরিত মুসলমান), কোল, কান্ডার, কুরি, চহিঙ্গ (চাঁই) ছবি, বাড়হা, কানজোল, রিশি ও

চন্ডাল — ঝলঝলিয়ার ভেতর দিকে এইসব জাতিরা এখনও বসবাস করে। জোলা দাঁ বারোস (১৫৫০ খৃঃ), গাসতালাদি (১৫৫৬), রেনেল এবং ভন-দেন ব্রোকের (১৬৬০) মানচিত্রও প্রমাণ করে যে এই নদনদীগুলির দ্বারা মালদহ জেলায় ভাঙ্গাগড়ার কাজ চলছিল। ঝলঝলিয়া এই শব্দটিও একটি ক্রমবর্তিত ভাঙ্গাগড়ার পথ ধরে এসেছে বলে মনে হয়। আমরা শব্দটিকে এভাবে ভাবতে পারি — জলজল / জলঝল / ঝলমল / ঝলমলে / ঝলমলিয়া / ঝলঝলিয়া। অন্ত্যজ এই সব উপজাতিদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সংযুক্তি থেকেই বোধহয় এই নামটির উৎপত্তি হয়েছে।

বাগবাড়ি / বাঘবাড়ি / বাগবাড়ি (৭৩)ঃ

ইংরেজবাজার বা মালদহ শহরের উত্তর - পশ্চিমে মানিকচকের পথে রাজমহল রোড দিয়ে ২ কি. মি. পথ এগোলে উভয় দিকে প্রায় মাইলখানেক দীর্ঘ আল দিয়ে ঘেরা যে অঞ্চলটি চোখে পড়ে তাই বর্তমান বাগবাড়ি। আলবেষ্টিত স্থানটি উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে অধিকতর দীর্ঘ। আলটির শীর্ষে এর প্রশস্ততা ১৫০ ফুট এবং উচ্চতা ২০ ফুট। উত্তর - দক্ষিণে বিস্তৃত দুর্গ - প্রাকার দিয়ে এটি দুই অংশে বিভক্ত। পশ্চিম দিকে রয়েছে একটি প্রশস্ত খাদ, পূর্বদিকের অর্ধাংশে বিশাল তম্‌না / টম্‌না বা তর্পনদীঘি। দুর্গ অভ্যন্তরে ছিল মৃতদেহ ফেলবার ভাত শালদীঘি। মূল সড়কের উভয় পার্শ্বে দুটি প্রধান গ্রাম বাগবাড়ি এবং রাজনগর। বাগবাড়ি হিন্দু অধ্যুষিত এবং রাজনগর মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম।

বাগবাড়ি সম্ভবতঃ গৌড়ের প্রাচীনতম অংশগুলোর অন্যতম। শোনা যায় দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি (১১৫৯ - ৭৯) বঙ্গেশ্বর বল্লাল সেন এই অঞ্চলকে রাজধানীতে পরিণত করেন এবং এই অঞ্চলে গঙ্গার ধারে উঁচু আল দিয়ে ঘিরে এক সুদৃশ্য বাগানবাড়ি নির্মাণ করেন।

সীমান্ত বাংলার মাল, মল্ল, বাগদি, কেওট, ডোম ইত্যাদি জাতির বসবাস ছিল এইসব অঞ্চলে। এইসব জাতিরা বাঘকে 'টোটেম' হিসাবে পূজো করত। এদের পদবী ও ছিল বাঘ/ বাগ। এরা প্রাচীন বাংলায় বংশ পরম্পরায় রাজার নিজস্ব দেহরক্ষী এবং সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করত। বাঘ পদবী তাদের শৌর্য জ্ঞাপক উপাধি। বল্লাল সেন এদের দ্বারা এক সুদক্ষ স্থল এবং নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। সেই থেকে স্থানটি বাগবাড়ি নামে পরিচিত হয়।

পরবর্ত্তীকালে জীবিকার সন্ধানে আরও অন্যান্য উপজাতিরা এসে উপস্থিত হয়। নুনিয়া, রিশি, মন্ডল, চাঁই, হালদার, রিণ। এদের মূল উপজীবিকা ছিল মাছ, কচ্ছপ, ইত্যাদি ধরা আরও পরবর্ত্তীকালে ইঁটভাটার শ্রমিক। জল - জঙ্গলে ঘেরা এই অঞ্চলটি একসময় কলেরা, প্লেগ মহামারীতে জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। এরপর প্রাচীন ঐতিহ্যে ঘেরা এই অঞ্চল পরিণত হল ঘন জঙ্গলে। ১৮৫২ সালে শেষ হওয়া সমীক্ষায় পেমবারটন মালদহ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বাঁশ, ঘাস, আর হিজল অধ্যুষিত অগম্য জঙ্গল বলে উল্লেখ করেছেন। ১৮৭২ সালে হান্টারের সমীক্ষায় মালদহ জেলার ১৫০ বর্গমাইলের ঘন জঙ্গলে একাধিক বাঘ, চিতাবাঘ গন্ডার আর বুনো শুয়োর, হরিণ ইত্যাদির প্রচুর পরিমানে অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। আর এই কিছুদিন আগেও ১৯৫১-সালের অশোক মিত্র-র মালদা জেলার রিপোর্টে ইংলিশবাজার ও পুরাতন মালদায় শহরের কাছাকাছিই প্রচুর চিতাবাঘ থাকার কথা বলা হয়েছিল। বাগবাড়ির উঁচু আল ঘেরা প্রাকারের নীচু

এবং জলা অঞ্চলে এইসব বাঘেদের চলাফেরা ছিল অবাধ। বাঘেদের আক্রমণে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে 'বাঘড়া' চন্ডীর পূজো এক সময় এখানে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সেই থেকে বাগবাড়ি পরিণত হল বাঘবাড়িতে।

মহাপ্রাণ বর্ণকে অল্পপ্রাণ বর্ণে পরিণত করে উচ্চারণ করা মালদহ জেলাবাসীর ভাষা - বৈশিষ্ট্যের একটি সাধারণ লক্ষ্মণ। তাই কালক্রমে উচ্চারণে আয়াসসাধ্য বাঘ পরিবর্তিত হল অনায়াস বাগ-এ। তাই বর্তমানে বাগবাড়ি। শব্দটি ক্রমান্বয়ে এসেছে এইভাবে বল্লালসেনের বাগানবাড়ি — বল্লালবাড়ি — বাগানবাড়ি — বাগবাড়ি — বাঘবাড়ি — বাগবাড়ি।

লম্বায় ৩ কি. মি এবং চওড়ায় ২ কি. মি. এই অঞ্চলটির বর্তমান লোক সংখ্যা ৯ থেকে ১০ হাজার। এলাকাটি পঞ্চায়েত অন্তর্ভুক্ত।

লক্ষ্মীপুর (৭৪) ঃ

বন্যাপ্রবল মালদা জেলার মানচিত্রে যে নামটি বর্তমানে আলোচনা ও বিতর্কের জায়গা করে নিয়েছে। সেটি হল ৭৪ নং মৌজা লক্ষ্মীপুর।

এলাকাটি ইংরেজবাজার জেলা শহর থেকে ২৫.০৯ কি.মি দক্ষিণ দিকে অবস্থত। এখানে রয়েছে বিখ্যাত অ্যাফ্লাক্স বাঁধ যেটি ইংরেজবাজারকে ফারাক্কা ব্যারেজ-এর সাথে যুক্ত করেছে। এলাকাটি প্রধানত লক্ষ্মীপুর বেসিন ৭.৯৫ বর্গ কি.মি. এবং উত্তরাসন বেসিন ১৭.৫০ বর্গ কি.মি. অঞ্চল নিয়ে অবস্থিত।

মালদহ জেলা প্রধানত অসংখ্য নদী নালা এবং তার শাখা প্রশাখা ও নীচু ডোবা জায়গা নিয়ে গঠিত। বেশির ভাগই নদীই এসেছে উচ্চভূমি হিমালয় থেকে এবং মিলিত হয়েছে বৃহত্তম নদী গঙ্গার সাথে। হিমালয় সন্নিহিত এই সব নদীগুলি প্রতি বছর বহন করে আনে ছোট ছোট নুড়ি, পাথর, এর সাথে পলি মাটি, এগুলো ক্রমাগত নদীর তলদেশকে ক্ষয় করছে তথা নদীর নাব্যতা কমিয়ে আনছে। ফলে প্রতি বছর একটু একটু করে নদী তার গতিপথ পাল্টে ফেলেছে। পরিত্যক্ত এই নদীখাত গুলি মালদহ জেলায় সৃষ্টি করেছে অসংখ্য বিল এবং নালা আর খালের। যা সমগ্র ইংরেজবাজার থানার নিকাশী ব্যবস্থায় সমস্যার সৃষ্টি করেছে। প্রাক্ স্বাধীনতা কালে ফি-বছর এই বন্যার জল প্রবাহিত হতো স্থানীয় নালার মাধ্যমে, এবং বাঁধ না থাকার দরুন মাঠের উপর দিয়ে অবশেষে নদীতে। শহর এলাকার জল বের হত ড্রেনের মাধ্যমে এবং সংলগ্ন এলাকা লক্ষ্মীপুর বিল এবং চাতরা বিলের মাধ্যমে। চাত্রা বিল থেকে আবার জল যেত ভাতিয়ার বিলে (এখন যেটি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে), সেখান থেকে মহানন্দায়।

স্বাধীনতার পর উন্নয়নের কাজে হাত দিয়ে গঙ্গার উপর বৃহত্তম বাঁধ এবং লক্ষ্মীপুর এবং চাতরা বিলের সঙ্গে সংযোগকারী অ্যাফ্লাক্স বাঁধ নির্মিত হয়। এর ফলে পুরানো নালা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়, ফলস্বরূপ লক্ষ্মীপুর সংলগ্ন গ্রাম এবং শহর মালদহের বেশ কিছু অংশ এক থেকে দেড় মিটার জলের গভীরতায় ডুবে যায় প্রত্যেক বছর সাধারণ বৃষ্টিপাতেই।

শুধু তাই নয় লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে বছরের পর বছরের জমা জল জমির উর্বরতাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। সুতরাং জীবিকাহীন হয়ে পড়ছে সেখানকার হাজার হাজার মানুষ।

বন্যার প্রকোপ থেকে জেলা শহরকে বাঁচাতে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে সত্তর দশকের মাঝামাঝি একটি প্রকল্প রচনার কাজে হাত দিয়েছিল সরকার। নানা আলাপ-আলোচনার পর আশির দশকে চূড়ান্ত হওয়া সেই প্রকল্পের রূপরেখা অনুযায়ী ঠিক হয়েছিল লক্ষ্মীপুর বিল ও চাতরা বিলকে একটি খালের মাধ্যমে সংযুক্ত করে শহর ও সংশ্লিষ্ট দুই বিল এলাকার সমস্ত জমা জল চাতরা বিল থেকে নিয়ে গিয়ে ফেলা হবে মধুঘাটের কাছে নদীতে। এর জন্য লক্ষ্মীপুর ও চাত্‌রা বিলের মাঝখান দিয়ে ফারাক্কা ব্যারেজের প্রকল্প এ্যাফ্লাক্স কাঁধের মাঝে বসানো হবে একটি রেগুলেটর, তৈরী করা হবে কালভার্ট। সেই অনুযায়ী মধুঘাটের কাছে শুরু হয়েছিল খালকাটার কাজ। কিন্তু এই কাজে বাধা দান করে খালসংলগ্ন বাগান ও জমির মালিকরা। এরপর ১৯৮৯ সালে নতুন করে এই নক্সা তৈরী করে জেলা ও পুর প্রশাসন। সেই নক্সা অনুযায়ী চাতরা বিলের জমা জল সরাসরি সাদুল্লাপুরের রাস্তার পাশ দিয়ে খালের মাধ্যমে ভাগীরথিতে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়, এর জন্য সদুল্লাপুরের কাছে একটি পাম্পিং স্টেশন গড়ার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। এই পরিকল্পনাও কার্যত ব্যর্থ হয় নতুন জাতীয় সড়কের নির্মাণ কল্পে ড্রেনের ব্যবস্থার জন্য। এছাড়া নরসিং কুপ্পা ও চাত্‌রা বিলের মাঝাখানের স্লুইস গেটটিও শহরের নিকাশী ব্যবস্থাকে কিছুটা ত্বরান্বিত করে দিয়েছে। পরিবর্তিত এই বিষয়গুলি সামনে রেখেই এবং ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার অভিজ্ঞতাকে হাতিয়ার করে চাত্‌রা বিলকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র লক্ষ্মীপুর বিলকে কেন্দ্র করে আবার এই প্রকল্পের নকশাকে ঢেলে সাজান হয়। মালদহ জেলায় সমর রায়, বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে বিষয়টি নিয়ে আবার নাড়াচাড়া শুরু হয়। তারই সুপারিশে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ থেকে টাকা দেয় সরকার। এই প্রকল্পে দেখান হয়েছে যে বর্তমানে ইংরেজবাজার পুর এলাকার নিকাশী ব্যবস্থার তুলনায় লক্ষ্মীপুর ও তার সংলগ্ন এলাকার অবস্থা বেশী খারাপ। বিশেষ করে চাতরা ও লক্ষ্মীপুর বিলের মাঝখানে ফারাক্কা ব্যারেজের এ্যাফ্লাক্স বাঁধ তৈরী হওয়ার পর লক্ষ্মীপুর এলাকার জমা জল বের হওয়ার গতিপথ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষ করে মালদা পলিটেকনিক, সেন্ট্রাল স্কুল, পাওয়ার গ্রীড ষ্টেশন সহ প্রায়২৫ বর্গ কি.মি. এলাকা প্রতি বছর বর্ষা ও বন্যায় জলবন্দি হয়ে হড়ে। নতুন প্রস্তাবিত প্রকল্পে এলাকার মানুষের বন্দি দশা ঘোচাতে লক্ষ্মীপুর বিল থেকে উত্তরাসন কারা পর্যন্ত এ্যাফ্লাক্স বাঁধ বরাবর একটি ৩.৯০ কি.মি. নতুন খাল খনন করা হবে। সংস্কার করা হবে উত্তরাসন দাড়া। তারপর সেই দাড়াকে যুক্ত করা হবে দুয়ারবাসিনীর কাছে নতুন খালের সঙ্গে। সেই খালের প্রবাহিত জল পড়বে সাদুল্লাপুরের কাছে ভাগিরথীর মোহনায়। পূর্ব নক্সা অনুযায়ী পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে সেই খালের জল নদীতে ফেলা হবে। বর্তমান এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩.৬৭ লক্ষ টাকা।

বর্তমানে এই প্রকল্প নিয়েও বিতর্কের অবসান হয় নি। প্রস্তাবিত এই প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে প্রতিবছর বন্যার আতঙ্ক থেকে খানিকটা হলেও মুক্তি পাবে মালদহ জেলার মানুষ।

ঝনঝনিয়া নওদাবাজার (৮০):

বড় সাগর দীঘির উত্তর পশ্চিম কোনে এবং নওদাবাজারের দক্ষিণে গৌড়েশ্বরী কমলাদেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে শিয়াপন্থী সাধক 'পীরানা - পীর শেখ আঁখি সিরাজুদ্দিন উস্‌মান এর

সমাধিভবন অবস্থিত। ঈদ্-উল-ফিতর এবং ইদ-উল-আজহা বা বক্র-ইদ এর পুণ্য দিনে এখানে ধর্মীয় সমাবেশ ও মেলা হয়। বৃহত্তর গৌড়ের সাগরদীঘি সন্নিহিত এই অঞ্চলটি এক সময় 'শহর মুহম্মদাবাদ' নামে পরিচিত ছিল।

জঙ্গলীটোটা — সাদুল্লাপুব থেকে পুরানো ভাগীরথীর সেতু পেরিয়ে প্রায় আড়াই কি. মি দূরে বর্তমান নওদা বাজার বা নতুন বাজার মৌজা। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গার মূল প্রবাহ সরে এসেছে ওখান থেকে। এই মৌজায় রথবাড়ি গ্রামে রয়েছে জঙ্গলীটোটা।

চৈতনোত্তর যুগের এক বিখ্যাত চরিত্র জঙ্গলীর নানা কীর্তিকলাপ এই জঙ্গলীটোটাকে কেন্দ্র করে বিদ্যমান। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতা দেবীর কাছে দীক্ষিত হন শুদ্র নন্দরাম ও ব্রাহ্মণ যজ্ঞেশ্বর। পুরুষভাব পরিত্যাগ করে তাঁরা ব্রজগোপীয় ভাবানুযায়ী সিঁদুর, শাড়ি, অলংকারাদি পরিধান করেন। এমনকি অঙ্গ মধ্যে নাবী চিহ্ন প্রদর্শিত হলে তাঁরা যথাক্রমে নন্দিনী ও জঙ্গলী নামে অভিহিত হন। পরবর্তী পর্যায়ে সীতা দেবীর নির্দেশে জঙ্গলী এখানে বসবাস করেন। সীতা দেবী নির্দেশ দেন যে, জনৈক হরিদাস নামক রাখাল গোধন রক্ষার্থে জঙ্গলীর চরণাশ্রিত হলে তার দ্বারাই শিষ্য পরম্পরা বৃদ্ধি হবে এবং অরণ্যটি জঙ্গলীটোটা নামে বিখ্যাত হবে। এখানেই গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহ জঙ্গলীর দেবী মহিমার পরিচয় পেয়ে যে টোটা নির্মাণ করিয়ে দেন, সেটিই জঙ্গলীটোটা নামে প্রসিদ্ধ। আবার অন্য একটি গ্রন্থ 'সীতাগুণকদম্ব' মতে বাদশাহ তাঁকে জঙ্গল দান করেন। 'প্রেমবিলাস' মতে গৌরেশ্বর তাঁর মাধ্য নারী ও পুরুয দুই রূপের পরিচয় পেয়ে তিনি জঙ্গলীকে মাতৃ সম্বোধন করেন এবং তাঁর জন্য একটি পুরী নির্মাণ করে দেন, তখন থেকেই এ স্থানের নাম 'জঙ্গলীটোটা' সবে কয়'।

বড় সাগবদীঘিব উত্তর পশ্চিম কোণে এবং নওদা বাজাবের দক্ষিণে গৌড়েশ্বরী কর্মা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গনে শিয়াপন্থী সাধক পীবানা-পীর শেখ আঁখি সিবাজুদ্দিন উসমান এর সমাধি ভবন অবস্থিত। ঈদ-উল-ফিতব এবং ঈদ-উল-আজহা বা বকর-ইদ এর পুণ্য দিনে দীঘি সন্নিহিত এই অঞ্চলটি এক সময় 'শহর মুহম্মদাবাদ' নামে পরিচিত ছিল। আঁখী সিরাজুদ্দিনের স্মৃতিসৌধের পাশেই রয়েছে ঝনঝনিয়া মসজিদ। যা পীর জাহানিয়ান জাহানখস্তের নামে। র্যাভেনশ ঝনঝনিয়াকে জানজহান মিঞার মসজিদ বলে অভিহিত করেছেন। হোসেন শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহের রাজত্বকালে এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৫৪৫ খৃঃ।

চণ্ডীপুর (৮৩)ঃ

শহর ইংরেজবাজার থেকে ৫ কি. মি দূরে চণ্ডীপুর মৌজা। চণ্ডীপুর গ্রামে রয়েছেন বল্লাল সেন প্রতিষ্ঠিত দ্বারবাসিনী চণ্ডী।একটি পরিপূর্ণ ভগ্ন ফটকের একাংশ দ্বারবাসিনীর মন্দির বলে সুদীর্ঘকাল জনমধ্যে প্রচাবিত। প্রকৃতপক্ষে মন্দির বলে কথিত এটি মুসলমান যুগের একটি দরওয়াজা। যার স্থাপত্য রীতি গৌড়ের দাখিল দরওয়াজাকে স্মরণ করায়। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধের রীতিও এখানে প্রতিফলিত। হিন্দু যুগের গৌড়ের পশ্চিম দ্বারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গৌড়েশ্বরীর কথা শোনা যায়। বুকানন হ্যামিলটন সাহেব গৌড়েশ্বরীর স্থানকে পুণ্যপ্রদা দ্বারবাসিনী বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

দেবী চণ্ডীর নামানুসারেই এই মৌজা চণ্ডীপুর নামাঙ্কিত হয়ে রয়েছে। এখানে মুসলমান স্থাপত্য ছাড়াও মুঘল বাদশা আলমগীরের ৭টি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে।

গৌড়েশ্বরী, কমলাবাড়ী — বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন খনিত বড় সাগরদীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে কমলাবাড়ী, গৌড়েশ্বরী দেবী চন্ডীর অপরনাম কমলা। গৌড়ের অপর আর এক প্রান্তে ছিল রক্ষা কর্ত্রী দেবী কমলার মন্দির। তাই এই স্থানের নাম গৌড়েশ্বরী কমলা বাড়ী।

সাদুল্লাপুর (৮৪) ঃ সাদুল্যাহপীর > সাদুল্যাহপুর > সাদুল্লাপুর > সোদলাপুর।

পীর শাহ আবদাল্লাহর নামাঙ্কিত স্থানই খণ্ডিত হয়ে আজকের প্রসিদ্ধ সাদুল্লাপুর নামে পরিচিত হয়েছে। সাদুল্লাপুরের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় যে, শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বে সূর্যবংশের রাজা ভগীরথ আদি ভাগীরথীর এই ধারাটি নিয়ে এই পথ ধরেই সাগরদ্বীপে কপিলমুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন। তিনি যেতে যেতে গৌড় নগরীর পশ্চিম প্রান্তে প্রবাহিত এই ভাগীরথীর পূর্ব তীরে দুটি জায়গায় স্নান করেছিলেন। তৈরী হয়েছিল পবিত্র দুটি স্নানের ঘাট। একটির নাম শঙ্খধ্বনি ঘাট আর একটির নাম ইন্দ্রেশ্বর ঘাট। বলা হয় ভগীরথ যখন গঙ্গাকে নিয়ে আসছিলেন তখন সমবেত শঙ্খধ্বনি সহ মুনি ঋষিরা গঙ্গাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তাই শঙ্খধ্বনি ঘাট আর অদূরেই (৪-৫ কি. মি দূরে) যেখানে গঙ্গাকে স্তুতি করে ইন্দ্র স্নান করেছিলেন সেটি হল ইন্দ্রেশ্বর ঘাট। এই পৌরাণিক কাহিনীর বদলে সাদুল্লাপুর নাম কি করে হল তার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। তবে ১৯২৮ সালে ইংরেজদের ভূমি সংক্রান্ত আইনের খাতায় এটি জে. এল নং ৮৪, মৌজা সাদুল্লাপুর বলেই উল্লেখিত হয়। আর ইন্দ্রেশ্বর ঘাটের নাম বর্তমানে হাপাসখানা বলেই পরিচিত।

শহর ইংরেজবাজার থেকে ৮ কি. মি দূরে ভাগীরথী তীরবর্তী সাদুল্লাপুর (যা লোকমুখে সোদলাপুর) মুসলমান আমল থেকেই হিন্দুদের শবদাহের জন্য শ্মশান হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল। স্বাভাবিকভাবেই বহু শতাব্দী প্রাচীন এই শ্মশানের মাহাত্ম্য লোকমুখে প্রচারিত হয়েছে। পৌষ সংক্রান্তিতে আজও এখানকার স্নান উপলক্ষে প্রচুর জনসমাগম হয় ও মেলা বসে। শ্মশানের বিপরীত দিকে ১০০ গজ দূরে একটি জীর্ণ শিব মন্দির আছে। সাদুল্লাপুর ঘাটকে কেন্দ্র করে এখনও অক্ষয়তৃতীয়া, গঙ্গা দশহরা, ভাদ্র সংক্রান্তি, মাঘী পূর্ণিমা ইত্যাদি তিথিতে গঙ্গাস্নানকে কেন্দ্র করে মানুষজন মিলিত হন।

এক সময় শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে সাদুল্লাপুরের খ্যাতি ছিল। এখানকার কাঁসার তৈরী জিনিসের বিশেষ করে এক ধরনের পিতলের ঘটি ছিল বিখ্যাত। এই ঘটির চাহিদা ছিল এশিয়া জোড়া, সেই সঙ্গে রৌপ্যশিল্পও সুনাম অর্জন করেছিল।

এই সাদুল্লাপুর মৌজাতেই আছে ঐতিহাসিক সুবিশাল জলাশয় সাগর দিঘি, ইংরেজবাজার থেকে ফরাক্কাগামী ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ধরে প্রায় ৪ কিমি পথ পার হলে ডানদিকে পাওয়া যাবে বহু প্রাচীন একটি পথ যা গঙ্গা নদীর পরিত্যক্ত খাদ ভাগীরথী নামে অভিহিত নদীর তীরে অবস্থিত সাদুল্লাপুর মহাশ্মশান ঘাট পর্যন্ত প্রসারিত। এই পথে ১ কিমি এগোলেই পথের ডান দিকে ঘন আম গাছ পরিবেষ্টিত সবুজ ছায়ায় অন্তরালেই রয়েছে এই ঐতিহাসিক দিঘি।

উত্তর- দক্ষিণে প্রসারিত এই সুবিশাল দিঘিটি ১,২০৫,১৯ একর বিশিষ্ট সাদুল্লাপুর মৌজার প্রায় ২৬৪.৫ একর জলাভূমি দখল করে আছে।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত এই দিঘি জলপূর্ণ ছিল অনেকটাই। তারপর থেকে তার পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। বিশ শতকের আটের দশকে সরকারি মৎসবিভাগ উদ্যোগ নেন এথ জলাশয়টি কেন্দ্র করে মৎস প্রজনন ও পালনের এক প্রকল্প গড়ে তুলতে। সেই অনুযায়ী এই প্রকল্পটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রকল্পটি জীর্ণদশায় ক্লান্ত।

অভিরামপুর (৯১) ঃ

১৬৮০ খ্রীঃ ২২শে এপ্রিল। বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে মালদহ জেলার নামডাক তখন তুঙ্গে এরই সরেজমিন তদন্তে একদল ইংরেজ বণিক এসে উপস্থিত হলেন এখানে। কলকাতা বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য আর একটি নিজস্ব বাণিজ্যকেন্দ্রের ভীষণ প্রয়োজন ছিল তাদের। মালদহ তখন ছিল তুঁত, মশলা, কাঁসার বাসন, গুড়, রেশম ইত্যাদির অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। বড় বড় নৌকায় বাণিজ্যদ্রব্য পরিবাহিত হত গঙ্গা - কালিন্দ্রী আর মহানন্দার জলপথে। যোগাযোগ ছিল ঢাকা, কলকাতা, ভাগলপুর, পাটনা, মুঙ্গের এলাহাবাদ ইত্যাদি শহরের সঙ্গে। আর এই বাণিজ্যের সুবিধার্থে ছিল একাধিক পোতাশ্রয়। যেমন নঘরিয়া, অমৃতি ইত্যাদি। দেখেশুনে আর দেরি করলেন না ইংরেজ বণিকদের অন্যতম নেতা ষ্টেইনহ্যাম। তিনি তার সহযোগী মিঃ রিচার্ড এডোয়ার্ডকে কোম্পানির তরফে দায়িত্ব দিয়ে এই মর্মে পাঠান যে, এডোয়ার্ড যেন রাজমহলকে কেন্দ্র করে মালদহ অঞ্চলে ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। সেই অনুযায়ী তিনি মালদহে পৌঁছবেন এবং পণ্য কেনার প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগ করবেন। এডোয়ার্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁরা প্রথমে বর্তমান পুরাতন মালদহ পরে বর্তমান ইংরেজবাজারে স্থায়ী আস্তানা তৈরি করবেন ঠিক করলেন। জায়গাটি সুরক্ষিত। কারণ মহানন্দা, টাঙ্গন, কালিন্দী, গঙ্গার প্রাকৃতিক পরিখা চর্তুদিকে। এ ছাড়া এর উঁচু জমি তুঁত চাষ ও রেশমের সুতো তৈরির সম্পূর্ণ অনুকূল। সুতরাং কালবিলম্ব না করে টমাস রো সহ কয়েকজন উপস্থিত হলেন তৎকালীন জমিদার রাজা রায়চৌধুরীর কাছে। তিনশত টাকার বিনিময়ে আট বিঘা বর্গাকার জমি হস্তান্তরিত হয়ে গেল। এর মধ্যে ছিল কুতুবপুর, হায়দারপুর, মকদুমপুর ও সিঙ্গাতলা এই চারটি গ্রাম। রাজাবাবু এই জমি বিক্রয় করেন এই আশায় যে, ইংরেজদের কুঠির সুবাদে তাঁর গ্রামগুলি উন্নত শহরে পরিণত হবে। এরপর ১৭৬৫ সালের দেওয়ানী লাভের পর ১৭৭০ সালে ইংরেজ কোম্পানী বর্তমান ইংরেজবাজারে একটি সুরক্ষিত ফ্যাক্টরী ভবন তৈরি করলেন, রেসিডেন্ট ছিলেন টমাস হেঞ্চম্যান। প্রশাসনিক কাজের সহায়তার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে। কালক্রমে শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠলেন এঁরাই। মালদহের শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার এবং অন্যান্য চাকুরিজীবীরাই অধিকাংশ ছিলেন এঁদের মধ্যে। এই সংখ্যাটা যখন কয়েক বছরের ব্যবধানে বেশ বেড়ে গেল, তখন তাঁদের বসবাসের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল অন্য একটি বৃহৎ জমি খন্ডের। কুতুবপুর, হায়দারপুর তখন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। মকদুমপুর এবং সিঙ্গাতলা নীলকুঠির সুবাদে ইংরেজদের এলাকা বলে চিহ্নিত সুতরাং জমির সন্ধানে "হেথা নয়.... অন্য কোনখানে।" ফ্যাক্টরী ভবন

তৈরির তাগাদায় তখন মহানন্দার পাড়ে সদ্য বাঁধ দেওয়া হয়েছে। মহানন্দা তখনও এমন শীর্ণা হয়ে যায়নি। বাঁক নেওয়া সুন্দরী মহানন্দার বিশাল বিস্তীর্ণ জলরাশিতে পাল তুলে চলে যাচ্ছে পণ্যবাহী, যাত্রীবাহী নৌকো আর ইংরেজদের সুবাদে সুদৃশ্য ষ্টীমার। দুই পাড়ে আম, জাম, কাঁঠালের সবুজ বনানী। দুষণমুক্ত এই নয়নাভিরাম পরিবেশেই গড়ে উঠল নতুন জনপদ। মহানন্দার তীরবর্তী এক থেকে দেড় কিলোমিটার অঞ্চল চিহ্নিত হল সম্ভ্রান্ত হিন্দু পাড়া হিসাবে। এখানেই বাড়ি করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ভেলু ভাদুড়ি, অমরেন্দ্রকৃষ্ণ ভাদুড়ি, বিখ্যাত উকিল সত্যরঞ্জন লাহিড়ী, কালীরঞ্জন লাহিড়ী। লাহিড়ী বাড়িতেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস মালদহে এসে উঠেছিলেন। এই মনোরম পরিবেশ তাঁকেও মুগ্ধ করেছিল নিশ্চয়ই। এখনও বহু প্রাচীন অভিজাত লোকের বাড়ি এই এলাকায় রয়েছে। নয়ন অভিরাম সেই অঞ্চলটিই কালক্রমে অভিরামপুর এই নামে চিহ্নিত।

পুরানো গুয়ামালতী (১০৫), নয়া গুয়ামালতী (১১০)ঃ

গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ তাঁর শৈশবে মালতী নামে এক ধাত্রীর কাছে প্রতিপালিত হন। তিনি তাঁকে 'বুয়া মালতী' বলে ডাকতেন। আবিদ আলীর মতে 'বুয়া মালতী' থেকেই 'গুয়া মালতী' হয়েছে। (বুয়া শব্দের অর্থ দিদি)। পুরনো মালদার চালসা পাতার লিপি থেকে জানা যায় যে, সুলতান নসরত শাহের রাজত্বকালে (১৫৩১-১৫৩২ খৃঃ) বুয়ামালতী একটি জলসত্র নির্মাণ করিয়েছিলেন। রজনীকান্ত চক্রবর্তীও অনুরূপ মনে করেন। অন্য আর একজন বিবি মালতীর সন্ধান পাওয়া যায়, যিনি ১৫৩৪-৩৫ খৃঃ গৌড়-লখনৌতির একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই বিবি মালতী আগে হিন্দু ছিলেন পরে মুসলিম হয়ে যান।

গুয়ামালতীর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান পাতালচণ্ডী বা পাটলাচণ্ডীর মন্দির। তিনি গৌড়ের রক্ষাকর্ত্রী দেবী চণ্ডী। পদ্মাপুরণের উত্তরখণ্ডে আর দেবীপুরাণে এই দেবপীঠের উল্লেখ আছে। অনেকে এটিকে মন্দির বললেও এর ভিত্তিমূলের গঠন লক্ষ্য করলে এটিকে কোন মন্দির বোধ হয় বলা যাবে না। প্রাচীন ভাগীরথীর শুকনো খাতে কোন স্তম্ভ বা মিনার ছিল যেটিকে প্রহরা স্তম্ভ বলা যেতে পারে। নদীপথে জলযান নোঙর করার বৃহৎ লৌহবলয় ২/১টি আজও দেখা যায়। একটি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড পাতালচণ্ডী বলে পূজিত হন। পাতালচণ্ডীকে কেন্দ্র করে লোকমুখে নানা অলৌকিক ঘটনা প্রচারিত। প্রতিবছর চৈত্র মাসের রাম নবমীতে পাঁচ দিনের একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গুয়ামালতী মৌজার ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত রয়েছে কালাপাহাড়ের গড়। সুলেমান কররানীর বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড়ের বাড়ী এই অঞ্চলে বলে কিংবদন্তী আছে।

কালাপাহাড়ের গড়ের পিছন দিকে আছে ঝাঁঝরা কুঠি। এটি একটি নীলকুঠি। দীর্ঘদিন জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকার জন্য এই কুঠির নাম ঝাঁঝরা কুঠি হয়ে গেছে। এটি মালদহের বিখ্যাত এলার্টন সাহেবের নীলকুঠি ছিল। এলার্টন সাহেব বাংলা ভাষায় কয়েকটি ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদক ছিলেন। ইউরোপীয় নার্সারির ধাঁচে স্থানীয় চাষী ও কৃষকদের ছেলেমেয়েদের জন্য এ জেলার বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

ঝাঁঝরা কুঠির উত্তর-পূর্ব কোণে একটি মসজিদের ভগ্নাবশেষ আছে। যার অবশিষ্ট চারটি

প্রস্তরস্তম্ভ দেখে মেজর উইলিয়াম ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর বিবরণে মসজিদটির স্তম্ভ ও বুরুজের অনবদ্য সৌন্দর্যের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

পাতালচণ্ডী বা পাটলাচণ্ডী পীঠ — বর্তমান গৌড় - মালদহ রেল ষ্টেশনের ২ কিমি. দক্ষিণ পূর্বে বৃহত্তর গৌড় নগরীর কালা পাহাড়ের গড় থেকে ১ কি. মি. দক্ষিণে গৌড়ের রক্ষাকর্ত্রী দেবী চণ্ডীর অবস্থান, পদ্মাপুরাণের উত্তরখণ্ডে, আর দেবী পুরাণে এই দেবপীঠের উল্লেখ আছে।

রামচন্দ্রপুর (১১২)ঃ

এই মৌজার রাজমহলগামী সড়কের পাশে ঘোড়াপীর নামে দুটি সমাধি পাশাপাশি অবস্থিত। এই সমাধি দুটি জাগ্রত পীরের সম্মানে আজও পূজিত হন ধূপ-ধুনো আর মাটির ঘোড়ার উপাচারে।

রামকেলী (১২৮)ঃ

বৃন্দাবন দাসের রচনায় পাওয়া যায়, —

গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ সমাজে তার রামকেলী নাম।।

মালদহ জেলার এই মৌজাটিতে পদার্পণ করেছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল থেকে বৃন্দাবনে যাবার পথে। সেই থেকে বৈষ্ণব ধর্মবলম্বীদের কাছে এই গ্রাম বৃন্দাবনের মর্যাদায় তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মহাপ্রভু আসার অনেক আগে থেকেই গ্রামটির নাম 'রামকেলী' বলে পরিচিত। এই নামকরণের পেছনে বহুবিধ জনশ্রুতি প্রচলিত। কেউ বলেন সুদূর ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র সীতা সহ এই গ্রামে এসে কেলি (জলক্রীড়া, জলবিহার) করেছিলেন বলেই তার নাম হয়েছে রামকেলী। এই তত্ত্ব যুক্তিহীন বলে মনে করেন প্রয়াত সুধীর চক্রবর্তী মহাশয়, তিনি বলেন, আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে পাল, সেন আমলের রাজধানী গৌড় যে ভূমির উপর অবস্থিত, বর্তমান মালদহ জেলার দিয়ারা ভূমিখণ্ড সেই সময় ভূ-পৃষ্ঠে ছিল না। কেউ কেউ এই বিষয়ে বলরাম কাহিনীর কথাও বলে থাকেন। অসুররাজ বাণ এই ভূখণ্ডে রাজত্ব করতেন, সেই অসুররাজ বাণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরাম যুদ্ধ করতে এসেছিলেন এই এলাকায়। সেই ভীষণ যুদ্ধের ক্ষেত্র ছিল সেন আমলের পরিচিত গৌড় রামকেলি অবধি। যুদ্ধে বলরাম বাণকে সংহার করে এই স্থানেই বিজয় উৎসব পালন করেছিলেন এবং তিনিই এই জনপদ স্থাপন করেছিলেন। এই প্রচলিত গল্পটিরও কোন দৃঢ়মূল ভিত্তি নেই। অসুররাজ বাণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের একটি বিরোধের পটভূমি আছে কৃষ্ণপুত্র অনিরুদ্ধের বিবাহকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সেটি যদি হয়েও থাকে তা হয়েছিল বরেন্দ্রীর প্রাচীন মাটিতে। রামকেলি নামটির পিছনে কেউ কেউ 'কর্ণাটকী রাগ রামকিরীর অস্তিত্ব খুঁজে পান। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় গৌর সাম্রাজ্যের সেন রাজবংশ কর্ণাটক থেকে এসেছিলেন। তাই অনুমান করা যেতে পারে, মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে (১১৭৯-১২০৪ খৃঃ) রাজদরবারে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রত্যহ আসর বসত; ও বিভিন্ন রাগ-রাগিনী নিয়ে নিজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত, তারই ফলশ্রুতি 'কর্ণাটকী সুর নির্যাসের 'রামকিরী' রাগের। তাই ক্রমে ক্রমে 'রামকেলি'-তে পরিণত হয়ে গ্রাম নামে পরিণত হয়।

এরপর ষোড়শ শতাব্দীতে মালদহে চৈতন্যদেবের আগমন, গৌড়ের তখ্তে তখন হুসেন শাহ। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের নীলাচল থেকে গৌড়ে আসবার নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে কবি কর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখায়। তাঁর এই প্রবেশ কালটি হল ১৫০৪ খৃ সেপ্টেম্বর মাস বাংলার ৯২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস। সেই সময় থেকে ১৫১৫ খৃঃ জুন মাস পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলার আষাঢ় মাস পর্যন্ত তিনি গৌড় দেশে ছিলেন। এই সময়কালের মধ্যে মধ্য জুন বা জৈষ্ঠ্য সংক্রান্তিতে তিনি রামকেলি গ্রামে পদার্পণ করেন। আর এখানে মহাপ্রভু তিন দিন অহোরাত্র সপার্যদ নামগানে বিভোর ছিলেন। এই নামবিহার বা রামনাম কেলি থেকেই স্থানটি 'রামকেলি', অর্থাৎ পূর্বনাম পরিবর্তনের আর প্রয়োজন হয়নি।

এই রামকেলিতে চৈতন্যদেবের আগমন উপলক্ষে প্রায় দুই শত বৎসর যাবত বৈষ্ণব মহা সম্মেলন ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এই মেলা জৈষ্ঠ্য সংক্রান্তির একদিন আগে থেকে শুরু হয়ে সাতদিন স্থায়ী হয়। সমগ্র বাংলাদেশ তথা বাংলার বাইরে থেকেও বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই মেলা উপলক্ষ করে মিলিত হয়।

রামকেলিতে এসে মহাপ্রভু একটি তমাল তরুর স্নিগ্ধ ছায়াতলে উপবেশন করেছিলেন। এখানে একটি মন্দির আছে। যেটি নির্মাণ করেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ১৯৪৩ খৃঃ, ঐ মন্দির মধ্যে শ্রীচৈতন্যের পদচিহ্ন রয়েছে আর আছে তিনটি লিপি — সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরাজীতে।

রামকেলি গ্রাম কেবল বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদেরই নয় সমগ্র হিন্দুদের কাছেই এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

বড় সোনা মসজিদ — এই গ্রামে আছে সুলতান হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দিন শাহ নির্মিত (১৫২৬ খৃঃ) বারদুয়ারী বা বড় সোনা মসজিদ। স্থাপত্য শিল্পে এটি একটি অনন্য নিদর্শন। এর ভিতরে আছে তিনটি আলাদা আলাদা এবং সামনে এগারটি খিলান দ্বারা উন্মুক্ত পথ। আছে একটি প্রার্থনা কক্ষ যা পাথরের স্তম্ভ দিয়ে বিভক্ত। মসজিদের উত্তর-পূর্বে 'ছুবত্রা'; যেখান থেকে 'মুয়াজ্জিন আজান দিতেন।' 'সোনা-মসজিদ' নামকরণের পেছনে কেউ কেউ সোনার অলঙ্করন ছিল বলে অনুমান করেন। বারটি দরজার জন্য বারদুয়ার একমনটিও বলা যাচ্ছ না, কারণ এটির মোট প্রবেশ দ্বার এগারটি। প্রত্নতত্ত্ব বিদ আবিদ আলি এটিকে জনকক্ষ বা জনতার জন্যে উন্মুক্ত কক্ষ' বলে চিহ্নিত করেছেন। ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষের মতে প্রকৃতপক্ষে রাজ প্রাসাদের বর্হিদেশে এর অবস্থান বলে বার দুয়ারী বলতে চান।

দাখিল দরওয়াজা — দ্বিতীয় স্থাপত্যকীর্তিটি দাখিল দরওয়াজা। গৌড় প্রবেশের যা সিংহদ্বার বা মূল দরওয়াজা। ছোল ছোট পোড়ানো ইটের তৈরী এই দরওয়াজা সুলতান বারবক শাহের রাজত্বকালে (১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে) তৈরী হয় বলে হেনরী ক্রেটন এর অভিমত। বাংলারীতিতে তৈরী হওয়া এটিই প্রথম সিংহদ্বার। রাজকার্য উপলক্ষে সুলতান বাইরে থেকে রাজধানীতে প্রবেশের মুখে এখান থেকেই কামান দেগে তাঁকে সম্মান জানানো হত বলে এই সিংহদ্বাদ্বারের অপর নাম ছিল দাখিল দরওয়াজা।

বাদুল্যা বাড়ী (১২৯) ঃ

কদম-ই-রসুল ভবন বা কদম শরিফ — ১৫৩১ সালে সুলতান নসরৎ শাহ কর্তৃক নির্মিত হয় এই ভবনটি। শ্বেত পাথরের উপর মুসলমান নবী হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন এখানে রক্ষিত রয়েছে বলে এটি 'কদম-শরিফ' অর্থাৎ ইসলামের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

ভবনটি বাঁকুড়া বীরভূমের রত্ন মন্দিরের ধাঁচে নির্মিত। ১৬ ফুট উচ্চতার এক গম্বুজ বিশিষ্ট এই ভবনটির ভেতরে কোন সেহরাব নেই। একটি কৃষ্ণবর্ণ বেদির উপর রয়েছে 'রসুলের পাদাচিহ্ন।'

ফতে খানের সমাধিভবন — শাহ সুজা তখন বাংলার সুবাদার। উচ্চাকাঙ্খী এবং সন্দেহ পরায়ন তৎকালীন দিল্লীর সুলতান ঔরজেবের মনে হল ভ্রাতা সুজা তার বিরূদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত। তিনি তখন সেনাপতি দিলীর খাঁকে দুই পুত্রসহ গৌড়ে প্রেরণ করেন বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে। পথশ্রমে ক্লান্ত দিলীর খাঁর অন্যতম পুত্র ফতে খাঁ গৌড়ে পৌঁছে রক্তবমনে মারা যান। কদম রসুলের খানিক দূরত্বে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। এই সমাধি স্থানটিই ফতে খাঁর সমাধি ভবন নামে খ্যাত। সময়টা আনুমানিক ১৬৫৭ থেকে ১৬৬০ খৃঃ। উল্লেখ করবার বিষয় এই যে, এই সমাধি ভবনটিও বাংলার দোচালা রীতির আদলেই তৈরী করা।

চিকা বা চামকান মসজিদ — বৃহৎ এক গম্বুজ বিশিষ্ঠ এই ভবনটিকে পর্যটকরা মসজিদ বলে ভুল করেন বলে লোকমুখে এটি মসজিদ বলে কথিত। কিন্তু ভবনটির ভেতরে কোন মেহবার নেই, তাই অনুমান করা যায় এটি রাজকার্যে ব্যবহৃত বিশেষ কোন ভবন। মামুদ শাহী বংশের নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ (১৮৩৫-৫৯) এটি নির্মাণ করেন। মিনে কবা ইটের উপর সূর্য এবং চাঁদের আলো পড়ে এটি উজ্জ্বল হয়ে উঠত বলে লোকমুখে এটি চামকান মস্‌জিদ পরবর্তীতে চিকা মসজিদ নামে পরিচিত হয়। এই ভবনটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাসের আর এক অধ্যায়। চৈতন্য স্নেহধন্য সনাতনকে এই ভবনেই বন্দী করে রেখেছিলেন সুলতান হোসেন শাহ। পান্ডুয়ার একলাখি ভবনের সাথে এর মিল দেখতে পাওয়া যায়।

কনকপুর (১৩০) ঃ

বহিশগজী প্রাচীর ও রাজপ্রসাদ — সুলতান নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহের পুত্র রুকনুউদ্দিন বারবক শাহ রাজপ্রাসাদকে বেষ্টন করে ৬৬ ফুট তথা ২২ গজ উচ্চতার যে প্রাচীরটি নির্মাণ করেন তাই বাইশ গজী প্রাচীর নামে বিখ্যাত। দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল রাজপ্রাসাদ যা 'হাভেলী খাস' নামে পরিচিত। এই প্রাসাদ তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল প্রথমে 'প্রকাশ্য দরবার মহল' তার পরে 'বাদশাহের খাস মহল' একেবারে শেষে বেগম বা জেনানা মহল। সব মিলিয়ে এই প্রাচীরের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪০০ গজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল অনুমান করা যায়, বর্তমানে পুরাতত্ত্ব বিভাগ এখানে খননকার্য চালিয়ে যে ভগ্নাবশেষ আবিস্কার করেছে তা এই প্রাসাদের ভিত্তিমূল বলেই বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেছেন। গঙ্গার কাছেই এই প্রাসাদ ছিল, কারণ অদূরেই খননকার্যের ফলে পাওয়া গিয়েছে বন্দরের অবয়ব, প্রবেশপথ এবং নৌকা বন্ধনের শিকলের খন্ডাংশ।

হোসেন শাহের সমাধি, খাজাঞ্চী খানা, চাঁদা দরওয়াজা, নিম-দরওয়াজা — ১৫১৯ খৃঃ বাংলার সুলতান হোসেন শাহ মারা গেলে এই পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে তিনি সমাধিস্থ হন। একটি বৃহৎ আবেষ্টনীর প্রবেশ পথটি নীল সাদা টালির আচ্ছাদনে সুসজ্জিত ছিল, বুরুজগুলি ছিল লতা- পাতা অলঙ্করণে সুসজ্জিত। বাইশগজী প্রাচীরের বাইরে বাংলা কোট নামক স্থানেই এই সমাধি ক্ষেত্র অবস্থিত।

হোসেন শাহের সমাধির অনতিদূরেই আছে সুলতানি খাজাঞ্চি-খানা বা টাঁকশাল। এটি ফিরোজবাদ বলে পরিচিত হলেও টাঁকশাল দীঘির অস্তিত্ব এই খাজাঞ্চিখানার সত্যতা স্মরণ করায়।

দাখিল দরওয়াজার অপেক্ষাকৃত পুরানো ইতিহাস বহন করছে চাঁদ দরওয়াজা এবং নিম-দরওয়াজা। 'চাঁদ দরওয়াজা' দিয়ে নগরের প্রাচীন ও নতুন উভয় অংশেই যাতায়াত করা যেত। আর রাজবাড়ির অর্ধেক পথে ছিল বলে অন্যটি নিম দরওয়াজা। পাথর ও ইট দ্বারা নির্মিত এই ফটক দুটি অনবদ্য স্থাপত্য কৌশলের নিদর্শন ছিল।

গুমটি দরওয়াজা — এটি এক দুয়ারী ছোট ঘর, যা প্রথমবার কাজে ব্যবহৃত হত। শব্দটি আসলে ফরাসী 'গুমবদ' যা হিন্দিতে রূপান্তরিত হয় 'গুমটি' তে। প্রচলিত তাই গুমটি ঘর বা 'গুমটি দরওয়াজা'। এই দরওয়াজার উপরদিকে একাধিক অলঙ্কৃত কুলুঙ্গি রয়েছে যা মুসলিমদের নির্মিত অন্যান্য মসজিদ বা প্রহরা স্তম্ভে দেখা যায়।

শাহী দরওয়াজা / শাহ সুজার দরওয়াজা / লক্ষ ছিপ্পি দরওয়াজা / লুকোচুরি গেট — সুলতানী আমলে এই দরওয়াজা অসংখ্য রঙের এবং ডিজাইনের মিনা করা ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছিল তাই এটি লক্ষ ছাপ্পা বা লক্ষ ছিপ্পি দরওয়াজা বলে পরিচিত হয়। এরপর শাহ সুজার আমলে মুঘল স্থাপত্য রীতির আদলে কিঞ্চিৎ অদলবদল ঘটিয়ে সংস্কার সাধন করা হয়। সময়টি ১৬৫৫ খৃঃ বলে অনুমান। সম্রাট শাহ সুজা হাতির পিঠে চেপে এই দরজা দিয়ে যখন যাতায়াত করতেন তখন এই দরওয়াজার উপর থেকে নহবত বাজান হত। প্রহরের সময় নিরুপণের জন্য দুটি ক্ষুদ্র কুঠুরিও আছে।

ফিরোজ মিনার — মুসলিম আমলের স্থাপত্যকীর্তির অন্যতম নির্দশন ফিরোজ মিনার বা ফিরোজা মিনার। গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা থেকে পূর্বদিকে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ দিকে এই ফিরোজ মিনার স্থাপত্যটি। সম্ভবত হাবশী সুলতান সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহের সময় (১৪৮৭ - ১৪৯০ খ্রীঃ) এটি নির্মিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই মিনারটি দিল্লীর কুতবমিনারের বাংলা সংস্করণ। মিনারটি সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহের 'জয়স্তম্ভ' বলে মনে করা হয় হয়। মিনারটি একসময় 'ফিরোজা' বা নীল বর্ণের মিনা করা ইট দিয়ে তৈরী কবা হয়েছিল, এই ধারণাতেও কেউ কেউ মিনারটিকে ফিরোজা মিনার বলে থাকেন। তবে এটি কেবল ধারণা মাত্রই। কারণ এই ধরণের মীনা করা ইটের সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

এই মিনারটিব উচ্চতা ৮৪ ফুট এবং ব্যাস ৬২ ফুট। ৭৩টি সিঁড়ি মিনারটির মধ্যস্থল ঘিরে চক্রাকারে উপরে উঠে গেছে। প্রবেশপথ থেকে তিনটি তলাযুক্ত এই মিনার অপেক্ষাকৃত

ছোট চতুর্থ ও পঞ্চম তলা শীর্ষদেশে একটি গম্বুজযুক্ত ঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে। তবে আদিতে মিনারটির যে উচ্চতা ছিল এখন তা নেই।

স্থানীয় পীরু শা বা পীরু শাহ এই মিনারটির স্থপতি বা নির্মাতা বলে 'পীরু শা' বা 'পীর আসা' মন্দির বলে মানুষজনেরা মিনারটি চিহ্নিত করেন। কেউ কেউ আবার 'ত্রিশূল মন্দির'ও বলতে চান। এর প্রবেশদ্বারের সিঁড়িগুলি পরবর্ত্তীকালের সংযোজন। তবে মিনারটির উপরে উঠার ব্যবস্থা অনুমোদন সাপেক্ষ।

গৌড়েশ্বরী মাতৃগম্নাপীঠ — বসতিহীন এই জায়গার নাম আগে বামনপাড়া ছিল. বর্তমান গৌড়দুর্গের সালামি দরওয়াজা বা দাখিল দরওয়াজার পৌনে এক কিমি দক্ষিণ পূর্বে দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী গৌড়েশ্বরী দেবীর ধ্বংসাবশেষ মূর্তি রয়েছে। এখানে রামকেলী মেলার সময় গৌড়ের প্রাচীন অধিবাসী পুন্ডরী, নাগর, ধানুক অন্ত্যজ জনজাতিদের রমনীরা মাতার উদ্দেশ্যে পিন্ডদান করেন।

মাতগদা (১৩৪) ঃ

গুনমন্ত মসজিদ — প্রচলত জনশ্রুতি এই মসজিদে নামাজ পাঠে পাপমুক্তি ঘটে। ফরাসী শব্দ গুনাহ্ + মত - অর্থাৎ পাপের মৃত্যু। এই রকম একটি বিশ্বাস থেকেই এই মসজিদটির নামকরণ হয়েছে বলে অনুমান। পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে প্রাপ্ত একটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে কানিংহাম, এই মসজিদটি ১৪৮৪ খ্রীঃ নির্মিত বলে রায় দিয়েছেন।

১২৮ নং থেকে ১৪৩ নং মৌজা এই বিরাট অংশের উপর পাওয়া যায় সুলতানি আমলের এইসব স্থাপত্য কীর্তি গুলি। সুতরাং অনুমান করা যায় গঙ্গা তীরবর্তী এই এলাকা এক সময় যথেষ্ট বর্ধিযুঃ এবং জনবহুল ছিল। শুধু তাই নয় মুসলিম রাজত্বের শাসনকার্য পরিচালিত হত এখান থেকেই। তারপর এই স্থান থেকে গঙ্গা প্রায় ৩৫ কি.মি. দূরে সরে যাওয়া সব মিলিয়ে অঞ্চলটির পূর্ব গৌর ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই বললেই চলে। এখানকার অধিবাসীরা বলতে এখন বিভিন্ন জনজাতি এবং মুসলিম সম্প্রদায় তাদের জীবিকা বলতে আম, রেশম, এবং দুগ্ধজাত ব্যবসায়। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ার দরুন বিভিন্ন রকম উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবসায়িক লেনদেনও হয়ে থাকে।

মহদিপুর (১৩৫) ঃ

পাগলা নদীর ধারে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম মহদিপুর। যা একসময় রাজধানী গৌড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছিল। সুলতানী শাসনের সময় এই গ্রামটি রাজধানীর কাছাকাছি থাকায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল এবং গৌড়ের জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনের অধিকাংশই এই গ্রাম থেকেই সরবরাহ করা হতো। বাংলাদেশ সন্নিহিত সীমান্ত এলাকা হওয়ার কারণে এখনও মহদিপুর সমগ্র দিয়ারা অংশের ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি বলা যায়।

এছাড়া এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে In Firojpur is the Dhahchas mosque ascribed to Dhanpat Saudagar, He and his brother chand Sandagar were the banks of Gour in the sistenth ecntury and lived near the smale Sagardhighi east of the Rotan Masjid.

এই মৌজায় রয়েছে আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থাপত্য —

চামকাটি মসজিদ — ১৪৭৫ খৃঃ সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ মহদিপুর গৌড় রোডের ধারে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। এই মসজিদে নীল, হলুদ ও সাদা এই তিন রঙের মীনা করা ইট ব্যবহৃত হয়। মসজিদটি বর্তমানে ভগ্নাবশেষ এ পরিণত হয়েছে। তবুও এখানকার মীনা করা ইটের উপর অপূর্ব কারুকার্য মসজিদ টির আভিজাত্যের কথা স্মরণ করায়। পাণ্ডুয়ার একলাখি মসজিদের সঙ্গে এই মসজিদের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। চামকাটি মসজিদের নামকরণ প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন মুসলমানদের মধ্যে চামকাটি সম্প্রদায় এই মসজিদ নির্মান করেন। আবার চাম অর্থে শীর্ণ এবং কাটি অর্থে পথ ধরলে শীর্ণ পথের পাশে যে মসজিদ এমনটিও হতে পারে। অন্য অর্থে, ইসলাম উপাসকদের কেউ কেউ মানসপূরণের উপহার স্বরূপ গায়ের চামড়া কেটে উপহার দিতেন এখানে সেই থেকেও এই মসজিদটি চামকাটি মসজিদ বলে অভিহিত হয়ে আসছে।

(তথ্যসূত্র ঃ মালদা জেলার ইতিহাস / ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ)

তাঁতী পাড়া — ১৪৭৪ খ্রীঃ ১৪৮০ খ্রীঃ মধ্যে সুলতান ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে এই তাঁতীপাড়া মসজিদটি নির্মিত হয়। নির্মাতা হিসাবে জনৈক মীরসাদ খান এর নাম শোনা যায়। পাণ্ডুয়া এবং গৌড়ে যে কটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে, তাব মধ্যে টেবাকোটার নিদর্শন হিসাবে তাঁতীপাড়া মসজিদ-ই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদাব। কেউ কেউ মনে করেন এই তাঁতীপাড়া মসজিদ আসলে ওমর কাজী ও তার ভ্রাতার সমাধি ক্ষেত্র।

লোটন মসজিদ — গৌড় মহদিপুরের রাস্তার পাশে এই লোটন মসজিদ অবস্থিত। মীনা করা ইট ও কারুকার্য নির্মিত অপূর্বসুন্দর এই মসজিদটির তৈবীর ইতিহাসের সঙ্গে লোটন নাম্নী এক নর্তকীর গল্প কাহিনী জড়িয়ে আছে। ডঃ ব্লখের মতে বিচিত্র বর্ণের মীনা করা ইট ও কারুকার্যের উপর আলো প্রতিফলিত হলে নৃত্যরত নর্তকীব মত লাগত সেইজন্য এটিকে লোটন মসজিদ বলা হয়। ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষেব মতে এটি সংস্কৃত নূতন, হিন্দিতে নৌতন, মধ্য বাংলায নৌতুন শব্দের পথ পার হয়ে বরেন্দ্রীর উপভাষায় 'ন' স্থানে 'ল' এর ব্যবহার লৌতন—লোতন — লোটন খুব সহজেই সাধাবণ মানুযের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

পাঁচ খিলানের সেতু — লোটন থেকে দক্ষিণ মুখী রাস্তা দিয়ে মহদীপুর যাওযার পথে পড়ে পাঁচ খিলানের সেতু। এই সুদৃশ্য সেতুটি ১৪৫৭ খ্রীঃ আবুল মোযাফ্‌ফর মাহমুদ শাহের সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান কবা যায়।

নাজির খানি (১৪০) ঃ

কোতোয়ালি দরওয়াজা — মহদিপুরের ১ কি.মি. আগে বিরাট এক গড়ের প্রবেশ পথটি কোতোয়ালি দরওয়াজা নামে পবিচিত। মূল শব্দটি কত্‌ল যা থেকে কোতল অবশেযে কোতোয়ালি। আরক্ষাধ্যক্ষ বা কোতয়ালের এটিই মূল পরিচালন শিবির ছিল বলে অনুমান। ১২৩৫ খ্রীঃ থেকে ১৩১৫ খ্রীঃ মধ্যে এই দরওয়াজা নির্মিত হয়। অন্যান্য সুদৃশ্য দরওয়াজার মত এটিও অত্যন্ত মনোরম এবং অলঙ্কৃত ছিল, অর্ধবৃত্তাকার ছয় ফুটের পরিধি যুক্ত দুটি বুরুজ সারিবদ্ধ কুলুঙ্গি

এবং অলঙ্কৃত স্তম্ভের উপর ছিল সুচাগ্র খিলান। নবাবের আগমন উপলক্ষে নহবতের সুবন্দোবস্ত ছিল।

অন্যান্য মৌজা (জে. এল. নাম্বার অনুসারে):

(১) উত্তর চন্ডীপুর, (২) মাদিয়া, (৩) ভবানীপুর, (৪) খাসকোল চন্ডীপুর, (৫) গঙ্গা গোবিন্দপুর, (৬) ইমামনগর, (৭) মিল্কি, (৮) গোঁসাইপুর, (৯) জোতপুরাণ, (১০) দক্ষিণ চন্ডীপুর, (১১) সত্তারী, (১২) হরিশপুর, (১৩) মথুরাপুর, (১৪) মোবারকপুর, (১৫) বরমপুর, (১৬) লালাপুর, (১৭) আটগামা, (১৮) আনন্দমোহনপুর, (১৯) ফতেপুর, (২০) চৈলামপুর, (২১) বাসুদেবপুর, (২২) বিনোদপুর, (২৩) নামতপুর, (২৪) ফুলবারিয়া, (২৫) নঘরিয়া, (২৬) লছমী ঘাট, (২৭) বালুপুর, (২৮) কানাইপুর, (২৯) সোনাতলা, (৩০) শ্যামপুর (৩১) দৌলতপুর, (৩২) খালিমপুর, (৩৩) উত্তর দিনাজপুর, (৩৪) সাহাজালালপুর, (৩৫) জোতনরসিংহ, (৩৬) দৈবাকিপুর, (৩৭) খুরধা - জালালপুর, (৩৮) মালিহাট, (৩৯) গঙ্গারামপুর, (৪০) নিচ্‌লি (৪১) উত্তর লক্ষ্মীপুর, (৪২) পায়লাপুর, (৪৩) খলিলাবাদ, (৪৪) নাগরাই, (৪৫) শৈলপুর, (৪৬) উত্তর গোপীনাথপুর, (৪৭) জোতবসন্ত, (৪৮) নরহাট্টা, (৪৯) জোত গোপাল, (৫০) আনন্দিপুর (৫১) উত্তর গোবিন্দপুর (৫২) ইটাখোলা, (৫৩) নিমা-সরাই, (৫৪) জটালপুর, (৫৫) জোত, (৫৬) আরাপুর, (৫৭) সুলতানপুর, (৫৮) নাজিরপুর, (৬২) কলতাপাড়া, (৬৩) শেরপুর-মোকিমপুর, (৬৪) কুতুবপুব, (৬৫) পুরাপাড়া, (৬৬) মহেশমাটি, (৬৮) মক্‌দমপুর, (৬৯) পিরোজপুর, (৭০) অরাজি দিলালুর, (৭১) উত্তর রামচন্দ্রপুর, (৭২) ঝলঝলিয়া, (৭৩) বাগবাড়ি, (৭৪) লক্ষ্মীপুর, (৭৫) মগনপাড়া, (৭৬) মহাডমোপুর, (৭৭) মাধবপুর, (৭৮) জোত প্রীথই (৭৯) কর্ম্মানি গ্রাম (৮০) নাওদা বাজার (৮১) কমলপুর, (৮২) আজিমপুর, (৮৩) চন্ডীপুর, (৮৪) সাদুল্লাপুর, (৮৫) মোল্লাপাড়া, (৮৬) জেরত নগর, (৮৭) দিলালপুর, (৮৮) উত্তর যদুপুর (৮৯) দক্ষিণ যদুপুর (৯০) গাবগাছি, (৯২) মহেশপুর, (৯৩) জগদীশপুর, (৯৪) নিশ্চিন্তপুর, (৯৫) গোপালপুব, (৯৬) রায়পুর, (৯৭) গোবিন্দপুর, (৯৮) কুমারপুর, (৯৯) কৃষ্ণপুর, (১০০) নৃসিংহপুর, (১০১) মোস্‌লেমপুর, (১০২) কৃষ্ণপ্রসাদ নৈজ, (১০৩) বড় ফুলবাড়ী, (১০৪) টিয়াকাঠি, (১০৫) পুরানো গুয়ামালতি, (১০৬) অরাজি ফুলবাড়ি, (১০৭) বড়চক, (১০৮) ধরমপুর, (১০৯) নয়াগুয়া মালতি, (১১০) গোপীনাথপুর, (১১১) বায়সপুর - অরাজি ইংলিশ, (১১২) রামচন্দ্রপুর, (১১৩) রায়সপুর - অরাজি ইংলিশ (১১৪) রায়সপুর, (১১৫) দরিযা দহ, (১১৬) দৈ গ্রাম, (১১৭) তাঁতিপাড়া, (১১৮) গণিবাহাদুরপুর খান (১১৯) বাহাদুরপুর (১২০) ফুলবাড়ি (১২১) কিষাণপুর, (১২২) ফুলবাড়ি অরাজি, (১২৩) গোলাহাট, (১২৪) জামালপুর, (১২৫) পোড়া মাদিয়া, (১২৬) নাজির খান অরাজি, (১২৭) ভোলানাথপুর, (১২৮) বামকেলি, (১২৯) বাদুল্লা বাড়ি, (১৩০) কনকপুর, (১৩১) চন্দনগড় (১৩২) পশ্চিম নাজির খানি অরাজি, (১৩৩) গোপী বাহাদুর খান অরাজি ইংলিশ, (১৩৪) মাতগদা, (১৩৫) মহদিপুর (১৩৬) পার্ব্বতীপুর, (১৩৭) চৌকা পাড়া, (১৩৯) বেলাবাড়ী (১৪০) নাজিরখানি, (১৪১) তেঁতুলিয়া, (১৪২) ঘুর্ণী মাদিয়া, (১৪৩) সদ্‌গদা, (১৪৪) অরাজি নাজির খানি, (১৪৫) উত্তর - ওমরপুর (১৪৬) গরমহালি।

বামনগোলা ঃ

বামনগোলা নামটির সঙ্গে আকারে ছোট অথচ সমৃদ্ধময় একটি গ্রামের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। গ্রামনাম অন্তে 'গোলা' শব্দটি শস্যসমৃদ্ধ একটি গ্রামের কথা বলে। পাল আমলে এই স্থানটি প্রকৃতিগত এবং ভূমিগত কারণেই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। আজ থেকে হাজার খানেব বছর আগে এটি একটি জনবসতিপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল অনুমান করা যায়। ব্রাহ্মণী, টাঙন, পুনর্ভবা ইত্যাদি একাধিক নদীপথে বামনগোলার যোগাযোগ ছিল মহানন্দার জলপথে গঙ্গানদীর। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট সুবিধা ছিল। তার উপর পাল রাজাদের কৃপাপুষ্ট হয়ে এই অঞ্চলটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বরিন্দ অঞ্চলের শক্ত কাঁকুড়ে জমি ছিল চাষ আবাদের জন্য অনেকটাই অনুপযুক্ত। যথোপযুক্ত খাদ্যশস্যাদির জন্য নির্ভর করতে হত পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামের উপর। সেইজন্য বামনগোলা অর্থাৎ ছোট গোলা এর রকম নামকরণ হতে পারে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালরাজাদের স্মৃতি এই এলাকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রয়েছে জগদলা বৌদ্ধ মহাবিহার। রয়েছে পালবংশীয় রাজা মদনপাল প্রতিষ্ঠিত মদনাবতী। পালরাজাদের খনিত মেঘ ডুম্বর দীঘি, আর তাঁদের উপাসিত বৌদ্ধধর্মের লোকায়ত রূপ গম্ভীরা পূজা।

পালযুগ পরবর্তী সেনযুগেও এই অঞ্চল তার পূর্ণ মহিমা নিয়ে বিরাজিত ছিল। হিন্দু তথা চণ্ডী পূজার উপাসক সে রাজাদের একাধিক চিহ্নও এখানে পাওয়া যাবে। বাঁশরা গ্রামে রয়েছেন অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী চামুণ্ডা। বরিন্দা গ্রামে চর্তুভুজা মহামায়া। এখনও এইসব দেবদেবী এবং মন্দিরকে কেন্দ্র করে বাৎসরিক উৎসব হয়।

বামনগোলা থানায় বরিন্দ অঞ্চলের বসবাসকারী সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুণ্ডা ছাড়াও রয়েছে একাধিক নিম্নবর্ণ উপজাতি তিওর, কাহার, বিন ইত্যাদিরা। একাধিক গ্রামনামে তাদের ভাষা, সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। যেমন, অহিল ছোরা (৫৪), বেরুল (৬৪), সীকাইল (৬৫), উধাইল (৬৭), বিনতারা (৭০), তুরাক মনোইল (৯৬) ইত্যাদি।

ধুলদা (৬), বাজে ধুলদা (৭) ঃ

এই মৌজায় রয়েছে প্রায় দুই /তিনশত বছরের পুরানো শিবমন্দির। ভেতরে রয়েছেন শিব তিলভদ্রেশ্বর; যা শিবডাঙ্গির শিবমন্দির নামেই খ্যাত। জরাজীর্ণ এই মন্দিরটি ভূমিপৃষ্ঠ থেকে ৬ ফুট উচ্চে অবস্থিত। আগে পাথরের সিঁড়ি ও প্রাচীরের বেষ্টনী ছিল। এই রত্ন মন্দিরটির ভেতরের চার কোণে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য যে আলম্ব ছিল তা পরিস্কার বোঝা যায়। বর্তমানে এই মন্দিরটির প্রকৃত চেহারা আর বোঝা যায় না, একটি বটগাছের অভ্যন্তরে মন্দিরটি ঢাকা পড়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ৪ বিঘা জমি জুড়ে বিরাট বটবৃক্ষের ভেতরেই মন্দিরের গর্ভগৃহ। জনশ্রুতি এই রকম, পাল আমলের মন্দিরটির ছাদে বটগাছটির জন্ম। পরে শিকড় ছড়িয়ে পুরো মন্দিরটিকে জড়িয়ে ধরে। এখনও শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে পূজা হয় এবং একটি মেলাও বসে।

উত্তর কসবা (৮), মদনাবতী ঃ

ব্রাহ্মণী নদীর তিন কি. মি. উত্তরে 'উত্তর কসবা'। এইখানে রয়েছে বিখ্যাত গ্রাম মদনাবতী।

অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, মালদহ রংপুর ও পাবনা এই কয়টি

জেলার অংশ বিশেষ দশম-একাদশ, দ্বাদশ শতকে 'বরেন্দ্রী মণ্ডল' নামে পরিচিত ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত এবং উত্তরপ্রদেশের বারাণসী জেলার কমৌলিতে প্রাপ্ত কামরূপ রাজ বৈদ্যদের তাম্রলিপিতে বরেন্দ্রীকে পালবংশীয় রাজাদের 'জনকভু' বা পিতৃভূমি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই বরেন্দ্রীর বিভিন্ন স্থান আজও পালরাজাদের অসংখ্য কীর্তিচিহ্ন ধারণ করে আছে, পাওয়া গেছে একাধিক তাম্রলিপিও।

রাজা দ্বিতীয় মহীপাল অত্যাচারী হয়ে পড়লে দিব্যোকের নেতৃত্বে বরেন্দ্রীর জনগণ বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা অর্জন করে, কিন্তু পরবর্তী পালরাজা রামপাল বিদ্রোহীদের হাত থেকে বরেন্দ্রী উদ্ধার করে আবার তা পাল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁর এই বিরাট জয়ের পরেই তিনি দুটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে কথিত আছে। নগরী দুটি হল রামাবতী ও মদনাবতী। এর মধ্যে রামাবতী পালরাজাদের রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল ব'লে তা অধিকতর খ্যাতি অর্জন করেছিল। আর টাঙন নদীর তীরে নির্মিত হয়েছিল পালরাজাদের অন্য একটি রাজবাড়ি বা পল্লীনিবাস যার নাম মদনাবতী। এই মদনাবতী ঠিক কোন রাজা প্রতিষ্ঠা করেন তা নিয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে রামপাল-ই নিজ মহিষী মদনাবতীর নামে এই রাজবাড়ির নামকরণ করেন। মালদহের ঐতিহাসিক স্বর্গীয় হবিদাস পালিতও লিখেছেন যে, মদনাবতী প্রতিষ্ঠা করেন রামপাল। অন্যদিকে ডঃ সুকুমার সেনের মতে মদনাবতীর প্রতিষ্ঠাতা মদনপাল। তবে বিদ্রোহীদের হাত থেকে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করার পর রামপাল নিজের নামে রামাবতী এবং রাজমহিষীর নামে মদনাবতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এরকম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এছাড়াও জনশ্রুতি এই যে মহারাজা বল্লাল সেনের শ্বশুর তান্ত্রিক আচার্য মদনহাড়ির বাড়ি নাকি এই অঞ্চলে ছিল। সেই থেকেই নাম মদন-বাটী বা মদনাবাটী।

একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মদনাবতী নগরী স্থাপিত হয়। তারপর বঙ্গদেশে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর দিল্লীর সুলতানি শাসনকালে যখন বঙ্গদেশ কখনও স্বাধীন কখনও পরাধীন ছিল সেই সুদীর্ঘ সাড়ে তিনশত বছর মদনাবতীর কোন বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সময় বর্ধিষ্ণু এই অঞ্চলটি মুসলিমরা নিজেদের বসতি স্থানে পরিণত করেছিল. আর মুসলিম অভিযানের প্রাক্‌লগ্নেই যে এই বসতি বিস্তার ঘটেছিল তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশেষ করে স্থানটির নাম 'কসবা' (আরবী অর্থ — সমৃদ্ধ গ্রাম) থেকেই সেই ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী'-র দ্বিতীয় খণ্ডে লখনৌতি বা জন্নতাবাদ সরকারের অধীন এই মদনাবতী পরগণা রয়েছে।

ইংরেজ আমলে এই গ্রামটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে এই মদনাবতীর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে। উইলিয়াম কেরী এই মদনাবতীতে মিষ্টার উডনির নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়করূপে যোগ দেন ১৫ই জুন ১৭৯৪ খৃঃ। এখানে কেরী ১৭৯৯ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিলেন। মদনাবতীতে কেরীর এই নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। মদনাবতীতে থাকাকালীন তিনি বরিন্দের কথ্য ভাষা সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়া বাংলা ব্যাকরণ, মহাভারতের কিছু অংশ অনুবাদ আর বাংলা অভিধান রচনা করেন। এখানে তিনি একটি পুরাতন মুদ্রণযন্ত্র ও এনেছিলেন। রয়েছে মুদ্রণালয়ের ভিত্তি কাঠামো।

এই অঞ্চলে পাল যুগের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। কষ্টিপাথরে নির্মিত দেবদেবীর অনেক মূর্তি, সুদৃশ্য অলংকরণসহ প্রস্তরস্তম্ভসমূহ, পালযুগের ইটেব টুকরো, পালরাজাদের খনিত বিশাল মেঘডম্বব দিঘি (৪ একর ৪৫ শতক) সেই আমলেরই বাঁধান ঘাটের ভগ্ন অংশ। পুরানো এই ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে গ্রামটির বিভিন্ন সংস্কার সাধন করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলছে।

হরিপুর (৩২) ঃ

হরিকোটিশ্রম > হরিকোট > হরিপুর এই বিবর্তনের মধ্যপথে এই অঞ্চলটির সাথে বহু শতাব্দীর ইতিহাস জড়িয়ে আছে। আদিশূর জয়ন্ত যিনি বৌদ্ধ রাজাদের পরাজিত করে গৌড়েশ্বর হন তিনি ৭৩৬ খৃঃ রাজত্ব করতেন। জয়ন্তের আগে এদেশের লোকধর্ম ছিল বৌদ্ধ অথবা তন্ত্রমূলক বৌদ্ধাচার। জয়ন্ত সনাতন বৈদিক ধর্ম পুনরুজ্জীবনের জন্য পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। এঁদের বসবাসেব জন্য যে পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন, এগুলি যথাক্রমে পঞ্চকোট, কামকোট, হরিকোট, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম। 'কোট' শব্দের অর্থ দুর্গ। প্রথম তিনটি গ্রাম ছিল দুর্গের কাছে তাই এগুলি 'কোট' শব্দান্ত। হরিকোটিশ্রম, অর্থাৎ বৌদ্ধ শ্রমণদেব থাকাব জায়গাকে নির্দিষ্ট করে। এর পরবর্তীকালে হিন্দু দুর্গাধিপতির নিকটস্থ স্থান বোঝাত। বর্তমানে সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আব অস্তিত্ব নেই, কালান্তরে তাই সেই গ্রামের সরলীকৃত নামকরণ হয়েছে হরিপুর।

উন্নত তাঁত শিল্পজাত সামগ্রীর জন্যে হস্ত রিপুব একসময় সুপ্রসিদ্ধ ছিল।

পারহবিনগর (জে.এল ৩৫) ঃ

আড়াই হাজার জনসংখ্যার এই গ্রাম নাম পারহবিনগব। স্থান নামের সঙ্গে নগর শব্দের সংযোজন প্রমাণ করে এই গ্রামটি একসময়ে যথেষ্ট বর্ধিষ্ণু তথা সমৃদ্ধ ছিল। এঁকে বেঁকে চপলগতিতে বয়ে চলেছে কিশোরী নদী টাঙ্গন। তার ভঙ্গিল তটের ঢালু পার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সবুজ গ্রাম পশ্চিমপারে গাড়াধূল, পূর্বপাড়ে পারহবিনগর। গ্রামটির নামকরনেব পেছনে ক্ষীনতোয়া টাঙ্গন নদীটির গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামটির দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে একটি ঘাট যার সাথে একটি চওড়া রাস্তা মিশে গেছে, এই ঘাটটি 'মুসলমানী ঘাট' নামে পরিচিত। এখানেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন নগর, প্রমাণ স্বরূপ প্রাচীন ইট পাথরের টুকরো আজও পাওয়া যায়। এই ঘাট কেন্দ্রিক নগবটিতে আসতে গিয়ে নদী পার হতে হত সবাইকে। এটি নগরটির সুরক্ষার কাজও করত। এর থেকেই হয়তো বা এর নাম হতে পারে পারহবিনগর। গ্রামটি দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন কিলোমিটার। শিক্ষিতের সংখ্যা দশ শতাংশ।

গ্রামেব অধিবাসীদের বেশীরভাগ কৃষিজীবী, মৎসজীবী, ব্যবসায় জীবী, চাকুরীজীবীও আছেন অন্তত্ত ৩০ টি পরিবারে ১:৭ অনুপাতে এখানকার মানুষের অধিকাংশের ভাষা পূর্ববঙ্গীয় ঢাকাই কথ্য ভাষা। কারণ গ্রামের অধিকাংশ মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত।

দুর্গাপূজা এই গ্রামের বড় উৎসব। এছাড়া বাসন্তীপূজা, চড়ক মেলা, রথযাত্রা, পৌষ - পার্বণ, বর্ষার নদীতে নৌকা - বাইচ, মনসা পূজা, সূর্যপূজা, দোল সবই রয়েছে।

মহেশবাটী (৩৭), মহেশপুর (৪১) ঃ

মহেশ নামযুক্ত অনেক মৌজার নাম মালদহ জেলার নানা অঞ্চলে পাওয়া যাবে। এই নামকরণেব সাথে সুদূর ইতিহাসের যোগসূত্র অনুভব কবা যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' থেকে জানা যায় (আনুমানিক ১০৭০ ৭১) দ্বিতীয় মহীপাল বরেন্দ্রীর সিংহাসনে বসেন। মহীপাল যখন রাজা হন তখন ববেন্দ্রীতে দিব্যোকের নেতৃত্বে কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়েছিল। পরবর্তী রাজা রামপাল সেই বিদ্রোহ দমন করলেও দিব্যেক ভ্রাতা রুদ্যোকের নেতৃত্বেও এই বিদ্রোহ যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। বরেন্দ্রভূম কিছুদিন ছিল এই কৈবর্ত সামন্ত রাজাদের অধীনে। এরপর সেন আমলে রাজা বল্লাল সেন কৈবর্ত দমনে বিশেষ ভূমিকা নেন এবং এদের 'অজলাচরণীয়' করে রাখেন। সেইজন্য বিশেষ শক্তিশালী এই কৈবর্ত জাতি নিজেদের মর্যাদা পুরুদ্ধারের জন্য সক্রিয় ছিল। এদেরই মধ্যে একজন ছিলেন মহেশ মাঝি। যিনি যুববাজ লক্ষ্মণ সেনের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর এবং নৌবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পিতার আচরণে ক্ষুব্ধ লক্ষ্মণ সেন গৃহত্যাগী হলে সম্রাট বল্লাল সেন এই মহেশ মাঝিকেই লক্ষ্মণ সেনকে ফিরিয়ে আনবার জন্য নিয়োগ করেন। সেই কাজ দক্ষতার সঙ্গে পালন করার পর বল্লাল সেন এই মহেশ মাঝিকে 'মহামাণ্ডলিক' উপাধি দেন এবং 'কৈবর্ত' জাতিকে জলাচরণীয় করেন। কৃতজ্ঞতায় অনেক ভূমিখণ্ড ও দান করেছিলেন। সেইগুলিই বর্তমানে 'মহেশ' নাম অন্তস্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে।

জগডালা (৭৭) ঃ

এই জগদালা গ্রাম নামের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে মালদার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। পালবংশের অন্যতম রাজা বামপাল (আনুমানিক ১০৭২-১১২৬) এই বৌদ্ধ মহাবিহারটির প্রতিষ্ঠাতা। যদিও অনেক বিশেযজ্ঞ এই মহাবিহারের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে নানারূপ বিপরীত মত প্রকাশ করে থাকেন। তাঁদের এইরূপ বিভ্রান্তির কারণ একাধিক জগদলা নামের অস্তিত্ব। অবিভক্ত মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় জগদল, জগদলা,জগদ্দলা, জগদাইল ইত্যাদি নামের বহু স্থান আছে। অবিভক্ত মালদহ জেলার নাচোল থানার জগদাইল (জে. এল.-১৮৭), বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজশাহী জেলার ধামেরহাট থানায় এবং রানিশঙ্কর থানায় জগদল নামে একাধিক গ্রাম আছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানায় জগদলা (জে. এল.- ৩), ইটাহার থানার জগদল (জে. এল২৪), এবং কালিয়াগঞ্জ থানার জগদল (জে. এল৬৮) ইত্যাদি। তবে বামনগোলা থানার এই জগদলা সম্পর্কে ঐতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দ কৌশাম্বী এইখানেই জগদলা মহাবিহার অবস্থিত ছিল বলে রায় দিয়েছেন। এখনও জগদলা ও তার কাছাকাছি জায়গায় বাঁধানো রাস্তার চিহ্ন, প্রচুর পুরোনো ইটের টুকরো, পুরোনো পুকুর ইত্যাদির অবস্থিতিতে এটি যে এককালে বর্ধিষ্ণু নগর ছিল তা বোঝা যায়।

বর্তমান জগদলায় একটি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। অন্য একটি 'রেখ বাংলা মন্দির' আছে তার বয়সও আনুমানিক দেড়শ বছর। এই মন্দিরের ভিতরে গৌরীপটসহ শিবমন্দির আছে।

জগদলার গম্ভীরা পূজা মালদহে প্রচলিত পুরোনো গম্ভীরা পূজাগুলির অন্যতম। এখানকার এই পূজা কয়েক শতাব্দী প্রাচীন। এখানে গম্ভীরার জন্য ১৪ বিঘা জমি দেবোত্তর করা আছে। এই

মন্দিরের বর্তমান সেবাইত জংলী চৌধুরী, ধীরেন চৌধুরী ও অমিয়পদ রায়। আদিতে গম্ভীরার যারা সেবাইত তাঁরা জাতিতে হাঁড়ি। এখানকার গম্ভীবা পূজা শুরু হয় চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন। শিবের পূজা শুরু হয় দুপুরে। গম্ভীরার জন্য নির্দিষ্ট আছে দুটি ঘর। একটিতে বুড়ো কালী ও বাশুলীর থান, দ্বিতীয়টিতে আছে শিবলিঙ্গ।

পশ্চিম কসবা (৮০), পূর্ব কসবা (২১৮), দক্ষিণ কসবা (২৩৯) ঃ

কসবা শব্দটি আরবী শব্দ কসবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ 'সমৃদ্ধ গ্রাম' বা এমন বসতি যা গ্রাম থেকেও বড় অথচ নগর থেকে ছোট। সুলতানি শাসনাধীন তুর্কী অথবা অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরা সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তারা কেবলমাত্র আর বাজধানীকে কেন্দ্র করেই বসতি স্থাপন করলেন না, ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা অন্যান্য জীবিকা অর্জনের তাগিদে ছড়িয়ে পড়লেন অন্যত্রও। 'কসবা' চিহ্নিত এলাকাগুলি মুসলিমদের নতুন গড়ে ওঠা বসতিস্থান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আলমপুর (১০৭) ঃ

হযরত-নুর-কুতুব-উল—আলম ছিলেন বিখ্যাত সুফী দরবেশ শেখ আলাউল হকের সুযোগ্য পুত্র ও সার্থক আধ্যাত্মিক উত্তবাধিকী। বাংলাদেশে ইসলাম শাসনের মাঝখানে যখন রাজা কংস ও তাঁর হিন্দু সহকারীদের কর্তৃত্ব বজায় ছিল তখন তিনি বাংলাদেশের মুসলমানদেব ঐক্যবদ্ধ ও শিক্ষিত করেন। পাণ্ডুয়ায় পিতাব সামধির কাছে নুর-কুতুব-আলম সমাধিস্থ আছেন। মালদহের সবচাইতে বেশী স্থাননাম এই সুফী দববেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। বামনগোলা থানার আলমপুর সেইরকম একটি স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত মৌজা।

বাঁশড়া (১০৮) ঃ

এই গ্রামে অধিষ্ঠিত আছেন চামুণ্ডা, বিশালাক্ষী দেবী। বিশালাক্ষী, বাঁশুলী থেকেই গ্রামনাম বাঁশড়া।

ওলান্দার / বরিন্দা (১২১) ঃ

এই গ্রামে অধিষ্ঠিত আছেন দেবী চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী।

গাজুরিয়া (১২২) ঃ

আদিবাসী অধ্যুষিত এই অঞ্চলটিতে মহারাজা গিরিজাত্মামানন্দের প্রচেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে 'সারদা তীর্থম' আশ্রম। এই আশ্রম ঘিরেই আদিবাসী তথা নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষদের জন্য স্কুল, হাসপাতাল এমনকি জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

সীমলা (১২৬) ঃ

সীমলা গ্রামের প্রায় চারশত বছরের প্রাচীন দুর্গাপূজা বিখ্যাত।

অন্যান্য মৌজা (জে. এল. নাম্বার অনুসারে) ঃ

এই থানার মৌজা সংখ্যা ১৪৫টি। (১) উত্তর চাঁদরাইল, (২) হরিশঙ্করপুর, (৩) শাহজাদুর,

(৪) শামসাবাদ, (৫) মাধব বাটী. (৬) ধূলদা, (৭) বাজে ধূলদা, (৮) উত্তর কস্‌বা , (৯) গবিসরা, (১০) খোকসান, (১১) মহারানী, (১২) দৌলতপুর, (১৩) গরানাড়া, (১৪) মহম্মদপুর, (১৫) বাহেরপুর, (১৬) ফরিদপুর, (১৭) উতর নাওপাড়া, (১৮) সৌহকপুর, (১৯) ঝাকলডাঙ্গা (২০) তেঁতুলমোড়া, (২১) গোবিন্দপুর, (২২) ধর্ম্মপুর, (২৩) মোজফরপুর, (২৪) অরাজি চান্দ্রাইল, (২৫) সুজাইল, (২৬) বিজলী, (২৭) চান্দ্রাইল, (২৮) লালপুর, (২৯) জোত ভবানী, (৩০) শায়েস্তাদ, (৩১) দক্ষিণ নোয়াপাড়া, (৩২) হরিপুর, (৩৩) আইগমতারা, (৩৪) কুরিবাড়ি, (৩৫) পারহবিনগর, (৩৬) ধামাইর, (৩৭) মহেশবাটী, (৩৮) ভাঙ্গারাইল পলাশবারি, (৩৯) ভোম্‌রাইল, (৪০) মহেশপুর, (৪১) বহরমপুর, (৪২) খাতিল, (৪৩) জোত হরিচরণ, (৪৪) ধর্ম্মডাঙ্গী, (৪৫) কস্‌বা, (৪৬) বাজে মানিকপুর, (৪৭) মোদিপুকুর, (৪৮) সরন্দা, (৪৯) রাজকুন্দলী, (৫০) বাইসুকবাড়ী, (৫১) রামনগর, (৫২) বেলতলা গাড়ি, (৫৩) গোপালপুর, (৫৪) আইলছোরা, (৫৫) পাটুল, (৫৬) মানিকপুর, (৫৭) চাঁদপুর, (৫৮) নাগ্রা, (৫৯) মহম্মদপুর, (৬৬০) শাদূলিপাড়া, (৬১) গোয়ালজাই, (৬২) পালপাড়া, (৬৩) বেরুল, (৬৪) সন্তরা, (৬৫) সীকাইল, (৬৬) মানুলি, (৬৭) উধাইল, (৬৮) বিজোরা, (৬৯) দুর্গাপুর, (৭০) বিনতারা, (৭১) পাইকপাড়া, (৭২) কুমারপুর, (৭৩) গারুল্যা, (৭৪) তেলিয়াপাড়া, (৭৫) ভবানীপুর, (৭৬) জেথ্‌রাইল, (৭৭) জগ্‌ডালা, (৭৮) ভদ্রেশ্বর, (৭৯) দাইহাট্টি, (৮০) গোপালনগর (৮১) পরমেশ্বরপুর, (৮২) মাধবপুর, (৮৩) গোপী নারায়নপুর, (৮৪) শ্রীপুর (৮৫) মাছুয়াকন্দর , (৮৬) জগ্‌সাধু, (৮৭) গুর নগর, (৮৮) সৌর নন্দন বাটী, (৮৯) টিট্‌পুর (৯০) রামকৃষ্ণপুর (৯১) উত্তরজাই (৯২) বামনগ্রাম, (৯৩) চেরগনা, (৯৪) জগন্নাথপুর, (৯৫) বারিন্দা, (৯৬) তুরুক মনোইল, (৯৭) বেংলা পাড়া, (৯৮) পাউল, (৯৯) মেহের পাড়া, (১০০) মাছুলাল, (১০১) কামার ডাঙ্গা, (১০২) থিনাগড়, (১০৩) জৈতান, (১০৪) মিরজাপুর, (১০৫) সালালপুর, (১০৬) চাঁন্দিপুর, (১০৭) আলমপুর, (১০৮) বসরা, (১০৯) হরিনন্দনবাটি, (১১০) বুজুরথালি, (১১১) বেলডাঙ্গা, (১১২) বিপ্রবাটী, (১১৩) শেপাড়া, (১১৪) কিরি পাড়া, (১১৫) মাকুলি, (১১৬) কংগসা, (১১৭) বাহাদিপুর, (১১৮) বামনকন্দর (১১৯) মহাদেবপুর, (১২০) বাঁকুলি, (১২১) ওলান্দার, (১২২) গাঙ্গুরিয়া, (১২৩) কশিমপুর, (১২৪) দাতুলিপাড়া, (১২৫) মালঞ্চ, (১২৬) সীম্‌লা, (১২৭) ডাবর, (১২৮) নেপালপুর, (১২৯) সাহারবাড়ী, (১৩০) মরমূরা (১৩১) সুকাইল(১৩২) আসরফপুর, (১৩৩) ছাতিয়া. (১৩৪) পাথর জগডালা, (১৩৫) পাথর শিম্‌লা, (১৩৫) বিবিনগর, (১৩৬) নবাবনগর (১৩৭) খাটিকা, (১৩৮) বাতুরিয়া, (১৩৯) বসাকবাড়ি, (১৪০) পশ্চিম লক্ষীনারায়ণ পুর, (১৪১) মহাদেবপুর, (১৪২) খুটাদহ, (১৪৩) রাঙ্গামোটিয়া, (১৪৪) নান্দিনাদহ, (১৪৫) আদাতলা।

গাজোল থানা ঃ

পাণ্ডুনগর-পুণ্ড্রবর্ধন-পাণ্ডুয়া-ফিরোজাবাদ-হজরত-পাণ্ডুয়া-প্রাচীন গৌড়বঙ্গ — প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত বিভিন্ন নামে শাসনকার্যের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা প্রাচীন বরিন্দের অভঙ্গুর মাটিতে বর্তমানের গাজোল থানা।

এই থানাটি একাধিক আদিবাসী অধ্যুষিত বিশেষত সাঁওতাল সম্প্রদায় এই অঞ্চলের সংস্কৃতির অনেকখানি জুড়ে রয়েছে। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে মুণ্ডারী, ওঁরাও, কোল, রাজবংশী, পালিয়া, কোচ ইত্যাদিরা।

এ জেলাব প্রাচীনতম উপরের পাললিক অঞ্চল 'বরিন্দ' নামে পরিচিত এবং অপেক্ষাকৃত নতুন অঞ্চল 'ভাঙর' নামে পরিচিত। ববিন্দ এলাকার গাজোল থানা এ অঞ্চলে উচ্চতম অংশ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যার উচ্চতা ৩৯.৭ মিটার। গাজোল থানার পূর্ব সীমান্তে পুনর্ভবা নদী এবং পশ্চিম সীমান্তে মহানন্দা ও টাঙন নদী বরিন্দকে দুটি সমবেখায় ভাগ করেছে। এই এলাকার জমিগুলোকে দুটি ধরনে ভাগ করা যায়। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে লালমাটির অঞ্চল অতি প্রাচীন নদীর দ্বারা গঠিত, এই জমিগুলির মাটি শক্ত এবং কাঁকর মেশানো, ঢেউ খেলানো এবং উঁচু-নীচু, ফসলের জন্য প্রায় অনুপযুক্ত-ই বলা যায। অপেক্ষাকৃত নতুন অঞ্চল হয় ভাঙ্গা বা ডাঙ্গা। যেমন, 'জামডাঙ্গা (৭৬), দক্ষিণ মালডাঙ্গা (১১৩), উত্তর মালডাঙ্গা (১২৫)ডাঙ্গাপাড়া (১৫৪), চক্ মুসাডাঙ্গা (১৫৯), মুথাডাঙা (১৬০), বৈরাডাঙ্গি (১৯২), বড়ডাঙ্গা (২০৮), সালাইডাঙ্গা (২১৪, আমালডাঙ্গা (২৪২), পলাশডাঙ্গা (২৪৫), বিসিংডাঙ্গা (২৫৯), পলাডাঙ্গা, (২৬০), ইত্যাদি। তার পরের অবস্থান তথা নিম্নভূমিকে বলা হয় কাঁদর বা কান্দর। যেমন, ছোটকান্দর (১০৩), সরকান্দর (১০৬), বালিয়াকান্দর (২৭২) ইত্যাদি।

রায়খান দিঘী (২৩) :

গাজোল থানায় অবস্থিত এই মৌজাটি একটি বিশেষ প্রত্নস্থল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই স্থান থেকে পাওয়া গিয়েছে অনেক প্রত্নসামগ্রী। প্রত্নস্থলের বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে এখনও রয়েছে মৃৎপাত্রের অবশেষাংশ। যা দেখে অনুমান করা যায় এই প্রত্নস্থলটি অতীতে একটি জমাট জনপদ ছিল। মৃৎপাত্রগুলি দেখে অনুমিত হয় এগুলি পঞ্চম, ষষ্ঠ, ত্রয়োদশ, চর্তুদশ শতাব্দীব মধ্যবর্তী সময়ের। জগজীবনপুবে আবিষ্কৃত প্রত্নসামগ্রীর সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

এই গ্রামটির নাম মালদা জেলার অন্যান্য জায়গা যেমন কেন্দপুকুর, নন্দা দিঘির মত পুকুর বা দিঘির নাম অনুসারী হয়েছে। এই দিঘিটিই রায়খান দিঘি নামে পরিচিত। যা গ্রাম নামটিকেও চিহ্নিত করেছে। প্রত্নস্থানটিব মাঝখানে রয়েছে দৈর্ঘ্যে তিন কি. মি, প্রস্থে এক কি মি বিশাল দিঘি, আর তার চারদিকে বিশাল উঁচু ঢিবি।

চান্দ্রাইল (২৯) :

চান্দ্রাইল > চাঁদরাইল > চাঁদ আইল। আদিশূর জয়ন্তর পরবর্তী আমলে বেড়ে ওঠা জনপদের একটি অংশ। এই মৌজার একাধিক পুকুর, পুষ্করিণী থেকে পাওয়া ভগ্ন মূর্তির অংশ এর প্রাচীনত্ব প্রমান কবে। এরই কাছাকাছি রয়েছে জীগনী ভূখণ্ড। এখানে রয়েছে পালখান দিঘি - - পূর্বে যা পাল আমলে খনিত কোন দীঘির কথা স্মরণ করায়। উত্তরে গোঁসাইলবাড়ি। প্রচলিত প্রবাদ এখানে মৃত বাদশাহের দেহকে স্নান কবান হত। এখনো একটি মাটির গড়ের অস্তিত্ব নজরে পড়ে য" চাঁদরাইল গড় নামে পরিচিতি।

কুতুবশহর (৩২) ঃ

পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত দরবেশ নুর কুতুব-উল-আলমের নামে এই মৌজাটি চিহ্নিত। এখানে রয়েছে তাঁর সমাধি। পীরের সমাধিটি একটি শুভ্র চন্দ্রাতপের দ্বারা আবরিত; এটি রক্তাভ পাথরের চারটি স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সমাধির শীর্ষে পঞ্চম স্তম্ভের উপরে যে লিপিটি আছে তা থেকে জানা যায় যে, হাতিমূল মুলুকের পুত্র (?) পীরজাত খান স্পেন থেকে স্তম্ভগুলিকে ১০২০ হিজরীতে অর্থাৎ ১৬১১ খৃঃ উপহার হিসাবে এই দরগাহকে দেন। নুর কুতুব উল আলমের সমাধির পূর্বদিকে আছে শেখ আলাউল হকের সমাধি। আছে বেহেস্ত-কা-দরওয়াজা নামে পরিচিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট গম্বুজ। দরবেশের পৌত্র শেখ জাহিদ এখানে জন্মগ্রহণ করেন বলে মুসমমানদের কাছে এটি একটি পবিত্রস্থান। আছে সিজাদা গৃহ বা নামাজ গৃহ এবং কাজী নূরের মসজিদ। জনৈক কাজী নূর এই মসজিদ রক্ষণাবেক্ষনের জন্য রহিখান দীঘির পার্শ্ববর্তী জমি দান করেছিলেন বলে শোনা যায় যার বাৎসরিক আয় ৬০০ টাকা। এই সম্পত্তি এখন ছ-হাজারী ওয়াকফ ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও আছে সৈনিক শের খান, শেখ আফ্‌কাহ, শেখ আলেয়ার, শেখ জাহিদ ইত্যাদির সমাধিস্থল।

ছোটী দরগাহর উত্তর-পূর্ব দিকে কুতুবশাহী মসজিদ বা সোনা মসজিদ। কুতুবল আলমের বংশধর মুহম্মদ আল খালিদীর পুত্র মখদুম শেখ কুতবুল আলমের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে এই মসজিদ নির্মাণ করেন।

কুতুবশাহী মসজিদের উত্তর-পূর্ব দিকে ১০০ গজের মধ্যে একলাখী সমাধি ভবন।

একলাখি সমাধি ভবন — আনুমানিক ১৪১২ - ১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় একলক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ভবনটি নির্মিত হয়েছিল বলে এটি একলাখি ভবন বলে পরিচিত। কেউ কেউ ভবনটিকে মসজিদ বলে চিহ্নিত করতে চান। তবে অভ্যন্তরে কোন মেহরাব না থাকায় এটি যে মসজিদ নয় সে কথা স্পষ্ট। তবে ভবনটির অভ্যন্তরে তিনটি সমাধি থাকায় এটি 'একলাখি সমাধি ভবন' নামেই অধিক পরিচিত।

ভবনের অভ্যন্তরে যে তিনটি সমাধি আছে, সেগুলি রাজা গণেশের পুত্র যদু অর্থাৎ জালালুদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রের কবর বলে অধিক প্রচারিত হলেও কেউ কেউ বলেন, এটি সুলতান গিয়াসুদ্দিন ও স্ত্রী এবং পুত্রবধুর। কারো মত জালালুদ্দিনের কন্যা ও পৌত্রের কবর।

প্রায় বর্গাকার এই সমাধি ভবনটির ভেতরে চারকোণে চারটি বুরুজ আছে। দেওয়ালে চারটি কুলুঙ্গীর মতো ছোট প্রকোষ্ঠ আছে। ভবনটির অন্তরস্থিত আয়তন ৪৮ বর্গফুট। ভবনটির বহিরঙ্গের নিখুঁত, অনবদ্য টেরাকোটার কাজ আজও পর্যটকদের স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষতার কথা স্মরণ করায়। প্রাক মুঘল পর্বের ইসলামী আমলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই একলাখি ভবন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পাণ্ডুয়া (৩৩) ঃ

হুগলির পাণ্ডুয়া নামক স্থান থেকে এই পাণ্ডুয়া আলাদা করবার জন্য মালদহের পাণ্ডুয়াকে কেউ কেউ হজরত পাণ্ডুয়া বলে অভিহিত করেন।

বরিন্দ ভূমির এই পাণ্ডুয়ার নাম বৈদিক সাহিত্যে, পারসিক ধারাবিবরণীতে এবং চৈনিক পর্যটকদের বিবরণীতে দেখা যায়।

এই পাণ্ডুয়াকে কেউ কেউ পুণ্ড্র আখ্যা দিয়েছেন। পার্জিটার মতে অঙ্গ ও বঙ্গের মধ্যবর্তী স্থলে পুণ্ড্রর স্থান। অক্ষয় কুমারের মতে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অংশবিশেষ পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র।

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ পুণ্ড্রবর্ধন পরিদর্শন করেছিলেন (৫২৯-৪৫ খৃঃ)। তিনি পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের পরিধি ৭০০ মাইল এবং রাজধানীর আয়তন ৫ মাইল বলে বর্ণনা করেছেন। দনুজমর্দনদেব (গণেশ) এবং তাঁর ধর্মান্তরিত পুত্র মহেন্দ্রদেব (?) জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের মুদ্রায় উৎকীর্ণ দেখা যায় পাণ্ডুনগর নামটি। মহাভারতের পাণ্ডবদের নামে এ অঞ্চল পরিচিত। সাতাশদীঘি (অর্জুন দীঘি) মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন কর্তৃক খনন করা হয়েছে বলে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

প্রকৃতপক্ষে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের গৌড় থেকে পাণ্ডুয়ার রাজধানী স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে পাণ্ডুয়ার ইতিহাসের পথে যাত্রা (১৩৪২ খৃঃ)। রাজধানী হিসাবে পাণ্ডুয়ার সঙ্গে ইলিয়াস শাহী বংশ এবং রাজা গণেশের নাম যুক্ত। আবার চীনা পরিব্রাজক মা হুয়ান ও কুও ছুংলির লেখায় বাংলা রাজ্যে ১৪০৯ খৃঃ থেকে ১৪১১ খৃঃ মধ্যে পাং-কো-লা-র বা পাণ্ডুয়ার উজ্জ্বল বর্ণনা আছে। জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের রাজত্বে চীন সম্রাটের যে কজন দূত ভারতে এসেছিলেন তাদের দূত দলের মধ্যে ফেইশিন্ (১৪১৬ খৃঃ) পাণ্ডুয়ায় এসেছিলেন।

সুলতান ইলিয়াস শাহের মুদ্রায় (১৩৩৯ খৃঃ) আবার 'ফিরোজপুরবাদ' নামটি উৎকীর্ণ। কেউ কেউ মনে করেন যে শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের (১৩০১ - ১৩২২) সময় থেকেই পাণ্ডুয়া বাংলার রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

গৌড় বাংলার রাজধানী থাকাকালীন পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়েছিল তিন দরবেশের জন্য। তাঁরা হজরত শাহ জালাল, হজরত নুর কুতুব উল আলম এবং শেখ রাজা বিয়াবানী।

পাণ্ডুয়ার গুরুত্ব ও ঐশ্বর্য অব্যাহত ছিল ১২০৬ থেকে ১৫৬৫ খৃঃ পর্যন্ত। এরপর সুলেমান কররানী টাঁড়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করলে পাণ্ডুয়ার গুরুত্ব কমে আসতে থাকে। তবে তারপরও অনেকদিন পর্যন্ত দরবেশদের প্রতি ভক্তিবশতঃ এখানে সৌধ মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ অব্যাহত ছিল।

পাণ্ডুয়ার আয়তন সম্পর্কে নানা মত আছে। কানিংহাম উনিশ শতকের শেষে এসে (১৮৭৯-৮০ খৃঃ) বিভিন্ন ভগ্ন অট্টালিকা ও রাস্তার চিহ্ন দেখে ইংরেজবাজার থেকে ৭ মাইল দূরে এই শহর শুরু হয়েছিল বলে অনুমান করেন। কেউ কেউ বলেন পাণ্ডুয়া নগরীর দৈর্ঘ্য ছিল ২৫ কি. মি ও প্রস্থ প্রায় ৩ কি. মি.।

বর্তমানে পাণ্ডুয়ার ভগ্নদশা হলেও পর্যটকদের দ্রষ্টব্য অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বড়ী দরগাহ্ বা শাহ জালালের দরগাহ্। এই দরগাহ্টি ১৩৪২ খৃঃ দরবেশের নির্দেশেই সুলতান আলাউদ্দিন আলি শাহ নির্মাণ করেছিলেন বলে অনুমান। দরগাহ্-র সামনে জামি মসজিদ, বামদিকে পুষ্করিণীর উত্তরে লক্ষ্মণসেনী দালান এবং দক্ষিণে হাজি ইব্রাহিমের বড় কবর ও ভাণ্ডারখানা। পশ্চিম সীমানায় দরবেশের দ্বিতীয় চিল্লাখানা, এরই কাছে তন্দুখানা।

পাণ্ডুয়ার ভিতর দিয়ে যে পথ গ্রামের দিকে গেছে সেই পথের উপরে বাংলা রীতির সালামী দরওয়াজা (পুনর্নির্মিত)।

আদিনা (৩৯) :

এই মৌজায় রয়েছে বাংলার গৌরব আদিনা মসজিদ। সুবিশাল এই মসজিদ দর্শকদের মনে বিস্ময় জাগায়। সুলতান ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-৯০খৃঃ) এর নির্মাতা। পশ্চিমদিকে বাইরের দেওয়ালে এই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ আছে। পশ্চিম দেওয়ালের বর্হিভাগ সংলগ্ন একটি অংশে তাঁর সমাধিব ধ্বংসাবশেষ আছে।

আদিনা মসজিদকে আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদ বলে মনে করা হয়। প্রথমটি রয়েছে দিল্লীতে, (জামি মসজিদ), দ্বিতীয় দামাস্কাসের আল-ওয়ালিদ এবং তৃতীয়টি আদিনার এই মসজিদ। এই মসজিদ যে পুনর্নির্মিত তা এর গঠন প্রণালী দেখলেই বোঝা যায়। বৌদ্ধ বিহার বা হিন্দু মন্দিরের (আদিনাথ শিব?) ধ্বংসাবশেষের উপরে এটি নির্মিত এই রকম অনুমান করা হয়। মসজিদ গাত্রের অপূর্ব কারুকাজ এবং মেহরাব্ এখনও মুগ্ধ পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আদিনা মসজিদ থেকে পূর্ব দিকে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক পেরিয়ে প্রায় ১ কি মি. দক্ষিণ-পূর্বদিকে এগিয়ে সিকান্দার শাহ্‌র রাজধানী ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। তবে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহেব রাজত্বকাল থেকেই এই অঞ্চল প্রসিদ্ধি লাভ করে। সাতাশ ঘর বা ষাট গম্বুজ বলে বর্তমানে পরিচিতি অঞ্চলটিতে ইলিয়াস শাহের রাজপ্রাসাদ ছিল বলে অনুমান। ১২০ গজ > ৬০ গজ অংশের ধ্বংসাবশেষকে কেন্দ্র করে এই প্রাসাদ চত্বর ছিল। দেওয়ালে বেষ্টিত জলবাহী নলেরও নিদর্শন আছে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি হামাম্ বা স্নানাগার। যেটি দিল্লীর ফিরোজ শাহ্‌র দরবারে আলতামশ্ শিল্পী দ্বারা নির্মিত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হামামের সমতুল। আদিনা ও সাতাশঘরার মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি মাটির গড় আছে। এর পশ্চিমের খাদটি পরিখার মত প্রাসাদের বেষ্টনীর কাজ করে। এই সমস্ত তথ্য বুকানন হ্যামিলটন লিপিবদ্ধ করেছেন ১৮০৮ সালে তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে।

প্রাচীন মহাভারতের পাণ্ডু রাজার নাম থেকে এই অঞ্চল জনপ্রিয় জনশ্রুতি এ কথাও বলে থাক। মহাভারতের বিরাট রাজার শ্যালক কীচকের রাজাভুক্ত ছিল এই অঞ্চল। অজ্ঞাতবাসে পাণ্ডবরা এইখানেই এসে আত্মগোপন করেছিলেন। জনশ্রুতি তথ্যভিত্তিক না হলেও বিভিন্ন মূর্তি বা মসজিদে প্রাপ্ত কষ্টিপাথরের অলংকরণ এবং উৎকর্ষতা এটুকু বুঝতে সাহায্য করে যে প্রাচীন হিন্দু আমলেও অঞ্চলটি বর্ধিষ্ণু এবং সমৃদ্ধ জনপদ ছিল।

মাঝরা (৬৮) :

এখানে শতবর্ষ প্রাচীন একটি দুর্গাপূজা হয়। যে পূজোর প্রচলন করেছিলেন স্থানীয় জমিদার, যিনি মালদহ জেলার রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত স্বনামধন্য কৃষ্ণজীবন সান্যালের পূর্বপুরুষ। কৃষ্ণজীবন ও এই পূজা পরিচালনা করে আসছিলেন ধারাবাহিক ভাবে। কিন্তু কৃষ্ণজীবনের স্ত্রী বরদাসুন্দরী দেবীর মৃত্যুর পর এবং স্বাধীনতা উত্তর জমির উর্দ্ধসীমা নির্ধারনের প্রেক্ষাপটে এই

পূজো দু/তিন বছর বন্ধ ছিল। তারপর গ্রামবাসীদের অনুরোধে সরকারের তরফে ১৫ বিঘা জমি দেবোত্তর করে দেওয়া হয় দুর্গাপূজোর খরচ চালিয়ে যাওয়ার কারণে। সেই থেকে এই দেবোত্তর জমিতে দুর্গাপূজো এবং কালি পূজা চলছে। পূজোয় সেবাইত রয়েছেন বর্তমানে রজনীকান্ত চক্রবর্তীর পুত্র গোবিন্দ চক্রবর্তী। তার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে ৩ বিঘা জমি। তিনি এখানেই বসবাস করেন।

গাজোল (৮৩) ঃ

গ্রামজল > গাওজল > গাজোল

কোনও একসময়ের জলাভাবের স্মৃতিই এই থানার মৌজার নামের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। এখানকার মাটি অত্যন্ত রুক্ষ, কঠিন। তাই জলাভাব মেটাতে একাধিক পুকুরের অস্তিত্ব এখানে দেখা যায়।

দেওতলা (১৭২), খোদ দেওতলা (১৭৬) ঃ

দেবমহল > দেওমহল > তাবরিজাবাদ > দেবতলা > দেওতলা।

বাংলা শব্দ 'দেওতলা' ফারসি 'দেবমহল'। শব্দটি সমানার্থক এবং উভয় শব্দের অর্থই দৈত্যস্থান। আইন-ই-আকবরীতে উত্তরবঙ্গের কিছু মহল ও অন্যান্য অনেক স্থানের নাম বর্ণিত আছে; এগুলোর শুরু দেও শব্দ দিয়ে, যেমন, দেবপুরা মহল, দেবীয়ারপুর মহল, দেবীয়া মহল ও দেবকোট। এই নামগুলোর মধ্যে একটি লৌকিক বিশ্বাস এই রকম যে এই অঞ্চলে এক সময় দৈত্য দানবের উপদ্রব ছিল। (শক্তিশালী কোন আদিবাসীদের দিকে বোধ হয় ইঙ্গিত করা হয়েছে) । দৈত্যদের দৌরাত্ম্য থেকে বোঝা যায়, সেই সময়ে এই অঞ্চলে রাহাজানি ও নরহত্যা বিরাজমান ছিল। নদীবহুল এলাকার যা বৈশিষ্ট্য।

আলেকজাণ্ডার কানিংহাম এই অঞ্চলে একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি, কয়েকটি হিন্দু যুগের স্তম্ভ দেখেছিলেন।প্রত্নতত্ত্ববিদ সরসী কুমার সরস্বতী মহাশয়ও এই অঞ্চলের পুরাবস্তুগুলির বিশ্লেষণ করে প্রত্নক্ষেত্রটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন, হতে পারে হিন্দু রাজাদের আমলে প্রতিষ্ঠিত কোন বিখ্যাত মন্দিরকে কেন্দ্র করেই এই স্থানের নাম হয়েছিল দেবমহল, পরবর্তীতে দেওমহল।

পরবর্তী কালে স্থানটি পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এটি ছিল পীরের চিল্লাখানা বা তাকিয়া (ধর্মীয় শিক্ষাক্ষেত্র। কথিত আছে, সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা শাহ জালালদের এমন ৩৬০ টি অস্থায়ী বাসস্থানের অন্যতম এই দেওতলা।

আবুল ফজল লেখেন, "দিল্লী থেকে শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজী বাংলাদেশে গমন করেন। বন্দর দেওমহল তাঁর চির নিদ্রার স্থান।" সিয়ারুল আরেফিকের লেখক বলেন, " শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজী যখন বঙ্গদেশে এসে পৌঁছান, তখন সে দেশের অধিবাসীরা তাঁর কাছে ভিড় জমায় এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এইখানে পুণ্যাত্মা শেখ একটি খান্‌কহ্‌ নির্মাণ করেন ও একটি লঙ্গরখানা (বিনামূল্যে খাবার স্থান) তৈরী করেন। তিনি কিছু জমি ও বাগান ক্রয় করেন এবং তা লঙ্গরখানার খরচ নির্বাহের জন্য দান (ওয়াকফ) করেন। সেখান থেকে তিনি আরও অগ্রসর হন এবং সেই বন্দর তখন দেওমহল নামে অভিহিত হোত। সেখানে একটি কূয়া ছিল।

জনৈক মূর্তি পূজক প্রচুর খরচে সেখনে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। পুণ্যাত্মা শেখ সেই মন্দির ধ্বংস করেন এবং এর ঘরগুলোকে তাঁর তাকিয়া বা বিশ্রামের স্থানে পরিণত করেন। বহু অবিশ্বাসীদের তিনি এইখানে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর একমাত্র সমাধি সৌধ এখন সেই মন্দিরের স্থানে অবস্থিত আছে এবং সেই বন্দরের অর্ধেক আয় উল্লিখিত লঙ্গরখানার জন্য বরাদ্দ করা হয়। পীর এই দেওতলা বন্দর থেকে অর্জিত অর্থের অর্ধাংশ ব্যয় করতেন তাঁর নির্মিত শহরে থানার জন্য। তাঁর মৃত্যুর পর এই মন্দিরের অভ্যন্তরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয। সমাধিটি এখনও আছে।

জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাকীর কাছে লেখা একটি পত্রে সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীব সিমনানী বর্ণনা করেছেন যে, "জালালীয়া দরবেশগণ দেওতলায় সমাহিত আছেন। (Bengal past and present, ১৯৪৮, পৃঃ ৩২ / এ. এইচ. দানী Inscription of Bengal, পৃঃ - ৮)

দেওতলার একটি মসজিদে ৮৬৮ হিজরী, ১৪৬৪ খৃঃ একটি উৎকীর্ণ লিপিতে স্থানটিকে 'কসবা তবারিজাবাদ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুলেমান কবরানীর সময়ের একটি শিলালিপিতে পরিস্কারভাবে 'তাবরাজিবাদ ওরফে দেওতলা' রূপে স্থানটিব উল্লেখ আছে। (এম. এ. আবিদ আলী, Memories of Gour. পৃঃ - ১৭০) দরগার চিল্লাখানায় প্রাপ্ত সূলতানী নুসরৎ শাহের সময়ের ৯৩৪ হিজরী / ১৫২৮ খৃঃ আর একটি উৎকীর্ণ লিপিতে আছে যে, শেখ জালালুদ্দিন তাব্রেজীর এলাকায় একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল, অতএব দেওতলা ছিল একটি কসবাহ্ (ক্ষুদ্র শহব) এবং দববেশ তাবরিজীর নামানুসারে এর নাম হয় তাবরিজাবাদ। শিলালিপিতে এই মহাপুরুযেব নাম উৎকীর্ণ করা হয়েছে শেখ জালাল মুহাম্মদ তাবরিজী রূপে। বিশেযভাবে মুহাম্মদ শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, এর অর্থ প্রশংসিত ব্যক্তি। ঐ শিলালিপি থেকে আরও জানা যায়, দেওতলা দেবকোটেব পথে সড়কের উপর অবস্থিত এবং দেবকোট তঙ্গা (টাঙন) নদীর পার্শ্বেই বিদ্যমান। এতে অনুমান হয় যে, দেওতলা ছিল একটি নদী বন্দর।

চিল্লাখানাটির ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনের মধ্যে কয়েকটি বাসস্থান আছে। সম্ভবত এগুলি পীরের খাদেমদের বাসস্থান (ভৃত্য বা অনুগামী)।

এই অঞ্চলের অন্য একটি পরিচিত জনপ্রিয় উৎসব 'কংস ব্রত'। মাঘী পূর্ণিমার দিন এই উৎসব লোক সংস্কৃতির অন্যতম প্রকাশ কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

রানীগঞ্জ (২৮৯)ঃ

রানীগঞ্জ বা রানীর গড়ের প্রাইমারী স্কুলের ভিত্তি যে কোনও প্রাচীন ভবনের ভিত্তিমূল ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এখানে দুটি বেলে পাথরের স্তম্ভ আছে। আছে প্রাচীরের অংশ। এখানে টাঙন নদীর ধারে তিনটি সুবৃহৎ ইটের ভগ্ন স্তম্ভদেহ দেখা যায়, অন্যটি ধ্বংসপ্রায়। ওপারের গ্রাম ঈশ্বরগঞ্জ নদীর তীবভূমি থেকে নদীগর্ভে অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ভগ্ন প্রস্তরের স্তূপ অনুমান করতে সাহায্য করে এই অঞ্চল এক সময় বর্ধিষ্ণু এবং প্রত্নসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ সবসীকুমার সবস্বতী এই অঞ্চলে পরিভ্রমণকালে একটি অষ্টভূজা দূর্গামূর্তি এবং বহুবিধ প্রত্নবস্তু দেখেছিলেন।

এই গ্রামে প্রচলিত আছে প্রাচীন কার্তিকী কালিপূজা ও এই উপলক্ষে উৎসব।

অন্যান্য মৌজা (জে. এল. নাম্বার অনুসারে) ঃ

(১) মল্লিকপুর, (২) ইন্দসাইল, (৩) কদমতলী, (৪) খোদ মালঞ্চ, (৫) গাজিপুর, (৬) আলাল, (৭) পাহাড়ী ভিটা, (৮) কিচ্মত সুলতানপুর, (৯) মোবারকপুর, (১০) রাজারামচক্, (১১) মহাকাল বোনা, (১২) মুরিয়া কুন্দা, (১৩) কগাসুরা, (১৪) বিলদাহাদর, (১৫) রসিকপুর, (১৬) বিলহটিয়া, (১৭) আকালপুর, (১৮) শেখপুরা, (১৯) সাহারুল (সাহারুল), (২০) জিগীন, (২১) অরাজি দেহারুল, (২২) জিবজালসর, (২৩) রায়খান দিঘী, (২৪) বাহির গচ্ছি, (২৫) কৈলাবাদ, (২৬) আলি নগর, (২৭) পশ্চিম বিনোদপুর, (২৮) কাজিহাটা, (২৯) চান্দ্রাইল, (৩০) বাঘিপুর, (৩১) বাযবাগ (৩২) কুতুব সহর (৩৩) পান্ডুয়া (নান্ডুয়া) (৩৪) মিসিপুর, (৩৫) খোদ বাবুপুর, (৩৬) খরনুনা, (৩৭) বসুধা, (৩৮) হাতিমারী, (৩৯) আদিনা, (৪০) জোত যদু, (৪১) ঘাগগুল, (৪২) টাকিপ্র, (৪৩) বারিজপুর, (৪৪) পূর্ব্ব বিনোদপুর, (৪৫) কুতুবপুর, (৪৬) মজলিশ - বাগ, (৪৭) কনাট, (৪৮) হোমাদীঘি, (৪৯) পরাহার, (৫০) ছুটী কন্দর, (৫১) দক্ষিণ নাওগ্রাম, (৫২) ছায়ঘাটি, (৫৩) তাঁতি বাড়ী, (৫৪) পাইল, (৫৫) মালিগাড়া, (৫৬) বোলবাড়ী, (৫৭) ভবানীকোঁটা, (৫৮) চাঁদপুর, (৫৯) কমলপুর, (৬০) খড়িবাড়ী, (৬১) আলমাগপুর, (৬২) রায়পুর, (৬৩) চলন্দর, (৬৪) মহিনগর, (৬৫) পবাইল, (৬৬) বাগদীঘি, (৬৭) একান্দাব, (৬৮) মাঝরা, (৬৯) বামনগ্রাম, (৭০) জোতমণি, (৭১) বড়তলা, (৭২) শীল নগর, (৭৩) খুব দাহিল, (৭৪) দলিলপুর, (৭৫) পশ্চিম সুন্দরপুর, (৭৬) জামডাঙ্গা, (৭৭) দুর্গাপুর, (৭৮) উত্তর রহিমপুর, (৭৯) বুঝরুক বন্দাইল, (৮০) সৈয়দপুর, (৮১) পশ্চিম কসবা, (৮২) বনধাইল, (৮৩) গাজোল, (৮৪) রাঙ্গাভিটা, (৮৫) গরাইল, (৮৬) বাজে গরাইল, (৮৭) শালবানা, (৮৮) হাটফতেরাজ, (৮৯) ঘনশহর, (৯০) বাঘসরাই, (৯১) রাণীপুব, (৯২) কোটাল হাটি, (৯৩) কৃষ্ণভোগ, (৯৪) ফতেপুর, (৯৫) মীরাদপুর, (৯৬) রাইল, (৯৭) মালঞ্চ, (৯৮) বালুক কোকা, (৯৯) শ্যামপুর, (১০০) মাতাইল, (১০১) পাঁচপাড়া, (১০২) ছিলিমপুব (১০৩) ছোট কন্দর, (১০৫) আকন্দ, (১০৬) সরকন্দর, (১০৭) হরিদাস, (১০৮) বোম্কা, (১০৯) শ্যামনগর, (১১০) বানাআইল, (১১১) মুসাধাপ, (১১২) অরাজি মিশ্রবাড়ী, (১১৩) দক্ষিণ মালডাঙ্গা, (১১৪) মোল্লাদিঘী, (১১৫) করকচ্ (১১৬) নিজগ্রাম, (১১৭) বদেময়না, (১১৮) রঘুনাথপুর, (১১৯) ময়না, (১২০) অনন্তরামপুব, (১২১) দিলালবাটী, (১২২) উপদেল, (১২৩) আমশোল, (১২৪) আতগেন, (১২৫) উত্তর মালডাঙ্গ, (১২৬) উত্তর মহীনগর, (১২৭) বাচ্চাহার, (১২৮) সোনাডাঙ্গা, (১২৯) হুসেনপুর, (১৩০) দোয়াস, (১৩১) চাক্দহ, (১৩২) গোহালপুরী, (১৩৩) বুনুর দিঘী, (১৩৪) বাজে দোয়াস, (১৩৫) খালাম্বা, (১৩৬) কাটনা, (১৩৭) কালিহর, (১৩৮) কেথরানি, (১৩৯) বাজেমলানীপুর, (১৪০) মলানীপুর, (১৪১) শ্রীনতিপুর, (১৪২) জগদীশপুর, (১৪৩) তাহেবখানি, (১৪৪) অর্জুনপুর, (১৪৫) আমাইতর, (১৪৬) গোবিন্দপুর, (১৪৭) কন্দর, (১৪৮) ছোহার, (১৪৪৯) উত্তর নাওগ্রাম, (১৫০) তেলিহার, (১৫১) দিগ্রা, (১৫২) নলপুব, (১৫৩) দহিল, (১৫৪) ডাঙ্গাপাড়া, (১৫৫) পীরপাড়া, (১৫৬) মাইল, (১৫৭) মদ্নাহাব, (১৫৮) বাজেসহীল, (১৫৯) চক্ মুসাডাঙ্গা, (১৬০) মুখাডাঙ্গা, (১৬১) কাইল, (১৬২) সহিল, (১৬৩) নন্দলাঙ্গপুর, (১৬৪) মহানগর, (১৬৫) চক্সুন্দর (১৬৬) লক্ষ্মীপুর, (১৬৭) মানিকর, (১৬৮) রাতুল, (১৬৯) শেখপাড়া, (১৭০) আটঘরা, (১৭১) গুরন্দর,

(১৭২) দেওতলা, (১৭৩) ধাওয়াইল, (১৭৪) বীজলবাড়ি, (১৭৫) খোদ দেওতলা, (১৭৬) শক্রোল, (১৭৭) বাবুপুর, (১৭৮) কস্তুর, (১৭৯) জলঙ্গাপাড়া, (১৮০) তিরপুর, (১৮১) তিরপুর, (১৮২) হিমসিম্, (১৮৩) মাছিমপুর, (১৮৪) গোহাইলবাড়ী, (১৮৫) জামালপুর, (১৮৬) উত্তর মালিপাড়া, (১৮৭) রাঙ্গামাটি, (১৮৮) সানবান্ধা, (১৮৯) জাজিলপাড়া, (১৯০) চক্ নগর, (১৯১) পূর্ব্ব সুন্দরপুর, (১৯২) বৈরাডাঙ্গি, (১৯৩) দুবা খোকসান, (১৯৪) বিল কাঞ্চন, (১৯৫) গঙ্গারামপুর, (১৯৬) মুদাসৎ হবিনগর, (১৯৭) ইমামনগর, (১৯৮) হবিনগর, (১৯৯) জোতভৈরব, (২০০) বাহার, (২০১) কোইল, (২০২) বাজে হবিনগর, (২০৩) বাজে ঝাড়সাবিল, (২০৫) রাজনগর, (২০৬) সাধাইল, (২০৭) সিলিকপুর, (২০৮) বড়ডাঙ্গা, (২০৯) উৎসব, (২১০) দহরা, (২১১) চাঁদপুর, (২১২) জসোইল, (২১৩) সিঙ্গাইল, (২১৪) সালাই-ডাঙ্গা, (২১৫) গোরাদা, (২১৬) বাঁশথোলি, (২১৭) মাধবপাড়া, (২১৮) পূর্ব কসবা, (২১৯) সিংহপাড়া, (২২০) রাধানগর, (২২১) পূর্ব অনন্তপুর, (২২২) সবাইল, (২২৩) বাগডোল, (২২৪) বড়তলা, (২২৫) জীবনপুর, (২২৬) পশ্চিম অনন্তপুর, (২২৭) রাইহোপাড়া, (২২৮) ভক্তিপুর, (২২৯) গণেশবাটী, (২৩০) ভাদর, (২৩১) নোয়াপাড়া, (২৩২) গোয়াল নগর, (২৩৩) বাদনগর, (২৩৪) শাহাজাদ্পুর, (২৩৫) বলরামপুর, (২৩৬) জোতঘাসি, (২২৭) কতেলাপুর, (২৩৮) গোপালপুর, (২৩৯) দক্ষিণ কসবা, (২৪০) মুরাদপুর, (২৪১) রহিমপুর, (২৪২) আমালডাঙ্গা, (২৪৩) অগমপুর, (২৪৪) সংখাইর, (২৪৫) পলাশডাঙ্গা, (২৪৬) বাহাদুরুর, (২৪৭) বোহারগাঁও, (২৪৮) বাননীপুর, (২৪৯) চন্ডীপুর, (২৫০) হরিরামপুর, (২৫১) দইবাক বাটী, (২৫২) ঝিনাইকুরি, (২৫৩) পূর্ব্ব রাণীপুর, (২৫৪) মহেশপুর, (২৫৫) সোনাপুর, (২৫৬) হরিপুর, (২৫৭) ইদাম, (২৫৮) আইল, (২৫৯) রিসিংডাঙ্গা, (২৬০) পলা-ডাঙ্গা (২৬১) মহীশাল, (২৬২) শালুকা, (২৬৩) হাতনগর, (২৬৪) আতিলী, (২৬৫) দোহাইল, (২৬৬) করজাডাঙ্গা, (২৬৭) আলতোর। (২৬৮) কৃষ্ণপুর, (২৬৯) জালসা, (২৭০) দোগাছি, (২৭১) বহুযার, (২৭২) বানিয়াকন্দর, (২৭৩) পুরিয়া, (২৭৪) করঞ্জা, (২৭৫) খন্তা, (২৭৬) বাজেকরঞ্জা, (২৭৭) বনকাটি, (২৭৮) চেংতোর, (২৭৯) হাতিন্ডা, (২৮০) বাঁশবাড়ী, (২৮১) তাহেরপুর, (২৮২) বাটীঝোরা, (২৮৩) সর্দ্দারপুর, (২৮৪) দারাপুর, (২৮৫) বড়বাড়ী, (২৮৬) যদুপুর, (২৮৭) দোঘরিয়া, (২৮৮) আধনা, (২৮৯) রাণীগঞ্জ, (২৯০) পশ্চিম বিল্লাহোরা, (২৯১) অরাজি জলসা (২৯২) পূর্ব মল্লিকপুর, (২৯৩ পূর্ব বিল্লাহোরা।

হবিবপুর ঃ

মালদহ জেলার এগারটি থানার অন্যতম হবিবপুর থানা। প্রাচীন রক্তাভ পলিমাটি ও নদীখাত দিয়ে গঠিত এই অঞ্চল ছিল বরেন্দ্রভূমির সমৃদ্ধ অঞ্চল। বর্তমানে মালদহ জেলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে থানাটি ভারত - বাংলাদেশের সীমান্ত। থানা হিসাবে হবিবপুর আলাদা মর্যাদা পায় ১৯২১ সাল নাগাদ। একটিমাত্র ব্লকে গঠিত এই থানার আয়তন ৩৯৭,১০ বর্গকি.মি. এবং এবং অন্তর্ভুক্ত মৌজার সংখ্যা ২৯১। থানার তিনদিকে রয়েছে মহানন্দা, পুর্ণভবা ও টাঙন নদী।

থানাটির নামকরণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে প্রাচীন নামটি

'হরহরিপুর' হতে পারে বলে অনুমান। অনুমানের ভিত্তিতেই বলা যায় প্রাচীনকালে এই স্থানটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল। উঁচু শক্ত জমি এবং একাধিক নদীর অস্তিত্ব একটি সমৃদ্ধশালী নগর তৈরীর সহায়ক। শুধু তাই নয় জগজ্জীবন পুরে খনন কার্যের ফলে বৌদ্ধ মহাবিহার প্রমান করে এই স্থানে একসময় বৌদ্ধদের বিচরণভূমি ছিল। বৌদ্ধ শ্রমনদের জীবিকা নির্ভরশীল সাধারণ লোকেব আর্থিক সচ্ছলতার উপর। তাছাড়া পালরাজারা বৌদ্ধদের জন্য এই স্থানটি নিষ্কর দান করেও থাকতে পারেন। এছাড়া একাধিক চন্ডী নামের স্থান নাম পরবর্ত্তী' সম্রাট লক্ষ্মণসেনের চন্ডী প্রীতিকেই মনে করিয়ে দেয়। অনুমান মধ্যযুগে এসে হবিব নামধারী কোনও জায়গীরদার অথবা জমিদারের প্রভাবে নামটি 'হবিবপুর' হয়ে থাকতে পারে।

এই থানার মোট জনসংখ্যার ৪৬.৬৮ শতাংশ অধিবাসী তপশিলী জাতি এবং ৩১.৩৫ শতাংশ তপশিলী উপজাতি। তপশিলীদের মধ্যে আছে রাজবংশী এবং পলিয়ারা। অন্যান্য প্রধান উপজাতিদের মধ্যে মুন্ডা, ওঁরাও, কোড়া, মাহাতো, মহালি, মুরারি, ভুঁইহার, তুরী, ছত্রী, কানু , কালোয়ার, খালাহা, ভড়, দোসাদ ও বারুই।

এখানকার লোক উৎসব সম্পর্কে কিছু না বললে 'হবিবপুর' সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা থেকে যাবে। মালদহের যে লোক উৎসব তথা লোক সংস্কৃতি মালদার বাইরেও এই জেলাকে সুপরিচিত করিয়েছে তা হল 'গম্ভীরা'। আর এই 'গম্ভীরা'-র প্রধান এবং বড় পূজাই হয় এই হবিবপুর অঞ্চলে। হবিবপুর থানার বিভিন্ন গ্রামে বিশেষ করে রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ করে এই উৎসব হয়। আমরা জানি গম্ভীরা মূলত কৃষি উৎসবেরই বিবর্তিত রূপ। আর রাজবংশী তথা চাঁই মন্ডল সম্প্রদায় এই কৃষিকাজেই বিশেষ দক্ষ। তাছাড়া অপসৃয়মান বৌদ্ধধর্মও যে একসময় এই সব হিন্দু লোক আচারের মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল এ সত্যও প্রমানিত। এখানে গম্ভীরায় শিব, কালী, ক্ষেত্র, খ্যাতরানি, শীতলা, বসন্ত, বুড়ি, মশানকালী ছাড়াও বিশেষভাবে পূজা পান 'বাসরানি' নামে এক দেবী। এর কোন প্রচলিত মূর্তি নেই। শুধু প্রতি বছর ৩রা বৈশাখ গম্ভীরার 'কিসি' পূজার দিন একজন ভক্ত 'বাসরানি' মুখা পড়ে দেবীরূপে পূজিতা হন। তাঁর একহাতে মাটির পাত্র যা মহাচীনতারা নীলতারার নর করোটির প্রতীক। মুখোশটির বর্ণ নীল, তাতে নীলতারার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলিও রয়েছে, যেমন গোলাকার ও লাল ত্রিনয়ন জিভ বার করা ভীষণ মুখ, শ্বদন্তের উপস্থিতি এবং অগ্নিশিখাকৃতি পিঙ্গল উর্দ্ধ কেশ। উৎসবের শুরুতে ইনি ভক্তের উপর ভর করেন তারপর পুরোহিত ফুল এবং পায়রা বলির রক্ত দিয়ে দেবীকে শান্ত করেন। এই আচার অনুষ্ঠান থেকেই বোঝা যায় দেবী আসলে বজ্রযানী নীলতারা, বাসরানী নামটি তাই এইভাবে এসেছে বলে মনে হয় ঃ — বাগীশ্বরী - বহিসরী - বাসরী - বাসরানী - বাসলী, অবশ্য বাসলীতে পরিণত হওয়ার আগেই বাসরানীদেবী রূপে হবিবপুরে তিনি স্বীকৃত।

খোচাকান্দর (১৯), জৈকন্দর)১০৫), পাথরকান্দি (১০৪), দীঘলকান্দি (১১৭), গাজিয়াকান্দর (১৪৪), সুখনীকান্দর (১৬৪) ঃ

ভূমিখণ্ডের শাখা অর্থে 'কান্দর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এটি একটি লোক শব্দ, যার একাধিক অর্থের মধ্যে আছে — ফাঁকা মাঠ, অনাবাদী জমি, জনবিরল স্থান, উঁচু-নীচু ভূমিখণ্ড। রক্তাভ শক্ত উঁচু-নীচু ঢেউ খেলানো জমি এই থানা অঞ্চলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অপেক্ষাকৃত উঁচু-নীচু

চাষবাস বা বসবাসের অনুপযুক্ত স্থানগুলিরই 'কান্দর' নামাঙ্কিত হয়ে গেছে।

পাথর দীঘালি (২), পাথর ছাপরি (৩), পাথর খয়রান (৪), পাথর মনডালা (৫), পাথর বাগুলী (৭), পাথর ফুলবনা (১০), পাথর ধরদেন্দা (৫৫), পাথর যোগী (৫৬), পাথর ইসলামপুর (৫৮), পাথব দোজাত)৬৫), পাথব শিববাম (৬৮), পাথর হরিশ্চন্দ্রপুর (৬৯), পাথর নন্দাগড় (৭১), পাথর শাওলী (৭২), পাথর কান্দি ৯১১৪), পাথর জিজাবাদ (১২২), পাথর চাপড় (১২৫), পাথর লিলিসন (১৩৫), পাথব কাশিনাথপুর (১৩৭), পাথর পারলিয়া (১৩৮) ঃ

হবিবপুর থানা বর্তমানে যে ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত নদীপথ তার থেকে বেশ খানিকটা দূরে। এই পরোক্ষ প্রমানের প্রধান অবলম্বন উপবোক্ত মৌজা নামগুলি। একাধিক পাথার (জল) অন্ত্যস্থান নাম ছাড়াও বয়েছে 'ডাঙ্গা' (পাথব শিশুডাঙ্গা (৮), তুলসীডাঙ্গা (৭৭) পলাশডাঙ্গা (৭৮), উত্তর খরিবাডাঙ্গা), পুকুর অন্ত (জাম্বিব পুকুর (৪০) একাধিক স্থান নাম।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মৌজা ঃ

রাহুতাড়া (২৭), খড়িবাড়ী ৩২) ঃ

ঐতিহাসিক তেমন কোন গুরুত্ব নেই। এখানে একটি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের গির্জা আছে। আদিবাসী অধ্যুযিত এলাকায় অনেকেই খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত।

জগজ্জীবনপুর (৭৩) ঃ

পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলাব হবিবপুর থানার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জগজ্জীবনপুর গ্রামটি অবস্থিত। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকারের তত্ত্বাবধানে উৎখনন কার্য পরিচালিত হওযায় ঐ গ্রামটি প্রত্নতাত্ত্বিক মানচিত্রে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

জগজ্জীবনপুর মৌজায এ পর্যন্ত পাঁচটি প্রত্নস্থানকে নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা গেছে। সেগুলি হল (১) তুলাভিটা, (২) আখবীডাঙ্গা, (৩) নিমডাঙ্গা, (৪) রাজার মায়ের ঢিবি বা মাহিভিটা, (৫) নন্দগড়।

১৯৮৭ সালের ১৩ই মার্চ স্থানীয যুবক শ্রীজগদীশ পাইন তুলাভিটার উত্তর-পূর্ব দিকে মাটি খুঁড়তে গিয়ে আকস্মিকভাবে নিজের অজান্তে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ তাম্রশাসন আবিষ্কার করে ফেলেন, যা ইতিহাসে এক অধ্যায় সংযোজিত করেছে। তাম্রশাসন ছাড়াও তুলাভিটা থেকে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের একটি ছোট বুদ্ধমূর্তি এখন মালদা জেলা সংগ্রহশালার অমূল্য সম্পদ। এছাড়া পোড়ামাটির প্লেটে বিভিন্ন দেবদেবীব মূর্তি, মোটিভ ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে।

তাম্রশাসনটির দীর্ঘ বিবরণীর মধ্যে মূল বিষয়বস্তু হল যে পালবংশীয় নৃপতি মহেন্দ্রপাল দেব কর্তৃকতাঁর সেনাপতি ব্রজদেবের অনুবোধে বৌদ্ধ দেব-দেবীদের পূজা ও ভিক্ষুদের উপাসনার নিমিত্ত 'নন্দদীর্ঘীক-উদঙ্গ মহাবিহাব'এব জমি প্রদান।

এই তাম্রশাসনটিব গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ পালবংশের রাজা মহেন্দ্রপাল দেবের নাম এই প্রথম পাওয়া গেল যা ইতিপূর্বে অজানা ছিল। তুলাভিটার বৌদ্ধ বিহার নন্দদীর্ঘী বর্তমান বিহার রাজ্যের অন্তর্গত উৎখনিত বিক্রমশীলা (আন্তিচক) মহাবিহারের সঙ্গে তুলনীয়।

বুলবুলচণ্ডী (২১২)ঃ

আদিবাসী অধ্যুষিত বরিন্দ অঞ্চল স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত ছিল গভীর জঙ্গলে ঢাকা। এই অরণ্যে প্রচুর পরিমাণে বুলবুলি পাখি পাওয়া যেত। এই বুলবুলির লড়াই ছিল আগে সাধারণ মানুষের আমোদের উপকরণ। পরে স্থানীয় জমিদারেরা এই সব পাখি সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে নিজেরাই বুলবুলির লড়াই এর বন্দোবস্ত করেছিলেন। এই পাখিগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আশপাশের জমিদারদের কাছে এমনকি কলকাতাতেও এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাখিদের চাহিদা ছিল প্রচুর। সেইজন্য এই অঞ্চলটি 'বুলবুলি' নামেই অনেকদিন পরিচিত হতো।

এই স্থানটি ছিল বর্তমান টাঙন নদী ও তার পুরনো খাতের ধারে।এই খাতগুলি এখন মোহনপুর ইনলিশ (দ্বীপ বা চর), সোনাডাঙ্গা, কচুপুকর, তালপুকুর, তেলিপুকুর ও পাঁচ পুকুরিযা মৌজার স্থলভূমিতে রূপান্তরিত। এই সব প্রাচীন পুরনো খাতের আশেপাশেই একটি পুকুর খননকালে মা ও শিশুর অনবদ্য ভাস্কর্য পাওয়া যায়। এখানকার মানুষ এই মূর্তিটিকে চণ্ডীমাতার মূর্তি বলেই বিশ্বাস করে। এইভাবেই স্থানটির বর্তমান নাম বুলবুলচণ্ডী।

শ্রীকৃষ্ণপুর (২৫৪)ঃ

তাজ খাঁ করর়ানীর মৃত্যুর পর সোলমান কররানী গৌড়ের মসনদে বসেন; কিন্তু গৌড়ের তৎকালীন পরিস্থিতি এবং আবহাওযা তাঁব পছন্দ না হওয়ায় গৌড় দুর্গের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গা নদীর প্রাচীন খাতের অপর পারে টাঁড়ায় নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন। এই অঞ্চলের বসবাসকারী মধ্যবিত্ত হিন্দুরা সংস্কারবশেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক এখান থেকে স্থানান্তরিত হলেন। তা়রা হবিবপুর অঞ্চলের এই স্থানে নতুন বসতি স্থাপন করে নাম রাখলেন শ্রীকৃষ্ণপুর।

বাণপুর (২৭২)ঃ

পুনর্ভবা খাতের ধারে বাণপুর নামটির সঙ্গে শিবভক্ত বাণরাজার নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। দিনাজপুর-মালদহর সীমান্ত এলাকায় বাণ রাজার রাজত্ব ছিল বলে অনুমান করা হয় (ঐতিহাসিক বাণগড় বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর, গঙ্গারামপুর এলাকায় অবস্থিত)। গম্ভীরা পূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠানে 'বাণফোড়া' ও বিভিন্ন রকম কৃচ্ছ্র সাধনের মাধ্যমে পূজা পদ্ধতির পিছনে আছে শিবভক্ত এই বাণ রাজার স্মৃতি। হরিবংশ পুরাণে আছে, —

বাণ নাচে রক্ত গায়ে বাহুহীন হৈয়া।
শিব তুষ্ট হইলেক সাঙ্গপাঙ্গ লৈয়া।।
শিবের দুরন্ত ভক্ত বাণ মহারাজ।
কালভৈরব হৈয়া মিলি গেল আজ।।
শঙ্কর সঙ্গেতে সাথী কৈলাসেতে ধাম।
তাহার চরণে করি দ্বাদশ প্রণাম।।

বর্তমানে স্থানীয় অধিবাসীরা বিশ্বাস করেন এই স্থানে বসবাসকারী একটি সম্প্রদায়ের মানুষ 'বাণ' মারার মন্ত্রগুণ ক্ষমতা সম্পন্ন। সেই জন্য স্থানটি বাণপুর বলে পরিচিত হতে পারে।

অন্যান্য মৌজা (জে. এল. নাম্বার অনুসারে) ঃ

(১) দোলাছোলা, (২) পাথর দীঘালি, (৩) পাথর ছাপরি, (৪) পাথর খয়রান, (৫) পাথর মনডালা, (৬) দোলঘারী - দিঘালী, (৭) পাথর বাঁশুলী, (৮) পথের শিশুডাঙ্গা, (৯) সীম্‌ডাঙ্গা, (১০) পাথর ফুলবনা, (১১) নাকাইল, (১২) সুন্দরবন, (১৩) মঙ্গলপুরা, (১৪) নিন্দল, (১৫) পাশুলি, (১৬) সর্বাদিকপুর, (১৭) রাজদোল, (১৮) রাঙ্গামাটি, (১৯) খোচাকন্দর, (২০) কালনা, (২১) জামালপুর, (২২), হোগ্‌লা, (২৩) চম্পাদিঘী, (২৪) জটারপুর, (২৫) করঞ্জা, (২৬) হাজিপুর, (২৭) রাহুতারা, (২৮) রাজারামপুর, (২৯) ছাত্‌রা, (৩০) খুজিপুর, (৩১) লালপুর বোদরা, (৩২) খরিবাড়ী, (৩৩) আইহোডাঙ্গা, (৩৪) কিয়ল, (৩৫) বৈদ্যপুর, (৩৬) ছরাইগোলা, (৩৭) পারলিয়া, (৩৮) কেন্দুডাঙ্গা, (৩৯) কত্‌রা নাওপাড়া, (৪০) জামির পুকুর, (৪১) নরসিংহ বাটী, (৪২) পেরাপুর, (৪৩) টপ্‌সাহার, (৪৪) বিনোদপুর, (৪৫) কালমেঘা, (৪৬) জাহানাবাদ, (৪৭) নিম্‌নাইল, (৪৮) পীরগাছি, (৪৯) হায়াতপুর, (৫০) বিজাইল, (৫১) পান্নাপুর, (৫২) চাক্‌লি, (৫৩) বিলপানি ভেন্দা, (৫৪) দল্লা, (৫৫) পাথর ধরদেন্দা, (৫৬) পাথর যোগী, (৫৭) প্রগাছি, (৫৮) পাথর ইসলামপুর, (৫৯) আঙ্গরপোতা, (৬০) তেলনাই, (৬১) পূর্ব্ব বাসুদেবপুর, (৬২) কদরি পাড়া, (৬৩) শীতল কুর্মি, (৬৪) পোয়ালি, (৬৫) পাথর দোজাত, (৬৬) বালি সীমলা, (৬৭) সসিন্দা, (৬৮) পাথর শিবরাম, (৬৯) পাথর হরিশ্চন্দ্রপুর, (৭০) কুছিয়া মোড়, (৭১) পাথর নন্দগড়, (৭২) পাথর শাশুলী, (৭৩) জগজীবনপুর, (৭৪) ধরেন্দা, (৭৫) বনকাইল, বিষ্ণুপুর, (৭৬) বনকাইল, (৭৭) তুলসীডাঙ্গা, (৭৮) পলাশডাঙ্গা, (৭৯) বাহাদুরপুর, (৮০) কিস্‌মত নানগবহরা, (৮১) নান্‌গবহরা, (৮২) বসন্তপুর, (৮৩) হরিশ্চন্দ্রপুর, (৮৪) আগ্রা, (৮৫) ভবানীপুর, (৮৬) ভৈরবপুর, (৮৭) বিষ্ণুপুর, (৮৮) উত্তর বৃন্দাবনবাটী, (৮৯) ভাবুক, (৯০) জয়পুর, (৯১) কিস্‌মত দাউদপুর, (৯২) দাউদপুর, (৯৩) মানীকাড়া, (৯৪) জয়পুর, (৯৫) লেনেসা, (৯৬) চক্‌সুকুর, (৯৭) নিমবাড়ী, (৯৮) ভজাইল, (৯৯) ওয়ালিশনতার, (১০০) গোপালপুর, (১০১) কাথাল রানপুর, (১০২) হরিপুর, (১০৩) রামপুর, (১০৪) ধনঞ্জয়া, (১০৫) জৈকন্দর, (১০৬) হরিনাথপুর, (১০৭) জয়দেবপুর, (১০৮) কোটালপুর, (১০৯) মাদাসিডাঙ্গা, (১১০) কাইচনা, (১১১) নয়নদোর, (১১২) ভাপিলা, (১১৩) ভোলাবাওনা, (১১৪) পাথর কান্দি, (১১৫) নুনচোরা, (১১৬) কাঞ্চনা, (১১৭) দীঘলকান্দি, (১১৮) সূচল মহম্মদপুর, (১১৯) আদমপুর, (১২০) আলিয়াপুর, (১২১) দাবুর, (১২২) পাথর মির্জাবাদ, (১২৩) সুন্দরপুর, (১২৪) মীরজাবাদ, (১২৫) পাথর চাপড়, (১২৬) জোত কবির, (১২৭) চাপর ডাঙ্গা, (১২৮) চন্ডীহার, (১২৯) বদে চন্ডীহার, (১৩০) কয়রা, (১৩১) খানপুর, (১৩২) পট্টার সুবর্ণী, (১৩৩) জেতবলরাম, (১৩৪) সিংগাবাদ, (১৩৫) পাথর - তিলাসন, (১৩৬) জোত - জিতান, (১৩৭) পাথর কাশিনাথপুর, (১৩৮) পাথর পারলিয়া, (১৩৯) পারলিয়া বুজরুক, (১৪০) রাম পুকুরিয়া, (১৪১) নিকাইল, (১৪২) চাঁদপুর, (১৪৩) বুজরুক - খানপুর, (১৪৪) গাজিয়া কন্দব, (১৪৫) উত্তর খরিকাডাঙ্গা, (১৪৬) কাদিপুর, (১৪৭) নিয়ামতপুর, (১৪৮) গন্ধবর্ষপুর, (১৪৯) আহারাইল, (১৫০) কাশি পাহারা, (১৫১) ছিলিমপুর, (১৫২) বরাইল, (১৫৩) পশ্চিম বাসুদেবপুর, (১৫৪) জোত - আলম, (১৫৫) কান্তরকা, (১৫৬) ছুচাইল, (১৫৭) হরাইল, (১৫৮) মুরারীপুর, (১৫৯) গোবিন্দপুর, (১৬০) মীরজাপুর,

(১৬১) মন দীঘি, (১৬২) রাখরপুর গুজিয়া, (১৬৩) সিংরা, (১৬৪) সুখনীকন্দর, (১৬৫) লক্ষীপুর।

মানিকচক থানা ঃ

দিয়ারা অঞ্চলের আরও একটি থানা মানিকচক। গঙ্গার নতুন পলি ও মাটিতে সমৃদ্ধ এ এলাকা মুখ্যতঃ রবিশস্যের উৎপাদনের অন্যতম জায়গা। এখানকার প্রধান উৎপন্ন শস্য হল— মটর, মুসরী, কলাই, খেসারি, মুগ (সোনা মুগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য) অড়হর, ভুট্টা, মাড়া, শ্যামা, কোদা, ছোলা, সরষে, চিনা এবং আখ। তুঁত এবং লাক্ষা চাষও হয়।

এই এলাকার মুখ্য অধিবাসীদের মধ্যে আছে বাদিয়া, মৈথিল, খোট্টা, নাগর, ধানুক, চাই,। এদের মধ্যে বাদিয়া সম্প্রদায় যারা শির্শা বাদিয়া বলে পরিচিত, তাদের নিজেদের ব্যবহারিক এবং সংস্কৃতিগত আচরণে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র রয়েছে। তারা মুসলীম সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও পরিচয়ে মুসলীম বলে স্বীকার করে না।

এই অঞ্চলটির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য হল; এই অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষদের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব। এখানে শিব, দেবী বিশালাক্ষী, হরিহরনাথ জীউর, লক্ষ্মী ইত্যাদি হিন্দু দেবদেবী যেমন আছে তেমনি মুসলমানদের মহবম, উরষ অথবা দরগাহর উৎসব উপলক্ষে জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষ অংশগ্রহণ করেন এবং আনন্দলাভ করেন। এই অঞ্চলটি নীলাভ এবং নতুন পলিযুক্ত মাটি, তাই কোন নব পত্তনিদার চকদার এর নামে এই অঞ্চলটি নামাঙ্কিত হয়েছে এই রকম মনে করা যেতে পারে।

এই থানাতে দুটি মৌজা আছে মানিকচক নামাঙ্কিত মানিকচক (৭৪), মানিকচক ঘাট (৮৪)। এখানে মীরপুব, কৃষ্ণনগর গ্রামের কোজাগবী লক্ষ্মীপূজা ও উৎসব, নুরপুব গ্রামের বৈশাখী (৫ ও ৬ তাবিখ) কালী পূজা ও মেলা হয়।

হরচন্দ্রপুর (৬), সুকাসনা (৮), হীরানন্দপুর (১২) ঃ

গঙ্গার মোহনায় জেগে ওঠা একটি ভূখন্ড যা ভূতনীর চর নামে বিখ্যাত। মালদহ জেলার মানিকচক থানার অন্তর্গত হরচন্দ্রপুব, সুকাসানা ও হীরানন্দপুর এই তিনটি মৌজা নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই ভূতনী দিয়াবার পশ্চিম দিকে গঙ্গা, উত্তরে কোশী নদী, পূর্বে ফুলহার নদী (এই ফুলাহার মহানন্দা নদীব একটি শাখা, যা মূল মহানন্দার প্রায় ৭০ ভাগ জল বহন করে)। ৬০ বর্গ কি.মি. দীর্ঘ চরটিতে বসবাস করেন প্রায় লক্ষাধিক মানুষ। প্রতিবছর উত্তর হিমালয়ের প্রচুর বৃষ্টিপাতে পরিপুষ্ট নদী গুলির জলস্ফীতিতে এই চব জলমগ্ন হয়ে পড়ার ফলে ১৯৭৪ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবু বরকত আতাউর গণি খানের তত্ত্বাবধানে ২৯ কি.মি. দীর্ঘ একটি চক্রবাঁধ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দুটি বড় বড় সুইস গেট আছে। যার নাম যথাক্রমে লাঠিপেটা এবং বোরোবাঁধা। ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরী হওয়ার পরেই এই চক্রবাঁধ তৈরী হয়েছিল।

গঙ্গা পলি বিধৌত এই চরটির মাটি অত্যন্ত উর্বর। স্বভাবতই এখানকার জমিতে প্রচুর ফসল ফলে। ধান,গম, বিশেষ করে মুগ, কলাই, সরিষা এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এছাড়া

নানাবিধ সব্জীরও চাষ হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ যেমন, চাঁই, রাজবংশী, কিষাণ এবং আরও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা বসবাস করেন। এখন এখানে প্রাইমারি, হাইস্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি সবরকম সুবিধা আছে। আছে মানিকচক ব্লকের অধীনে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত হীরানন্দপুর, দক্ষিণ চন্ডীপুর, উত্তর চন্ডীপুর। এই ভূতনীর চরে পৌছানোর একমাত্র রাস্তা মথুরাপুর থেকে শঙ্করীটোলা ঘাট দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে।

গঙ্গা নদীর মোহনার মুখে ফরাক্কা ব্যারেজ এ প্রভাবিত ভূতনীর চর এবং ভূতনীর চরকে রক্ষা করার জন্য দেওয়া চক্রবাঁধ থেকে আশু সুফল এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়েছে মালদহ জেলার মানচিত্রে। এব্যাপারে সরকারী পরিসংখ্যানে নজর রাখলে দেখা যাবে যে ১৯৩১ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ১৪,৩৩৫ হেক্টর, ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ২৫৬৬ হেক্টর জমি গঙ্গা গর্ভে বিলীন হয়েছে। শুধু তাই নয় গঙ্গা এদিকে সরে আসার ফলে ওপারে যে চর জাগছে তা আর পশ্চিমবাংলার মানচিত্রের অন্তর্ভূক্ত না হয়ে বিহারের ঝাড়খন্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায়, বিতর্কিত মৌজার সৃষ্টি করে উভয় সরকারকেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে অসুবিধার সৃষ্টি করে চলেছে। এর পরেও ১৯৯৮ সালে মালদহে দেখা দেয় বিধ্বংসী বন্যা এবং এই ২০০৫ সালেও গঙ্গার ভাঙন অব্যাহত থেকে গ্রাস করে নিয়েছে আরও বহু হেক্টর জমি। উদ্ভুত এই বিপর্যয়ের জন্যে বিশেষজ্ঞ ফারাক্কা ব্যারেজকেই দায়ী করলেও ভূতনীর চক্রবাঁধকেও অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করছেন না। কারণ এই চক্রবাঁধের ফলে গঙ্গা তাঁর স্বাভাবিক গতিপথ হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি ভূতনীর চর-এর ৬০ হেক্টর জমি ও গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে যায়। ফলে ১৯৯৯ সালে ৪ নং রিটায়ার্ড বাঁধ তৈরী হয় প্রায় সাড়ে চার কি.মি. জায়গা ঘিরে। কিন্তু গঙ্গা সেই বাঁধের কাছাকাছি এসে পড়লে এখন ৫ নং রিটায়ার্ড বাঁধের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আগে উত্তরের কোশী নদী গঙ্গার অতিরিক্ত জল বহন করে বর্ষার সময় চরের উপর দিয়ে অবাধে প্রবাহিত হোত। কিন্তু চএ-বাঁধের ফলে কোশী নদী প্রায় মৃতপ্রায় হয়ে চরে পরিণত হয়েছে। তাই মালদহ মুর্শিদাবাদের ভাঙন ঠেকাতে চক্রাবাঁধের পূর্বদিকের অংশ কিছুটা পশ্চিম দিকে অপসারিত করলে এবং পূর্বদিকের বাঁধ আরও গভীরভাবে কেটে দিলে গঙ্গা দু-দশক আগের মত ভূতনীর চরের দুদিক দিয়ে প্রবাহিত হবে এবং জলের তীব্রতা হ্রাস পেয়ে মানিকচক, কালিয়াচক এর অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে ভাঙনের মাত্রা হ্রাস পাবে।

মথুরাপুর (২৬) ঃ

এখানে আছে প্রাচীন বাণেশ্বর শিব এবং হরিহরনাথ জীউর-এর মন্দির। এখানে শিবরাত্রিতে মহাশিবরাত্রি উৎসব হয়। তবে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের হরিহরনাথ জীউর-এর প্রভাবেই স্থানটির নাম মথুরাপুর হতে পারে। জর্জ উডনী এখানে একটি ফাক্টরী নির্মাণ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে একটি জমিদারীও কিনেছিলেন। কিছুদিন পরে সেই জমিদারী বেচে দিয়ে তিনি এখান থেকেই ইংলণ্ডে ফিরে যান। এখানকার রসগোল্লা বিখ্যাত।

শেখপুরা (৫৮) ঃ

মুসলীম অধ্যুষিত এই গ্রামের প্রধান উৎসব মহরম।

পূর্ব সৈয়দপুর (৫৬) উত্তর ধরমপুর (৮৩) :

এই দুই গ্রামের প্রান্ত সীমানায় কালিন্দ্রী নদীর তীরে বটগাছের নীচে আছে বুড়িমার থান। এই গরাম দেবী আদতে দেবী বিশালাক্ষী। তিনি লোকায়ত নাম বাসুলী বা বাসুনী নানা নামে অভিহিত হয়ে পূজিতা হন।

মীরাগ্রাম (৬৫), মীরাপাড়া (৭৩) :

এই অঞ্চলটির পূর্ব নাম ছিল চাক্‌লা গ্রাম। এই গ্রামেই ছিলেন অমরনাথ ন্যায়রত্ন। তাঁর সুন্দরী কিশোরী বধূর নাম ছিল অমৃতা। তৎকালীন গৌড়ের সুলতান সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ এই অমৃতাকে তুলে নিজের বাঈজী মহলে নিয়ে এসেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন মীরাবাঈ। নজরানা দিয়েছিলেন এই চাক্‌লা গ্রামের রাজস্ব স্বত্ত্ব। এরপর থেকেই চাক্‌লা গাম পরিবর্তিত হয়ে গেল মীরা তালুকে। এই মীরা তালুক রাজস্ব আদায়ের সুবিধার কারণে পরবর্তীকালে বিভাজিত হয়েছে মীরাগ্রাম, মীরাপাড়া ইত্যাদিতে।

মানিকচক ঘাট (৮৪) :

বড় গঙ্গার স্নানঘাটে মাঘী পূর্ণিমার মেলা বিখ্যাত।

মীরপুর (৮৯) :

গ্রামের নাম মীরপুর হলেও সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় কোজাগরী পূর্ণিমার লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে উৎসব।

অন্যান্য মৌজা (জে. এল. নাম্বার অনুসারে) :

(১) গদাই, (২) কেশরপুর, (৩) উত্তরচন্ডীপুর, (৪) চন্ডীপুর মাল, (৫) পশ্চিম চন্ডীপুর, (৬) হরচন্দ্রপুর, (৭) নেয়াবারার জায়গীর, (৮) সুকাসনা, (৯) দেরগামা, (১০) রামবাড়ী, (১১) শোভানাথপুর, (১২) হীরানন্দপুর, (১৩) মসাহা, (১৫) বাগডুক্‌রা, (১৬) সঘস্তিপুর, (১৭) শোভাপুর (১৮) চন্ডীপুর তফির, (১৯) দক্ষিণ চন্ডীপুর, (২০) দুয়ানি তফির, (২১) পশ্চিম নারায়নপুর, (২২) নারায়নপুর, (২৩) উগ্‌রিটোলা, (২৪) করিয়া সুলতানপুর, (২৫) কমলপুর, (২৬) মথুরাপুর, (২৭) খনসিগান, (২৮) বাহাদুরপুর, (২৯) তালিমনগর, (৩০) চণ্ডীপুর, (৩১) মহব্বতপুর, (৩২) লস্করপুর, (৩৩) হরিপুর, (৩৪) পরমান্দপুর, (৩৫) জিত্‌মানপুর, (৩৬) নাজিরপুর, (৩৭) নিরঞ্জনপুর, (৩৮) অনুপনগর, (৩৯) খরতলা, (৪০) নুরপুর। (৪১) শ্যামলাল পাড়া, (৪২) তিয়ারপাড়া, (৪৩) ব্রাহ্মনগ্রাম, (৪৪) গোবিন্দপুর, (৪৫) যে নি গাঁও, (৪৬) নাজিরপুর সাহেবদি, (৪৭) নন্দো মহেশপুর, (৪৮) বিশ্বম্ভর বিনোদপুর, (৪৯) বড়ভবানীপুর, (৫০) লালবাথানি, (৫১) ছোট ভবানীপুর, (৫২) কংসা বিনোদপুর, (৫৩) কাশিম নগর, (৫৪) ফতেনগর, (৫৫) অরাজি মথুরাপুর, (৫৬) সৈয়দপুর, (৫৭) অনাথপুর, (৫৮) শেখপুরা, (৫৯) চাঁদপুর, (৬০) গীধাপোতন, (৬১) বাকিপুর, (৬২) শ্যামসুন্দরী, (৬৩) নওযাদা, (৬৪) এনায়েতপুর, (৬৫) মীরাগ্রাম, (৬৬) অনন্তপুর, (৬৭) লক্ষ্মীপুর, (৬৮) গঙ্গাপ্রসাদ, (৫৯) বৈষ্ণবপুর, (৭০) মীরাপাড়া, (৭১) ভক্তবল্লবপুর, (৭২) পূর্ব্ব সৈয়দপুর,

(৭৩) ধর্ম্মপুর ভগবানপুর (৭৪) মানিকচক, (৭৫) ইসলামপুর, (৭৬) উত্তর ধরমপুর, (৭৭) সলাব্যগঞ্জ, (৭৮) বিষ্ণু প্রসাদ, (৭৯) চৌকি মীরদাদপুর, (৮০) গৌরিপুর, (৮১) খানপুর, (৮২) জোতভবানী, (৮৩) ধরমপুর, (৮৪) মানিকচক, (৮৫) রাণীগঞ্জ, (৮৬) গোবিন্দপুর, (৮৭) রুস্তমপুর, (৮৮) মীরপুর, (৮৯) রহিমপুর, (৯০) গোপালপুর।

কালিয়াচক থানা ঃ

কালিয়াচক দিয়ারা অর্থাৎ গঙ্গার চর এলাকায় অবস্থিত। নীলাভ এবং অপেক্ষাকৃত নতুন পলিযুক্ত এই মাটি বর্তমান মালদহ জেলার সবচেয়ে সুফলা এবং সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানকার জমি তিন ফসলা। তাছাড়া মালদহের অন্যতম অর্থনৈতিক উৎস 'রেশম চাষের' জন্যও এই অঞ্চল বিখ্যাত। কালিয়াচক অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছে গঙ্গা ছাড়াও আরও একাধিক নদী। মহানন্দার নিম্ন -ধারা ভাগীরথী, এবং পাগলা নদীর ধারা। এ অঞ্চল রবিশস্য উৎপাদনের জন্য সুপরিচিত। রেশম চাষের উপযুক্ত তুঁত এবং লাক্ষা উৎপাদনের উপযুক্ত জমি। বর্তমানে আম ও লিচু উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে সম্ভবনাময় এই অঞ্চলটি রাজস্ব আয়েব একটি অন্যতম উৎস।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে মীর কাশিমের ভূমি সংক্রান্ত চুক্তি হল। এই চুক্তির ফলে রাজা এবং ভুঁইঞার পরিবর্তে জমিদার হলেন স্থায়ী ভূমি স্বত্ত্বের অধিকারী। এর ফলে উদ্ভব হলো একাধিক তালুকদার এবং চকদার এর। এককালীন অর্থ ও বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে অনাবাদী উর্বর জমি এবং নদীর চরগুলি জমিদারী সেরেস্তা থেকে বিলি - বন্দোবস্ত হতে লাগল। যারা কিনলেন তারা হলেন নব পত্তনিদার 'চকদার'। নদীর ধারে বাঁধ দিয়ে ঘিরে রাখা জমিকে বলা হয় চতুষ্কচক'। চকদার এককথায় মধ্য স্বত্ত্বভোগী স্থিতিশীল রায়ত। এরা আবার নিজেরা চাষ করতেন না, ছোট ছোট প্লটে জমি ভাগ করে ভাগচাষীদের চাষের জন্য দিতেন। বড় বড় চকদার রাজত্বের বিনিময়ে (ভাগ, সাঁঝা, ঠিকা) প্রজাস্বত্ত্ব বিলি করতেন আর নিজের নামে 'চক' এর নামকরণ করতেন। উৎকোলীয় ব্রাহ্মণ, করণ, ধনী, মুসলমানরা ছিলেন এইধরণের 'চক' - এর অধিকারী। এইভাবেই সমগ্র বাংলা তথা মালদহে গড়ে উঠেছিল একধরনের নতুন অভিজাত শ্রেণী।

কালিয়াচক এই নামকরণের পেছনেও আছে কালিয়া অথবা কালুয়া নামধারী কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব। তিনি হিন্দু অথবা মুসলীম যে কোন সম্প্রদায়েরই হতে পারেন। তবে তিনিই যে এই সমৃদ্ধশালী অঞ্চলটির নামকরণের অন্তরালে আজও বেঁচে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চরি-অনন্তপুর (৪৭) ঃ

চরি অনন্তপুরে শারদীয়া দুর্গোৎসব ও মহামেলা চলে ৪ দিন ধরে। সাদীপুর গোঁসাইহাটে দশনামী গিরি সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির ঘিরে মহাশিবরাত্রির মেলা, ভাদ্রমাসে হয় সৈয়দ পীরের উরস উৎসব, পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে হয় সোনা রায়ের পুজো। সোনা রায়ের গান মালদহের লোক সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল দিক। সোনা রায় 'ব্যাঘ্র বাহন' বাঘের দেবতা। সমস্ত মালদহ জুড়ে এ পূজা ও গানের প্রচলন। পৌষ সংক্রান্তিতে মূর্তি গড়ে ঘটা করে এ পূজানুষ্ঠান

হয় এখানে। পৌষের প্রথম থেকেই বালকেরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গেয়ে মাগন করার ভিতর দিয়ে সোনা রায়ের পূজানুষ্ঠানের সূচনা হয়। সারা মাসের মাগন সংগ্রহের মাধ্যমে যে অর্থ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ হয় তা দিয়েই পুজো করার নিয়ম। এক সময় সোনা রায়ের পুজো যে খুব ধুমধামের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হত কাগচিড়া গ্রামের সোনা রায়ের মন্দির ও মালদহ মিউজিয়ামে রক্ষিত সোনা রায়ের প্রস্তর মূর্তি তার সাক্ষ্য বহন করে।

এই মৌজার আলিপুর গ্রামে বৈশাখ সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে চারদিনের গম্ভীরা পূজা উৎসব। শুকপাড়া গ্রামে হয় মাঘ মাসের প্রথম রবিবার সূর্য্যব্রত ও ধুনুচি নাচ।

কুতুব-আলমপুর (৬৩) :

পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত পীর নুর-কুতুব-উল-আলমের নামে মালদহে অসংখ্য চিল্লাথানা ছিল। এটি তারই একটি বলে অনুমান।

জোত ধানাই (৭৭), জোত পরান (৭৯), জোত কস্তুরী (৮), জোত অনন্তপুর (৯৮), জোত গোপাল (১০১), জোত কবিল (১০৪), জোত দোমন (১০৫)

কালিয়াচক থানায় একাধিক মৌজার নামের পূর্বে জোত শব্দটি আছে। কালিয়াচক থানা যেহেতু নতুন জেগে ওঠা চর, তাই তার চাযবাস, কর ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রয়োগবিধি মোটামুটি কার্যকর হয়েছে। স্থাননামের পূর্বে বা পরে 'জোত' এই শব্দ শাসন এবং করবিধির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। 'জোত — একজোড়াবলদ নিয়ে যে জমি চাষ করা যায়; সাধারণত ২৩ বিঘার হিসাব এই জমি, জমিদার ও পত্তনিদারের কাছ থেকে চুক্তি শর্তে চাষীরা নিত চাষের জন্যে। তার সঙ্গে যোগ হত তার নিজের নাম অথবা আরাধ্য দেবতার নাম।

কালিয়াচক (৭৮) :

বালিয়াডাঙ্গার প্রাচীন হরিসভার বার্ষিক দুর্গোৎসব। যে অনুষ্ঠানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষজনও অংশগ্রহণ করে ও উপভোগ করে।

উত্তর লক্ষ্মীপুর (৮৮), পূর্ব লক্ষ্মীপুর (১৬৩), দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর (১৬৮) :

কালিয়াচক থানাটি দিয়ারা অঞ্চলে অবস্থিত। গঙ্গা ও তার শাখানদী সমূহ এই অঞ্চলে থাকায় এই অঞ্চলটি উর্বর বলে পরিগণিত। নানাবিধ কৃষিজাত দ্রব্যের উৎকৃষ্ট উৎপাদন হয়। এখানকার বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষই তাই কৃষির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে মংস্যজীবী মানুষের সংখ্যাও কম না। লক্ষ্য করবার বিষয় এই উভয় সম্প্রদায়ের মৎসজীবী মানুষের প্রধান আরাধ্য দেবতা সম্পদের দেবী লক্ষ্মী। তাই এখানকার অধিকাংশ মৌজার নাম লক্ষ্মীপুর নামে চিহ্নিত।

জালুয়াবাথান (১০৯) :

কালিয়াচকের জালুয়াবাথান গ্রামটি অতীতের রাজধানী টাঁড়ার স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে রয়েছে। র‍্যালফ্ ফীচ নামক জনৈক ইউরোপীয় পর্যটকের লেখা থেকে এই স্থানটির কথা প্রথম

জানা যায়। ফিচ আরও লিখেছেন তুলা ও তুলাজাত কাপড়ের ব্যবসা-বাণিজ্যে টাঁড়া ছিল সমৃদ্ধ। এখানে বাঘ, বুনো মোষ ও বুনো মুরগীর প্রাচুর্য ছিল।

১৮১০ খৃঃ বুকানন হ্যামিলটন তথ্য দিচ্ছেন যে টাঁড়ার তেমন কোন প্রাচীনত্ব নেই। মুঘল হুমায়ুন যখন পাঠান শেরশাহ ও তাঁর পরিবারবর্গকে ক্ষমতা বঞ্চিত করলেন, তখন বাংলার শাসকেরা দিল্লীর অধীনতা ছিঁড়ে ফেলে, গৌড় ত্যাগ করে পুরনো গঙ্গা পার হয়ে টাঁড়ায় এসেছিলেন। কালিয়াচকের জালুয়াবাথান গ্রামটি আজকের খাওয়াসপুর টাঁড়ার এক মাইলেরও কম দক্ষিণে রয়েছে। বলা হয় সুলেমান করবানি গৌড় থেকে এসে তাঁর রাজধানী গৌড় থেকে টাঁড়ায় সরিয়ে নিয়ে যান। প্রথম দিকে মোগল সুবেদারদের রাজধানীও ছিল টাঁড়া। আবার ১৬৮০ খৃঃ শাহ সুজা রাজমহল থেকে টাঁড়ায় পশ্চাদপসরণ করেন — আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলার প্রচণ্ড চাপের মুখে এই টাঁড়া নগরীতেই এক প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাংলার সুবেদার শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। এরপর থেকে ইতিহাসের পাতা থেকে টাঁড়া আস্তে আস্তে হরিয়ে যায়।

ছোট মহদিপুর (১৩৩) :

মহতিপুর > মহদিপুর। পাগলা নদীর ধারে একসময় বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল।

এটি সেকালের একটি বিখ্যাত ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রও ছিল। গৌড় রাজধানীর সঙ্গে এই গ্রামটির যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ।

যদুপুর (১৩৭) :

যদুপুর গ্রামের ঈদ-উল-ফিতরের প্রার্থনা, সমাবেশ ও মেলা, বালুগ্রামের জগৎতারিণী সর্বমঙ্গলা মাতার দেবীস্থানে কার্তিকী অবাবস্যার কালিপূজা ও মেলা। এখানে রেশম চাষ হয়।

জালালপুর (১৪৪) :

জালালুদ্দিন আকবরের নামানুসারেই এই স্থানের নামকরণ হতে পারে জালালপুর। র‍্যালফ্ ফীচের বানানে যা Zelabdin Echeber. তুলা ও তুলাজাত কাপড়, উৎকৃষ্ট রেশম উৎপাদনের জন্য এ স্থান পূর্বে বিখ্যাত তো ছিলই এখনও সেই সুনাম অব্যাহত আছে। জালালপুরে একাধিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে রথযাত্রার মেলা চলে ৮দিন ধরে।

কাশিমচক (১৫৭), ভোলাইচক (১৭২), চক দোমাই (১৭৩), চক মাইলপুর (১৭৮), কাজিচক (১৮২), লারচক (১৮৩), চক লালু (১৮৪)

ইংরেজ প্রবর্তিত পাঁচ-শালা, দশ-শালা; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এক নতুন জমিদার এবং তালুকদারদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। এককালীন অর্থ ও বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে অনাবাদী উর্বর ভূমি অথবা নদীর চর নব পত্তনিকারের কাছে জমিদার সেরেস্তা থেকে বিলি বন্দোবস্ত হতে লাগল। নদীর ধারে বাঁধ দিয়ে ঘিরে রাখা জমি 'চতুস্ক চক'। এই জমি যিনি নির্দিষ্ট অর্থের ভিত্তিতে ইজারা নিলেন তিনি চক্‌দার মধ্যস্বত্ত্বভোগী স্থিতিশীল রায়ত। এঁরা নিজেরা জমি চাষ না করে ছোট ছোট প্লটে চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। এলাকার অস্থিতিশীল প্রজারাই

এই জমি চাষ করতেন। 'চকদার' এদের ভূমি বণ্টন করতো ভাগ, সাঁজা ও ঠিকার বিনিময়ে। বড় বড় চকদার প্রজাস্বত্ত্ব বিলি করে নিজেদের নামে 'চক'-এর নামকরণ করতেন। ব্রাহ্মণ, বণিক, ধনী মুসলমানেরা ছিলেন এইসব 'চক' বা পত্তনিকার নবোদ্ভুত অভিজাত শ্রেণী। মালদহ জেলা একাধিক নদীর মোহনার ভূখণ্ডে অবস্থিত হওয়ায় নতুন জেগে ওঠা চর বা জলাভূমের অন্ত্য ছিল না, তাই এই থানার একাধিক মৌজার নামকরণ এই 'চক' অন্ত্য নামে।

নাওদা (১৮৮) : নতুন দহ > নবদহ > নওদহ > নওদা > নাওদা

কালিয়াচক থানার অদূরেই গঙ্গা, রয়েছে একাধিক শাখা নদী। গঙ্গা তার গতিপথ পরিবর্তন করে সরে যাওয়ার ফলে নতুন জেগে ওঠা চরের নামকরণেই এই নাম হতে পারে।

অন্যান্য মৌজা (জে. এল. নাম্বার অনুসারে) কালিয়াচক ব্লক - ১ :

(৩১) সুলতানগঞ্জ, (৬) ফতে চাঁপুর, (৬৭) মারুপুর, (৬৮) খাস চাঁদপুর, (৬৯) করারি চাঁদপুর, (৭০) আলিপুর, (৭১) মহেশপুর, (৭২) বালিয়াডাঙ্গা, (৭৩) খালতিপুর, (৭৪) বাহাদুরপুর, (৭৫) কৃষ্ণপুর, (৭৬) ইসলামপুর, (৭৭) জোত ধানাই, (৭৮) কালিয়াচক, (৭৯) জোতপরান, (৮০) বীরগাছি (৮১) আলিনগর, (৮২) নবীনগর, (৮৩) নূর নগর, (৮৪) জগদুল্লা, (৮৬) দালুগ্রাম, (৮৭), ত্রিমোহিনী, (১১৬) বাখরপুর, (১১৭) ছোট সুজাপুর (১১৮) মধুগ্রাম, (১১৯) নাজিরপুর, (১২০) মাসিমপুর, (১২১) বড় সুজাপুর, (১২২) চাষপাড়া, (১২৩) গয়েস বাড়ি, (১২৪) গন্ধর্ব গ্রাম, (১৩০) মদন পুর কিস্‌মত, (১৩১) ছিরামপুর, (১৩৫) জগদীশপুর, (১৩৬) ইন্নাতপুর, (১৩৭) যদুপুর, (১৩৮) উত্তর দরিয়াপুর, (১৩৯) আজিমপুর, (১৪০) নতীবপুর, (১৪১) পূর্ব্ব চাঁদপুর, (১৪২) শেরপুর, (১৪৩) ববানগর, (১৪৪) জালালপুর, (১৪৫) বামনগ্রাম, (১৪৬) জামাপুর ইংলিশ, (১৪৭) ছিট বাখরপুর, (১৪৮) হারুগ্রাম ইংলিশ, (১৪৯) পাহাড়পুর, (১৫০) পূর্ব্ব কৃষ্ণপুর, (১৫১) মকদুমপুর, (১৫২) মল্লিকপাড়া, (১৫৩) জালুয়াবাথান, (১৫৪) মিদির চক, (১৫৮) শ্রীরামপুর, (১৬০) উত্তর রায়পুর, (১৬১) সেলিমপুর, (১৬২) কুতুব আলমপুর, (১৬৩) পূর্ব্ব লক্ষ্মীপুর, (১৬৪) বুজরুক পিরোজপুর, (১৬৫) নারায়নপুর, (১৬) হারুচক, (১৬৭) দক্ষিণ রায়পুর, (১৬৮) দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর, (১৬৯) মাজুমপুর, (১৮৫) কদমতলা।

অন্যান্য মৌজা (জে. এল. নাম্বার অনুসারে) কালিয়াচক ব্লক - ২ :

(১)পলাশগাছি, (২) পিয়ারপুর, (৩) কাঁক্‌রিবান্ধা ঝাউবোনা, (৪) রেজাকপুব, (৫) কামালুদ্দিনপুর, (১৬) দরিদিয়ার ঝাউবোনা, (৭) মহাদেবপুর, (৮) জোত কস্তুরী, (৯) সুকুরুল্লাপুর, (১০) বীরুধি, (১১) পঞ্চানন্দপুর, (১২) দরি জয় রামপুর, (১৩) দাসকাঠিয়া, (১৪) ইস্‌লামপুর, (১৫) হামিদপুর, (১৬) নিত্যানন্দপুর, (১৭) জিৎ নগর, (১৮) পরাণপুর, (১৯) রতন লালপুর, (২০) শ্রীঘর, (২১) কাছি যদুপুর, (২২) কোম'ওয়ানস্‌, (২৩) হাকিমাবাদ, (২৪) সঙ্গতপুর, (২৫) হুসেনা বাদ, (২৬) দোগাছি, (২৭) গাজিয়াপাড়া, (২৯) চরবাবুপুর, (৩০) নয়া গ্রাম, (৮৫) শ্রীপুর, (৮৮) উত্তর লক্ষ্মীপুর, (৮৯) বিষ্ণুপ্রসাদ (৯০) ধরমপুর, (৯১) খানপুর, (৯২) বাবলা, (৯৩) উত্তর চন্দ্রপুর, (৯৪) গঙ্গারামপুর, (৯৫) দিয়ার গঙ্গারামপুর (৯৬) মবারকপুর,

(৯৭) জোত অনন্তপুর, (৯৮) সাদিপুর, (৯৯) (১০০) দুলালগঞ্জ, (১০১) জোত গোপাল কাগ্‌মারী, (১০২) আইল পাড়া, (১০৩) মেহেরাপুর, (১০৪) জোত কবিল, (১০৫) জোত দোমন, (১০৬) গঙ্গাপ্রসাদ, (১০৭) শ্যামদাসপুর, (১০৮) মেস্তোকাপুর, (১০৯) হরিপোতা, (১১০) নয়াবাদ, (১১১) জয়ন্তিপুর, (১১২) বিরহিমপুর, (১১৩) বেবীপুর, (১১৪) গোপাল প্রসাদ, (১১৫) টেপ প্রতাপপুর, (১২৫) প্রতাপপুর (১২৬) চক্ প্রতাপপুর, (১২৭) মোথাবাড়ি, (১২৮) পূর্ব্ব হোসেনাবাদ, (১২৯) মদনপুর, (১৩২) পূর্ব্ব শ্রীপুর, (১৩৩) ছোট মহদিপুর, (১৩৪) দক্ষিণ দেবীপুর।

অন্যান্য মৌজা (জে. এল. নাম্বার অনুসারে) কালিয়াচক ব্লক - ৩ ঃ

(৩১) সুলতানগঞ্জ(অংশ), (৫৫) মহবতপুর, (৫৬) মোহনপুর দৌসবিঘা, (৪৭) চরি অনন্তপুর, (১৫৫) সয়েবতনরা, (১৫৬) উজিরপুর, (১৫৭) কাশিমচক, (১৭০) বাল্টিপুর (১৭১) পাক্কাকোট, (১৭২) ভোলাইচক, (১৭৩) চক দোমাই, (১৭৪) শাহাবাজপুর, (১৭৬) গোলাপগঞ্জ, (১৭৭) শাশানি, (১৭৮) চক্‌মাইলপুর, (১৭৯) দক্ষিণ চাঁদপুর, (১৮০) ফতেপুর, (১৮১) সরিনিবাসপুর, (১৮২) কাজিচক্, (১৮৩) লারচক, (১৮৪) চক্‌লালু, (১৮৬) মহিলাপুর, (১৮৭) আকন্দবারিয়া, (১৮৮) নাওদা, (১৮৯) সুলতানপুর, (১৯০) বৈরবোনা।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানা ঃ

উত্তরে মালদহ জেলার সর্বশেষ থানা হরিশ্চন্দ্রপুর। গঙ্গা এবং ফুলহরার বিধৌত নীল মাটিই হরিশ্চন্দ্রপুরের ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলটি সমৃদ্ধ এবং নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। হরিশ্চন্দ্রপুর এই নামকরণের পশ্চাতে রয়েছে কৌশিকী কচ্ছের হরিশ্চন্দ্র নামধারী দৌর্দন্ড প্রতাপশালী সামন্তরাজের স্মৃতিচিহ্ন। পরবর্ত্তীকালে ভারতবন্দিত পন্ডিত অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রীর জন্মস্থান বলেও স্থানটি বিশেষত্বের দাবী রাখে।

এই অঞ্চলে রয়েছে একাধিক, আদিবাসী সম্প্রদায়, পাঝরা, কুঝড়া, নাড়েগুস্তি, মুন্ডা, ওঁরাও, মালো, কেওট, তিওর, তোরা কৈবত, বাগদী, ডোম ইত্যাদি।

এই জেলার বর্তমান লোকসংখ্যা ১,৬২,৩৬৯ (একলক্ষ বাষট্টি হাজার একশত বাইশ, মহিলা উনআশি হাজার দুইশত সাত্চল্লিশ। যার মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ছাপ্পান্ন হাজার আটশত সাতান্ন (District Sensus Report - 2001)।

ডাঙ্গি মহেন্দ্রপুর (৩০), চৌপলডাঙ্গা (৪১), ঝিকাডাঙ্গা (৫৯), বড় ডাঙ্গি (৮) ঃ

'ডাঙ্গা' শব্দ অন্ত্য স্থাননাম মালদহ জেলায় প্রচুর। সাধারণত তৃণ, গুল্মহীন উঁচু শুকনো জমিকে ডাঙ্গা বলা হয়, কিন্তু বাংলা অভিধানে শব্দটি দেশজ। হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় একাধিক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাঁওতাল মুণ্ডা সম্প্রদায়। 'মুণ্ডারী' শব্দকোষে 'ডাঙ্গার' শব্দটি রয়েছে 'উচ্চভূমি' এই অর্থে । কোনও এক সময় এই অঞ্চল মুণ্ডা আদিবাসী অধ্যুষিত ছিল এমনটি হতেই পারে।

দাকল (২), ওয়ারী (৭), ভাটল (১১), কাইলপাড়া (১৬), বিঘর (৩১), গোহিলা (৪৩), লাহাদ (৪৭), দিযুয়া (৫১), ভাগ বারুল (৬০), বারুল (৬১), কিচমত বারুল (৬২), খোকরা (৯৬), সিকাতানি (১৪৯) ঃ

এই সমস্ত মৌজগুলি বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা বলে ধরে নেওয়া যায়। তাদের নিজস্ব শব্দগুলিই এই স্থাননামগুলির পিছনে সক্রিয় এই রকমটিই অনুমান। কারণ হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় এই সমস্ত অঞ্চল পাঁঝরা, কুঁমরা, নাড়েগুস্তি ইত্যাদি একাধিক আদিবাসী সম্প্রদায় অধ্যুষিত ছিল। একসময় বর্তমানের ক্রমবর্ধমান জনবসতি এই তথ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে।

শ্রীচন্দ্রপুর (৫৩) ঃ

শ্রীচন্দ্রপুর গ্রাম বিখ্যাত শ্রীপঞ্চমীর পূজা ও মেলার জন্য। এই উপলক্ষে আশপাশের গ্রাম থেকেও প্রচুর জনসমাবেশ হয়।

পিরোজপুর (৬৫) ঃ

মহম্মদ বিন তুঘলকের খুল্লতাত পুত্র দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহের স্মৃতি মালদহ জেলার একাধিক মৌজা এখনও বহন করছে। লোকজ উচ্চারণে যা পিবোজ হয়ে গেছে। এই রকমই একটি মৌজা হরিশ্চন্দ্রপুরেব পিরোজপুর।

মবারকপুর (৬৭) ঃ

পালযুগের সামন্ত রাজাদেব পূজিত অষ্টভূজা মহিষমর্দিনীর পূজা বিখ্যাত। এছাড়া কার্তিক মাসে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় কালীপূজা উৎসব।

বেজপুরা (৮৭), উত্তর বেজপুরা (৮৮) ঃ

এই গ্রামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের শ্মশানকালী পূজা ও উৎসব বিখ্যাত।

শালদহ (৫১), চাপদহ (৮৩), বিলদহ (১১৮), দহরা (১২৩), মশালদহ (১৭৮) ঃ

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার একাধিক মৌজা 'দহ' অন্ত্য নাম যুক্ত। হরিশ্চন্দ্রপুর থানাটি 'টাল' অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এক সময় কুশী নদী এই অঞ্চলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হোত। এছাড়া আছে ফুলহরা এবং গঙ্গা নদী। এই সমস্ত নদীরা তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে সরে গেছে অন্যত্র। কিন্তু তাদের ফেলে যাওয়া নদীখাতগুলি সঙ্কীর্ণ জলাশয় বা 'দহ'-তে পরিণত হয়েছে, কোথাও বা কেবলই স্মৃতিটুকু রয়েছে। কালক্রমে এরই পাশে পাশে গড়ে উঠেছে নতুন বসতি, সেই মৌজাগুলি 'দহ' অন্ত্য স্থান নাম নিয়ে আজও পুরাতন স্মৃতি বহন করছে।

দক্ষিণ হরিশ্চন্দ্রপুর (১০১), উত্তর হরিশ্চন্দ্রপুর (১০২) ঃ

এই থানা শহরে এক সময়ে বিখ্যাত ছিল গোপাল বিগ্রহের দোলযাত্রা। এখন সেই খ্যাতি অনেকটা ম্লান হয়ে এলেও তার গৌরব হারায়নি। জমিদার বাড়ীর এই উৎসবে এখনও জমিদার পরিবারের সদস্যরা মিলিত হন। অংশগ্রহণ করেন গ্রামের অন্যান্য মানুষেরাও।

দক্ষিণ মহেন্দ্রপুর (১০৯) ঃ

এখানে আছে বালাপীর সাহেবের দরগাহ্। মহরম এখানকার প্রধান এবং আকর্ষণীয় উৎসব। এক সময় এর থানা ছিল তুলসীহাটা। এই গ্রামের খ্যাতির মূলে আছেন দেশিকোত্তম বিধুশেখর শাস্ত্রীর মত বিদ্বান ও বিদগ্ধ সন্তান। তিনি কালীবাড়ির ভট্টাচার্য পরিবারের ভূষণস্বরূপ। সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বিধুশেখর শাস্ত্রীকে শান্তিনিকেতনের সূচনা পর্বে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর নামে বর্তমানে হরিশ্চন্দ্রপুরে একটি গ্রন্থাগার আছে।

বাঁশারিয়া (১১১) ঃ

রাজবংশী সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবী বিশালাক্ষী লোকমুখে কখনও বিসলামারী, কখনও বাঁশুলী হয়ে গেছে। সেই দেবীর আরাধ্য থান থেকেই অনেক মৌজা চিহ্নিত হয়ে আছে। এই গ্রাম রাজবংশী সম্প্রদায় অধ্যুষিত, অথবা তারা বসতি স্থাপন করার পর দেবীর নামানুসারেই এই গ্রামনাম চিহ্নিত করে রাখতে পারেন।

অর্জুনাই (১৩৬) ঃ

এই গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় মহারাজ পূজা ও উৎসব। এই উপলক্ষে গ্রামে বিরাট মেলা বসে। পূজা অনুষ্ঠিত হয় ফাল্গুন মাসের প্রথম রবিবার থেকে পর পর তিন দিন।

মালিয়র (১৬৪) ঃ

মালিওর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় জিন্দাপীরের উৎসব।

অন্যান্য মৌজা (জে. এল. নাম্বার অনুসারে) ঃ

(১) বীজহাট, (২) দাকল, (৩) রাজল, (৪) ভগবানপুর, (৫) বাহার, (৬) ওয়ারী, (৭) গরবা, (৮) মাধাইপুর, (৯) ধরমপুর, (১১) ভাটল, (১২) দুয়ারকোলা, (১৩) গুছিয়া, (১৪) কস্তুরীয়া (১৫) রামশিমূল, (১৬) কাইলপাড়া, (১৭) ভেলাবাড়ী, (১৮) নাসিরপুর, (১৯) অরাজি জয়নগর, (২০) কুতুবপুর, (২১) জয়নগর, (২২) লক্ষ্মীপুর, (২৩) কানাইচন্ডী, (২৪) কোটাল, (২৬) রানাপুরা, (২৭) রসিদাবাদ, (২৮) জনমদল, (২৯) ভক্তিপুর, (পিঘা, (৩০) ডাঙ্গি মহেন্দ্রপুর, (৩১) বিঘর, (৩২) বিষাণপুর, (৩৩) দৌলা, (৩৪) কুষিদা, (৩৫) উত্তর মুকুন্দরপুর, (৩৬) উত্তর রামপুর, (৩৭) নন্দীবাটি, (৩৮) শিমুলিয়া, (৩৯) ধূরি নাড়া, (৪০) বারুই, (৪১) চৌপল ডাঙ্গা, (৪২) পরাশতলা, (৪৩) গোহিলা, (৪৪) উত্তর রামনগর, (৪৫) চয়েনপুর, (৪৬) পাঞ্জলা, (৪৭) লাহাদ্, (৪৮) উত্তর গৌরীপুর, (৪৯) মহাদেবপুর, (৫০) দিখুয়া, (৫১) শালদহ, (৫২) চন্ডীপুর, (৫৩) শ্রীচন্দ্রপুর, (৫৪) কামার্তা, (৫৫) তুলসী-হাটা, (৫৬) সালালপুর, (৫৭) শাক্তাল, (৫৮) পারু, (৫৯) ঝিকাডাঙ্গা, (৬০) ভাগ-বারুল, (৬১) বারুল, (৬২) কিচ্‌মত বারুল, (৬৩) অঙ্গারমণি, (৬৪) ঘহাট্টা, (৬৫) পিরোজপুর, (৬৬) নায়ার, (৬৭) মবারকপুর, (৬৮) তেঙ্গিয়াপাড়া, (৬৯) বসতপুর, (৭০) কর্পূরগঞ্জ, (৭১) দরা কান্দি, (৭২) খুরিয়াল, (৭৩) কোনাব, (৭৪) লক্ষ্মণপুর, (৭৫) খোকরা, (৭৬) ভীঙ্গল, (৭৭) ঈষাদপুর,

(৭৮) কানুয়াভবানীপুর, (৭৯) গোপালপুর, (৮০) বড়ডাঙ্গি, (৮১) উত্তর চিতলিয়া, (৮২) বৈরাত, (৮৩) চাপদহ, (৯৫) খেজুরবাড়ী, (৯৭) রঙ্গাইপুর, (৯৮) সন্তোষপুর (৯৯) নবগ্রাম, (১০০) মুন্‌গল, (১০১) দক্ষিণ হরিশ্চন্দ্রপুর, (১০২) উত্তর হরিশ্চন্দ্রপুর, (১০৩) গাঙ্গো, (১০৪) নাজিরপুর, (১০৫) খরঙ্গীপুর জাবরা, (১০৬) পূর্ব্ব রারিয়াল, (১০৭) পশ্চিম রারিয়াল, (১০৮) হরনাথপুর, (১০৯) দক্ষিণ মহেন্দ্রপুর, (১১০) দক্ষিণ রাসপুর, (১১১) বাঁশরিয়া, (১১২) বাংরুয়া, (১১৩) ভবানীপুর, (১১৪) গনন্‌দীয়া, (১২৭) পপ্‌িলা কাশিমপুর, (১২৯) নারায়নপুর (১৩১) জনকী নগর।

হরিশ্চন্দ্রপুর - ব্লক - ২

(১০) জয়রামপুর, (৮৪) ইলাম খিলিম, (৮৫) ইলাম, (৮৬) মসলন্দপুর, (৮৭) বেজপুরা (৮৮) উত্তর বেজপুরা, (৮৯) লতাসি, (৯০) গাউসপুর, (৯১) মালিপকার, (৯২) দৌলতপুর, (৯৩) দোবল, (৯৪) বঁনেদল, (৯৬) চিতলিয়া, (১১৫) ছত্রাক, (১১৬) পলাসপুর, (১১৭) মনোহরপুর, (১১৮) বিলদহ, (১১৯) সাহারানপুর, (১২০) সয়রা, (১২১) কুশল, (১২২) চক্‌স্থান, (১২৩) দহরা, (১২৪) সুলতান নগর, (১২৫) দারল, (১২৬) দক্ষিণ মুকন্দপুর, (১২৮) খন্তা, (১৩২) সমুখা, (১৩৩) নেচ্‌পাড়া, (১৩৪) তেতিয়া, (১৩৬) অর্জুনা, (১৩৭) বসত ধানীপাড়া, (১৩৮) সাহাপুর, (১৩৯) দতিয়ান, (১৪০) পুটীয়া, (১৪১) কঙ্কনিয়া, (১৪২) উত্তর কুমেদপুর, (১৪৩) তলগ্রাম, (১৪৪) হরিহরপুর, (১৪৫) বেতাহাল, (১৪৬) সাহারা বহড়া, (১৪৭) মহড়া পাড়া, (১৪৮) সাদ্‌লিচক, (১৪৯) সিকাতানি, (১৫০) বাসুদেবপুর, (১৫১) সূর্য্যপুরা, (১৫২) দক্ষিণ কুমেদপুর, (১৫৩) তালবা কুরিয়া, (১৫৪) শিকাতানি ইংলিশ, (১৫৫) ভূনা, (১৫৬) নোয়াপাড়া, (১৫৭) দিগ্‌রি ইতলিশ, (১৫৮) খোপাকাটি, (১৫৯) উত্তর দাকুরিয়া, (১৬০) দক্ষিণ ডাকুরিয়া, (১৬১) দৌলত নগর, (১৬২) মিঞাঘাট, (১৬৩) বেলশূর, (১৬৪) মালিয়র, (১৬৫) তালশূর, (১৬৬) জালালপুর, (১৬৭) দক্ষিণ গৌরিপুর, (১৬৮) হরদম নগর, (১৬৯) তাল বাংরুয়া, (১৭০) ভৈরবপুর, (১৭১) তালগাছি, (১৭২) জগন্নাথপুর, (১৭৩) ফতেপুর, (১৭৪) পারাভালুকা, (১৭৫) ভালুকা, (১৭৬) বেগুন, (১৭৭) করিয়ালি, (১৭৮) মশালদহ, (১৭৯) মোহনপুর।

চাঁচল থানা ঃ

চাঁচল থানা আটের দশক পর্যন্ত খরবা থানার অতর্ভুক্ত ছিল। ১৮১৩ খৃঃ মালদা জেলা সৃষ্টির বেশ কিছু সময় পরে বিহারের পূর্ণিয়া জেলা থেকে এই জেলায় সংযোজিত হয়ে নতুন থানার নামকরণ হয় চাঁচোল। পলাশির যুদ্ধের পর এই থানা অঞ্চলটি তৎকালীন মুর্শিদাবাদ নিজামতের চাক্‌লা আকারাবাদের অঙ্গ ছিল। এরপর পৃথক থানা অঞ্চল তৈরীর পর খ্যাতনামা জমিদার শরৎচন্দ্র রায়ের বিভিন্ন জনহিতকর কাজের ফলশ্রুতিতে চাঁচল নামটি জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

চাঁচল থানা মালদার 'টাল' অংশ বা নদী বিধৌত সমভূমি দিয়ে গঠিত। এই থানার কনুয়া মৌজার কাছে বারমাসিয়া থেকে বার হওয়া মিহিপুর দাঁড়াও এককালে নৌপথ রূপে

গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তার প্রমান এই নদীর তীরবর্ত্তী চাঁচল, মালতীপুর, গোবিন্দপাড়া, মিহিপুর, বিদ্যানন্দপুর, প্রভৃতি জনবসতিগুলি।

এই জেলা দক্ষিণাংশেব কিছু ভূ-ভাগ প্রাচীন মালদহের ঐতিহ্যময় প্রত্নকীর্তি স্থল বলে পরিচিত। মালদহ মিউজিয়ামে রাখা বহু প্রাচীন মূর্ত্তি এই সমস্ত স্থান থেকে পাওয়া গিয়েছে। কান্ডারণ (১০৫), মেঘদুমড়া(১০৭), দমনভিটা (১০৮) ও বাঙ্গাপাল। এই সমস্ত মৌজাগুলির মাটি পুরাতন পলি দিয়ে তৈরী। এছাড়া ভক্তিপুরে (মৌজা - ভগবতীপুব) পাওয়া একটি মূর্তিকে স্থানীয় অধিবাসীরা ভৈরবী ভগবতী জ্ঞানে পূজো করে থাকে। দামাইপুর (১১৪ নং) গ্রাম থেকে ৯৬ এর জুলাই মাসে মাটির তলা থেকে বেশ কিছু বাংলার সুলতানি রৌপ্য মুদ্রা (৪১টি) ও দুটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায়।

এই থানার পুরনো হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে গণেশসহ অন্যান্য তন্তুবায় শ্রেণী, পোদ্দার, মাহিষ্য, কামার, ভুঁইমালী, সদ্‌গোপ, তিওর, মান ও গোয়ালা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিগত শতাব্দীব মাঝামাঝি থেকে জমিদারী সেরেস্তার কাজের সুবাদে পূর্ববাংলাসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে কায়স্থ তথা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বসতি চাঁচলে গড়ে ওঠে। আবার বিগত শতাব্দীর বিশের দশক থেকে বিহার থেকে মুসলমান এবং সাঁওতাল পরগণা থেকে সাঁওতাল, ওঁরাও রা অনেক সংখ্যায় এই থানায় প্রবেশ করে এ ছাড়াও আছে হাড়ী, বেলদার (যাদের জীবিকা পুকুব খোঁড়া) এছাড়া কংসবণিক কুসীদজীবির পোদ্দার এবং তিলি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল।

চাঁচল থানাটির নামকরণটির সঠিক উৎস এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি, চঞ্চল ভূমি' এইরূপ একটি সঙ্কীর্ণ অর্থ করা যেতে পারে। চাঁচল থানা মালদার টাল অংশে (যা নদী মোহনার অংশ বলে পরিচিত) রয়েছে। রেনেল অঙ্কিত জেলার প্রথম মানচিত্রে (১৭৬৪ - ৭৩) মহানন্দা নদীর উপস্থিতি থানায় পশ্চিম কৌনিক বিন্দুতে অবস্থিত স্বরূপগঞ্জের নিচ দিয়ে পশ্চিম সীমানা বরাবব, যা বর্তমানে বারমাসিয়া নদীখাত রেখে সরে গিয়ে বয়ে যাচ্ছে থানার পূর্ব সীমানা ধরে। সেইজন্য গোটা চাঁচল থানাই মহানন্দার পুরাতন পলিমাটির উপর নতুন পলিমাটি দিয়ে গঠিত। সেই অর্থে চঞ্চল ভূমি বা চাঁচরভূমি। কান্ডারণ চৈতনপাতি (১০৭), মেঘদুমড়া (১০৮), দমনভিটা (১০৯), বাঙ্গাপাল (১১০) ইত্যাদিতে প্রাপ্ত প্রত্নচিহ্ন এখনও চাপা পড়া প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে।

চাঁচল নামকরণটির অন্তে রয়েছে 'ওল' প্রত্যয়। এই প্রত্যয়টির অর্থ সাধারণ অভিধানের বাইরে। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই একাধিক জাতি, উপজাতিব আগমন এই জেলায় ঘটেছে। তাদের বিচিত্র ভাষা এবং অভিধানও নিজস্ব। এখান থেকেও এই প্রত্যয়টি সংযুক্ত হতে পারে। কারণ কাছাকাছি এই প্রতায় সমৃদ্ধ আরও কয়েকটি গ্রামনাম পাওয়া যাচ্ছে - গাজোল, নাচোল, বিন্দোল (রায়গঞ্জ থানা) ইত্যাদি।

এই অঞ্চলের চাঁচর উৎসব খুব বিখ্যাত। চাঁচর উৎসব আদিতে ফসল উৎসবের দ্যোতক ছিল, পরে তা হোলি বা চাঁচর উৎসবের অগ্রুৎসবে পরিণত হয়। এই উপলক্ষে জীবন্ত (মেড়া) বা ভেড়া পোড়ানোর রীতি রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশে এখনও দোলের আগের দিন চাঁচাবি বা বাঁশেব ঘরে আগুন দিয়ে 'বুড়ির ঘর' পোড়ানোর একই প্রচলন আছে। এ রকমভাবে খড়ের ভেড়ার মূর্তি পোড়ানো কিংবা জ্যান্ত ভেড়ার গায়ে আগুন ছুঁইয়ে তাকে প্রতীকী ভাবে দগ্ধ

করা ইত্যাদি আচারও কম বেশী কোথাও কোথাও প্রচলিত। বলাই বাহুল্য এগুলি বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত তন্ত্রাচারী মহাযোগীদের আচরিত ধর্মাবশেষ। কিন্তু পরবর্তীকালের বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রভাবে এবং মালদহ জেলায় চৈতন্যদেবের আগমনের কারণে এই নিয়মগুলি পরিবর্তিত হয়ে বৈষ্ণব ধর্মানুযায়ী প্রচলিত হয়। তাই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব দিবসকে স্মরণে রেখে প্রতি শ্রীদোল পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হত শ্রীরাধাগোবিন্দের 'চাঁচর' উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে পাহাড়পুর নামক স্থান থেকে রাজবাড়ী পর্যন্ত বিরাট বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হতো। এই উৎসবের জন্যই অঞ্চলটির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র বাংলাদেশে। জনশ্রুতি এই বিখ্যাত চাঁচর উৎসব থেকেই স্থানটির নাম চাঁচোল।

প্রচলিত একটি প্রবাদ - চুর চুরামন কলিগাঁও, বেটি না পেলে জগন্নাথপুর যাও' — চুরামন এখন ইটাহার থানার অন্তর্গত। এই অঞ্চলগুলিতে তিলি সম্প্রদায়ের ঘন বসতি ছিল। থানা বিভাজনের আগে এই 'চুরামন' অঞ্চলটি অবিভক্ত ছিল। তারই খন্ডাংশ এখন মালদা জেলায় রয়ে গেছে। তারই স্মৃতিতে চুরামন থেকে চানচোল — চাঁচোল হতে পারে।

স্বরূপগঞ্জ (১), আসরাইল (৬৩), বড়াইল (৮৭) ঃ

চাঁচল থানার এই দুটি মৌজা মালদহ জেলার নিজস্ব লোক সংস্কৃতি 'ঘোড়ানাচ' এবং 'চরকি নাচ' এর জন্য প্রসিদ্ধ। আনুষ্ঠানিক এই ঘোড়া নৃত্যের সঙ্গে প্রধানত মুসলীম সম্প্রদায়ের যোগাযোগ অধিক থাকলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। সাধারণতঃ বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরী ঘোড়া আকৃতির কাঠামোর ভেতর ঢুকে শিল্পী কোমর বরাবর হাত দিয়ে ধরে থাকেন এবং নাচের প্রয়োজন মত ব্যবহার করেন। রঙীন কাগজ ও অন্যান্য বস্তু দিয়ে কাঠামোটিকে সুদৃশ্য করা হয়। সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ঢোল, দামামা বা ব্যোম থাকে। মহরম মাসের চাঁদ দেখে নাচের মহড়া শুরু হয়। যষ্ঠী। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই চারদিন এলাকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে মহরমের ঘোড়া নাচ পরিবেশিত হয়। এক সঙ্গে দলবদ্ধভাবে একাধিক ঘোড়া থাকতে পারে। আবার একক ঘোড়াও থাকতে পারে। শ্রদ্ধেয় হরিদাস পালিত মহাশয় এই ঘোড়ানাচের বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে — " ঘোড়ানাচের ঘোড়া বংশ নির্মিত ও কাগজাদি দ্বারা মণ্ডিত। ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশে যেখানে জিন দিতে হয়, সেখানে ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের মধ্যে অশ্বারোহী কটিদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করাইয়া অশ্বের উপর পার্শ্বস্থিত রজ্জু স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। এখানে এরকম নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।" গম্ভীরার মুখা নাচের মতো ঘোড়ানাচেও খণ্ড খণ্ড সমাজ চিত্র তুলে ধবার প্রয়াস দেখা যায়। মুখা নাচে যা শুধু নাচের মধ্য দিয়ে, আব মহরমের নাচের সঙ্গে যুক্ত হয সংলাপ, কোথাও গান, চাঁদ সদাগরের কাহিনী অবলম্বনেও'ঘোড়ানাচ' দেখানো হয়।

মহরম উপলক্ষে এই সব অঞ্চলে 'ঘোড়নাচ' ছাড়াও 'চরকি নাচ' নামের এক বিশেষ নাচ দেখা যায়। বাঁশের তৈরী সুসজ্জিত চক্রাকারে চরকির মধ্যস্থলে হাত দিয়ে ধরে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে 'চরকির নাচ' দেখানো হয়।

নোনাতোড় (২) ঃ

জনৈক পীর সৈয়দ নোনা-শাহ-এর নামানুসারে হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। এখানে পীর-এর একটি চিল্লাখানা ছিল বলে অনুমান।

ভগবতীপুর (৫৯) ঃ

এখানে পাওয়া গিয়েছে বৌদ্ধ আমলের একটি মূর্তি। ভৈরবী ভগবতী আজও এই মূর্তির মহা সমারোহে পূজা হয়ে থাকে। ভৈরবী থেকেই ভগবতী এইভাবেই এই স্থানটি চিহ্নিত হতে পারে।

হাতিন্দা (৬৫) ঃ

চাঁচলের জমিদারীর সবচেয়ে বড় পরগণার নাম হাতিন্দা। আসল কথাটা হচ্ছে হাতিকান্দা পরগণার এমাথা ও মাথা এতটাই বড় ছিল যে পায়ে হেঁটে যেতে সারাদিন লেগে যেত, এমনকি হাতিও এ মাথা ও মাথা যেতে নাকি কেঁদে ফেলত. সেই থেকে নাম হাতিকান্দা বা হাতিন্দা। চাঁচল রাজবাড়িতে মানুষ হওয়া সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর ভালোবাসা ঈশ্বর পৃথিবী নামক আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থে বলেছেন — এই পরগণাটি "বাল্যকাল থেকে রাজ ভোগে মানুষ সহোদর বোনের ছেলেটি (শিবরামের পিতা) তার অবর্তমানে অবশেষে দশচক্রে না ফেসে যায় এই ভেবে তাঁর রানী মাসিমা নিজের অন্তিমকালে বাবার একটা ব্যবস্থা করে যেতে চেয়েছিলেন। ওই হাতিন্দা পরগনা দিয়ে যান বাবাকে।" ...."রানীমার স্বর্গ প্রয়াণের পর বাবাকে রাজা (শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী) চাঁচলের পুরাতন রাজবাড়িটা ছেড়ে দেন থাকার জন্য, নিজেবা মহানন্দার ওপারে নতুন রাজপ্রাসাদ বানিয়ে সেখানে চলে যায়। আর হাতিন্দা সম্পর্কে বলেন", দাদা আপনি সন্ন্যাসী মানুষ, আপনি কি পারবেন জমিদারীর এই ঝক্কি পোহাতে, খাজানা আদায় পত্র, হিসেব রাখার হাঙ্গামা। ঐ ঝামেলায় না গিয়ে আপনি বরং মাস মাস একটি মাসোহারা নিন।" এইভাবে হাতিন্দা পরগণা আবার চাঁচল জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

সিঙ্গিয়া (৬৮) ঃ

চাঁচলের সিঙ্গিয়া মৌজায় এখনো রয়েছে ইংরেজ স্থপতির প্ল্যানে তৈরী রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরীর নতুন রাজবাড়ী। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই শুরু হয়েছিল রাজবাড়িটির নির্মানকার্য, রাজা গৃহ প্রবেশ করেন ১৯০৪ খৃঃ। গঠন সৌন্দর্যে চাঁচল রাজবাড়ী ভ্রমন পিপাসুদের এবং দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। এই রাজবাড়ীতে ঢোকার মুখে ডান দিকে পড়ে ইরোপীয়ান গেষ্ট হাউস এবং বামদিকে সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল, এগুলো চাঁচল রাজার স্মরণীয় কীর্তি। এই অঞ্চলে বসবাসকারী দাস পদাধিকারীরা করেন বিশেষ লোক দেবতার পূজা 'ঘাণ্টু পূজা'।

চাঁচল (৭০) ঃ

সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ভালবাসা ঈশ্বর পৃথিবী' তে বলেছেন— "শোনা যায় গোড়ায় এই পরগণাটি ছিল নবাবের জমিদারী সেই মোগলদের আমলে। নবাবের দেওয়ান এই রাজবংশের পূর্বপুরুষ, শেষ নবাবের তিরোধানে তাঁর বিধবা

বেগমকে ঠকিয়ে কৌশল করে তাঁর তালুক মুলুক সব হাত করেছিলেন এই বাদশাহী রাজত্বের পড়ন্ত দশায়। এই নেমকহরামির জন্য বেগম সেই দেওয়ানকে অভিশাপ দিয়ে গেছেন তাঁর বংশলোপ হবে। হয়েওছিল। দেওয়ানের পরবর্তী পুরুষানুক্রমে তারা নিঃসন্তান, তাদের পোষ্যপুত্র নিতে হয়েছে। শেষ পুরুষ চাঁচলের রাজা স্বর্গত শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরীর ছেলেটিও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে বেশ বেড়ে উঠে আত্মহত্যায় নিজেকে নিঃশেষ করে। তারপর রাজা বাহাদুরও যথাসময়ে গত হন। তিনি আর কোন পোষ্যপুত্র নেন নি, এককালের বেগমের সেই হৃদয়ক্ষত এইভাবে এইকালে এসে খতম।

শেষ জমিদার রাজা শরৎচন্দ্রের পালক পিতা ঈশ্বরচন্দ্র অপুত্রক মারা যান। তাঁর দুই রানী সিদ্ধেশ্বরী আর ভূতেশ্বরীকে তিনি পরম্পরায় দত্তক গ্রহনের অধিকার দিয়ে গেছেন। চাঁচলে যাওয়ার আগে আমরা থাকতাম চোঁয়ায়। চোঁয়া মুর্শিদাবাদের কোন গ্রাম। বাবার মা আমার ঠাকুমা আর রানী ঠাকুমা ছিলেন কোলেপিঠের সহোদর বোন রানী সিদ্ধেশ্বরী। মার পেটের বোনের ছেলে থাকতে কাকে আর পোষ্য পুত্র নেবেন? তাই বাবার ডাক পড়েছিল চাঁচলে; আমার ঠাকুমা বাবাকে নিয়ে উঠলেন রাজবাড়িতে।

বাবার কিন্তু কারোর পোষ্যপুত্র হবার কি জমিদারী করার সাধ ছিল না। তৎকাল সুলভ তীব্র বিষয় বৈরাগ্য ছিল তাঁর মনে। তিনিই একটি সুদর্শন সুলক্ষ্মণ ব্রাহ্মণ সন্তানকে এই রাজা শরৎচন্দ্রকে বেছে নিয়ে আসেন রানী মাসিমার দত্তক নেওযার জন্যে। এবং তিনিই উৎসাহী হয়ে পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন।

রাজা মানসিংহ তাঁর চাঁচলের ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন যশোহরবাসী এক ব্রাহ্মণকে। ইংরেজ আমলে এরাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে জমির মালিকানা পান। ১৮৮৮ খৃঃ চাঁচল জমিদারীর অন্তর্গত ছিল তিনটি গ্রাম। সেগুলি হল যথাক্রমে মালতীপুর, সমলিয়া ও নবগ্রাম।

এই (পাল) বংশের দত্তক পুত্র দানশীল রাজা শরৎচন্দ্রের বহুবিধ জনহিতকর কাজ আছে। যেমন ১৯০৮ সালে খরবা থানার ভীষণ দুর্ভিক্ষে এই রাজা রেঙ্গুন থেকে ১লাখ ৬০ হাজার টাকার চাল আনিয়ে ছিলেন দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য। ১৯৩৩ সালে মালদহ শহরের জলাভাব দূর করার জন্য তাঁরই নির্দেশে তৈরী হয় ওয়াটার ওয়ার্কশপ। এর জন্য তিনি ১০ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নির্মাণে তাঁর অবদান অনেক। এছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র রায় দাতব্য চিকিৎসালয়, চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনষ্টিটিউট, চাঁচল সামসী রোডের ২০ কি. মি পথ পিচ বাঁধাই, জাতীয় বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বিনয় কুমার সরকারের হাতে তিন লক্ষ টাকা প্রদান, ইংরেজবাজার গ্রন্থাগারে আজীবন সদস্যপদর জন্য পাঁচশত টাকা প্রদান। এই রকম আরও বহুবিধ কাজের জন্য চাঁচলের মহারাজার নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। বর্তমানে এই রাজবাড়ীতেই চলছে থানার একমাত্র মহাবিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা।

সমকালীন গম্ভীরা শিল্পী শরৎ দাস এই মানযটির প্রশংসায় গান বেঁধেছিলেন —

চাঁচলের দানবীর রাজা বাহাদুর
করেছেন কত দেশের অভাব দূর।

এই অঞ্চলে রয়েছে মালদহের বিখ্যাত পীর আঁখি সিরাজ-উদ্দিনের সমাধি।

কাগুারণ (১০৫), মেঘদুমরা (১০৭), দমনাভিটা (১০৮) :

প্রাচীনকালে এই স্থানটি ছিল গহন অরণ্য বেষ্টিত একটি টিলা। সেখানে বাস করতেন যোগভ্রষ্ট এক মুনি। তাঁর নাম কাগুার মুনি। পবিত্র গঙ্গাজলে তাঁর দেহের অস্থি পতিত হলে তিনি দেহত্যাগ করে বৈকুণ্ঠে গমন করবেন। এই মুনির নামানুসারেই স্থানটির নাম হয় কাগুারণ।

সুদূর অতীতে গঙ্গা নদীর একটি শাখানদী গড় কাগুারণ-এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। নদীর নাম গঙ্গাহার। বর্তমান সামসী কলেজের সামনের দীঘি এবং তারই পার্শ্ববর্তী উঁচু ঢিবিগুলির বিস্তৃতি সামসী কলেজ থেকেই। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বৃহত্তর গৌড়বঙ্গকে রক্ষা করার জন্য এখানে একটি দুর্গ থাকাও অস্বাভাবিক নয়। 'গড়' শব্দের অর্থ দুর্গ বা পরিখা। সাধারণত শাসকরা দুর্গ তৈরী করার জন্য যে ধরনের পরিবেশ বাছাই করে নিতেন এটি সেই রকমই একটি উপযুক্ত জায়গা ছিল। এখানে ছিল শুকিয়ে যাওয়া নদী, পুনর্খনিত দীঘি এবং দীঘিতে প্রাপ্ত বেশ কিছু পুরাবস্তু দুর্গের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানকার স্তুপ বা ঢিবিগুলি দেখে তার সঠিক বয়স নির্ণয় করা না গেলেও অনুমান করা যায় এগুলি পাল রাজাদের আমলের অথবা আরও পূর্ববর্তী সময়ের। এখান থেকে পাওয়া সামগ্রীগুলির মধ্যে আছে পোড়ামাটির দাবার ঘুঁটি, মৃৎ পাত্রের ধরনি, পোড়ামাটির অলংকৃত ইট, পাথরের হাড়ের একটি অংশ। কাগুারনে প্রাপ্ত ৫/৬টি মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশে অভ্র ও সোনার কণা মিশ্রিত রয়েছে। গবেষকরা বলেন অলংকরণের জন্য এই সব পাত্রে সোনা ব্যবহৃত হয়নি, এখানকার কোন বিশেষ অংশের মাটির সাথেই মিশে রয়েছে স্বর্ণকুচি। এছাড়া বেশ কিছু মূর্তিও পাওয়া গেছে, তার মধ্যে একটি ১০০ X ৫৯ সে.মি. আয়তনের একটি বৃহস্পতি মূর্তি, একটি ১০০ সে.মি উঁচু গরুড় মূর্তি, দশম শতকের একটি গণেশ মূর্তি ২০ X ৩৬ সে. মি. আয়তনের, ১২ শ শতকের উমা মহেশ্বরের আলিঙ্গনের ভগ্ন মূর্তি, একটি বিষ্ণুমূর্তি ৩০ X ১৫ সে. মি। এই বিরাট অঞ্চল আরও অনেক প্রত্নচিহ্ন আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে। এ সবই পাল সেন আমলের প্রত্ন-নিদর্শন সন্দেহ নেই।

এ ছাড়া কাগুারণে সমাধিস্থ রয়েছেন পীর নূরজাহান আলী।

দামাইপুর (১১৪) :

কাগুারণ থেকে অল্প দূরত্বেই দামাইপুর মৌজা। ১০০৬ সালের জুলাই মাসে এই গ্রাম থেকেই ২টি বিষ্ণু মূর্তি এবং বাংলার সুলতানি আমলের ৪১টি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। প্রতিটি রৌপ্য মুদ্রা ২ থেকে ২৫ গ্রাম ওজনের। পাল-সেন যুগে তো বটেই বাংলার সুলতানি আমলেও যে এই স্থান যথেষ্ট সম্পদশালী ছিল এই রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কারই সেই পরিচয় বহন করে।

বাহারাল (১১৭) :

চাঁচল থানার এই মৌজাটিতে পৌঁছানো যায় দুটি রাস্তায়। একটি মাদিয়াঘাটে কালিন্দ্রী নদী পার হয়ে এবং দ্বিতীয়টি নূরপুর সেতু দিয়ে কালিন্দ্রী পার হয়ে। এই দুটি পথের সংযোগস্থলে বাহারাল মৌজা। এখানে রয়েছে দানশা ফকিরের সমাধি। বাংলার অস্তমিত স্বাধীনতার সঙ্গে যার নাম জড়িয়ে আছে। জন ষ্টুয়ার্টের History of Bengal গ্রন্থ থেকে জানা যায়, — পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর পলায়নের উদ্দেশ্যে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লা হাতীর পিঠে চেপে প্রচুর

অর্থ ও রত্নালঙ্কার বোঝাই করে বেগম লুৎফন্নেসা এবং আরো দুজন মহিলা সহ একটি ঢাকা গাড়ীতে চেপে ভগবানগোলায় পৌঁছান। সেখানে তার জন্য যে নৌকা রাখা ছিল তাতে চেপে তাঁরা নদীর উজানে চলতে থাকেন। লক্ষ্য ছিল জনৈক বিচ্ছিন্ন ফরাসী সৈন্যাধিনায়কের সঙ্গে মিলিত হবেন, যাঁর নাম মঁসিয়ে লঁ। যার সাহায্যে সিরাজ পূর্ণিয়ায় পালাবেন এবং পুনরায় সৈন্য-সামন্ত জোগাড় করে শক্তি সঞ্চয় করবেন কিন্তু রাজমহলের বিপরীত দিকে পৌঁছতেই বেলা দুপুর হয়ে গেল এবং তাঁরা সকলেই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। দানশা ফকিরের আস্তানার কাছে নৌকা থামিয়ে তাঁরা ফকিরের আশ্রমে কিছু খাদ্যের আশায় এলেন। ফকিরের আপ্যায়ণেও কোন ত্রুটি ছিল না। তিনি তাঁদের জন্য খিচুড়ীর ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু নবাব থাকাকালীন একদিন ফকিরকে অপমান করেছিলেন সেই স্মৃতি ফকির ভোলেন নি। এখন সিরাজকে পেয়ে তাঁর মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠল। তিনি মীরকাশিমের কাছে গোপনে চর প্রেরণ করলেন। খবর পেয়ে মীরকাশিম নিজেই এলেন পুত্র মহম্মদী বেগকে সঙ্গে নিয়ে। হতভাগ্য পলাতক নবাব বন্দী হলেন এবং তারপরই মহম্মদী বেগের হাতে প্রাণ দিলেন। বাংলার স্বাধীনতার শেষ আশাটুকুও এরই সঙ্গে নির্বাপিত হলো। তবে কোন কোন গবেষক সিরাজ ঃ ত্যার সঙ্গে দানশা ফকিরের এই যোগাযোগ ঐতিহাসিক সত্য বলে মানতে চাননি।

দানশাহ এবং তার ভাই আশিক হোসেন শাহ ইসলাম ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন পশ্চিম ভারত থেকে। এখানে আছে দানশাহের বসত ভিটা ও সাধনস্থল যা হাভেলী বা চিল্লাখানা নামে অভিহিত হয়।

এখানে রায়বাড়ীতে প্রায় তিনশত বৎসর ধরে পূজিত হয়ে আসছেন দেবী কালী। এই পূজোর প্রাচীনত্ব ও অভিনবত্ব জেলার মানুষের কাছে বাহারালের নাম সুনির্দিষ্ট করেছে।

মালতীপুর (১২৯)ঃ

উত্তর মালদহের মালতীপুর ছিল সমৃদ্ধশালী জনপদ। এই মৌজাটি ছিল টান্দীর জমিদারেব গৌরহন্ড পরগনার অন্তর্গত। নির্ধারিত দিনে রাজস্ব প্রদানে অসফল হওয়ায় সেখানকার জমিদারেব কাছ থেকে স্থানীয় রামচন্দ্র রায়চৌধুরী তা নিলামে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে হস্তগত করেছিলেন। উত্তরকালে তিনি তাঁর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র এবং পুত্রবধূ সিদ্ধেশ্বরীর সহায়তায় এখানকার জমিদারীর প্রশাসনিক কার্যাদির সুষ্ঠু পরিচালনা করেন।

কলিগ্রাম (১৫১)ঃ

চাঁচল থেকে দু'মাইল দূরে কলিগ্রাম। এক সময় সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান হিসাবে সুপরিচিত ছিল। সংস্কৃত চর্চার জন্য ছিল অনেক টোল ও চতুস্পাঠী। বাস করতেন বহু পণ্ডিত ও অধ্যাপক। এই রকমই একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন পুরষোত্তম গোস্বামী, জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন ঈশান লাহিড়ী, কাব্য ও ন্যায়ে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল কৃষ্ণরত্ন ও কৃষ্ণকেশব গোস্বামীর। এই গ্রামের অন্যতম সুসন্তান ছিলেন উদার দেশপ্রেমিক কৃষ্ণধন সরকার। জাতীয় শিক্ষা সমিতিতে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

এক সময় এই কলিগ্রাম থেকেই প্রকাশিত হোত বিখ্যাত গম্ভীরা পত্রিকা; যার ধারাবাহিকতা

এবং সাহিত্যিক মূল্য আজও বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এখানকার হাইস্কুল সংলগ্ন উঁচু বেদীর উপর দোচালা জিন্দাপীরের দবগাটি সাম্প্রদায়িক মিলনের নিদর্শন। ভিতরে পীরের সমাধি, কেউ বলেন পীরের নাম সুর্য খাঁ। এই পীরেব দরগায় 'সিন্নি' নিবেদন করেন হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়। বাংলা রীতির এই দরগাটিতে হিন্দু প্রভাব লক্ষনীয়। এই দরগায় মহরম উৎসবের সূচনা করেন জনৈক হিন্দু কৃষ্ণ পণ্ডিত। পীরের পাগড়ি রক্ষার দায়িত্বে আছেন হিন্দু নরসুন্দর পরিবার। মহরম উৎসবের দিনে কাববালা যুদ্ধের করুণ অভিনয়ের পাশাপাশি গীত হয় করুণ রসের মার্সিয়া বা ঝারণী গান।

দ্বিতীয় নিদর্শনটি বাজারের পিছনে অবস্থিত ইসলামী প্রভাবের এক গম্বুজ বা রত্ন বিশিষ্ট শিবমন্দির। আটকোণা এই মন্দিরটির বহিরঙ্গে পঙ্খের কৃত্রিম দরজা। মূল প্রবেশ পথের উপরদিকে দুই সারি পত্রাকৃতি খিলানের মধ্যে পঙ্খের লতা-পাতা, জ্যামিতিক নকশা ও মাঝখানে একটি গণেশ মূর্তি। ভিতরে পূজিত হন শিবলিঙ্গ।

উল্লেখ্য শিবমন্দিরটি যে বিশাল দীঘির পাবে অবস্থিত তার নাম রানীদিঘি। (হিন্দু রীতি অনুযায়ী মন্দিরের কাছে পুকুর বা দিঘি আবশ্যক)। রানীদিঘিকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে আরও দুই/তিনটি পুকুর আছে. যার একটি কলিগ্রাম হাইস্কুল সম্মুখস্থ। প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, বিহারের পূর্ণিয়া জেলার সার্উরিনার রানী (দ্রাক্ষায়নী?) ইন্দ্রাণী ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য এই দিঘি খনন কবান, সেই থেকে এই দিঘির নাম রানীদিঘি। তারপর চাঁচলেব মহারাজ শরৎচন্দ্র এই বৃহৎ দীঘিটির যথোপযুক্ত সংস্কার করেন।

কলিগ্রামের কামড়া নামক স্থানে আছে ডাচদের কুঠি, বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ এবং সমাধি স্থান। এখানকার বস্ত্র শিল্পের আকর্ষণে ডাচেরা এসেছিলেন এবং এই সমস্ত কুঠি গড়ে তুলেছিলেন। এখানকার তৈরী উৎকৃষ্ট মানের কাপড় ও মশারীর থান তারা ইউরোপে চালান দিতেন। এখানকার কাঁসা শিল্পও ছিল উৎকৃষ্ট। কংসবণিকদের একটি সমৃদ্ধ বসতিও এখানে গড়ে উঠেছিল।

উৎকৃষ্ট দুগ্ধজাত মিষ্টদ্রব্যের জন্যও কলিগ্রামের সুনাম আছে। বিশেষকরে বিশাল আকারের 'কমলাভোগ' ও 'ক্ষীর'-এর সুখ্যাতি মালদার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। 'চিড়ের মোয়া' এই অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় কুটীরশিল্প।

কলিগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গেছে ১৮৩ X ৭৫ সে. মি. আয়তনের দ্বাদশ শতাব্দীর একটি বিষ্ণুমূর্তি।

বলরামপুর (১৫৭) ঃ

চাঁচল ২ নং ব্লক থেকে ১১ কিমি এবং মহকুমা সদর থেকে ১৭ কি.মি. রাস্তার পর কল্কি মোড়। সেখান থেকে মহানন্দা বাঁধের ভাঙাচোরা ৩ কি.মি. পথ পার হওয়ার পর বাঁধ থেকে নেমে আরও ১ কি.মি. রাস্তা এগোলে পাওয়া যায় বলরামপুর গ্রাম।

এই গ্রামের অন্যতম নদী মহানন্দা যেন গ্রামটির চারদিকে অক্টোপাশের মত ঘিরে রয়েছে। সাম্প্রতিক কালে কয়েক বছরের মধ্যে মহানন্দার ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে গ্রামের আরও আধ

কিলোমিটার জমি। প্রতি বছর বর্ষায় এই ভাঙনের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মালদহবাসী বলরামপুর গ্রামকে চেনেন 'সম্প্রীতির গ্রাম হিসাবে। এখানে আছে পুরানো মন্দির, ঠিক তার পাশেই মসজিদ। একই সঙ্গে পূজা ও নামাজ পড়া চলে মন্দিরে মসজিদে। মনসা পূজোয় গ্রামের হিন্দু মুসলমানরা মিলে একসঙ্গে মেলা চালান। গ্রামে সাতদিন ধরে চলে ঐ মেলা। কিন্তু বর্তমানে এই মনসা মন্দিরটির ভগ্নদশায় সংস্কারের প্রয়োজন।

এই গ্রামের জনসংখ্যা ৩৫০০। প্রাথমিক স্কুল একটি। গ্রাম থেকে ৪ কি.মি. দূরে যদুপুরে আছে একটি হাইস্কুল।

চণ্ডীপুর-ডারমা (১৭১) ঃ

এখানে রয়েছে পীর নীকো-শাহ। তাঁর সমাধিকে কেন্দ্র করে উরস ও ফাতিহা (মৃত্যু দিবস) অনুষ্ঠানে এছাড়া মহরম ইত্যাদি অনুষ্ঠানে হিন্দুরাও অংশগ্রহণ করে। এই অসাম্প্রদায়িক চরিত্রই এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য।

খরবা, অন্যান্য মৌজা (জে. এল. নাম্বার অনুসারে) চাঁচল ব্লক - ১ ঃ

(১) স্বরুপগঞ্জ, (২) নোনাচুর, (৩) মল্লিকপাড়া, (৪) নিখরাল, (৫) মহানন্দপুর, (৬) সাধুহাট, (৭) পশ্চিম ভগবানপুর, (৮) নৈধা কাবুল হাট, (৯) উত্তর গোপালপুর, (১০) শেরপুর, (১১) গাওরিয়া, (১২) উত্তর বসন্তপুর, (১৩) বগজানা, (১৪) খুরিয়াল, (১৫) শীতলপুর, (১৬) পাইকপাড়া, (১৭) নদীসিক, (১৮) ফিরোজাবাদ, (১৯) ইসমাইলপুব, (২০) হরিপুর, (২১) খাদিয়ারপুর, (২২) আশ্বিনপুর, (২৩) বলতার, (২৪) গাওরিপুর, (২৫) রায়ঘাটা, (২৬) সনকোলা, (২৭) ধন্‌জনা, (২৮) হারিয়ান, (২৯) দাইভাটা, (৩০) রাট্‌ঢ়, (৩১) নয়নপুর, (৩২) রামদেবপুর, (৩৩) রানাপুর, (৩৪) জোতচন্ডী, (৩৫) পূর্ব্ব ভগবানপুর, (৩৬) শের বাউর ভগবানপুর, (৩৭) শের ধাউর বলরামপুর, (৩৮) বাগুনজা, (৩৯) নৈকান্দা, (৪০) চন্ডীপুর, (৪১) ভেবা কালিগঞ্জ, (৪২) তারাপুর, (৪৩) শক্তিহার, (৪৪) খরবা, (৪৫) আশাপুর, (৪৬) শ্রীকৃষ্ণপুর, (৪৭) কোবাইয়া, (৪৮) ইসলামপুর, (৪৯) খরবা - গোপালপুর, (৫০) পাঁচরেখা, (৫১) দীঘি, (৫২) বাশিলহাট, (৫৩) গোবিন্দপুর, (৫৪) কেন্দুয়া, (৫৫) শাহবাজপুর, (৫৬) খোশালপুর, (৫৭) অরারা, (৫৮) বিবিজুতি, (৫৯) ভগবতীপুর, (৬০) নবগ্রাম, (৬১) বালিডাঙ্গা, (৬২) মহব্বতপুর, (৬৩) আস্‌রাইল, (৬৪) অলিহাস্তা, (৬৫) হাতিন্দা, (৬৬) সিহিপুর, (৬৭) খেলনেপুর, (৬৮) সিঙ্গিয়া, (৭০) চাঁচল, (৭২) কোনুয়া, (১৩৩) দক্ষিণ শহর, (১৩৬) সাঞ্জীব, (১৩৭) বীরস্থলী, (১৪৫) মতিপুর, (১৪৬) ঝাকরপুর, (১৪৭) শালুকা, (১৪৮) রাজাপুর, (১৪৯) পাহাড়পুর, (১৫০) বমুয়া, (১৫১) কলিগ্রাম, (১৫২) বগছড়া, (১৫৩) ডোমাপীর, (১৫৪) দক্ষিণ বসন্তপুর, (১৫৫) মতিহারপুর, (১৫৬) শীতলপুর দিলালপুর (১৫৭) বলরামপুর কালিপাড়া, (১৫৮) শিবপুর, (১৫৯) বরাতা, (১৬০) জামগাছি, (১৬১) দাউদপুর, (১৬২) রামপুর, ভীমপুর, (১৬৩) মালচা, (১৬৪) মথুরাপুর, (১৬৫) খানপুর ইলাসপুর, (১৬৬) পরশুরামপুর, (১৬৭) নরসিংহপুর, (১৭৩) বালাকন্ট, (১৭৪) রহিমপুর, (১৭৫) গাগরা, (১৭৬) ব্যাকিপুর, (১৭৭) কুসমাই, (১৯৪) জগন্নাথপুর।

খরবা, অন্যান্য মৌজা (জে. এল. নাম্বার অনুসারে) চাঁচল ব্লক - ২ঃ

(৬৯) ভাকরি, (৭১) উত্তর রসুলপুর, (৭৩) উত্তর ভবানীপুর, (৭৪) রামপুর, (৭৫) ইলাম, (৭৬) গোরখপুর, (৭৭) পূর্ব্ব বেজপুরা, (৭৮) সদরপুর, (৭৯) বোয়ালিয়া, (৮০) সূতী, (৮১) কাপসিয়া, (৮২) ডমরু, (৮৩) পূর্ব্ব লতাসী, (৮৪) গৌরহন্দ আম্বাদিপুর, (৮৫) গৌরহন্দ, (৮৬) এনায়েত নগর, (৮৭) শোলাবাঘা, (৮৮) জীতরপুর, (৮৯) আনন্দগঞ্জ, (৯০) বেলুনগাঁও, (৯১) দক্ষিণ ভবানীপুর, (৯২) রানাঘাট, (৯৩) ইলাঙ্গি, (৯৪) শোলমারী, (৯৫) খালিয়াবাড়ী, (৯৬) আওলাগাছি চাউ পুকুরিয়া, (৯৭) দক্ষিণ পবানপুর, (৯৮) উত্তর পরানপুর, (৯৯) চোরুলমনি, (১০০) খেমপুর, (১০১) কাশিমপুর, (১০২) বীজলি, (১০৩) শ্রীপুর, (১০৪) ছিদামপুর, (১০৫) কন্দরণ, (১০৬) ছাইতনবাটী, (১০৭) মেঘদুমরা, (১০৮) দমনভিটি, (১০৯) বঙ্গপাল, (১১০) শম্ভূনগর, (১১১) ছান্দুয়া, (১১২) গঙ্গাদেবী, (১১৩) গোপালপুর, (১১৪) দামাইপুর, (১১৫) কালিগঞ্জ, (১১৬) দুর্গাপুর, (১১৭) আলাদিপুর, (১১৮) শিমূলতলা, (১১৯) বত্রিশকোলা, (১২০) ধূনরিবান, (১২১) বেরাডাঙ্গি, (১২২) বাসুদেবপুর, (১২৩) হরিশপাড়া, (১২৪) কাশিপাড়া, (১২৫) গোবিন্দপাড়া, (১২৬) গৌরসন্ধা, (১২৭) অনুপনগর, (১২৮) বর্ণা বাঘু, (১২৯) মালতীপুর, (১৩০) মহদিপুর, (১৩১) মোহনপুব, (১৩২) কৃষ্ণগঞ্জ, (১৩৪) মহম্মদপুর, (১৩৫) বিদ্যানন্দপুর, (১৩৮) দক্ষিণ রসলপব, (১৩৯) লালগঞ্জ, (১৪০) মীরজাদপুর, (১৪১) গহলাপাড়া, (১৪২) পরানীনগর, (১৪৩) অরাজি গহলাপাড়া, (১৪৪) লক্ষ্মীপুর, (১৬৮, যদুপুর, (১৬৯) ভাস্তরিয়া, (১৭০) কানাইপুর, (১৭১) চন্ডীপুর দরমার, (১৭২) বলরামপুর, (১৭৮) মগ্রা মারাই, (১৭৯) প্রতাপপুর, (১৮০) যানিপুর, (১৮১) রামপুজিতপুর, (১৮২) রামকৃষ্ণপুর, (১৭৩) মকরগুই, (১৮৪) দহুকা, (১৮৫) হজরতপুর, (১৮৬) জালালপুর, (১৮৭) বহরাবাদ, (১৮৮) উজিতপুর, (১৮৯) চন্দ্রাপাড়া, (১৯০) গোয়ালপাড়া, (১৯১) খানপুর, (১৯২) হুসেনপুর, (১৯৩) মাধাই হাট।

অন্যান্য মৌজা (জে. এল. নাম্বার অনুসারে) রতুয়া ব্লক - ১ঃ

(১) গদাই মহারাজ, (২) পশ্চিম রতনপুর, (৩) কমলপুর, (৪) মানিকনগর, (৫) ঈশ্বরপুর, (৬) সাহানগর, (৭) উদয়পুর, (৮) দ্বিতীয় বালুপুর, (৯) রাম নগর, (১০) কতোয়ালী, (১১) সম্বলপুর, (১২) বাজিপুর, (১৩) বালুপুর, (১৪) দুর্গাপুর, (১৫) কাঁশিচক, (১৬) বলরামপুর, (১৭) ক্ষিদিরগঞ্জ, (১৮) রাধানগর, (১৯) দেবীপুর, (২০) জাননগর, (২১) তেরাশিয়া দেবীপুর, (২২) নন্দনপুর গোপালপুব, (২৩) সূর্য্যপুর, (২৪) বিষ্ণুপুর লক্ষ্মীপুর, (২৫) শিবপুর, (২৬) নরোত্তমপুর, (২৭) মোহনপুর, (২৮) হরিপুর গোপী, (২৯) অরাজি হর গোবিন্দপুর, (৩০) হরগোবিন্দপুর, (৩১) কালুটোলা, (৩২) আলুটোলা (৩৩) রঘুনাথছর কালেথান, (৩৪) রতুয়া, (৩৫) রুকুন্দিপুর, (৩৬) মহাদেবপুব, (৩৭) ঘুমানিয়া, (৩৮) নিজগাঁও ফরিদপুর, (৩৯) ডালুয়ারা, (৪০) কারনানা, (৪১) রামপুর, (৪২) বিহাবী, (৪৩) শেহেরাকল, (৪৪) হরিণকল, (৪৫) বাহিরকাপ, (৪৬) বঙ্গশিবপুর, (৪৭) ভাদো, (৪৮) চন্ডীপুর, (৪৯) অরাজিবলরামপুর, (৫০) কনে কট্, (৫১) রামপল চরখী, (৫২) চন্ডীপ্রসাদ, (৫৩) নাওকারাম, (৫৪) দাউদপুর, (৫৫) জগন্নাথপুর, (৫৬) বিশাল গকুলপুর, (৫৭) দোতল, (৫৮) বালিয়া বিনোদপুর, (৫৯) পরাকরম, (৬০) মতিগঞ্জ, (৬১) গোপালপুর, (৬২) অমর সিংঘী, (৬৩)

হরেকৃষ্ণপুর, (৬৪) ছাবিলপাড়া, (৬৬) সামসী, (৬৭) রতনপুর, (৬৮) অন্দিরামপাড়া, (৬৯) গঙ্গারামপাড়া, (৭০) মহেশপুর, (৭৩) মহম্মদপুর, (৮৩) সলাবেতপুর, (৮৪) বিজরাভিটা, (৮৫) লক্ষ্মীপুর, (৮৬) সান্তপুর, (১০০) গৌরিপুর, (১০১) তাল পরানপুর, (১০২) খানপুর, (১০৩) পূর্ব্ব রাধানগর, (১০৪) বানিয়াবাটী, (১০৫) অরাজি রাঘববাটী, (১০৬) দরগাসিনী, (১০৭) দক্ষিণ দুর্গাপুর, (১০৮) শিবরামপুর, (১০৯) রামচক, (১১০) জয়দেব নগর, (১১১) অরাজি রতুয়া, (১১২) বৈকুণ্ঠপুর, (১১৩) আলপাড়া, (১১৪) পূর্ব্ব কমলপুর, (১১৫) ফরিদপুর, (১১৬) আটগামা বলরামপুর, (১১৭) বাহারাল, (১১৮) সাহাপুর, (১১৯) বলরামপুর দিয়ারা, (১২০) বলরামপুর, (১২১) কসবা, (১২২) জোত ল^ক্ষ্মী, (১২৩) রাঘববাটী, (১২৪) বাখরা, (১৫২) গোবিন্দপুর,

অন্যান্য মৌজা (জে. এল. নাম্বার অনুসারে) রতুয়া ব্লক - ২ ঃ

(৭১) শ্রীপুর, (৭২) বল্লভপুর, (৭৪) খেরিয়া, (৭৫) শেখপুর, (৭৬) লস্করপুর, (৭৭) মাগুরা, (৭৮) গৌরনা গোয়ালদহ, (৭৯) গোন্দিপুর, (৮০) হরিরামপুর, (৮১) াগুরা খোদ, (৮২) বড়াইল, (৮৭) সম্বলপুর, (৮৮) কুমারগঞ্জ, (৮৯) পলাশবোনা, (৯০) রানী - নগর, (৯১) মহারাজপুর, (৯২) রাজাপুর, (৯৩) রাঙ্গমাটিয়া, (৯৪) ইলাহাবাদ, (৯৫) সুলতানগঞ্জ, (৯৬) পূর্ব্ব বলরামপুর, (৯৭) শিবনগর, (৯৮) কদমতলী, (৯৯) হরিপুর, (১২৫) নিজগান পরানপুর, (১২৬) চাঁদপুর, (১২৭) পরানপুর, (১২৮) যোগীগোপা বাহাদারপুর, (১২৯) নাওদা, (১৩০) বিষাণপুর, (১৩১) মীরদাদপুর, (১৩২) নাগ গনারাইডাঙ্গা, (১৩৩) পীরপুর, (১৩৪) সীমলা, (১৩৫) বেটাহেক্ বর্ণা, (১৩৬) নেম্তা (১৩৭) সুলতানপুর, (১৩৮) পাহাড়পুর, (১৩৯) কোকলামারী, (১৪০) উত্তর মরিচা বিষাণপুর, (১৪১) সুটাহা, (১৪২) লোকরা, (১৪৩) গোবরজানা, (১৪৪) পুর্খাবিনা, (১৪৫) নসীপুব, (১৪৬) খাইলসানা, (১৪৭) আইলপাড়া, (১৪৮) ছাওদুয়ার, (১৪৯) খরবাড়ী জামুরিয়া, (১৫০) সংকারা, (১৫১) দক্ষিণ মরিচা বিষনাপুর।

বৈষ্ণবনগর, অন্যান্য মৌজা (জে. এল. নাম্বার অনুসারে) ঃ

(২৮) গোবিন্দপুর, (৩২) বৈষ্ণবনগর, (৩৩) বাবুপুর, (৩৪) পালগাছি, (৩৫) জগন্নাথপুর, (৩৬) লক্ষ্মীপুর, (৩৭) চক্ শেহেরদি, (৩৮) দরিয়াপুর, (৩৯) কৃষ্ণপুর, (৪০) চক বাহাদুরপুর, (৪১) সুজাপুর মনদাই, (৪২) চাইনপাড়া, (৪৩) জয়েনপুর, (৪৪) সুখপাড়া, (৪৫) কুম্ভিরা, (৪৬) নূরনগর, (৪৭) বাখরাবাদ, (৪৮) বিয়নাপুর, (৪৯) সাবদুলপুর, (৫০) সুখদেবপুর, (৫১) হাদিনগর, (৫২) নীয়োগি নগর, (৫৩) মোহনপুর খাস, (৫৪) মোহনপুর, (৫৮) নন্দলালপুর, (৫৯) চক্ শেহেরদি, (৬০) ভগবানপুর, (৬১) কালিনগর, (৬২) সাহাবন্দ চক্, (৬৩) সতঙ্গাপাড়া, (৬৪) বেদরাবাদ, (৬৫) গোপালপুর, (১৭৫) মালতিপুর, (১৯১) বানিয়াগ্রাম, (১৯২) দেবীদাসপুর, (১৯৩) পারদেওনাপুর, (১৯৪) পার পরান পাড়া, (১৯৬) জাইওল মারি, (১৯৭) পার লালপুর, (১৯৮) বলরামপুর, (১৯৯) পার অনন্তপুর, (২০০) পার শিবপুর, (২০১) শোভাপুর, (২০২) অরাজি ধরমপুর, (২০৩) ধরমপুর, (২০৪) চাঁদপুর, (২০৫) জোতকাশি (২০৬) পার দক্ষিণ বৈদ্যনাথপুর।

● তথ্য সহায়তা

১. সংস্কৃতির বিবর্তন — আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

২. সাংস্কৃতিকী --- আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৩. মালদহ জেলার পুরাকীর্তি — ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ।

৪. অতীতের স্মৃতিতে গৌড় মালদহ -- শ্রীগোপাল চন্দ্র মণ্ডল।

৫. ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা, ভালবাসা, পৃথিবী, ঈশ্বর — শিবরাম চক্রবর্তী।

৬. সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান -- কার্তিক চন্দ্র শাসমল।

৭. মালদহ জেলার বাঘ চিতাবাঘের গল্প। রতন দাশগুপ্ত (রূপান্তরের পথে, ৩০ শে নভেম্বর)।

৮. লোককথার ঐতিহ্য -- দিব্যজ্যোতি মজুমদার।

৯. বাংলার লৌকিক দেবতা — গোপেন্দ্র কৃষ্ণ রায়।

১০. উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ও ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ — ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়।

১১. প্রসঙ্গ লোক পুরাণ --- ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী।

১২. লোক সমাজ ও সংস্কৃতি -- প্রবোধ কুমার চক্রবর্তী।

১৩ আদিবাসী সমাজ ও পাল পার্বণ --- ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে।

১৪. পূজা পার্বণের উৎসকথা --- পল্লব সেনগুপ্ত।

১৫. লোকজীবন মনস্তত্ত্ব শিল্পসৃষ্টি — মানস রায়চৌধুরী।

১৬. বাংলার লোকশ্রুতি — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

১৭ মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোক সাহিত্য — ডঃ সুনীত কুমার মুখোপাধ্যায়।

১৮. উত্তরবঙ্গের লোক নাটক ও জনজীবন -- সুবোধ সেন।

১৯. বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি — ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০. লোক সংস্কৃতি গম্ভীরা --- ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ।

২১ গম্ভীরা ঃ পুর্ণবিচার — ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ।

২২. সংযোগের সন্ধানে লোক সংস্কৃতি — ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত।

২৩. লোক - সংস্কৃতি গবেষণা --- বাংলার মুখোশ বিশেষ সংখ্যা

২৪. বৈতানিক -- উত্তরবঙ্গের লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি সংখ্যা।

২৫. গম্ভীরা — ডঃ পুষ্পজিৎ রায়।

২৬. পশ্চিমবঙ্গের লোক - সংস্কৃতি বিচিত্রা --- শ্রীসনৎ কুমার মিত্র।

২৭. পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সমাজের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি — ডঃ সুনীল চন্দ্র মণ্ডল।

২৮. লোকশ্রুতি -- বিভিন্ন সংখ্যা।

২৯. লোক সাহিত্যের ইতিহাস --- শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

৩০. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ---- শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যক্তি ঋণ -- স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজ (অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদহ); শ্রীপ্রশান্ত গুহ মজুমদার (সহযোগী জেলা সমাহর্তা) প্রধ্যাপিকা চৈতালী চট্টরাজ (মহিলা মহাবিদ্যালয়), অধ্যাপক ওঙ্কার ব্যানার্জী (মালদা কলেজ), শ্রীবিকাশ রঞ্জন মিত্র (মালদা কলেজ), শ্রীবিজন রায় (মালদা কলেজ), শ্রীশুভেন্দু চৌধুরী (বিধায়ক, মালদা), শ্রীকৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী (প্রাক্তন পৌরপিতা), শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী (রাজস্ব আধিকারিক), উজ্জ্বল কুমার চক্রবর্তী (বাগবাড়ী), গোপেন মাস্টার (কালগালিয়া), শ্রীভবানী চক্রবর্তী (বাঁশবাড়ী), কল্যাণ কুণ্ডু (রামকৃষ্ণপল্লী), শ্রীনীলোৎপল সিংহবর্মা (বাচামারী), বাণী ঘোষ (পুরাতন মালদহ), মুস্তাক আলী (মঙ্গলবাড়ী)

মৌজা অনুযায়ী মালদহ জেলার

মৌজাব নাম	মৌজার কোড নং গ্রাম / শহর (অনুপযুক্তটি কেটে বাদ দাও)												
	গ্রাম					শহর							
৪	৫												
হরিশ্চন্দ্রপুর - ১	০	০	০	১		–	–	–	–	–	–	–	–
হরিশ্চন্দ্রপুর - ২	০	০	০	২		–	–	–	–	–	–	–	–
চাঁচল - ১	০	০	০	৩		–	–	–	–	–	–	–	–
চাঁচল - ২	০	০	০	৪		–	–	–	–	–	–	–	–
রতুয়া - ১	০	০	০	৫		–	–	–	–	–	–	–	–
রতুয়া - ২	০	০	০	৬		–	–	–	–	–	–	–	–
গাজোল	০	০	০	৭		–	–	–	–	–	–	–	–
বামনগোলা	০	০	০	৮		–	–	–	–	–	–	–	–
হবিবপুর	০	০	০	৯		–	–	–	–	–	–	–	–
পুরাতন মালদা	০	০	১	০		–	–	–	–	–	–	–	–
০৪বি.এন.,বি.এস.এফ(এস.এমপি.)	এস	–	০	৪		–	–	–	–	–	–	–	–
১১বি.এন.,বি.এস.এফ(এস.এমপি.)	এস	–	০	৩		–	–	–	–	–	–	–	–
ইংরেজ বাজার	০	০	১	১		–	–	–	–	–	–	–	–
মানিকচক	০	০	১	২		–	–	–	–	–	–	–	–
কালিয়াচক - ১	০	০	১৩	–		–	–	–	–	–	–	–	–
এস.আই.বি.(এস.এম.পি.)	এস	–	০	৫		–	–	–	–	–	–	–	–
কালিয়াচক - ২	০	০	১	৪		–	–	–	–	–	–	–	–
কালিয়াচক - ৩	০	০	১	৫		–	–	–	–	–	–	–	–
১০২বি.এন.বি.এস.এফ.(এস.এম.পি.)	এস	-	০	২		–	–	–	–	–	–	–	–
সি.আই.এস.এফ.(এস.এম.পি.)	এস	–	০	৬		–	–	–	–	–	–	–	–

লোকসংখ্যার পরিসংখ্যান

গ্রাম/ শহব	জনসংখ্যা			০-৬ জনসংখ্যা			শিক্ষিত		
	জ	প	ম	জ	প	ম	জ	প	ম
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
গ্রাম	১৬২৩৬৯	৮৩১২২	৭৯২৪৭	৩৪৫৩৭	১৭৮২৯	১৬৭০৮	৫৬৮৫৭	৩৫০০০	২১৮৫৭
গ্রাম	১৯৮১২৭	১০২০৭৫	৯৬০৫২	৪৬৬৮৭	২৩৯০৯	২২৭৭৮	৬১৮৫০	৩৭৪০৯	২৪৪৪১
গ্রাম	১৭৪১৭৭	৮৯২২০	৮৪৯৫৭	৩২৬৫৯	১৬৪৯৩	১৬১৬৬	৮০১০৯	৪৬৮৬১	৩৩২৪৮
গ্রাম	১৬৫১৬৮	১৪৮৭৩	৮০৯৯৫	৩৪৮৪৪	১৭৬২৫	১৭২১৯	৫৮৪৩৫	৩৪৪০০	২৪০৩৫
গ্রাম	২১৭২৫৯	১১২৪৬২	১০৪৭৯৭	৪৫৮৮৯	২৩১০৬	২২৭৮৩	৭৮১০৪	৪৮০০৪	৩০১০০
গ্রাম	১৬০৯২২	৮২৩৪৬	৭৮৫৭৬	৩৩৫৮৭	১৬৮৮৮	১৬৭০৯	৬১৫৯৭	৩৬০৫৫	২৫৫৪২
গ্রাম	২৯৪৭৪৯	১৫০৩৩৭	১৪৪৪১২	৫২৮৩৮	২৬৫৯৭	২৬২৪১	১২৫৩০৫	৭৭১৭২	৪৮১৩৩
গ্রাম	১২৭১৫৬	৬৫১৯৬	৬১৯৬৯	২৯৪৩৮	১০৪৩৮	১০০০০	৬০৪৭৯	৩৭৩৩৭	২৩১৪২
গ্রাম	১৭১০৪৫	৮৬৪৬৬	৮৪৫৭৯	২৮৯৪৯	১৪৫৯৭	১৪৩৫২	৬৫৭৪৯	৩৭৩৩৭	২৩১৪২
গ্রাম	১২৮৮৯৮	৬৫৭৭৬	৬৩১২২	২৩০৯৯	১১৮১১	১১২৮৮	৪৯৯২০	৩০১৯১	১৯৭২৯
গ্রাম	১১০৩	৮৬৭	২৩৬	১৪৮	৮৮	৬০	৯৩৩	৭৭৬	১৫৭
গ্রাম	১২২৯	৯৪৯	২৮০	১৩৫	৮৩	৫২	১০৮৬	৮৬৩	২২৩
মোট	১৩১২৩০	৬৭৫৯২	৬৩৬৩৮	২৩৩৮২	১১৯৮২	১১৪০০	৫১৯৩৯	৩১৮৩০	২০১০৯
গ্রাম	২২৬২১৫	১১৬৩৭১	১০৯৮৪৪	৪২১৫০	২১৩৪৬	২০৮০৪	৯৪২৩৭	৫৫৭১৭	৩৮৫২০
গ্রাম	২১৪১২৩	১১০৪০৭	১০৩৭১৬	৪৩১২০	২২১৭৮	২০৯৪২	৭৫৯২৭	৪৯৩৬৫	২৬৫৬২
গ্রাম	৩১০৮২০	১৫৯৯১৮	১৫০৯০২	৬১৩৮৫	৩১২১৭	৩০১৬৮	১৩৬৯৯৯	৮০০৭৫	৫৬৯২৪
শহব	১	১	—	—	—	—	১	১	—
মোট	৩১০৮২১	১৫৯৯১৯	১৫০৯০২	৬১৩৮৫	৩১২১৭	৩০১৬৮	১৩৭০০০	৮০০৭৬.	৫৬৯২৪
গ্রাম	২১১৫৩৩	১০৮৯৫৫	১০২৫৭৮	৪২৯১২	২১৭৬৯	২১১৪৩	৭৮৪৭০	৪৭৪০০	৩১০৭০
গ্রাম	২৮৩০৩৬	১৪৫১৪৭	১৩৭১৪৭	৬০০৪৯	৩০৫৮১	২৯৪৬৮	৯১৭৭৯	৫৮৪২১	৩৩৩৫৮
গ্রাম	১১০৮	৮২৩	২৮৫	১৫৩	৮৩	৭০	৯৪৮	৭৫৯	২০৯
গ্রাম	২০৭	২০৭	—	—	—	—	২০৬	২০৬	—
মোট	২৮৪৩৫১	১৪৬৯১৯	১৩৭৪৩২	৬০২০২	৩০৬৬৪	২৯৫৩৮	৯২২৩৪	৫৯০৬৬	৩৩২৬৭
সর্বমোট	৩০৪৯২৪৫	১৫৬৫৫৬০	১৪৮৩৬৮৫	৬০২৫৮৯	৩০৬৬৩৮	২৯৬৯৫১	১১৭৮৯৯১	৭১৭৯৪২	৪৬১০৪৯

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১। বৃহৎ বঙ্গ - প্রথম খণ্ড — দীনেশ চন্দ্র সেন।
২। বৃহৎ বঙ্গ - দ্বিতীয় খণ্ড — দীনেশ চন্দ্র সেন।
৩। বাংলায় মুসলীম অধিকারেব আদিপর্ব — সুখময় মুখোপাধ্যায়।
৪। বাংলা ইতিহাসের দুশো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদেব আমল — শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়।
৫। বাংলাব ইতিহাস (১ম খণ্ড) — রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। বাংলাব ইতিহাস (২য় খণ্ড) — রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭। বাংলা ও বাঙ্গালীব বিবর্তন — ডঃ অতুল সুব।
৮। গৌড়েব ইতিহাস — বজনীকান্ত চক্রবর্তী।
৯। গৌড় ও পাণ্ডুয়া — শ্রীকালীনাথ লাহিড়ী।
১০। গৌড় পাণ্ডুযাব ধারাস্নানে মালদহ — সুধীর কুমাব চক্রবর্তী।
১১। মালদহ — শ্রীসিদ্ধার্থ গুহ রায়।
১২। গৌড় ও পাণ্ডুযাব স্মৃতিকথা — এম আবিদ আলী খান মালদহী।
১৩। গৌড়-পাণ্ডুযাব কাহিনী ও কিংবদন্তী — শ্রীকৃষ্ণ কমল সরকার।
১৪। আমি কালাপাহাড় — শ্রীবিশ্বনাথ বসাক।
১৫। বাংলা স্থাননাম — সুকুমার সেন।
১৬। অতীতেব মালদহ — প্রবাল রায।
১৭। মেদিনীপুরের স্থাননাম চর্চা এবং নাম — বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি।
১৮। মধুপর্ণী — মালদহ জেলা সংখ্যা।
১৯। বাংলা পীর সাহিত্যেব কথা — গিরীন্দ্রনাথ দাস।
২০। পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা — শ্রীসনৎ কুমার মিত্র।
২১। পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সমাজের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি — ডঃ সুনীল চন্দ্র মণ্ডল।
২২। তবকাত-ই-নাসিবী — মীনহাজ - ই- সিরাজ।
২৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস — শ্রীনীহাররঞ্জন রায়।
২৪। বাংলার ইতিহাস (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড) — বমেশচন্দ্র মজুমদার।
২৫। জেলার পুবাকীর্তি — ডঃ প্রদ্যোত কুমার ঘোষ।
২৬। রিয়াজ - উস - সালাতীন — গোলাম হোসেন।
২৭। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১ম, ২য় খণ্ড) — এম. এ. করিম।
২৮। ইতিহাস ও সমাজ চিন্তা — আহমদ্ শরীফ।
২৯। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক — মমতাজুর রহমান তরফদার।
৩০। বাংলা মঙ্গলকাব্যেব ইতিহাস -- শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।
৩১। সংশয়ের দিনগুলো — কমল বসাক (আমাদের মালদা, ২৫ শে আগষ্ট)
৩২। মালদহ জেলার বাঘ-চিতাবাঘের গল্প — রতন দাশগুপ্ত (রূপান্তরের পথে, ৩০ শে নভেম্বর)
৩৩। বাঙ্গালীর কৃশচর্চা — শ্রীকেশব চন্দ্র চক্রবর্তী।
৩৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — শ্রীসুকুমার সেন।
৩৫। ভ্রমণে, দর্শনে মালদহ — কমল বসাক।

৩৬। মালদহ জেলার লোকসাহিত্য (গবেষণাপত্র) — ডঃ পুষ্পজিত রায়।

৩৭। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান — কার্ত্তিক চন্দ্র শাসমল।

৩৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৯। লোকশ্রুতি — বিভিন্ন সংখ্যা।

৪০। জোয়ার — বিভিন্ন সংখ্যা।

৪১। কৌশিকী — আঞ্চলিক ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, ২০০২।

৪২। মালদহের পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি — ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ / মালদা জেলা চতুর্দশ বইমেলা স্মরণিকা